বাংলার লোক-সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ, পি-এইচ্. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

বাংলা ছড়ার প্রথম সংগ্রাহক ও
আজীবন লোক-সাহিত্য প্রেমিক
কবি সার্বভৌম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থ সমর্পিত হইল

বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড : আলোচনা
দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া
তৃতীয় খণ্ড : গীতি
চতুর্থ খণ্ড : কথা
পঞ্চম খণ্ড : প্রবাদ ও ধাঁধা

নিবেদন

'বাংলার লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া' প্রকাশিত হইল। সর্বাগ্রেই আমি বাংলা ছড়ার প্রথম সংগ্রাহক ও বিদগ্ধ সমালোচক; আজন্ম বাংলার লোক-সাহিত্য প্রেমিক সেই বিশাল কীর্তিমান্ পুরুষ কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণ করি। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের এক প্রান্তে 'কড়ি ও কোমলে'র 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', অন্য প্রান্তে তাঁহার জীবিত কালের শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'ছড়া', আর মধ্যাহ্ন আকাশে উদ্ভাসিত লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ 'লোক-সাহিত্য'। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এই ছড়া দিয়া তাঁহার শিশুমনে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ, তারপর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে রচিত 'ছড়া' দিয়া যাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বহুমুখী সাধনার অবসান, তাঁহার প্রভাব এবং অনুপ্রেরণা গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার উদ্দেশ্যেই আমার প্রথম প্রণাম নিবেদন করি।

আজ হইতে মাত্র আট বৎসর পূর্বে যখন আমার 'বাংলার লোক-সাহিত্য' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, ইহার দ্বিতীয় খণ্ড কোন দিন প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই আট বৎসরের মধ্যে যখন প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন বিষয়টি বিস্তৃততর ভাবে প্রকাশিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ পাঠকদিগের মধ্য হইতেও এই বিষয়ে আগ্রহের যে সাড়া পাইলাম, তাহাও অভাবনীয়। সুতরাং গ্রন্থখানি বিস্তৃততর রূপে প্রকাশিত করিয়া বিষয়টির যথাসম্ভব পূর্ণ মর্যাদা দিবার প্রয়াসী হইয়াছি। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা ছড়ার আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। অন্যান্য খণ্ডে ক্রমে অন্যান্য বিষয়ক সংগ্রহ ও আলোচনা স্থান পাইবে। ইহার তৃতীয় খণ্ডে লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ও আলোচনা প্রকাশিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডটিতে লোক-কথার আলোচনা ও সংগ্রহ থাকিবে এবং পঞ্চম খণ্ডটিতে প্রবাদ এবং ধাঁধার আলোচনা ও সংগ্রহ এক সঙ্গেই প্রকাশিত হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রমে পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইবে। তাহা হইলে বাংলার মৌখিক সাহিত্য ধারার পরিচয় অনেকটা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের 'লোক-সাহিত্য' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটিই যে

এই পাঁচখণ্ড গ্রন্থ রচনার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

একদিন বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট যে কয়জন মনীষী বাংলার লোক-সাহিত্য অনুশীলন বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ যেমন রস-দৃষ্টি দ্বারা লোক-সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তেমনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া এই বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের আলোচনা পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহে সে-দিন লোক-সাহিত্যের বহু বিষয় সংগৃহীত হইয়াছিল, বহু সংগ্রহ-গ্রন্থের তিনি ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়া বিষয়টির প্রতি সমাজ ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টি উন্মেষের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া' নামক গ্রন্থের জন্য যে একটি ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের পর এই বিষয়ক সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। 'খুকুমণির ছড়া' গ্রন্থটি আজ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহার লিখিত ভূমিকাটিও ক্রমে লোক-চক্ষুর অন্তরালবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বাংলা ছড়ার আলোচনা বিষয়ে ইহার মধ্য দিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। সেইজন্য আদ্যোপান্ত তাহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। বাংলা ছড়ার আজ নূতন মুল্যায়নের দিনে তাঁহার এই ভূমিকাটি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সহায়ক হইবে।

১৮৯৪ সনে রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' নামক প্রবন্ধ রচিত হইয়া প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাংলা দেশে ছড়ার বহু সংগ্রহই প্রকাশিত হইয়াছে, কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দরই দুইটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাদের সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। রামেসুন্দরের পর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা প্রকাশিত হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহার সময় হইতেই লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার ধারা এ'দেশে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার পর সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও তাহা আর পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। তবে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবার যে স্বাভাবিক প্রেরণা দেখা দিয়াছে, তাহাতেই আজ ইহার বিষয়ে

গভীরতর অনুশীলনের আবশ্যক। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হইতে পারে ভাবিয়া ইহাকে যথাসম্ভব তথ্য দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার বহু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও ইহাই আজ পর্যন্ত বাংলা ছড়ার বিস্তৃততম আলোচনা এবং বৃহত্তম সঙ্কলন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব রস এবং রুচিবোধ অনুযায়ী ছড়া-সংগ্রহের যে একটি নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত নীতি হইতে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেন নাই, রস-সম্মত আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সংগ্রহ দ্বারা তাঁহার কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধে আঘাত করে বলিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ যেমন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমনই কিছু কিছু সংগ্রহে দুই একটি শব্দও পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যে কোন শব্দই পরিবর্তনীয় নহে, রবীন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন; সেইজন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে দুই একটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহার জন্য বিনীতভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরই যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার 'খুকুমণির ছড়া'র সংগ্রহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বহু অঞ্চল হইতেই ছড়া সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সেই সকল সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়াই নিজের সঙ্কলন প্রকাশ করেন; কিন্তু তিনি সমাজ ও ভাষাবিজ্ঞানের দিক হইতে একটি নিতান্ত আপত্তিকর কায করেন—বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলের ছড়াগুলি হইতে প্রাদেশিক ভাষা বর্জন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কলিকাতার কথ্য ভাষায় আনুপূর্বিক রূপান্তরিত করিয়া লন। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা হইতে দুই একটি ছড়া তাঁহার সংগ্রহে স্থান দিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে তিনি তাহাদের সংগ্রহ-স্থান বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ তাহাও করেন নাই। অথচ চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রকাশিত ছড়াও কলিকাতার কথ্য ভাষায় তাঁহার সংগ্রহে স্থান লাভ করিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের যে মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগ্রহের সেই মূল্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই। আঞ্চলিক ভাষা বর্জন করিয়া কিংবা সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত রুচি ও নীতি বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া

কোন ছড়া বর্তমান গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই ; সুতরাং ইহা পূর্ববর্তী সংগ্রহ এবং আলোচনা হইতে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিপুল সংখ্যক ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে এই নীতি গ্রহণ করাই আবশ্যক বলিয়া মনে করি। একই ছড়ার বিভিন্ন পাঠ বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে যে পরিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করা যায় তাহা স্বেচ্ছাচার-প্রসূত নহে, বরং মনোবিজ্ঞান-সম্মত। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ছড়ার কোন পাঠই পরিত্যাজ্য নহে।' বর্তমান গ্রন্থে আমি সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই ছড়ার বিভিন্ন আঞ্চলিক পাঠই নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। যে অঞ্চল হইতে যে পাঠটি যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যথাযথ সেই ভাবেই উপস্থাপিত হইয়াছে। এ' কথা সত্য, একদিন যে ভাবে এ'দেশে এক অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গে আর এক অঞ্চলের অধিবাসীর যোগাযোগ হইত, আজ তাহা সেইভাবে হয় না ; আজ যানবাহন চলাচলের সুবিধার যুগে সেই যোগাযোগ যেমন ব্যাপক, তেমনই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু একদিন তেমন ছিল না—একদিন এই যোগাযোগ যেমন এত ব্যাপকও ছিল না, তেমনই এমন ক্ষণস্থায়ীও ছিল না। সেইজন্য একদিন এক অঞ্চলের ছড়া অপরিবর্তিত রূপে অন্য অঞ্চলে শুনা যাইত না, কিন্তু আজ তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক ভাষার ব্যবধানও নানা কারণে আজ কমিয়া আসিতেছে, সেইজন্য আধুনিক অনেক সংগ্রহের মধ্যেই ভাষা এবং রূপগত বৈচিত্র্য বড় বিশেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রাচীনতর সংগ্রহে তাহা পাওয়া যাইত।

বাংলার মৌখিক সাহিত্যের বিশেষ রূপ, এই ছড়ার প্রভাব যে আধুনিকতম লিখিত সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই—যাইতে পারে না, 'সাহিত্যিক ছড়া' নামক অধ্যায়টির মধ্য দিয়া তাহাই প্রমাণিত হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়টি ইহাতে সংযোগ করিয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনায় কতদিন ধরিয়া কতভাবে যে কতজনের নিকট সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা কোনদিনই সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না। কারণ, পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের কাজ চলিয়াছে। তবে কয়েকজনের কথা যথাসম্ভব উল্লেখ করিতেছি। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নলিখিত লেখকদিগের সংগ্রহ হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি, যেমন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্তরঞ্জন রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, কুঞ্জলাল রায়, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'প্রতিভা' (ঢাকা), 'সৌরভ' (মৈমনসিংহ), 'মাসিক মোহম্মদী', 'অর্চনা', 'উপাসনা', 'বসুধারা', ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংগ্রাহকের সংগ্রহ হইতেও আমি সাহায্য লাভ করিয়াছি। মুর্শিদাবাদ জিলা সরগাছি বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার সেনগুপ্ত ও তাঁহার ছাত্রগণ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ইহার সংগ্রহ কার্যে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। বিগত প্রায় ২৫ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ইহার সংগ্রহ কার্যে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাত্র কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দুলাল চৌধুরী, সুভায বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, পার্থ ঘোষ, সুধাংশু শাসমল, নারায়ণ ইন্দ্র, অমর আদক, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, রমা রায়, দীপালি ঘোষ, তাপসী রায় চৌধুরী, কমলা পেরেরা, সাধনা লাহিড়ী, সুমিত্রা দাশগুপ্ত, শকুন্তলা দেবী প্রভৃতি। অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আশ্‌রাফ সিদ্দিক, মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাশীমপুরী ইহাদের সংগ্রহ হইতেও আমি প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমতী গোপাহেমাঙ্গী রায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ও মালীবুড়ো তাঁহাদের সংগ্রহ হইতে আমাকে সাহায্য দান করিয়াছেন। পুরুলিয়া জিলার সংগ্রহ কার্যে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার মিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের কর্মচারিবৃন্দ আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমার ছাত্র শ্রীমান্ ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় এম, এ কাছাড়ের ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সুপরিচিত পক্ষীতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্ত পক্ষীবিষয়ক ছড়াগুলির আলোচনায় সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির প্রেস কপি তৈরী করিবার ব্যয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন; সেজন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং ভূতপূর্ব উপাচার্য স্বর্গত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহোদয়ের নিকট ঋণী। কবি-বন্ধু শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত মহাশয় আমাকে এই কার্যে সর্বদা উৎসাহ দিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে 'সাহিত্যিক ছড়া'র আলোচনা ব্যাপারে

শ্রীমিহির সেন ও আমার ছাত্র স্নেহভাজন শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র এম, এ সাহায্য করিয়াছেন এবং শব্দসূচী প্রণয়নের দুরূহ কাজও শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের ছড়া সংগ্রহ যে নিতান্ত অপ্রচুর তাহা সকলেই লক্ষ্য করিবেন। উত্তরবঙ্গের ছড়া পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে যেমন প্রকাশিত হয় নাই, তেমনই আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াও এই বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য হই নাই। বাংলার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের কার্য সহজ-সাধ্য করিবার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে আমি বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের পক্ষ হইতে ইতিমধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার ছাত্র শ্রীমান্ দুলাল চৌধুরী এম, এ'র নেতৃত্বে শিলিগুড়িতে একটি কেন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেনগুপ্তের নেতৃত্বে কাসিয়াঙ-এ একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আমার ছাত্রী অধুনা জলপাইগুড়ি কলেজের অধ্যাপয়ত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি চক্রবর্তী এম. এ এবং শ্রীমতী জয়শ্রী চৌধুরী এম. এ.র উপর জলপাইগুড়ি অঞ্চলের সংগ্রহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদিগের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে গ্রন্থের এই অপূর্ণতা দূর হইতে পারে। পুরুলিয়া জিলার কাঁটাদি গ্রামে যে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যেই পরিষদের নিজস্ব জমির উপর গৃহ নির্মিত হইয়া আশানুরূপ সংগ্রহ কার্য আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ পূর্ণতর হইয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

'ছড়ার কোন পাঠই পরিত্যাজ্য নহে'—এই নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য সংগৃহীত বহু ছড়াই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তথাপি যাহাতে প্রত্যেক বিষয়েরই কিছু কিছু ছড়া ইহাতে স্থান পাইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। ভবিষ্যতে যদি সম্ভব হয়, তবে এই খণ্ডের আর একটি ভাগ প্রকাশ করিয়া তাহাতে অবশিষ্ট ছড়গুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
অশোক-ষষ্ঠী, ১৩৬৯ সাল

'........ছড়াগুলি স্থায়ী ভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, সে বিষয়ে বোধকরি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। ......এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়-বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ : 'লোক-সাহিত্য'

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

বাংলার লোক-সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া

ভূমিকা

এক

মৌখিক আবৃত্তির জন্য মুখে মুখেই যাহা রচিত হয়, তাহাই ছড়া। মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্য ধারায় ইহাদের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য বাস্তব জীবনাশ্রিত রচনা। তাহা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মৌখিক ঐতিহ্যই তাহার ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির কিছু কিছু ছড়া নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। লিখিত হইবার ফলে ইহাদের মধ্য দিয়া পূর্ণাঙ্গ মৌখিক রূপ প্রকাশ পাইতে পারে নাই, একথা সত্য ; তথাপি বহুলাংশে ইহাদের মধ্যেও যে মৌখিক সাহিত্যের ধর্ম আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। নিম্নোদ্ধৃত ঘুমপাড়ানি ছড়াটি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ছড়ার একটি রূপ মুখ্য ভাবে অবলম্বন করিয়াই যে ইহা রচিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্ববর্তী আর কোন বাংলা ছড়ার নিদর্শন পাওয়া যায় না, সুতরাং নানা কারণেই ইহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃতি-যোগ্য—

আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগন-ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগন-মণ্ডলে পাতিব ফাঁদ।
ধরিয়া আনিব গগন-চাঁদ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোঁটা।
কালি গড়াইয়া দিব সোনার ভেটা॥

খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখাব গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায়॥

মৌখিক ঐতিহ্য (oral tradition) হইতেই ছড়াটি রচিত হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহারই একটি রূপ বিংশতি শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঁকুড়া জিলার লোক-মুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মনে হয়, মুকুন্দরামের সমসাময়িক কালে প্রচলিত ইহার অনুরূপ একটি মৌখিক রূপকেই মুকুন্দরাম উক্ত লিখিত রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বাঁকুড়া জিলার বেলেতোড় গ্রাম হইতে সংগৃহীত ছড়াটি এই প্রকার—

আয় রে আয়।
কি লেগে কাঁদিস রে বাছা কি ধন তোর চাই॥
খাওয়াইব ক্ষীর খণ্ড মাখাইব চুয়া।
পাকা পাকা পান দিব সরেস গুয়া॥
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া॥
তুলে এনে দিব গগন-ফুল।
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল॥
সে মূলে গড়াব হার সোনার।
আমার যাদু রে কেঁদ না আর॥ —(সা-প-প ২, ৩২৭)

মনসা-মঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যেও মধ্যযুগের বাংলার কতকগুলি মৌখিক ছড়ার লিখিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়া। ঐন্দ্রজালিক ছড়ার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহারা সহজে পরিবর্তিত কিংবা বিকৃত হয় না। কারণ, সাধারণের বিশ্বাস, ইহারা পরিবর্তিত কিংবা বিকৃত হইলে ইহাদের শক্তি হ্রাস পায়; সুতরাং ইহাদের দ্বারা

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত ঐন্দ্রজালিক ছড়াগুলি সমসাময়িক বাংলায় প্রচলিত এই বিষয়ক মৌখিক ছড়ারই এক একটি রূপ বলিয়া মনে হইতে পারে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে রচিত জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গলে নিম্নোদ্ধৃত যে সাপের ঝাড়ন মন্ত্রটি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বহুলাংশে যে মৌখিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়—

দোহাই ধর্মের বিষ পঞ্জরে মিলাও॥
হাড়ি-ঝীর আজ্ঞা আর সিদ্ধিগুরুর পাও।
অনাদ্যের দোহাই বিষ ক্ষয় হইয়া যাও॥
ধর্মে দিলা তৈল ঈশ্বর জ্বালে বাতি।
শিবের হুঙ্কারে বিষ ঘটে হৈলা স্থিতি॥
জল আদি জল মূল জল নিরাকার।
জলেতে জন্মিল জীব জলেতে সংহার॥
আদি ধর্ম নিরঞ্জন প্রভু নিরাকার।
গগন-ধরণী নাহি বিশ্বজলাকার॥
ব্রহ্মরূপে নিরঞ্জন বিস্ময় ভাবিঞা।
বটপত্রে ফিরে প্রভু জলশায়ী হঞা॥
আপনার চরণ তার বদনে আরোপিয়া।
বিশ্বরূপে ফিরে প্রভু আঙ্গুলী চুষিয়া॥
আঙ্গুলী চোষণে নাথ পাইলা বড় প্রীত।
করপদ বহিয়া পড়িল মুখামৃত॥
কর হৈতে জনমিল পীযূষ প্রধান।
পদ হৈতে কালকূট হৈল উপাদান॥ ··ইত্যাদি।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাপে কাটার ঝাড়ন মন্ত্রগুলি সহজে পরিবর্তিত হয় না, সুতরাং মৌখিক এবং লিখিত রূপে যে ইহাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে, তাহা নহে। অতএব উদ্ধৃত ছড়াটি জীবন মৈত্রের সমসাময়িক কালে উত্তর বঙ্গে মৌখিক প্রচলিত সাপে কাটার ঝাড়ন মন্ত্রের একটি রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে একটি ঐন্দ্রজালিক ঘুমপাড়ানি ছড়া আছে, তাহাও সমসাময়িক কালে প্রচলিত

মৌখিক ছড়ারই যে কতকটা লিখিত রূপ তাহাও নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। ছড়াটি এই প্রকার—

জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর॥
আগম ডাখিনা তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিভুটি॥
লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ॥
খাটে বাটে ভূমে পড়ে যেজন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগ তায়॥

খনা ও ডাকের নামে প্রচলিত বাংলার কৃষি এবং নীতিমূলক ছড়াগুলি যে এদেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা গেলেও প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহাদের প্রয়োগের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এমন কি, এই বিষয়ে মঙ্গল কাব্যেও যে কোন উল্লেখ আছে, তাহাও নহে। কিন্তু এই ছড়াগুলি যে ভাবে একদিকে উড়িষ্যা এবং অপর দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এখনও যে ভাবে সাধারণ সমাজের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই মনে হইতে পারে যে, ইহারা দীর্ঘকাল পূর্বেই রচিত হইয়া কেবল মাত্র মুখে মুখে জনসমাজের মধ্য দিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন ছড়ার মধ্যে ভাষাগত প্রাচীনত্বও কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছে। তাহা হইতে মনে হয়, মধ্য যুগের বিভিন্ন সময়েই ইহারা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ছড়ায় লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হইয়াছে; কারণ, এই বিষয়ে ইহাই রীতি; সেইজন্য ভাষা হইতে ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া কঠিন।

মৌখিক সাহিত্যের প্রাচীন রূপের সন্ধান পাওয়া যাইবার কথা নহে। লিখিত সাহিত্যেরই প্রাচীন রূপ আছে, মৌখিক সাহিত্যের তাহা নাই। তবে ঊনবিংশ বিংশতি শতাব্দীতে যে বিপুল ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা ঊনবিংশতি বিংশতি শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় নাই, ইহারা একটি ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। কতকগুলি সমসাময়িক সামাজিক প্রথা ও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে,

ইহাদের রচনা কাল উক্ত সামাজিক প্রথার প্রচলন কাল কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনার সংঘটন কালের পূর্ববর্তী নহে। যেমন, 'বর্গী এল দেশে' ছড়াটি বর্গীর আক্রমণের পূর্ববর্তী কালে রচিত হইতে পারে না—এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্গীর আক্রমণকালীন বাংলা ভাষার রূপ যে ইহার ভাষায় রক্ষা পায় নাই—তাহা যে আধুনিকতায় পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে—তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং ছড়ার সংগ্রহও আধুনিক কালেই সম্ভব হইয়াছে, প্রাচীন কিংবা মধ্য যুগে তাহা হইবার উপায় ছিল না।

দুই

আধুনিক কালের বাংলা ছড়ার সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়, ইহার কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলার লোক-সাহিত্যের এই একটি বিশিষ্ট সম্পদকে সাধারণ লোক-দৃষ্টির সম্মুখবর্তী করিয়াছেন। ইহার পূর্বে ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজনে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক বাংলার কিছু কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সঙ্কলনের রীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে একটি নূতন বিষয়ই সর্বপ্রথম সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহাই নহে; ইহার সম্পর্কে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বাংলার লোক-সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপকরণরূপে কতকগুলি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার সংগ্রাহক রেভাঃ উইলিয়ম মর্টন। ইহার মধ্যে আট শতাধিক বাংলা প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল, কিছু সংস্কৃত প্রবাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইংরেজি ভাষাভাষীদিগের প্রয়োজনেই ইহাদের 'translation and application in English' ইহাদের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছিল। তিন বৎসর পর উইলিয়ম মর্টন তাঁহার দ্বিতীয় বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাও ইংরেজি অনুবাদ এবং ইংরেজি ভাষায় প্রয়োগের উদাহরণ সহ প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রায় দেড়শত বাংলা প্রবাদ ইহার মধ্যেও স্থান লাভ করিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বৃহত্তম বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম 'প্রবাদ-মালা'। ইহার পরিচয়-পত্রিকায় উল্লেখিত হইয়াছে, " 'প্রবাদ-মালা'। বঙ্গদেশীয় বিবিধ জানপদ ব্যবহার মূলক। Two Thousand

Bengali Proverbs illustrating Native Life and Feeling." ইহাতে সঙ্কলয়িতার কোন নামোল্লেখ না থাকিলেও ইহা যে পাদ্রী রেভাঃ জেম্‌স্ লঙের সঙ্কলন, তাহা সকলেই মনে করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ জেম্‌স্ লঙের বাংলা প্রবাদের দ্বিতীয় সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, ইহাতে 'Three Thousand Bengali Proverbs and Proverbial sayings illustrating Native Life and Feeling among Ryots and women' সংগৃহীত হইয়াছিল। এ'যাবৎ প্রকাশিত প্রবাদ-সংগ্রহগুলির মধ্যে কিছু কিছু ছড়াও সংগৃহীত হইয়াছিল, এ' কথা সত্য; কারণ, ছড়া এবং প্রবাদে সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ ইংরেজ সংগ্রাহকদিগের থাকিবার কথা ছিল না, তবে স্বতন্ত্রভাবে ছড়া বলিয়া কোন সংগ্রহ সেদিন পর্যন্ত নির্দেশ করা হয় নাই, সকলই প্রবাদ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি, এই পার্থক্যবোধ যে বাঙ্গালী সংগ্রাহক-দিগের মধ্যেও সর্বদাই বর্তমান থাকিতে দেখা যায়, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি যে ছড়া, তাহা অনেকে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন—

কাক কালো, কোকিল কালো কোলো ফিঙের বেশ।
তার চাইতে অধিক কালো, কন্যা, তোমার মাথার কেশ।

অথচ একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রবাদ সংগ্রাহকও ইহাকে তাঁহার প্রবাদ সংগ্রহের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ইংরেজ সংগ্রাহকগণ এই শ্রেণীর ভুল করিবেন, তাহাতে অস্বাভাবিকতার কিছু নাই।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন্ বাংলা লোক-সাহিত্যের আর একটি বিষয় উত্তর বঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশিত করেন, তাহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান'। গীত বা গীতিকা ইংরেজি ballad শ্রেণীর রচনা, ইহার মধ্যেও কোন ছড়া প্রকাশ পাইবার কোন অবকাশ ছিল না। তবে এ'কথা সত্য, রচনা কিংবা বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহার অনেক অংশই বাংলা ছড়ার স্বধর্মী। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর যে বর্ণনা আছে, তাহা বাংলা দেশে প্রচলিত গাজীর ছড়ার অনুরূপ। নিম্নোদ্ধৃত পদ কয়টি ('গোপীচন্দ্রের গান' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং ১৯৫৯, পৃ. ৭৮) বাংলা ছড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে—

দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী।
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী॥

*　　*　　*　　*

মাছে চিনে গহীন জমিন পক্ষী চিনে ডাল।
মায় চিনে পুতের দয়া যার বক্ষে শাল।

স্বতন্ত্রভাবে না হইলেও 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' বা 'গোপীচন্দ্রের গানে' প্রকাশিত এই শ্রেণীর কয়েকটি পদই বাংলা ছড়ার প্রাচীনতম সংগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

ইহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ লালবিহারী দে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Folk-tales of Bengal* নামক গ্রন্থে 'আমার কথাটি ফুরুলো' এই সুপরিচিত ছড়াটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিলেন এবং ইহার সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন—

'Sambhu's mother used always to end every one of her stories—and every orthodox Bengali story-teller does the same—with repeating the following formula—

Thus my story endeth,
The Natiya-thorn withereth.
"Why, O Natiya-thorn, dost wither ?"
"Why does thy cow on me browse ?"
"Why, O cow, dost thou browse ?"
"Why does thy neat-herd not tend me ?"
"Why, O neat-herd, dost not tend the cow ?"
"Why does thy daughter-in-law not give me rice ?"
"Why, O daughter-in-law, dost not give rice ?"
"Why does my child cry ?"
"Why, O child, dost thou cry ?"
"Why does the ant bite me ?
"Why O ant, dost thou bite ?"
Koot Koot! Koot!

'What these lines mean why they are repeated at the end of every story, and what the connection is of the several parts to one another, I do not know. Perhaps the whole is a string of nonsense purposely put together to amuse little children.'

কিন্তু এই পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮৩ সন পর্যন্ত কোনও বাংলা ছড়া স্বাধীনভাবে বাংলায় প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি, গ্রীয়ারসন কর্তৃক প্রকাশিত মাণিকচন্দ্র রাজার গানের মধ্যেও যে ছড়াগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গীতিকার সঙ্গে একাকার হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, রেভাঃ লালবিহারী দে কর্তৃক উদ্ধৃত ছড়াটিও ইংরাজি অনুবাদের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মধ্য দিয়া জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি নানাভাবে যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনের সূচনাতেই তাহার প্রভাব নিজের জীবনে গভীরভাবে অনুভব করিলেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

'আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সর্বপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোন নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।'

এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশবশিক্ষার সূচনা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী পাঠ করিয়া স্বদেশ প্রেম কিংবা ভলটেয়র, রুসোর জীবনী পাঠ করিয়া মানব-প্রেম শিক্ষালাভ করিতে হয় নাই। নিজস্ব পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে শৈশব শিক্ষার ভিতর দিয়াই তিনি জীবনে

ইহার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লোক-সংস্কৃতি অনুশীলন কবিবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান সবে মাত্র স্থাপিত হয়, তাহাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মধারা সম্পর্কে তাঁহার কোন জ্ঞান কিংবা পরিচয় ছিল না; সুতরাং এই বিষয়ক তাঁহার সর্ববিধ প্রেরণাও তাঁহার পারিবারিক জীবনের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং যে শিক্ষা পুথিলব্ধ নহে, যে শিক্ষা পরানুকরণজাত নহে, যে শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও নহে, শৈশবের সেই পারিবারিক জীবনের সহজাত শিক্ষা তাঁহার জীবনে যে সুগভীর প্রেরণা সঞ্চার করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অগ্রজগণ 'হিন্দু মেলা'র অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। হিন্দু মেলাই ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'হিন্দু কন্‌ফারেন্স' নহে, 'হিন্দু কংগ্রেস' নহে, এমন কি, ইহাদের বাংলা অনুবাদ হিন্দু সম্মেলনও নহে, বরং তাহার পরিবর্তে 'হিন্দু মেলা' কথাটির ভিতর দিয়াই সেদিনকার ঠাকুর পরিবারের স্বাজাত্যবোধের বিশেষত্বটি যে কোন্ ধারায় অগ্রসর হইতেছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যাইবে। কারণ, এ'দেশের সংস্কৃতিতে 'মেলা' শব্দটির দ্বারা যে তাৎপর্য প্রকাশ পায়, ইংরেজি শব্দ 'কন্‌ফারেন্স', 'কংগ্রেস' দ্বারা তাহা পায় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির মর্ম কথাটি যে কি ভাবে ধরা দিয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়।

যে বয়সে শিশু মাতামহী পিতামহী কিংবা জননীর নিকট হইতে রূপকথা ও ছড়া শুনিয়া আনন্দলাভ করে, সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'দাস-রাজত্বে'র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করিতেছিলেন। রুগ্না জননীর সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি শৈশবে বাড়ীর দাস-দাসী; চাকর-চাকরানি, সহিস, কোচম্যান, মাঝি-মাল্লা, কর্মচারী-গৃহশিক্ষক ইহাদের সান্নিধ্য হইতে কি ভাবে যে বাংলার পল্লী সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার শিশু মনের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতেন, তাহার কথা তাঁহার জীবনীতে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই শিক্ষার ধারা কোন দিক হইতেই বাধা প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহার জীবনে ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত পরিবারে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পল্লী সাহিত্যের প্রবেশাধিকার সেখানকার অন্তঃপুর জীবনে নিতান্ত সঙ্কুচিত ছিল; কিন্তু এই সকল নানা ক্ষেত্র হইতে তিনি পল্লী সাহিত্যের সহজ সরল এবং নিতান্ত অনাড়ম্বর রসোপকরণগুলি সন্ধান করিয়া গভীরভাবে তাহাদিগকে আস্বাদন করিতেন, তাঁহার শিশুচিত্ত তাহা অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

১৮৮৩ সনে অর্থাৎ যখন তাঁহার বাইশ বৎসর বয়স, তখন 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামক বাংলার পল্লী ও লৌকিক ধর্মসঙ্গীতের একটি সঙ্কলন সমালোচনা করেন। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজিশিক্ষিত নব্য বঙ্গ সমাজ রচিত তৎকালীন বাংলা ভাষার কৃত্রিমতার তুলনায় পল্লী সাহিত্যের সহজ ও সাবলীলতার তিনি যে উল্লেখ করেন, তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহার দৃষ্টি বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের কোন স্তরে যে সে দিন নিবদ্ধ ছিল, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,

'চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাবটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই— বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতে ইহা লেখা সম্ভব এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিস লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক, আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন, এমন লেখা ইংরেজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই। সংস্কৃতবাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই; এ কি বাঙ্গালা; আমরা তাঁহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে, আর ইংরেজিওয়ালাদের ভাষাও বাংলা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই। আর ইংরেজি ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।'

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাষার সন্ধান পাইলেন। সেইজন্য সেই বয়স হইতেই তিনি লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে সক্রিয় ভাবে মনোযোগী হইলেন। ১৮৯৪ সনের পূর্ব হইতেই তাঁহার মেয়েলী ছড়ার সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ১৮৯৪ সন, বা ১৩০১ সাল হইতে 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সংগৃহীত ছড়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইভাবেই স্বতন্ত্রভাবে বাংলায় বাংলা ছড়ার প্রথম সংগ্রহ প্রকাশ পাইল।

চার

১৩০১ সাল হইতে 'সাধনা' এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেও, তাঁহার প্রকৃত সংগ্রহ কার্য যে ইহার কিছু কাল পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এই সংগ্রহ কার্যে তিনি যে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা না গেলেও, কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। ১৩০৫ সালে লিখিত 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাঁহাদের উপর তিনি গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন,

'প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে, এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উহা জানেন না। দুই একজন জানিলেও সকলে জানেন না। সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচগ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়। এদেশের পুরাতন বৈষ্ণবীগণের দুই-একজনকে মাঝে মাঝে এইরূপ কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাই। তাহাদের কথিত ছড়াগুলি সমস্তই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক। এইরূপ বৈষ্ণবী সচরাচর মেলে না এবং মিলিলেও সকলেই একবিধ ছড়াই গাহিয়া থাকে। এমতস্থলে একাধিক নূতন ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত বহু বৈষ্ণবীর সাহায্য আবশ্যক। তবে শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির কৃপায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুই একটি বিদেশিনী নূতন বৈষ্ণবীর "জয় রাধে" রব শুনিতে পাওয়া বড়ো কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের উপর ইহাদের সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। যতদূর জানিতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারীর কর্মচারীদিগের উপরই প্রধানতঃ ইহাদের সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সকলের দায়িত্ব ও রসবোধ সমান ছিল না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের তখন পর্যন্তও পল্লীজীবনের সঙ্গে নানাভাবে যোগ ছিল বলিয়াই তাহারাই তাঁহার এই কার্যে যথার্থ সহায়ক হইতে পারিবে বিবেচনা করিয়া প্রধানতঃ তিনি তাহাদেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই বিস্তৃত ছিল, সুতরাং এই সকল কর্মচারী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপকরণই গৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়ে বলিয়াছেন, 'ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা লক্ষিত হইবে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ গভীরভাবে অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কলিকাতা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংগ্রহই তিনি প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত অল্পই দৃষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছড়ার সংগ্রহ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার মাত্র দশ বার বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে লোক-সাহিত্য বিষয় অনুশীলন করিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 'ফোকলোর সোসাইটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে ইউরোপের স্কাণ্ডানেভিয়ায় এই বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেও ইংলণ্ডের সঙ্গে তাহার কোন যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। স্কাণ্ডানেভিয় দেশের অনুসরণেই ইংলণ্ডে যে প্রতিষ্ঠানের প্রথম সৃষ্টি হইল, তাহাও প্রধানতঃ লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ কেবলমাত্র সংগ্রহের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলাদেশের ছড়াগুলির সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের কার্যে মনোযোগী হইলেন, তখনও ইংলণ্ড এই বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে নাই। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিবার যে পদ্ধতি বা প্রণালীটি গ্রহণ করিয়াছিলেন. তাহা তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের লোকশ্রুতিবিদ্‌গণের অগোচর ছিল।

ইউরোপের অন্তর্গত স্কাণ্ডানেভিয়ান দেশ সমূহ অর্থাৎ সুইডেন, নরওয়ে কিংবা ডেনমার্ক এই বিষয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলেও, সে দেশে যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতগণ সংগৃহীত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এই বিষয়ক স্কাণ্ডানেভিয়ান পদ্ধতিই আধুনিক মার্কিন দেশীয় পদ্ধতির পথপ্রদর্শক। ইহাদের কাহারও ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারার কোন প্রকার যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছড়ার সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ বিষয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এ কথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, তাহা পাশ্চাত্ত্য প্রণালী অপেক্ষা নানা বিষয়েই অধিকতর সন্তোষজনক। কারণ, পাশ্চাত্ত্য জগতে এই বিষয়ের যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ ভাষা-তত্ত্ববিদ্, ভাষাতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজনে তাঁহারা এই বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ আর একশ্রেণীর উৎসাহী জাতি বা নৃতত্ত্ববিৎ ; ইঁহাদের কেহই আন্তর্জাতিক প্রতিভার অধিকারী কবি নহেন। ইঁহাদের দৃষ্টি তত্ত্বসন্ধানী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি রস-সন্ধানী। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন,

'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।'

সুতরাং ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। অতএব রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ক প্রেরণা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণজাত নহে। নিজস্ব মৌলিক কবি-প্রতিভা হইতেই জাত এবং এই বিষয়ক তিনি যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার নিজস্ব। কিন্তু তিনি ইহাদের যে কাব্য-রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বস্তুরস নিরপেক্ষ নহে। কবির দৃষ্টি সত্যের দৃষ্টি। সুতরাং কবির দৃষ্টি দ্বারা ইহাদের রসের বিচার হইলেও এই রস বস্তু কিংবা সত্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না বলিয়া ইহাও সাহিত্য সমালোচনার যথার্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে ব্যর্থকাম হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ছড়া-সংগ্রহের মধ্যে যেমন দুইশ্রেণীর ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তেমনই গীতি সংগ্রহের মধ্যে ('গ্রাম্য-সাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) দুই তিন শ্রেণীর গীতিই প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে। ছড়ার মধ্যে যে দুই শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা ছেলে ভুলানো ছড়া ও ছেলেখেলার ছড়া ; গীতির মধ্যেও হরগৌরীবিষয়ক সঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক

সঙ্গীত এবং সাধারণ প্রেমসঙ্গীত—এই তিন শ্রেণীর সঙ্গীতই সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা লোক-সাহিত্যের যে আরও বিচিত্র উপকরণ আছে, তিনি তাহাদের কোন সংগ্রহ কিংবা আলোচনা প্রকাশ করেন নাই। তবে বাংলার কয়েকটি প্রচলিত রূপকথা অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাহার একটি সরস উপলব্ধিও প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ১২৯৮ সনে তাঁহার 'ছিন্ন পত্রে'র এক স্থানে শিলাইদহ হইতে লিখিতেছেন,

'ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরাজি নাম, ইংরাজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম, এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গাম।...বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরস ক'রে লিখতে পারতুম, তা'হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হতো।'

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাংলার মেয়েলি রূপকথা তিনি বেশি জানিতেন না এবং এই অভাবের বেদনা তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার রূপকথা সম্পর্কে তাঁহার যতটুকু পরিচয় ছিল, ততটুকুর উপরই নির্ভর করিয়া তিনি সেই যুগেই রচিত তাঁহার 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে 'বিম্ববতী' (১২৯৮), 'রাজার ছেলে রাজার মেয়ে' (ঐ), 'নিদ্রিতা' (১২৯৯), 'সুপ্তোত্থিতা' (ঐ) প্রভৃতি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, বাংলার লোক-সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন যেটুকু জ্ঞানই লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার কাব্যসাধনার মধ্যে নিয়োগ করিয়াছেন। তবে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে ছড়া সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ছড়ার আলোচনাই তাঁহার যে বিস্তৃততম হইয়াছে, তাহা নহে—তাহা গভীরতম হইবারও সুযোগ লাভ করিয়াছে।

ছড়াগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন, 'সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহার প্রতি স্বাভাবিক মমত্ব বশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী, আমাদের স্ত্রী-কন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয় পালিত মধুর কণ্ঠ লালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।' বর্তমান সংগ্রহেরও ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঁচ

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের সংগ্রহকার্য যেমন কঠিন, ইহার বিচারও তেমনি জটিল। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের যে পদ্ধতি সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ যান্ত্রিক। এমন কি, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহীত হয় এবং তাহা ভিত্তি করিয়াই ইহার আলোচনা হইয়া থাকে। আজ হইতে সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন, তখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইবার সূচনা দেখা দেয় নাই, তথাপি তখনও সেখানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত, তাহা অনেকটা যান্ত্রিক নিয়মেরই অনুসারী ছিল। তথাপি এ' কথা সত্য, তাহাতে কতকটা হৃদয়ের স্পর্শও অনুভব করা যাইত। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই বিষয়ক যে যান্ত্রিক নিয়মটি আধুনিক যুগে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিভিন্নমুখী দিক হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে; প্রথমতঃ ভাষাতত্ত্বের দিক। ইহাতে প্রাদেশিক শব্দের উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া, প্রতিটি শব্দ ও তাহার উচ্চারণের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন। সামগ্রিক ভাব কিংবা রস অথবা চিত্রের পরিবর্তে এখানে শব্দ-দেহের গঠনটিই লক্ষণীয়। সুতরাং ইহা সাহিত্যের প্রয়োজন নহে, ব্যাকরণের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোক-সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর দিয়া যে এই পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এমন কি, কোন কোন শব্দ যেখানে তাঁহার নিজস্ব আদর্শ ও নীতিবোধে আঘাত করিয়াছে, সেখানে তিনি সমগ্র বিষয়টিই পরিত্যাগ করিয়াছেন। একটি মাত্র ক্ষেত্রে একটি ছড়া তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার একটি আপত্তিকর শব্দ তিনি পাঠকের নিকট অনেক জবাবদিহি করিয়া তবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব।

ভাষাতত্ত্ব না হইলেও বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য বাংলা দেশে লোক-সাহিত্যের উপকরণ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও কেহ কেহ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে' কথা পূর্বে বলিয়াছি। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ তখন এদেশে আসিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারাই নিজেদের প্রয়োজনে বাংলা ব্যাকরণ

প্রণয়ন করিয়াছিলেন; সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন নাই, বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা বাংলা ভাষার রূপটি সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেইজন্য বাংলার পল্লী জীবন হইতে তাহার ভাষার নিদর্শন সন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা কিছু কিছু বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই বাংলার লোক-সাহিত্য রূপে বাংলার প্রবাদই প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে কোন প্রবাদ স্থান পায় নাই। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্ব কিংবা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উপযোগী হইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। বাংলার আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ বাংলা লোক-সাহিত্যের কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, তবে তিনি উপরোক্ত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদিগের মত প্রবাদ মাত্র সংগ্রহ করেন নাই, বাংলা লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর বাংলার কৃষকদের নিকট হইতে শুনিয়া 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামে যে গীতি-কাহিনী প্রকাশ করিলেন, তাহাই বাংলার লোক-সাহিত্যে প্রথম সংগৃহীত গীতিকা (বা Ballad)। তারপর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সমীক্ষা (Linguistic Survey) প্রসঙ্গে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-গীতিও কিছু কিছু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মূলতঃ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার সুবিচারের জন্যই তিনি ইহাদিগকে প্রকাশিত করিলেও ইহাদের দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; ইহারা প্রবাদমাত্র ছিল না বলিয়া ইহারা একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক আবেদন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল; তাহার ফলেই বাংলা লোক-সাহিত্যের অনুরূপ বিভিন্ন উপকরণের অনুসন্ধানের জন্য অনেকের মনেই আগ্রহ সৃষ্টি হইল। একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, স্যার জন গ্রীয়ারসনকেই বাংলা গীতিকা ও লোক-সঙ্গীতের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তীকালে বাংলা লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হইয়া কিছু কিছু গ্রাম্য সঙ্গীত সংগ্রহ করিলেও কোনও গীতিকা তাঁহার সংগ্রহে স্থান পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লোক-সাহিত্য বিষয়ের আলোচনায় নিজের সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কাহারও সংগ্রহের

উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং দেখা যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্ব কিংবা ব্যাকরণ রচনার জন্য সেদিন লোক-সাহিত্যের যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইতেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশে সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার জন্যও অনেক সময় লোক-সাহিত্যের উপকরণ অবলম্বন করা হইয়া থাকে এবং সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আমাদের দেশে এখনও নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় আছে এবং এই উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত কেহ আজও এ'দেশে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কিংবা তাহার ব্যবহার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যদিও ইহাদের এই বিষয়ক মূল্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়, তথাপি এই উদ্দেশ্যে তাঁহার উপকরণ-সমূহ তিনিও সংগ্রহ করেন নাই। সমাজ-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার জন্য লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত নীতি ও রুচিবোধ দ্বারা কোন দিক দিয়াই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না—সমাজের মধ্যে যাহা যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা কোন দিক দিয়া পরিবর্তিত কিংবা মার্জিত করিয়া লইবার অধিকার কাহারও নাই, অবশ্য লোক-সাহিত্যের সকল উপকরণ সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য, তথাপি সাধারণ লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক যেমন তাঁহার রুচি এবং নীতিবোধের অনুগামী না হইলে লোক-সাহিত্যের বিশেষ কোন উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, সমাজ কিংবা নৃতত্ত্ববিদ্ তাহা পারেন না, তাহাতে সকল কিছুই যথাযথ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। গ্রাম্য জীবনের স্থূল পরিচয় তাঁহার পরিত্যাগ করিবার যেমন অধিকার নাই, মার্জিত করিবারও কোন অধিকার নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে তাঁহার লোক-সাহিত্যের উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই বিষয়ে কি নীতি যে তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি 'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে' এই ছড়াটি সংগ্রহ করিতে গিয়া ইহার শেষ চরণের অর্ধেক অংশ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তিনি পাঠক সমাজের নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিয়াছেন,—

'এইখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুইটি একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভাল, তথাপি সাধারণতঃ এরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহ কালে তাহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা এই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে ॥'

কোন শব্দটিকে যে রবীন্দ্রনাথ এইখানে 'ইতর ভাষা' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে; অথচ এ'কথা সত্য, এই শব্দটি দীনবন্ধু, অমৃত লাল প্রভৃতির রচনার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট নীতি, রুচি ও রসবোধ পল্লী হইতে সংগৃহীত ছড়ার মধ্যেও ইহাকে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিল না। অথচ এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এ'কথাও মনে করেন নাই যে, ইহা উন্নত রুচি ও নীতিবোধ আঘাত করে বলিয়া সর্বথা পরিত্যাজ্য। তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি বিশেষ একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন, পরিবর্তন করিতে না হইলেই তিনি সর্বাপেক্ষা সুখী হইতেন। ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দই যে একটি রস, বাক্য ও চিত্রগত অখণ্ডতা রক্ষার সহায়ক, তাহা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ভদ্র সমাজে পরিবেশন করিবার মত যোগ্যতা থাকাও যে আবশ্যক, এ'কথা তিনি মনে করিতেন। এই মনোভাব কিংবা রুচিবোধ দ্বারা লোক-সাহিত্যের যে উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা সাহিত্য রসোপলব্ধির

যতখানিই সহায়ক হউক, অন্ততঃ সমাজ কিংবা নৃতত্ত্ববিদের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিতে পারে না ; কারণ, সমাজ কিংবা নৃবিদ্যা আলোচনার জন্য সকল তথ্যই প্রয়োজনীয়, কোন কিছুই বর্জনীয় নহে। এমন কি, সমাজের গালাগালির ভাষাও সমাজতত্ত্ববিদের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এ কথা মনে করিতে পারেন যে, ইতিহাস রচনার প্রয়োজনেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুরের কৃষক সমাজ হইতে সংগৃহীত গোপীচন্দ্র বিষয়ক গীতি-কাহিনীতে একাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ের মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে লোক-সাহিত্য যেমন সেখানে সংগৃহীত হয় না, তেমনিই ইহার কোন তথ্যই ঐতিহাসিক নজির হিসাবেও ব্যবহৃত হয় না। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—'It is like a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits'.

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ নিতান্ত আধুনিককালে এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া এ' কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না।'*

উপরি উদ্ধৃত ইংরেজ সমালোচকের সাম্প্রতিক এই উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বেকার এই উক্তির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই প্রাচীন কোন ঐতিহ্য থাকিলেও ইহা নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই ইহার প্রাণধারা অব্যাহত রাখিয়া চলে। সুতরাং ইহার মধ্যে ইতিহাসের তথ্য যাহা থাকে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, ঐতিহ্যের রূপে তাহা ইহার মর্মমূলে সমাহিত হইয়াই থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সমসাময়িক নূতন উপকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উক্তিরও ইহাই অর্থ। 'প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ

অংশ' রক্ষা করিয়াই লোক-সাহিত্যের পরিচয়; অথচ এ' কথাও সত্য যে, এই সকল বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক উপকরণগুলিকে একত্র যোগ করিয়া ইতিহাসের কোন পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহাদের মধ্য হইতে উদ্ধার করা যায় না। 'কোন পুরাতত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না'। কথার অর্থ এই যে, লোক-সাহিত্যের উপকরণ ঐতিহাসিকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না, অথচ ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপকরণ যে তাহাতে নাই, তাহাও নহে। কবিত্বের দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন,

'বালকের কল্পনা ঐতিহাসিক রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রু বাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।'

লিখিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমসাময়িক সমাজ-জীবনের রূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে; সেইজন্য মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য হইতে কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীরও কথা ও নাট্যসাহিত্য হইতে আমরা সমসাময়িক সমাজ জীবনের এক একটি পরিচয় পাইতে পারি। কিন্তু লোক-সাহিত্য হইতে তাহা পাইবার উপায় নাই। লোক-সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনের পরিচয় পাই, তাহা অতীত জীবনের নহে, ভবিষ্যৎ জীবনেরও নহে; অতীত জীবনের কোন ভার ইহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়ালোক ইহার কল্পনা অধিকার করিতে পারে না, কেবলমাত্র প্রবহমাণ জীবনের ধারায় ইহা অগ্রসর হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার বাংলার ছড়ার সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,

'তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে' সেইটিই তাঁহার নিকট 'আদরণীয় বোধ হইয়াছিল,—'আর কোন প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তিনি ইহাদের সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাম্প্রতিক কালে কিংবা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেও যাঁহারা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র যে ইহাদের প্রতি কাব্যরসের আকর্ষণ বশতঃ এই কার্য করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ কিংবা সমাজ-নৃতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-সাহিত্যের উপকরণ আর কেহই

এ' যাবৎ সংগ্রহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন কবির ত কথাই নাই, সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকও এই কার্যে ব্রতী হন নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ইহাদের ভিতর দিয়া যে রসবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন, অন্য কেহ তাহা পান নাই। ইহা যে বাংলা লোক-সাহিত্যের পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের কথা বাদ দিলেও আজ প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ বাংলা দেশেই বাংলা সাহিত্যের যে অনুশীলন হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়াও যে সকল প্রতিভার উদয় হইয়াছিল, তাহাদের কেহই এই বিষয়ের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের কাহারও রচনার ভিতর দিয়া বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি কোন আকর্ষণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই ; তাঁহাদের সাহিত্যের মূলে বাংলার লোক-সাহিত্যের যে কোন প্রভাব ছিল, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁহার 'লোক-সাহিত্যে'র প্রবন্ধ কয়টির ভিতর দিয়াই নহে, নিজের ধ্যান-ধারণার মধ্যেও ইহার রস স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে লিখিয়াছেন,

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান'

এই ছড়াটি বাল্যকালে 'আমার নিকট মোহমন্ত্রের মত ছিল' এবং 'সেই মোহ' এখনও 'আমি ভুলিতে পারি নাই', ইহা কেবলমাত্র তাঁহার বাংলার জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপের প্রতি লৌকিক প্রশস্তি-বাচন নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ কতকগুলি পর্ব বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কথা তাঁহার সাধনায় কত গভীর সত্য। বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি আমাদের যথার্থ পরিচয় নাই বলিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা এখনও সম্যক্ সচেতন হইতে পারি নাই।

লোক-সাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই সংগ্রহ কার্য স্বভাবতঃই জটিল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা আরও জটিল ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে পল্লীজীবনের যোগ খুব নিবিড় ছিল না। বিশেষতঃ এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি পূর্ব হইতে তাঁহার পরিচিত ছিল না, সুতরাং এই সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই তাঁহাকে কার্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার সংগ্রহের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের দিকে লক্ষ্য করিলে সেই পরিকল্পনা

যে কত সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। শুধু নিজের দিক দিয়াই যে তাহা সার্থক ছিল, তাহা নহে—তাঁহার নিজের সার্থকতা দ্বারা অন্য যাঁহাদিগকে এই কার্যে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের কার্যে ব্যাপক সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পর পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলার লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন, একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তাহাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম রচনার যুগ। রবীন্দ্র কাব্যসাধনার দিক দিয়া তাহা প্রধানতঃ 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র যুগ, কথা সাহিত্যের দিক দিয়া 'গল্পগুচ্ছে'র যুগ এবং নাট্য রচনার দিক দিয়া নাট্যকাব্য অর্থাৎ 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি রচনার যুগ। রবীন্দ্র-জীবনের কোনও কীর্তিকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই, ইহাদের প্রত্যেকটি ধারাই একটি অখণ্ড যোগসূত্র দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং রবীন্দ্র কবিমানসের ক্রমবিকাশ যাঁহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের একটি পর্বে বাংলার লোক-সাহিত্য তাঁহার মধ্যে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার সেই যুগের সাহিত্য-রস-বিচার কিছুতেই সার্থক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোক-সাহিত্য হইতে যে রস-প্রেরণা একদিন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র রসোপলব্ধি যেমন সার্থক হইতে পারে না, তেমনই 'গল্পগুচ্ছে'র ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর গৃহ ও পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁহার যে মমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। অথচ এ' কথা সত্য, রবীন্দ্র-কাব্যপাঠক মাত্রই এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইহা রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোন্ ভাবে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, তাহা কেহই এ' পর্যন্ত উপলব্ধি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার মৌলিক ভিত্তিটির সন্ধান করিতে না পারিলে, রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলন আমাদের যে যথার্থ সত্যের সন্ধান দিতে পারিবে না, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ এ' পর্যন্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠক ও

গবেষকের নিকট রবীন্দ্রনাথের উপর বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রভাবের বিষয় যথার্থ গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কাব্যরসের আস্বাদন লাভ করিয়াই লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বিষয়টির গুরুত্ব যত বেশী, তিনি যদি ঐতিহাসিক কিংবা সমাজ-তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লোক-সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেন, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের নিকট তাহা তত গুরুত্ব লাভ করিবার কথা ছিল না। কিন্তু তাঁহার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কবি হইয়া লোক-সাহিত্যের মধ্য হইতে কাব্যেরই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি 'আমার শৈশবের মেঘদূত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনা কিংবা রবীন্দ্র-কাব্যের উপর বাংলার বর্ষাপ্রকৃতির প্রভাব বিষয়টি বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবের মেঘদূত' যে কি ছিল, তাহা যে পরবর্তী জীবনে তাঁহার উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও সম্যক্ বুঝা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যদি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করিতেন, তবে ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সংগৃহীত তথ্য লইয়া আলোচনা করিতেন, তিনি যদি সমাজতত্ত্ব কিংবা নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিকোণ হইতে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ এবং বিচার করিতেন, তবে সমাজ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিতেন; কিন্তু তিনি নিজে কবি হইয়া যখন কাব্যরসের প্রেরণায় বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও বিচার করিয়াছেন, তখন রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় তাহা যদি ভিত্তিরূপে স্বীকৃত না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মৌলিক স্বরূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইতে পারিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে বাংলার বিদগ্ধ সমাজ সম্যক্ অবহিত হইয়াছেন বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছড়ার সংগ্রহ। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে ইংরেজ ধর্মপ্রচারকগণ যে প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশে (idiom)-র সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ছড়াও সংগৃহীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু

তাহা প্রধানতঃ প্রবাদ-ধর্মী রচনাই ছিল এবং প্রবাদ বলিয়া মনে করিয়াই সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ অবিমিশ্র ছড়ার সংকলন, কাব্যধর্মী ছড়া ব্যতীত তাঁহার সংগ্রহে আর কোন ছড়াই স্থান পায় নাই। ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথ পল্লীসঙ্গীতেরও একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পল্লীসঙ্গীতের স্বতন্ত্র কোন সংকলন তিনি প্রকাশ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সমাজের কেবল মাত্র যে একটি অঞ্চলের সঙ্গেই সুনিবিড় পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পল্লী সঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ সেই অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরবর্তী কাল হইতে বাংলার পল্লীসঙ্গীতের যে সুবিপুল সম্ভার সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে 'গ্রাম্য সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসঙ্গীতের উদ্ধৃতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইবে। তথাপি এ'কথা সত্য, পল্লীসঙ্গীতের মধ্যেও যে উচ্চাঙ্গের কাব্যসম্মত জীবন-রস আছে, তাহা তিনিই সবপ্রথম আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পল্লীসঙ্গীতের নিজের সংগ্রহ ব্যতীতও তিনি এই পথে বহু উৎসাহী কর্মীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সমস্ত জীবনব্যাপী এই বিষয়ক তাঁহার অনুরাগ কোন দিক দিয়াই শিথিল হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই।

ছড়া এবং সঙ্গীত ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের আর কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন নাই। লোক-কথা (Folk-tales)-র ভিতর দিয়াও তাঁহার যে অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ কোন লোক-কথা-সংগ্রহের ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইলেও, তিনি তাঁহার জীবনে ইহার সুগভীর প্রেরণার কথা স্বীকার করিয়া যেমন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তেমনই বিভিন্ন সংগ্রাহককে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়ার সংগ্রহ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহার সংগৃহীত ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছড়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়; প্রথমতঃ ছেলে ভুলানো ছড়া, দ্বিতীয়তঃ ছেলেখেলার ছড়া। এই দুই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি শিশুর জননী কিংবা শিশু-ধাত্রীর রচনা, সেইজন্য ইহাদের দেহে ও আত্মায় পরিণত বুদ্ধির স্পর্শ লাগিয়া যায়। শিশু ইহার অর্থ বুঝে না, মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত সুরটুকু শুনিয়াই মুগ্ধ হয় মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়ার মধ্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। যেমন,

মাসি পিসি বনগাবাসী বনের মধ্যে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন॥

ইহার মধ্য দিয়া শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তির পরিবর্তে যে পরিণত জীবন ও সমাজ-বোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কের আন্তরিকতা ও নিবিড়তার কথা স্মরণ করিলে মাসি কিংবা পিসির কথা যে কিছুতেই আসিতে পারে না, ইহাই এই ছড়াটির বক্তব্য। ইহা সুপরিণত জীবন অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, শিশুর অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র নহে। এই শ্রেণীর ছড়া শিশুর রচনা নহে; বরং পরিণত বুদ্ধি মানব-মনের সৃষ্টি। সেইজন্য ইহার যে আবেদন শিশুর নিকট প্রকাশ পায়, তাহা অর্থগত কিংবা ভাবগত নহে; বরং একান্ত সুর এবং ছন্দোগত। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বলিয়াছেন এবং তিনি কেবলমাত্র ছড়ার ভাব দ্বারা নহে, ছড়ার ছন্দ দ্বারাও যে কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্য পাঠকের অবিদিত নাই। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ছন্দ বাংলা প্রাচীন রীতিকেই অনুসরণ করিয়াছিল; এমন কি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত যতই নূতন ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত হোন না কেন, বাংলার ছড়ার ছন্দকে কোন দিক দিয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনায় নিয়োজিত করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলার অলিখিত (unwritten) সাহিত্যের একটি বিশেষ রূপকে লিখিত সাহিত্যের ধারার মধ্যে সার্থকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোক-সাহিত্য-প্রীতির ভিতর দিয়াই বাংলা ছড়ার ছন্দের যথার্থ শক্তির পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে দ্বিতীয় যে আর এক শ্রেণীর ছড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয় খেলা। এই ছড়াগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহারা কিশোরমতি ছেলেমেয়েদের নিজস্ব রচনা, ছেলে ভুলানো ছড়ার মত শিশুধাত্রীর রচনা নহে। শিশুর রচনা বলিয়াই ইহারা অর্থহীন, কিন্তু

ছন্দ কিংবা তালহীন নহে, বরং ছন্দ ও তালের পরিচয় ইহাদের মধ্যে আরও প্রত্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চল্‌ল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা।
সূয্যি মামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই॥ ইত্যাদি।

খেলার ছড়া বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে, যেমন ছেলেদের খেলার ছড়া, মেয়েদের খেলার ছড়া, ইহাদের মিশ্র খেলার ছড়া। নিজেরা ছড়া বলিতে আরম্ভ করিয়া ছেলে এবং মেয়েরা প্রথমে এক সঙ্গেই খেলা করিয়া থাকে, তখনকার ছড়াগুলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ছেলে এবং মেয়েদের খেলা পৃথক্ হইয়া যায়; ছড়ার ভিতর দিয়া এই পার্থক্যের পরিচয়টিও গোপন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে ছেলেদের স্বতন্ত্র খেলার ছড়া নাই বলিলেই হয়, এমন কি, কোন ছড়ার মধ্যেই মেয়েদেরও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র খেলার ছড়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ অনুভব করা যায় না—কেবলমাত্র মিশ্র খেলার ছড়ার পরিচয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। উপরে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা মিশ্র খেলার ছড়ারই নিদর্শন। ছড়াটি একটি ডোম চতুরঙ্গের বা যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু নিতান্ত ঘরকন্নার কথা দিয়া শেষ হইয়াছে। সেইজন্য ইহার প্রথমাংশে একটু পৌরুষের স্পর্শ থাকিলেও শেষাংশ অন্তঃপুর জীবনের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পুরুষ এবং নারী উভয়ের জীবন-অভিজ্ঞতারই পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে এই শ্রেণীর ছড়ার সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নাই।

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ যত অসম্পূর্ণই হোক, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি লোক-সাহিত্যের যে বিচার করিয়াছেন, তাহা কোন দিক দিয়াই অসম্পূর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। তিনি ইহার মূল সুর ও

তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার সম্পর্কে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র আমাদের দেশে নহে, সর্বদেশেরই লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও বিচারের ভিত্তি স্বরূপ হইতে পারে।

ছয়

বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ছড়া। ইহার কাব্যগুণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকলেই এ'কথা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, ইহা কেবল মাত্র শিশুর কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া যে পরিণত মনের নিকট কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ, তাহা নহে—পরিণত বয়স্কের রস-মানসও ইহাদের মধ্য হইতে যথার্থ রস-গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

বাংলার ছড়াগুলির একটি প্রধান গুণ এই যে, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কোন কোন বিষয়ের মত ইহারা যে কেবল মাত্র আঞ্চলিক, অর্থাৎ একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে,—অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, এক একটি ছড়া যে কোন ভাবেই হোক, বাংলা দেশের এক প্রান্তে রচিত হইলেও কালক্রমে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। যে সকল সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালীর মধ্যে কালক্রমে একটি অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে, ছড়া তাহাদের অন্যতম; লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের যে প্রকার এক একটি আঞ্চলিক (regional) পরিচয় অনেক সময় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে, ছড়ায় তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ, ছড়ার মধ্যে সহজ আনন্দের যে ভাবটি প্রকাশ পায়, তাহার একটি সর্বজনীন আবেদন থাকে। ছড়া সাধারণতঃ শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হয়, শিশুর আচার ব্যবহার ও অনুভূতির মধ্যে যে সর্বজনীনতা আছে, তাহা দ্বারাই ছড়াগুলি অতি সহজেই সর্বজনীন উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠে। লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় এত সহজে এমন সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। ছড়াগুলি তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত নহে, নিতান্ত, লঘুভার একটি ভাব আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন আঞ্চলিক রূপ প্রকট হইয়া উঠিতে পারে না। যেখানে তথ্য ও তত্ত্ব, সেখানেই বিশিষ্টতা; কিন্তু ছড়াগুলিতে যেমন কোন তথ্য নাই, তেমনই কোনও তত্ত্বও নাই; সেইজন্য ইহারা নির্বিশেষ আনন্দোপলব্ধির কারণ হইয়া থাকে।

বাংলার ছড়াগুলি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি মাত্র বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া ইহারা রচিত হইয়াছে ; নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়াও ইহাদের ভাবের যেমন কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় না, তেমনই নূতন বিষয়ও ইহাদের মধ্যে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। বিষয় অনুযায়ী বাংলার ছড়াকে এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, প্রথমতঃ শিশুবিষয়ক ছড়া। শিশুবিষয়ক ছড়ার মধ্যেও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয় আছে, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ কোন ছড়াই রচিত হয় না। যেমন নিদ্রা বিষয়ক ছড়া, ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রথমতঃ শিশুর ঘুমপাড়ানি ছড়া। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলিও সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপিয়াই সুনির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় লইয়াই রচিত হইয়াছে ; যেমন প্রথমতঃ দোলনার ছড়া, ইংরেজিতে ইহাকেই Cradle song বলে। দ্বিতীয়তঃ, ঘুমের আবাহন বা 'আয় ঘুম' বিষয়ক ছড়া। তৃতীয়তঃ, ঘুমের অনুজ্ঞা বা অনুরোধ অর্থাৎ 'ঘুম যারে' বিষয়ক ছড়া, চতুর্থতঃ, ঘুমন্ত শিশুর রূপ বা 'ঘুম যায়' বিষয়ক ছড়া। 'বর্গী এল দেশে' বিষয়ক ছড়াগুলি ইহারই অন্তর্গত। সর্বশেষে নিদ্রালি মা ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসির আবাহন মূলক ছড়া। এই কয়টি সুনির্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত বাংলার ঘুমপাড়ানি ছড়ার আর সাধারণতঃ কোন বিষয় নাই। এই বিষয়গুলি কেবল মাত্র যে বাংলার এক একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহা নহে—সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই এই বিষয়গুলি প্রচার লাভ করিয়াছে। এই ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি হইলেও যদৃচ্ছা সৃষ্ট নহে। লিখিত সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিষয় যেমন সুনির্দিষ্ট একটি ধারা কিংবা শৃঙ্খলা অনুযায়ী রচিত হয়, ছড়াগুলিও তেমনই সুনির্দিষ্ট একটি ধারা অনুসারেই রচিত হইয়া থাকে। কারণ, ব্যক্তি কিংবা সমাজ-মানস একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়াই আচরণ করিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্মের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কিংবা নিয়মানুবর্তিতা স্বীকার না করিলে সেই সৃষ্টি কখনও সার্থক হইতে পারে না। ছড়াগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহারা শারদাকাশে যদৃচ্ছা ভাসমান লঘুভার মেঘের মত—যখন যে রূপ ইচ্ছা ধারণ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের সৃষ্টির মধ্যেও একটু শৃঙ্খলা আছে, বিশেষ একটি ধারা অস্বীকার করিয়া ইহারা রচিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির

যে বিষয়ের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ আর কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া ঘুমপাড়ানি ছড়া রচিত হয় না—সমাজ-মানসের অলক্ষ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার ধারা ইহাদের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

শিশুবিষয়ক ছড়ার মধ্যে নিদ্রাবিষয়ক ছড়ার পরই ছেলেখেলার ছড়ার কথা উল্লেখ করিতে হয়। ঘুমপাড়ানির ছড়াগুলি জননী কিংবা শিশু-ধাত্রীর রচনা বলিয়া ইহাদের ছন্দ, তাল ও সুর সুগ্রথিত; ছেলেখেলার ছড়াগুলি শিশুমনের সৃষ্টি বলিয়া ইহাদের রচনা যেমন অশিথিল, ইহাদের ভাবও তেমনই অসংলগ্ন। ইহাদের মধ্যে যে সুর, ছন্দ বা ধ্বনিগুণ প্রকাশ পায়, তাহা ছেলেভুলানো ছড়ার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শিশু-সম্পর্কিত কোন কোন বিষয়ক ছড়ার মধ্যে বিজ্ঞজনোচিত তত্ত্বকথাও প্রকাশ পায়; যেমন, শিশুকে বৃন্দাবনের যশোদাদুলালের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে; কিন্তু ছেলেখেলার ছড়াগুলি কেবল মাত্র চিত্রধর্মী; সেই চিত্রের মধ্যেও সর্বত্র যে সঙ্গতি থাকে, তাহা নহে। খেলার প্রকৃতি অনুযায়ী ছেলেখেলার ছড়ার সুর নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যেমন, হাডুডু খেলার ছড়ার সুর ও ঝাল ঝাপ্‌টি খেলার ছড়ার সুর এক নহে; কারণ, এই উভয় খেলার প্রকৃতির মধ্যেই মৌলিক বিরোধ আছে। কিন্তু ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুর সর্বত্র অভিন্ন। কারণ, ইহার বিষয় নিদ্রা এবং নিদ্রার চিত্রটি সর্বত্রই অভিন্ন। সেইজন্য ছেলেখেলার ছড়ায় যেমন বৈচিত্র্য আছে, ঘুমপাড়ানি ছড়ায় তাহা নাই। এ' যাবৎ বাংলা লোক-সাহিত্যের যে সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ছেলেখেলার ছড়াই সংখ্যার দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক। রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের মধ্যে ছেলেখেলার ছড়ার সংগ্রহ এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঘুমপাড়ানি ছড়া ও ছেলেখেলার ছড়াকে এক সঙ্গে আলোচনা করিয়া ইহাদের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছেলেখেলার ছড়ার প্রকৃতির সঙ্গে ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির মৌলিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য কেবলমাত্র ভাব কিংবা অর্থগত নহে—এই পার্থক্য বহিরঙ্গগতও বটে, ইহাদের ছন্দ, তাল ও সুর এক নহে। ঘুমপাড়ানি ছড়া পরিণতবয়স্কা জননী কিংবা ধাত্রীর কণ্ঠে আবৃত্তি হইবার জন্য রচিত, ছেলেখেলার ছড়া অপরিণতবয়স্ক শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হইবার জন্য রচিত; একটি ভাব এবং অর্থযুক্ত, অপরটি অর্থহীন,

অকারণ আনন্দের সৃষ্টি। সুতরাং উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টির দিক দিয়া ইহারা অভিন্ন হইতে পাবে না, এ'কথা পূর্বেও বলিয়াছি।

ছেলেখেলার ছড়ার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সুর বা ছন্দটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন নূতন চিত্র—এমন কি, সমসাময়িক জীবনের আধুনিক চিত্র অতি সহজে গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু ঘুমপাড়ানি ছড়ায় তেমন হইতে দেখা যায় না। বাংলার পল্লীতে এখনও 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে' ছড়াটি নানাভাবে বিকৃতরূপে হইলেও শুনিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু সহরে আর 'আগডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটি শুনিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র চিরাচরিত সুরটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরেজি-বাংলা মিশ্র ভাষা দ্বারা রচিত এই প্রকার ছড়া বর্তমানে শুনিতে পাওয়া যাইবে।—

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি।
যত্ন মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী॥
রেল কাম ঝমাঝম।
পা পিছলে আলুর দম॥

কিংবা

সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি।
বোম ফেলেছে জাপানি॥
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ।
ব্রিটিশ বলে বাপ্‌রে বাপ॥

এখনও হয়ত গ্রামাঞ্চলে ইহারই স্থলে এই সুপরিচিত ছড়াটি কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যাইতে পারে, যেমন—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চল্‌ল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥

এই দুই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে বহির্মুখী চিত্রগত যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, সুর, তাল এবং ছন্দ সম্পূর্ণ অভিন্ন। ছেলেখেলার ছড়াগুলি যে বিষয়গুণে বাঁচিয়া থাকে, তাহা নহে—ইহারা সুরের গুণেই বাঁচিয়া থাকে। যেদিন এই

সুর-চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যায়, সেই দিন কেবলমাত্র বহির্মুখী বিষয় ইহাদিগকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, ছেলেখেলার ছড়ার সুরে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ঐক্য আছে; কারণ, পৃথিবী ব্যাপিয়া শিশুর সুর ও ছন্দ-চেতনা সম্পূর্ণ অভিন্ন। মার্কিন দেশীয় শিশুর খেলার এই ছড়াটি এখানে উল্লেখ করা যায়,—

One-ery two-ery ickery Ann,
Fillicy fallacy Nicholas John,
Queever quaver Irish Mary,
Stinclum stanclum buck.

ইহার সঙ্গে উপরি-উদ্ধৃত 'আইকম বাইকম' কিংবা 'আগডুম বাগ্‌ডুম' ছড়া দুইটির যে বহির্মুখী ঐক্য রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ছেলেখেলার ছড়ার সুর ও ছন্দে কেবলমাত্র যে কালগত একটি অখণ্ডতা আছে, তাহাই নহে,—ইহাতে দেশদেশান্তর-নিরপেক্ষ পৃথিবীব্যাপী একটি ঐক্য আছে। কারণ, শিশুমনের প্রকৃতি অনুযায়ী ছেলেখেলার ছড়াগুলি রচিত হইয়া থাকে এবং শিশুর অন্তঃপ্রকৃতি দেশে দেশে অভিন্ন।

ছেলেখেলার ছড়া ব্যতীত শিশু সম্পর্কিত আর কোন ছড়াই শিশু যেমন আবৃত্তি করে না, তেমনই রচনাও করে না—সকলই জননী কিংবা শিশুধাত্রী আবৃত্তি ও রচনা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে অল্প একটু বিজ্ঞতার স্পর্শ থাকে, তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। শিশু-বিষয়ক অন্যান্য ছড়ার মধ্যে খোকার খাওয়া, খোকার অভিযান, খোকা ও চাঁদ, খোকার নৃত্য, খোকার বিয়ে, মামাবাড়ী, শিশু ও পশুপক্ষী, খোকা ও যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণ, খোকার রূপ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যেই পরিণত মনের বিজ্ঞতার স্পর্শ অনুভব করা যায় বলিয়া ছেলেখেলার ছড়ার মত ইহারা অকারণ আনন্দের সুনির্মল অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়া বোধ হইবে না।

শিশুর পরই ছড়ার আর একটি প্রধান উপজীব্য নারী। নারীজীবনের দুইটি দিক—একটি গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবন, আর একটি তাহার আচার (বা ritual) জীবন। এই দুইটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই লোক-সাহিত্যে

অগণিত ছড়া রচিত হইয়াছে, শিশু সম্পর্কিত ছড়ার তুলনায় ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি। পারিবারিক জীবনের ছড়াগুলি নারীর ঘরকন্না রান্নাবাড়ার বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, জা প্রভৃতির সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা লইয়া রচিত ; সুতরাং ইহারা জীবনধর্মী রচনা, ইহাদের মধ্যেই উপন্যাসের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আছে ; বাস্তব জীবন-বোধ হইতেই ইহাদের বিকাশ, সুতরাং সাহিত্য হিসাবে ইহাদের বিশেষ একটি মূল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। রান্নাবাড়া সম্পর্কে এই ছড়াটি উল্লেখ করা যায়—

এক নৌকা সরু চাল এক নৌকা ঘি।
ভাল ক'রে রান্না কর ময়রা ঠাকুর ঝি॥
আমি কি ভাল রাঁধি না, মন্দ রেঁধেছি।
বাড়ীর বেগুন কাঁচকলাটি পটল ভেজেছি॥—২৪ পরগণা

মেয়েলী খেলাচ্ছলে এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে ; সুতরাং এই ছড়া যাহারা আবৃত্তি করে, তাহাদের রান্নাবাড়া সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার কথা নহে, তবে তাহারা খেলাঘরের রান্না রাঁধিয়া থাকে, এই মাত্র। সুতরাং ইহা অভিজ্ঞতার কথা নহে, খেলার কথা মাত্র, ইহাতেই শিশুমনের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

খেলাঘরের রান্নাপাতি হইতেই যে ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা গড়িয়া উঠে, এ'কথা সত্য। সেইজন্য খেলাঘরেই ছোট মেয়েদের ছড়া আবৃত্তি করিতে শুনা যায়—

শাউড় নাই ননদ নাই কারে করমু ডর।
আগে বাড়মু ভিজ্যা ভাত পাছে মুছমু ঘর॥—পাবনা

এইভাবে নারীজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া এক শ্রেণীর ছড়া রচিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি সাধারণ বিষয় আছে, যেমন শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর সম্পর্কিত নারীর অভিজ্ঞতার পরিচয়, বর কিংবা বধূর জীবন-চিত্র। ইহাদের মধ্যে বুড়ো বর একটি সাধারণ বিষয় হইয়া থাকে ; বাংলার সমাজে বিবাহ-বিষয়ে বর ও বধূর মধ্যে বয়সের অসমতা ইহার লক্ষ্য। বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা জর্জরিত সমাজের মধ্যেই ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক সূত্রেই আসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ছড়ার একটি প্রধান অংশ মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাত্রার বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। এই সকল ছড়ার জীবনধর্মিতা ইহাদিগকে উচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদা দান করে।

ছড়াগুলি মেয়েলী খেলাচ্ছলে আবৃত্তি করা হইলেও, ইহারা সুগভীর জীবন-রসাশ্রিত—রচনার মধ্যে গ্রাম্যতা থাকিলেও সহজ করুণ-রসে আর্দ্র। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

ও পারের কুলগাছটি রামছাগলে খায়,
তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুরবাড়ী যায়।
আগে যায় গো ভার বাউটি,
পিছে যায় গো ডুলি।
মা বড় নিবুর্দ্ধি, কেন কেঁদে মর,
আপনি ভাবিয়ে দেখ মা কার ঘর কর।—২৪ পরগণা

নারীর আচার (ritual)-জীবন সম্পর্কিত ছড়াগুলিই মেয়েলী ব্রতের ছড়া। ইহারা আচারের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব কিংবা অলৌকিকতা কিছুমাত্র নাই, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তি-জীবনের কল্যাণ ইহাদেরও লক্ষ্য। যেমন ভাদুলী ব্রতের ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

নদ, নদী কোথায় যাও,
বাপ্ ভায়ের বার্তা দাও।

দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট প্রবাসী সদাগরের কন্যা ও ভগ্নীরা এই ব্রতপালনের ভিতর দিয়া তাহাদেরই নিরাপত্তা কামনা করিয়া থাকে। সেই সূত্রে ব্রতের ছড়াগুলিও যথার্থ জীবন-রসসিক্ত।

শিশু ও নারীর পরই বাংলার ছড়ায় আর যে সকল বিষয় উপজীব্য করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পশুপক্ষী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশুর মধ্যে যেমন কয়েকটি নির্দিষ্ট পশু ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তেমনই পক্ষীর মধ্যেও নির্দিষ্ট কয়েকটি পক্ষীই ইহাদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে—নির্বিচারে যে কোন পশুপক্ষী ইহাতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। পশুর মধ্যে শৃগালই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিই বাংলার শৃগাল সম্পর্কিত বহু ছড়ার প্রেরণা জোগাইয়াছে—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান॥
এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে এক শিয়ালে খায়।
আর এক শিয়ালে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যায়॥

বাপের বাড়ী তেল সিন্দুর মালীর বাড়ীর ফুল।
শিয়ালের বিয়ে হ'লো ক্ষীর নদীর কূল॥
বাপ দেয় ধান দূর্বা মা দেয় ফুল।
এমন খোঁপা বেঁধে দিব হাজার টাকার মূল॥—২৪ পরগণা

ছড়ার সাধারণ প্রবৃত্তি অনুযায়ী উদ্ধৃত ছড়াটির বিষয় শিয়ালের বিবাহ-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার খোঁপা বাঁধা পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' শ্রেণীর যত ছড়া এ' দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই ছড়াটি প্রাচীনতম। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর যে কয়টি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিই ইহার তুলনায় আধুনিকতর। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শিয়াল কথাটি শিব ঠাকুর বা শিব সদাগর নামক কোন ব্যক্তির নামে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; ইহা আধুনিকতার পরিচায়ক।

পশুর মধ্যে শৃগালের পরই ব্যাঘ্রের স্থান। শৃগাল সম্পর্কিত ছড়াগুলি যেমন কৌতুককর, ব্যাঘ্র সম্পর্কিত ছড়াগুলি তাহার পরিবর্তে তেমনই ভয়ঙ্কর বা ভীতিপ্রদ। ব্যাঘ্রের নর-মাংসাহারের গুণটি সর্বত্র বিদ্যমান, যেমন—

আস্তক লক্ষী বাস্তক ঘরে,
খাট বিছাই দিম থরে থরে।
খাটর নীচে বাঘর ছা,
যে ন মাতে তারে খা॥—চট্টগ্রাম

খেলাচ্ছলেই এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঘ্রের ভয়ঙ্কর রূপটি সর্বত্রই বর্তমান থাকিয়া যায়, তাহা কোন দিক দিয়াই মার্জিত করিয়া লওয়া হয় না।

শৃগাল ও ব্যাঘ্রের পরই ছড়ার মধ্যে গো-জাতির স্থান। কিন্তু গো-জাতি সম্পর্কিত সকল ছড়াই আচার-জীবনের অন্তর্ভুক্ত। ইহা প্রধানতঃ গোরক্ষ-নাথের ছড়া বলিয়া পরিচিত।

বাংলার ছড়ায় পক্ষীর মধ্যে ঘুঘুর একটি বিশেষ স্থান আছে। বর্ধমান হইতে সংগৃহীত ঘুঘু বিষয়ক এই ছড়াটি রবীন্দ্রনাথ 'সংগৃহীত 'আজ যমুনার অধিবাস কাল যমুনার বিয়ে' নামক ছড়া হইতে প্রাচীনতর, যেমন—

ঘুঘু ম'লো ঘুঘু ম'লো চাল পিটুলি খেয়ে,
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে।—বর্ধমান

কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়ায় পশুপক্ষীর চরিত্রের উল্লেখই প্রাচীনতর, ক্রমে নরনারী পশুপক্ষীর স্থান গ্রহণ করিয়াছে। উপরের একটি দৃষ্টান্ত হইতে যেমন দেখা গিয়াছে যে, শিয়াল শিব ঠাকুর হইয়াছে, তেমনই এখানেও ঘুঘুই রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যমুনায় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

ঘুঘুর পরই কাক, চড়ুই, টিয়া, শালিক, বক ইত্যাদির স্থান। বাংলার শিশুরা যে সকল পক্ষী তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে চোখে দেখিয়া থাকে, অথচ যাহাদের সঙ্গে তাহাদের কৌতুককর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদের কথাই ছড়ায় আবৃত্তি করিয়া থাকে। বাদুড় সম্পর্কেও এই ছড়াটি সুপরিচিত--

আদুড় বাদুড় চাল্‌তা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে,
টোপর মাথায় দে।
তোরা দেখ্‌তে যাবি কে?
চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংরা কাঠি দে।—২৪-পরগণা

নৈসর্গিক প্রকৃতিও বাংলার ছড়ায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রোদ বৃষ্টির আবাহনই প্রধান। বৃষ্টির অবসান করিয়া রৌদ্রের প্রার্থনায় এই ছড়াটি বলা হয়—

রৈদ দেরে রৈদানি।
চান্দার মার পুতানি॥
চান্দারে বাটি।
সাত থর কাটি॥
চান্দার হাতত্‌ বৈল ফুল।
চিরচিরাইয়া রৈদ তুল॥—চট্টগ্রাম

অন্য একটি সংক্ষিপ্ত ছড়ায় শুনা যায়—

নেবু পাতা করঞ্চা।
হে বৃষ্টি ধ'রে যা॥—বর্ধমান
কচুর পাতে হল্‌দি।
এই মেঘটা জলদি॥—মুর্শিদাবাদ

বৃষ্টির আবাহন জানাইয়াও অনুরূপ ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে।

এই সকল ছড়া ব্যতীতও সমসাময়িক কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সাহিত্যিক গুণ নিতান্ত নগণ্য।

বাংলার উপকথাগুলির মধ্যেও এক শ্রেণীর ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, ইহারা প্রধানতঃ কাহিনীর সঙ্গে জড়িত বলিয়া স্বাধীনভাবে আবৃত্তি করা হয় না, কাহিনীচ্ছলেই আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যেমন—

উকুনে বুড়ী পুড়ে ম'লো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল। ইত্যাদি

সকল কথা বলা শেষ হইলে যে ছড়াটি ভরতবাক্যের মত স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তাহা এই—

আমার কথাটি ফুরুলো,
নটে গাছটি মুড়াল।
কেন রে নটে মুড়লি ?
গরুতে কেন খায় ?
কেন রে গরু খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস্ না ?
বৌ কেন ভাত দেয় না ?
কেনলো বৌ ভাত দিস্ না ?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ?
কেনরে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না ?
ব্যাঙ কেন ডাকে না ?
কেনরে ব্যাঙ ডাকিস্ না ?
সাপে কেন খায় ?
কেন রে সাপ খাস্ ?
খাবার ধন খাবনি ?
গুড়গুড়ুতে যাব নি ?

প্রথম অধ্যায়

ঘুমপাড়ানি

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছড়া সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ ঘুম-পাড়ানি ছড়া, দ্বিতীয়তঃ ছেলেখেলার ছড়া। এতদ্ব্যতীত ছড়ার যে আরও বিভিন্ন বিষয় ও প্রকৃতি আছে, তাহা তাঁহার আলোচনার মধ্যে স্থান পায় নাই। এ' কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ যখন ছড়াগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিচিত্র প্রকৃতির ছড়া সংগৃহীত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহের উপরই নির্ভর করিয়া আলোচনা করিতে হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যাহা নিজে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার আলোচনা করিয়াছেন। বিস্তৃত সংগ্রহের অভাবে তাঁহার আলোচনায় কোন কোন বিষয়ে যে অসম্পূর্ণতা দেখা দিয়াছিল, তাহা আজ পূর্ণ করিয়া লইবার সুযোগ দেখা গেলেও সে'দিন এই সুযোগ ছিল না।

ঘুমপাড়ানি ছড়ার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের বিষয়ের মধ্যে যেমন খুব বেশি একটা বৈচিত্র্য নাই, ইহার সুর এবং ছন্দও প্রায় অভিন্ন। কেবল মাত্র শিশুর নিদ্রা যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিষয় ও সুরগত বৈচিত্র্য থাকিবার কথাও নহে। বিশেষতঃ শিশু সম্পর্কিত ছড়া বলিয়া শিশুচরিত্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া ইহারা রচিত হয়; শিশু যতদিন শিশু থাকে, ততদিন তাহার আচরণের মধ্যেও বিশেষ কোন বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না। সেইজন্য তাহার সম্পর্কিত ছড়ার মধ্যেও কোন বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকে না।

ঘুমপাড়ানি ছড়ার একটি অংশের নাম দোলনার ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যায়; ইহাকেই ইংরাজিতে cradle song বলে। দোলনায় শিশুকে শোয়াইয়া তাহাতে দোল দিবার তালে তালে এই ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। এখানে তালটি প্রধানতঃ লক্ষ্য থাকে বলিয়া কথায় রস কিংবা বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইবার অবকাশ হয় না। যেমন—

চাঁদ দোলে সূয্যি দোলে
দোলে নদীর জল।

দোলে আমার গোপাল মণি
দে দোল দে দোল ॥—নদীয়া, শান্তিপুর

উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে নির্দোষ আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেলেও পরিণত-বুদ্ধি জননী কিংবা শিশুধাত্রী অনেক সময় নিজস্ব মনোভাব ইহার উপর আরোপ করিয়া থাকেন। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

দোল দোল দোলানি।
কানে দিব চৌদনি ॥
কোমরে দিব ভেড়ার টোপ।
ফেটে মরবে পাড়ার লোক ॥—২৪ পরগণা

ইহার মধ্যে একদিক দিয়া নিজের ঐশ্বর্যের প্রচার এবং অপর দিকে প্রতিবেশীর ঈর্ষাবোধের আশঙ্কা এই উভয়ের সংমিশ্রণে ইহার ভাবগত নির্দোষিতা সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। ইহা শিশুসম্পর্কিত ছড়া হইলেও শিশুর চরিত্র কিংবা শিশুর ধর্ম ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোলনার ছড়াগুলি এই প্রকৃতির হইয়া থাকে। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

দোল দোল দোলনি।
কাল যাব বেলুনি ॥
কিনে আনব দোলনি।
বেলুনির পাকা আমড়া,
খেয়ে অম্বলে বুক চাপড়া ॥—বর্ধমান

এখানে প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষার আশঙ্কা এত প্রবল না হইলেও তাহার একেবারে অভাব আছে, এ কথা বলা যায় না।

দোলনার ছড়াগুলি প্রধানতঃ এই একটিমাত্র পদ হইতে ক্রমে সর্বত্র গিয়া যে আরও বিস্তৃত রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; এই সেই একটি পদ,—

দোল দোল দোলনি।

কালক্রমে বিভিন্ন পদ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, ইহাকে নানা আকার দান করিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়াগুলি সুর-প্রধান, কথা-প্রধান নহে।

সেইজন্য ইহাদের মধ্যে কথার কিংবা অর্থের সঙ্গতির পরিবর্তে কেবলমাত্র সুরগত একটি অখণ্ডতা প্রকাশ পাইয়াছে।

দোলনার ছড়ার পরই 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' এবং 'বর্গী এল দেশে' বিষয়ক ছড়াগুলির উল্লেখ করিতে হয়। ইহারাই প্রকৃত ঘুমপাড়ানি ছড়া। রবীন্দ্রনাথ ছেলেখেলার ছড়ার সঙ্গে ইহাদিগকে একাকার করিয়া আলোচনা করিয়াছেন; সুর, ছন্দ ও তাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহির্মুখী চিত্র ও ভাষার দিক দিয়া ছেলেখেলার ছড়া যত সহজে পরিবর্তিত হয়, ঘুমপাড়ানি ছড়া তত সহজে পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তিত হয় না বলিয়াই ইহার মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব দেখা যায়। বাংলার ঘুমপাড়ানি ছড়ার বিষয়ের দিক দিয়া দুইটি বিষয়ই উল্লেখযোগ্য; প্রথমতঃ 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' এবং দ্বিতীয়তঃ 'বর্গী এল দেশে।' 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' ছড়াটি 'বর্গী এল দেশে' ছড়াটির মতই সমগ্র বাংলা দেশব্যাপী প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং বাংলা দেশের অধিকাংশ ঘুমপাড়ানি ছড়া কেবলমাত্র ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। ঘুমপাড়ানি ছড়াটির মধ্যে এই একটি পদই মূল, যথা—

'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাদের বাড়ী যেও।'

তারপর ইহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ সংযুক্ত হইয়া ইহাকে যেমন দীর্ঘ করিয়াছে, তেমনি চিত্র-পরিকল্পনার দিক দিয়াও বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অনেক সময় এ কথাও মনে হয়, কেবলমাত্র 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' কথা দুইটিই এই ছড়াটির মূল প্রাণ-বিন্দু বা nucleus; কারণ, এই দুইটি শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ বা পদ বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই ছড়াটির প্রথম পদটির মধ্যেই এই প্রকার বিভিন্নতা দেখা যায়, যেমন—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ী এসো।—ঢাকা
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আঁরো বাড়ীত যাইও।—চট্টগ্রাম
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেও।—বর্ধমান
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাদের বাড়ী যেও।—হুগলী
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাদের বাড়ী এসো।—২৪ পরগণা
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ী যেও।—ঐ, ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ব্যতীত আর কোন কথাই অভিন্ন নহে। এমন কি, কতকগুলি ছড়ার মধ্যে 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' কথা দুইটিও নাই; বরং তাহার পরিবর্তে শুনিতে পাওয়া যায়—

ঘুম্‌নি পিসি ঘুম্‌নি পিসি নিন্দ দিয়া যাও।
মান্দার টল মল্যা নিন্দ চক্ষু ভর্য়া দাও॥—ঢাকা
নিন্দল মাসী নিন্দল মাসী কাল বাদুড়ের ছাও।
একটি কলাই মাটিত প'লো ধুইয়া ধুইয়া খাও॥—ঢাকা
নিদঁ মাউসী নিদঁ মাউসী চালে বাড়ে থা।
আমার খোকন কাঁদনে যে গো নিদঁ দিই যা॥—মেদিনীপুর
আয়রে আয় নিদালু মাসি মোদের বাড়ী আয়।—ঐ ইতাদি।

পূর্ববর্তী উদ্ধৃত ছড়াগুলির সঙ্গে এখানকার উদ্ধৃত পদগুলির কেবলমাত্র একটি বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়, তাহা এই যে, নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্কটি স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাসী, কেবল এক ক্ষেত্রে পিসি, তাহারও পূর্ববর্তী রূপ মাসীই ছিল বলিয়া মনে হয়।

এমন কি, কোন কোন অঞ্চলের ছড়ার মধ্যে দেখা যায় যে, মাসীও নাই, পিসিও নাই, যিনি আছেন তিনি নিদ্রালী মা। যেমন—

নিদ্রালী মাউরে, আমার বাড়ীত আইও।
খাট নাই পালঙ নাই, পিঁড়ি দিতাম জাগা নাই,
আমার মণির চউক্ষের উপর বইস॥—চট্টগ্রাম
নিনরাওয়ালী মাইয়া গো কাল বাদুড়ের ছাও।
পাইল্যা লাইল্যা সিয়ান্ করলাম ফড়িং ধইরা খাও॥—মৈমনসিংহ

উদ্ধৃত ছড়াগুলি হইতে এ'কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বহির্মুখী শব্দ ও চিত্রের মধ্যে ক্বচিৎ কিছু কিছু পরিবর্তন স্বীকার করিলেও ঘুমপাড়ানি ছড়ার যে একটি শ্রুতিসুখকর সুর আছে, তাহা অবিনশ্বর—তাহা কোনদিক দিয়াই বিকৃত হইতেছে না এবং চিত্রগুলির মধ্যেও যে মোটামুটি অনৈক্য আছে, তাহাও নহে।

দোলনার ছড়াগুলির সঙ্গে ইহাদের তুলনা করিলে দেখা যায়, ইহারা অধিকতর চিত্রধর্মী, কথারসও ইহাদের বিশিষ্ট একটি রস—দোলনার ছড়াগুলির মত ইহাদের মধ্যে পরিণত বুদ্ধির কোনও অন্যায় অনাচারও প্রবেশ করিতে

পারে নাই। ইহাদের মধ্যে প্রতিবেশী কিংবা অন্য কাহাকেও আঘাত করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না, সুতরাং ইহারা অনাবিল আনন্দরসে সিক্ত ; শিশুর চরিত্রের সঙ্গে ইহাদের সঙ্গতি আছে বলিয়াই ইহাদের আবেদন সর্বাপেক্ষা ব্যাপক।

ঘুমপাড়ানি ছড়ার আর একটি বিষয় (motif) নিদ্রার আবাহন (Invocation) বা 'আয় ঘুম'। নিদ্রা পার্থিব পদার্থ কিংবা ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন জীব-জন্তু নহে, তথাপি নানা পার্থিব ভোগ্য বস্তুতে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে হয়—

ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে দেব ছানা ননী।
ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে সোনার যাদুমণি॥
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে দেব মিঠাই খেতে
খোকার চোখে ঘুম আয়রে সোনার পীঁড়ি পেতে॥—পাব্‌না

আমরা মন্ত্রের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাস করি। 'আয় ঘুম' ছড়াগুলিও তেমনই ঘুমের আবাহন মন্ত্র স্বরূপ ; মাতৃকণ্ঠে ছড়াগুলি নিদ্রার আবেশমাখা স্বরে আবৃত্তি করা হইতে থাকিলে দুরন্ততম শিশুও নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে নিদ্রাকাতর শিশুর সুখনিদ্রার একটি রমণীয় চিত্র ফুটিয়া উঠে—

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি পাড়া দিয়ে।
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কখনও কখনও শিশুকে অতিক্রম করিয়া চিত্রটি অন্যকে আশ্রয় করিয়াও পরম রমণীয় হইয়া উঠে—

আয় ঘুম আয় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে।
দত্ত বউ পান সেজেছে এলাচদানা দিয়ে॥—২৪ পরগণা

দত্ত বৌয়ের হাতে এলাচদানা দিয়া সাজা পান খাইবার লোভ সংবরণ করা যে স্বপ্নলোকের অধিবাসী ঘুমের পক্ষেও অসম্ভব, বাংলার শিশুধাত্রীরা তাহা বুঝিতেন। এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে 'আয় ঘুম' কথাটিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া সর্বত্রই ঘুমকে কোন পার্থিব বস্তু দ্বারা প্রলুব্ধ করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নলোকের কেবলমাত্র নিদ্রাদেবীকে আবাহন করিলেই চলে না, যাহার জন্য নিদ্রার আবাহন সে যদি সেই আহ্বান উপেক্ষা করে, তবে জননীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, শিশুর নিদ্রা আসিবে না। সেইজন্য ঘুমের আবাহনের সঙ্গে

সঙ্গেই শিশুকে নানা পার্থিব বস্তুতে প্রলুব্ধ করাইয়া নিদ্রাগত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়—

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমের বাছা মণি।
ঘুমের থুন্ উঠিলেবাছা তই খাইও ননী॥—চট্টগ্রাম

শিশুর সঙ্গে সর্বদাই পক্ষীর একটি সুনিবিড় সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভব করা হয়। সেইজন্য ছড়ায় অনেক সময় শিশুর নিদ্রার জন্য পক্ষীর সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠে—

আয়তো পাখী বস্‌ত ডালে,
ভাত খেয়ে যা সোনার থালে।
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
খুকুকে ঘুম পাড়াবি॥—২৪ পরগণা

তারপর ঘুমপাড়ানি ছড়ার আর একটি বিষয় ঘুমন্ত শিশুর রূপ বর্ণনা বা 'ঘুম যায়'; ইহাদের মধ্যে নিদ্রিত শিশুর একটি সুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠে—

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা।
ষষ্ঠী তলায় ঘুম যায় মস্ত হাতী ঘোড়া॥
ছাই গাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর।
খাট পালঙ্কে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর॥
আমার কোলে ঘুম যায় খোকন মণি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর নিদ্রিত রূপকে উপলক্ষ করিয়া শিশুধাত্রী এখানে বিশ্বরাজ্যের একটি পরম রমণীয় চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন। শিশুর নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসংসার যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে কেবল স্বপ্নের কথা নহে, সুন্দরের আরাধনা নহে—খেঁকি কুকুরটি যে ছাই গাদায় লেজে মুখে এক করিয়া শুইয়া পরমা তৃপ্তিতে ঘুমাইতেছে, তাহার অশুচি চিত্রও বাদ যায় নাই। এই দৃষ্টিটিই নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির উপরও বিস্তারলাভ করিয়াছিল, যেমন—

বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জালমুড়ি দিয়ে।

শিশুর রাজ্যে অশুচি বলিয়া কিছু নাই। সেইজন্য সেখানে ষষ্ঠী ঠাকুর, খেঁকী কুকুর আর বাগ্‌দিদের ছেলে এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার ছেলেভুলানো ছড়াগুলির ভিতর দিয়া যে এই বিশ্বজনীন অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহাদিগকে এক অপরূপ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে।

দোলনা

আদিম মানব বৃক্ষশাখা হইতে নামিয়া আসিবার পূর্ব পর্যন্ত বৃক্ষ শাখাতেই তাহার নিদ্রার শয্যা রচিত হইত, বৃক্ষশাখার নিরন্তর দোলার শিহরণ তাহার স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়া গিয়া অস্থি এবং মজ্জায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে। মানব-শিশুর সেই আদিম সংস্কার আজিও দূর হয় নাই, বৃক্ষশাখা হইতে নামিয়া আসিয়াও সে দোলনার শিহরণ লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া উঠে। সেইজন্য দোল বা ঝুলন হইয়াছে তাহার উৎসব—কেবল মানুষই নহে, দোলনা বা ঝুলনে দেবতারও প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। সুতরাং সভ্য জাতির মধ্যেও শিশুর সর্বাধিক আকর্ষণীয় শয্যা দোলনা। এমন কি, দোলনার অভাবে মাতৃক্রোড়ও যখন শিশুর আশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তখনও শিশু ক্রোড়ে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, দুলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। সুতরাং দেশদেশান্তরে যেখানেই শিশু আছে, সেখানেই দোলনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছড়া শিশুর নিত্য-সহচর, শিশুর শয্যারূপে যেখানেই দোলনার ব্যবহার, সেখানেই ছড়া; সেইজন্য শিশুর জন্য দোলনার ছড়াও রচিত হইয়া থাকে। ইংরেজিতে ইহাই cradle song নামে পরিচিত। বাংলায় সাধারণভাবে ইহারা ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিয়া পরিচিত হইলেও, ঘুম পাড়াইবার প্রণালীর মধ্যে ইহাতে যে বিশেষত্ব আছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে দোলনার ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

দোলনার ছড়াগুলি তাল-প্রধান, স্বর-প্রধান নহে; কারণ, ইহার সঙ্গে একটি ক্রিয়া (action) সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা দোলনাটিকে দুলাইবার ক্রিয়া। সেইজন্য ইহার রস নিবিড়তা লাভ না করিয়া কতকটা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, যেমন—

১

চাঁদ দোলে সূয্যি দোলে
দোলে নদীর জল।
দোলে আমার গোপাল মণি
দে দোল দে দোল॥ —নদীয়া, শান্তিপুর

খোকন আমার দোলে রে
রাজার ঘোড়া চলে রে।
ঘোড়া ছুটে পাই পাই
দোলনা দোলে সাঁই সাঁই ॥—ঐ

কখনও ইহার চিত্রগুলি একটু পরিণত রস-মানসের স্পর্শ লাভ করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে—

৩

খোকন দোলে
মল্লিকা চম্পা দোলে।
দখিনা বাতাস বয়
নতুন দোলে ॥
বকুল ঝরে দলে দলে
পাখীরা চলে
নতুন বোলে।
খরার নদী চলে
গাছে মুকুল দোলে
আকাশে তারা দোলে
মল্লিকা চম্পা দোলে।
তারি সাথে খোকন দোলে ॥—ঢাকা

বর্ণনার গুণে চলিষ্ণু বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শিশুর ক্ষুদ্র দোলনাটি একাকার হইয়া যায়। শিশু যে প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত, তাহার যে স্বাধীন সত্তা বলিয়া কিছু নাই, বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড সত্তার মধ্যে সেও বিধৃত, তাহাই দোলনার ছড়াগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়—

৪

দে দোল দে দোল,
খোকন দোলে।
আমের গাছে গাছে
মুকুল দোলে ॥

কৃষ্ণচূড়ার ফুল দোলে,
গাছের ডালে ডালে
খাল নদী দোলে।
খোকন দোলে॥
আকাশের কোলে কোলে
মেঘ দোলে,
মাটির কোলে কোলে
সবুজ দুর্ব্বা দোলে।
দে দোল দে দোল
খোকন দোলে।—ঐ

কিন্তু এই সুনির্মল চিত্রটির সঙ্গেও অনেক সময় পরিণত-বুদ্ধি শিশু-ধাত্রীর ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা-স্বার্থ-দ্বন্দ্ববোধ জড়িত হইয়া যায়; সেইজন্য শিশুকে দোল দিতে দিতে জননী কখনও পাড়ার লোকের ঈর্ষার আশঙ্কায় শিহরিত হইয়া উঠেন—

দোল দোল দোলনি।
কানে দেব চৌদানি॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ।
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক॥ —২৪ পরগণা

নিজের শিশু সন্তানকে নিজের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া যদি অলঙ্কার সম্ভারে সাজাইয়া রাখি, তবে পাড়ার লোকের ঈর্ষা করিবার কারণ আছে বৈ কি? কিন্তু শিশুর নিদ্রাকালীন পরম পবিত্র চিত্রটি যে সেই আশঙ্কায় ম্লান হইয়া যায়, তাহা শিশুধাত্রী বুঝিতে পারেন না; সেই জন্য অস্থানেই এই আশঙ্কাটি তিনি এমন ভাবে প্রকাশ করেন—

৬

দোল দোল দোলনি।
কানে দোব চৌদানি॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ।
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক॥

মেয়ে নয়কো সাত বেটা।
গড়িয়ে দেব কোমর পাটা ॥
দেখ শত্তুর চেয়ে।
আমার কত সাধের মেয়ে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর পরিচয়, সে শিশু—সে মেয়ে হইলেও অবহেলার নহে; কারণ, জননী মনে করেন, সেও সাত ছেলের সমান; সুতরাং মাতৃস্নেহের অধিকারে সে কোন দিক দিয়েই বঞ্চিত নহে। তাহার যে কোমর পাটা গড়াইয়া দিবার অভিলাস ব্যক্ত হইল, তাহা শুনিয়াই শত্রুর মুখে ছাই পড়িবে, শত্রুরা চাহিয়া দেখুক, আমার মেয়ে অনাদরের সন্তান নহে, মেয়ে বলিয়া অবহেলার বস্তু নহে। পরিণত-বুদ্ধি শিশু-ধাত্রীই দোলনার ছড়ার রচয়িত্রী বলিয়া ইহাতে এই প্রকার বিজ্ঞতার স্পর্শ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। অনেক সময় এই প্রকার চিত্রের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা পায় না, খেলার ছড়া যেমন অর্থহীন, অনেক সময় ইহাও প্রাসঙ্গিকতা বর্জিত হইয়া তেমনই অর্থহীন হইয়া উঠে, যেমন—

৭

দোল দোল দোলনি। •
কাল যাব বেলুনি ॥
কিনে আন্‌ব দোলনি।
বেলুনির পাকা আমড়া।
খেয়ে অম্বলে বুক চাব্‌ড়া ॥—বর্ধমান

ইহা নিদ্রার চিত্রই নহে; কারণ, দোলনা শিশুর যে কেবল মাত্র নিদ্রার আশ্রয়, তাহাই নহে—ইহা তাহার জাগ্রতাবস্থায় বিশ্রামেরও স্থান, তাহার বিশ্রামের মুহূর্তগুলিতে শিশুধাত্রী তাহার কর্ণে ছড়ার সুধাবর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা কখনও অর্থ ও ভাববাহী হয়, আবার কখনও অর্থ ও ভাবের সম্পর্কবিহীন হইয়া উঠে। এখানে শিশুকে দোলনায় দোল দিতে দিতে প্রথমেই বেলুনি নামক কোন এক স্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইল, সেখানে গিয়াও নূতন একটি দোলনি কিনিয়া আনিবার সঙ্গে সঙ্গে পাকা আমড়া কিনিবার যে কি প্রয়োজন দেখা দিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না; অথচ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই পাকা আমড়ার যে সুপাচ্য ও সুখাদ্য বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহা

নহে, তাহা খ ইবা মাত্রযে অম্ল রোগে আক্রান্ত হইয়া দুঃসহ চাপড়াইতে হইবে, তাহা নিশ্চিত, অথচ তাহা কিনিয়া আনিবার সঙ্কল্পটিও অত্যন্ত সুদৃঢ় বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি সব কিছু মিলিয়া একটি অখণ্ড রস সৃষ্টি করে, এই মাত্র।

কোন কোন সময় চিত্রটি অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইলেও যে অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা নহে; শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে বহু দূরাগত একটি সুখচ্ছবি ইহার মধ্যে ছায়া বিস্তার করে—

৮

দোল দোল দোলনি,
রাঙা মাথায় চিরুণি।
বর আসবে এখুনি,
নিয়ে যাবে তখুনি॥—২৪-পরগণা

শিশু কন্যারূপিণী; একদিন—সে'দিন যতই দূর হউক—তাহাকে বধূবেশে পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, ইহার কল্পনার মধ্যে আনন্দ এবং বেদনা উভয়ই সমানভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে; শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত হইতে যে দিন প্রকৃতই তাহার জীবনে এই ঘটনাটি সত্যে পরিণতি লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত এই আশঙ্কাটি জননী বা শিশুধাত্রীর মনের মধ্যে কখনও কখনও উঁকি দেয়। এখানে তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়।

শিশু শালগ্রাম; শালগ্রামের যেমন শয়ন, বিশ্রাম, ভোজন সকলই একই অবস্থায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনই শিশুর দোলনাও তাহার শয়ন, বিশ্রাম এবং ভোজনের স্থান। দুই একটি ছড়ায় দেখা যায়, দোলনাতে শিশুর ভোজন পর্ব সমাধা হইতেছে—

৯

দোলে মা জননীর গোপাল।
কলা দিয়ে দুধু ভাতু খায়॥
ভুতু ভুতু গাল॥—২৪-পরগণা

শিশুর আধ আধ ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই শিশুর উদ্দেশ্যে ছড়া রচিত হইয়া থাকে, সেইজন্য এখানে দুধ হইয়াছে 'দুধু', ভাত হইয়াছে 'ভাতু' এবং ভোঁতা হইয়াছে ভুতু। শিশুর এই ভাষা অনুকরণ করিবার মধ্য দিয়া

শিশুর প্রতি স্নেহবোধ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ছড়াটির গঠন হইতেই বুঝিতে পারা গেল, শিশুর নিদ্রা ইহার লক্ষ্য নহে, বরং শিশুকে আহার করাইবার মত একটি দুঃসাধ্য কার্যই ইহার লক্ষ্য ; সেইজন্য শিশুকে ভুলাইবার ভাষা এখানে অবলম্বন করা হইয়াছে।

অনেক সময় স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছড়ার কোন বিভিন্ন অংশ দোলনার ছড়ার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়া যায়, তালের সূত্রেই তাহা আসে, ভাবের সূত্রে নহে। সেইজন্য সময় সময় শিশু সম্পর্কিত সুনির্মল চিত্রটিও ম্লান হইয়া যায়, যেমন—

১০

দোল দোল দোলে,
খোকন মণি কোলে।
কুলগাছটির তলে॥

কিন্তু তারপরই এই ছড়াটির সঙ্গে ছেলে খেলার একটি ছড়ার এই অংশটি আসিয়া যুক্ত হইয়া ইহার চিত্রটিকে আবিল করিয়া তুলিয়াছে—

মামী কাটে সরু সুতো,
মামা কাটে পাত।
সত্যি ক'রে বলনা মামী,
মামা কি তোর বাপ॥—২৪ পরগণা

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য। মাতুল সম্পর্কে মামী বা মাতুলানীকে যে জিজ্ঞাসাটি এখানে করা হইল, তাহা যে শিষ্টজনোচিত নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তথাপি একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই, এমন কি মহারাষ্ট্র গুজরাট অঞ্চলের সামাজিক জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগিনেয় মাতুলানীর সম্পর্কের মধ্যে একটু ঠাট্টা তামাসা বা পরিহাস-রসিকতার পরিচয় আছে। যদিও আত্মীয়তার দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তথাপি বিষয়টি যে সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিষয়টি সুগভীর সামাজিক তাৎপর্যমূলক। ইহার সম্ভাব্য কতকগুলি কারণ মামাবাড়ী সম্পর্কিত ছড়ার আলোচনা সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দোলনার ছড়াগুলিতে সুর অপেক্ষা তালই প্রধান লক্ষ্য থাকে বলিয়া ইহাদের মধ্যে চিত্র ও ভাবগত রস-নিবিড়তা প্রকাশ পাইতে পারে না, দোলা দিবার তালই এখানে লক্ষ্য ; যেখানে একান্তভাবে তালই লক্ষ্য হইয়া থাকে, সেখানে সুসঙ্গত অর্থ প্রকাশেরও দায়িত্ব থাকে না, ইহাদের মধ্যেও তাহা প্রকাশ পায় নাই।

ইংরেজ লোকশ্রুতিবিৎ পণ্ডিত ভেরিয়র এলউইন বলিয়াছেন, 'Cradle songs are everywhere very much the same ; in talking to a baby all the world uses the same language.[1]

এই বলিয়া তিনি একটি পাঞ্জাবি দোলনার ছড়ার একটি ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

A swing-cradle for your bed,
Hung with silken ropes ;
The nurse has come from Kabul
To make the cradle swing ;
Sleep, sleep my baby,
Sleep, sleep.[2]

উত্তর ভারত হইতে অনুরূপ অসংখ্য দোলনার ছড়া সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আরও একটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

O mother, moon, come up quickly
Bring milk and rice in a golden cup
And put it in darling's mouth.[3]

1. Verrier Elwin, *Folk-song of Chattisgarh* (London, 1946) p. 12.

2. Temples' Some Hindu Folk-songs from the Punjab : Nursery Rhymes' J. A. S. B., li, 218.

3. Crooke, 'Cradle Songs of Hindusthan', *N. I. Notes and Querries*, iii, 34.

ঘুম আয় রে

দেবপূজায় যেমন আবাহন আছে, শিশুর নিদ্রারও তেমনই আবাহন আছে। ঘুমের আবাহনের ছড়া দিয়া ঘুমপাড়ানি ছড়ার আলোচনার সূত্রপাত করিতে হয়। দেবতাকে আবাহন করিতে হইলে যেমন 'ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ' বলিয়া আবাহন করিলেই যথেষ্ট হয় না, তাঁহার সম্মুখে ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় এবং পরোক্ষ ভাবে দেবতাকে তাহার প্রলোভন দেখাইয়া আহ্বান করা হয়, শিশুর নিদ্রায়ও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এখানেও ষোড়শোপচারের নৈবেদ্য ও স্বর্ণাসনের প্রলোভন আছে—

> ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে দেব ছানা ননী
> ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে সোনার যাদুমণি।
> ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে দেবো মিঠাই খেতে,
> খোকার চোখে ঘুম আয়রে সোনার পিঁড়ি পেতে।
>
> —পাবনা

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, খাদ্যবস্তুগুলি এখানে মুখ্য নহে। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে যেমন বিনা নৈবেদ্যেও দেবতার সন্তুষ্টি হয়, ষোড়শোপচারের প্রয়োজন হয় না, তেমনি এই ছড়ার মধ্যেও সুরটি বস্তুকে ছাড়াইয়া গিয়া যে রসগত আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই নিদ্রাদেবীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা সাধারণ বুদ্ধিজীবী, সংসারের মানুষ, কাহাকেও প্রসন্ন করিতে হইলে আমরা খাদ্যের কথাই ভাবি, সেই সূত্রেই খাদ্য বস্তুর তালিকাটি এখানে আসিয়াছে; কিন্তু ইহার সুর-সঙ্গীত বস্তুতালিকাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহা ঘুমের আবাহন, সুতরাং ঘুমের একটি পরিবেশ রচনা করিবার এখানে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বটি এখানে কতখানি সার্থকভাবে যে পালন করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। উদ্ধৃত ছড়ার প্রত্যেকটি পদ চারিটি পর্বে বিভক্ত; ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি পর্বের আদি শব্দটি 'ঘুম', কেবল সর্বশেষ পদে এক স্থলে মাত্র ইহার ব্যতিক্রম আছে। প্রতি

পদের দুইটি করিয়া পর্বে 'ঘুম' কথাটি পর পর উচ্চারিত হইবার ফলে আপনা হইতে ঘুমের একটি সুনিবিড় সুরগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়; বিশেষতঃ ঘুম শব্দটির আদ্য অক্ষরে যে স্বরাঘাত হয়, তাহাতে একটি সার্থক গীতি সুর সৃষ্টি হয় এবং ইহা দ্বারা একটি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের ক্রিয়া সৃষ্টি করে, ঘুমের আবাহন আর ব্যর্থ হইতে পারে না।

কেবলমাত্র ষোড়শোপচারের প্রলোভন দেখাইয়াই যে শিশুর নিদ্রার আবাহন করা হয়, তাহাই নহে—অনেক সময় এমন দুর্লভ বস্তুর প্রলোভনও দেখান হয় যে, নিদ্রা দেবতার পক্ষে তাহা কাটাইয়া উঠা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

২

আয় ঘুম আয় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে।
দত্ত বৌ পান সেজেছে এলাচ দানা দিয়ে॥ —বীরভূম

মণ্ডা মিঠাই ছানা ননীর পরিবর্তে এখানে নিদ্রার দেবতাকে একটি মাত্র মিঠা পানের প্রলোভন দিয়া আহ্বান জানান হইয়াছে, হয়ত পূর্বোক্ত সুখাদ্যগুলির তুলনার একটি মাত্র মিঠা পান কিছুই নহে, কিন্তু এলাচ দানা দিয়া সেই পানটি যিনি সাজিয়াছেন, তাহার হাত হইতে তাহা গ্রহণ করিবার প্রলোভন দেবতার নিকটও দুর্জয়, তিনি এই আবাহন কি করিয়া উপেক্ষা করিবেন?

কোন্ পথ দিয়া ঘুম আসিয়া যে শিশুর চোখের উপর বসিবে, তাহার নির্দেশও ঘুমের আবাহন মন্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, এখানে যেমন দত্তপাড়ার উল্লেখ আছে, তেমনই আরও শুনিতে পাওয়া যায়,—

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ
আয় ঘুম আয় ঘুম কলা বাগান দিয়ে।—ঐ
আয় ঘুম আয় ঘুম ঘোষ পাড়া দিয়ে।—নদীয়া

কিন্তু আর যে পথ দিয়াই ঘুম আসুক না কেন, দত্ত পাড়ার পথই যে ঘুমের দেবতার পক্ষে প্রশস্ত এবং আকর্ষণীয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নিদ্রা দেবতার আগমনের পথের বর্ণনায় অনেক সময় যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহাও উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

৩

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্‌দি পাড়া দিয়ে।
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এই চিত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'ওই শেষ ছত্রে জাল মুড়ি দিয়া বাগ্‌দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে, সে ছবি পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক আর কিছু নহে, ওই জাল মুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগ্‌দি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।'

নিদ্রাদেবী আগমন পথে অনেক সময় এমন দৃশ্যও প্রত্যক্ষ হয়, যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ সূত্রে নিদ্রার কোনও যোগই নাই, কিন্তু তথাপি তাহা দ্বারাও তাহার যাত্রাপথ বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠে—

৪

আয় ঘুম আয় ঘুম কলা বাগান দিয়ে,
হেঁড়ে পানা মেঘ করেছে।
লখার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে ॥
আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে সিঁদুর পরবে কিসে ॥
—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

আমানি খাইতে যদি কাহারও দাঁত সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া যায়, তথাপি এ'কথা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না যে, ইহাতে তাহার সিঁদুর পরিতে বাধা কোথায় ; কিংবা হেঁড়ে পানা মেঘের সঙ্গে কপাল ফুটা করিয়া নথ পরিবারই যোগ কোন্ খানে ? তথাপি বর্ণনাটির ভিতর দিয়া যাত্রাপথের যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, তাহাই নিদ্রার দেবতাকে এই পথে আকর্ষণ করিতে পারে।

৫

আয় ঘুম আয় ঘুম ঘোষ পাড়া দিয়ে।
আসলে পরে খেতে দেব দই সন্দেশ চিঁড়ে ॥
দই আনার বায়না দিয়েছি,
খোকার চোখে ঘুম এনেছি,

গগনেতে গোল চাঁদ,
যত পারিস তত কাঁদ,
চাঁদ আকাশে ডুব দিল,
খোকা বাবুও ঘুমিয়ে প'ল। —নদীয়া

খোকাই চাঁদ, সুতরাং আকাশে চাঁদের অস্তগমন, খোকার নিদ্রাগমনেরই রূপক। অনেক সময় আরও অসম্ভব চিত্র শিশুর নিদ্রার আগমন পথে দেখা যায়—

৬

আয় ঘুমানি আয়,
ভালুকে তেঁতুল খায়।
নদীর বালি ঝুর ঝুরানি,
নুন ব'লে ব'লে খায়।—সাঁওতাল পরগণা

৭

আয় ঘুমানি আয়,
ভালুকে তেঁতুল খায়
তারা নুন কুথা পায়,
শাওড়া গাছের নুন
কুসুম গাছের তেল ;
তারা তাই দিয়ে দিয়ে খায়।—সাঁওতাল পরগণা

এখানে চিত্রটি যে একান্তই অসম্ভব, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ভালুকের তেঁতুল খাইবার মধ্যে কিছুই অসম্ভাব্যতা নাই ; কিন্তু তেঁতুল খাইতে হইলে ভালুকেরও যে নুনের একান্তই প্রয়োজন এবং তাহার অভাব এক ক্ষেত্রে সে নদীর ঝুর ঝুরানি বালি এবং আর এক ক্ষেত্রে কুসুম গাছের তেল দ্বারাই পূর্ণ করে এবং কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে শেওড়া গাছ হইতে নুনের সন্ধান পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে, ইহার মধ্যেই একটু অসম্ভাব্যতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অসম্ভব এবং অসঙ্গত চিত্রের মধ্য দিয়াই ছড়ার রস প্রকাশ পায়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। মনুষ্যজীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারাই ছড়াও রচিত হইয়া থাকে, সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে তেঁতুল খাইবার সময় যদি নুনের আবশ্যকতা

বোধ হয়, তবে ছড়ার রাজ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই, সেখানে মানুষ না থাকিলেও পশুর জন্যও এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কারণ, ছড়ায় পশু পক্ষী অনেক সময় মানুষেরই প্রতিনিধি—ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কেবল মাত্র ভালুকের পক্ষেই তেঁতুল খাইতে হইলে যে নুনের আবশ্যক, তাহাই নহে; দেখিতে পাওয়া যায়, বানরেরও একবার যখন তেঁতুল খাইবার সাধ হইল, তখন সেও নুন ব্যতীত ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিল না. শিশুর নিদ্রার আবাহন সঙ্গীতের মধ্যেই বানরের নুন দিয়া তেঁতুল খাইবার চিত্রটিও যুক্ত রহিয়াছে—

৮

আয়রে আয়রে আয়,
বাঁদরেরা দোল খায়।
তারা নুন কোথা পায়?
অনুনে রাঁধে;
ফিক্‌রে কাঁদে।
সাত রাজার নুন মেপে খায়,
সাত রাজার নুন পেয়েও
গঙ্গাচরের বালিগুলো
নুন বলে বলে খায়।
আয়রে খোকন ঘুমায়॥—ঢাকা

বাঁদরের নুনের তৃষ্ণা আর কিছুতেই মিটিতে চাহে না, তাই সাত রাজার নুন মাপিয়া খাইয়াও গঙ্গাচরের বালিগুলি তাহাকে নুন বলিয়া খাইতে হয়। ছড়াটির মধ্যে তেঁতুলের উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পূর্ববর্তী ছড়াটিরই একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রূপ; তেঁতুল কথাটি কোনরূপে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তেঁতুল খাইবার ভাবটি এখানে বর্তমান আছে, নতুবা শুধু শুধু নুন খাইবার ত কোন অর্থ হয় না। কিন্তু ছড়ার রাজ্যে অর্থ ত কেহই সন্ধান করে না! এখানে মূল বিষয়টিই তো বাদ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার কাহারও লক্ষ্যই নাই। বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ বিষয়ের ভিতর দিয়াও যে গীতিসুরের প্রবাহটি এখানে সৃষ্টি হইয়াছে, ঘুমপাড়ানি ছড়ার তাহাই লক্ষ্য—বিষয় লক্ষ্য নহে।

বানরের কথা ছড়ায় বেশি শুনিতে পাওয়া যায় না। কারণ, তাহার আকৃতি কুৎসিৎ, আচরণ বিরক্তিকর—প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময় এই জীবটি অনভিপ্রেত। ইহা অতি পরিচিত জীবের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং ছড়ায় ইহার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। উদ্ধৃত ছড়াটির প্রাচীনতর রূপের মধ্যে ইহার পরিবর্তে ভালুকের উল্লেখ থাকাই অধিকতর সম্ভব। কারণ, ভালুক শিশুর নিকট স্বপ্নরাজ্যের জীব—নিদ্রার জগৎ আর স্বপ্নের জগৎ অভিন্ন।

বানরের মত কুকুরের সঙ্গেও ছড়ায় সচরাচর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না; কারণ, কুকুরও প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের নিতান্ত পরিচিত ঘৃণ্য জীব। কিন্তু নিদ্রার চিত্রের সঙ্গে কুকুরের একটি সুনিবিড় সম্পর্ক আছে—কুকুর যখন ছাইগাদায় পড়িয়া লেজে মাথায় এক করিয়া ঘুমাইয়া থাকে, তখন তাহার যে চিত্রটি প্রকাশ পায়, তাহা যেন নিদ্রারই একটি মূর্ত রূপ। সেই জন্য শিশুর নিদ্রার আবাহনের মধ্যে ঘুমন্ত কুকুরের ছবিটি অতি সহজেই আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়ে—

৯

আয় আয় ঘুম যায় ঘুম ঘুম।
ঘুমাল গাছের পাতা।
হেস্তাল ঘরে ঘুম যায়রে
মাগুর মাছের মাথা॥
খিড়কির দুয়ারে ঘুম যায়রে
কালো কুকুর।
বিছানাতে ঘুম যায়রে বাপের ঠাকুর॥— ২৪-পরগণা

খিড়কির দ্বারে যে কুকুরটি লেজে মাথায় এক করিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার রংটি কালো। নিদ্রার জগৎ অন্ধকার, তাহার রূপ কালো; সেইজন্য ঘুমন্ত কালো কুকুরটি যেন নিদ্রারই একটি প্রত্যক্ষ রূপ।

উদ্ধৃত ছড়াটির আরও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার মত। বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, মানুষের মত গাছেরও ঘুম আছে; সুতরাং গাছের পাতা ঘুমাইবে ইহাতে যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, তেমনই চিত্রগতও একটি সার্থকতা আছে। রাত্রি যখন নিঝুম হইয়া আসে, তখন বিশ্বপ্রকৃতিই যেন ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু তখন হেঁসেল ঘরে মাগুর মাছটি তাহার সমস্ত দেহটি বাদ

দিয়া কেবল মাত্র মাথাটি লইয়াই নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবে, ইহা কেমন কথা? অন্য একটি ছড়ার মধ্যে পাই,

হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুধের কুমারী॥

ছড়ার জগতে হেঁসেল ঘরও নিদ্রার একটি প্রশস্ত স্থান। সুতরাং ইহাতে চমৎকৃত হইবার কিছু নাই; কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে, কেবল মাত্র মাগুর মাছের মাথাটি লইয়া। ইহার মত বিসদৃশ চিত্র আর কি হইতে পারে? ইহা কেমন করিয়া নিজের দেহটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল মাত্র মাথাটি লইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে পারে? এখানে ইহার একটি জবাব এই মনে হইতে পারে যে, মৎস্যভোজী বাঙ্গালীর নিকট মাগুর মাছের মাথাটি সর্বাধিক আকর্ষণীয়। সুতরাং মাগুর মাছের কথা মনে হইলে ইহার মাথাটির কথাই প্রথম মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়ার মধ্যে বস্তুগত বৈসাদৃশ্য উপেক্ষণীয়; এখানেও তাহাই হইয়াছে। প্রিয় অপ্রিয়, পরিচিত অপরিচিত, সম্ভব অসম্ভব সকল কিছুই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; এই কথাটি বলিবার প্রসঙ্গে এই চিত্রটি আসিয়া পড়িয়াছে। তারপর সুরের টানে ছন্দের প্রবাহে একবার যাহা আসিয়া পড়ে, তাহাকে আর দূর করা সম্ভব হয় না। ছড়ার ইহাই নিয়ম। এই ছড়ায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চিত্র—

'খিড়কির দুয়ারে ঘুম যায়রে
কালো কুকুর।'

কালো কুকুরটির ঘুমাইবার যে স্থানটি কোথায় হইতে পারে, এই বিষয়ে ছড়া রচয়িত্রীর মন বাস্তব-সচেতন। ইহার মধ্য দিয়া এই ঘৃণ্য জীবটির প্রতি যথার্থ ঘৃণা নহে, বরং সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। জীবটিকে যথার্থ যদি ঘৃণ্য বলিয়া মনে করা হইত, তবে ইহার দিকে ছড়া রচয়িত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না, আকৃষ্ট হইলেও এতখানি সুনিবিড় মনঃসংযোগ সহকারে ইহার চিত্রটি কেহ প্রত্যক্ষ করিত না। কালো কুকুরের এই নিদ্রারূপটির মধ্যে একটি রস-গত আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই ইহার বাস্তব পরিচয়টিকে ছড়ার মধ্য দিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সেইজন্য এখানে খিড়কির দুয়ারের কালো কুকুরটির সঙ্গে বিছানাতে বাপের ঠাকুরটি অর্থাৎ শিশু-সন্তান একাকার হইয়া ঘুমাইতেছে— ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ প্রকাশ পায় নাই। ছড়ায় পশু মানব ও

দেবতার এই সমদর্শিতার ভাব সর্বত্রই দেখা যায়। সেইজন্য এখানে কুকুর আর ঠাকুর সহজেই একাকার হইতে কোন বাধা দেখা যায় না।

কিন্তু অনেক সময় দুরন্ত শিশু কিছুতেই ঘুমাইবে না। ঘুমের আবাহন মন্ত্র তাহার নিকট ব্যর্থ হইতে থাকে। তখন তাহাকে ভয় দেখান ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না—

১০

একা বুড়ি দোকা বুড়ি
তেকা বুড়ির ছা।
খোকনমণি ঘুমায় নাকো
তাকে নিয়ে যা ॥—২৪-পরগণা

কিন্তু যাহার মনের মধ্যে ভয়েরই জন্ম হয় নাই, তাহাকে একা বুড়ি, দোকা বুড়ি, তেকা বুড়িতেই বা কি করিবে? কারণ, বুড়ীর যে কি রূপ সেই সম্পর্কেও তাহার মনে কোন ধারণারই সৃষ্টি হইতে পারে নাই, সুতরাং তাহার কথায় তাহার ভয় আসিবে কোথা হইতে? অতএব এইবার প্রলোভনের কথা আসে—

১১

খোকা হবে নায়েব।
দেখবে কত সায়েব ॥
খোকার পূজায় হবে ধূম।
সোনার খাটে শুবে যাদু
আয়রে যাদুর ঘুম ॥—চট্টগ্রাম

পল্লীর জননীগণ জমিদারের কাছারীর নায়েব অপেক্ষা আর কোন পদস্থ ব্যক্তির কল্পনা করিতে পারিতেন না। তাহারা জমিদারকে চিনিতেন না, নায়েবকে চিনিতেন। নায়েবেরা দিনে রাত্রে যখন খুসি তখন পেয়াদা দিয়া লোককে ধরিয়া লইয়া যাইতেন, তাঁহাদের ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। সুতরাং শিশুকে যদি ভবিষ্যৎ জীবনের কোন প্রলোভন দেখাইতে হয়, তবে তাহাকে নায়েবেব কথাই বলিতে হয়; কিন্তু নায়েব সম্পর্কে শিশুর কোন অভিজ্ঞতা তখন পর্যন্ত হয় নাই, সুতরাং এই আশ্বাসে তাহার উৎফুল্ল হইবার কোন কথা নহে। তবে ছড়াগুলি যে জীবনের ছায়াপথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া

গিয়াছে, স্বতন্ত্র কোন স্বপ্নপথ রচনা করে নাই, তাহাই ইহার মধ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ, শিশুকে এখানে রাজপুত্র হইয়া দিগ্বিজয় করিবার আশ্বাস দেওয়া হইতেছে না, নায়েব হইবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। বাস্তব জীবনের এই প্রকার সম্পর্ক আছে বলিয়াই ছড়াগুলি শিশুর হইয়াও সাহিত্য।

ভয় এবং আশ্বাস যখন কিছুতেই কিছু করিতে পারে না, তখন ঘুমকে হাট হইতে কিনিয়া আনিয়া শিশুর চোখে স্থাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না—

১২

হাটের ঘুম বাটের ঘুম
পথে পথে ফিরে।
চার কড়া দিয়ে কিনলাম ঘুম
মণির চোখে আয়রে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর রাজ্যে ঘুমও কিনিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য দুরন্ত শিশু যখন নিজে হইতে কিছুতেই কোন উপায়েই ঘুমাইতে চাহে না, ঘুমের সকল আবাহন মন্ত্রই যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, তখনই অগত্যা হাট হইতে তাহা কিনিয়া আনিবার প্রয়োজন হয়। কারণ, যে কোন উপায়েই হউক, ঘুম চাই-ই। কিন্তু ঘুমের মূল্য খুব বেশি নহে, মাত্র চার কড়া কড়িতেই তাহা কিনিতে পাওয়া যায়। বহুমূল্য প্রলোভন ব্যর্থ করিয়া মাত্র চার কড়া কড়ির বিনিময়েই যখন ঘুম হাটে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার জন্য এত আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু ইহা হাটে কিনিতে পাওয়া যাওয়াও যে একটি স্বপ্ন-কল্পনা মাত্র! ইহার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত বহু চিত্রেরই কোন বিরোধ নাই। সেইজন্য এই বিসদৃশ পরিকল্পনাও অতি সহজেই ছড়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

শিশুর সঙ্গে চাঁদের একটি সম্পর্কের কথা সকল দেশের ছড়াতেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধানতঃ ঘুমের আবাহনমূলক ছড়াগুলির মধ্যে চাঁদের কথা থাকিবার কথা নহে; কারণ, সুষুপ্তির রাজ্য অন্ধকারের রাজ্য, সূর্য চন্দ্রের আলো ও তাপহীন রহস্যের রাজ্য। সেইজন্য শিশুর সম্পর্কে চন্দ্রের যেখানে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেখানে তাহার সঙ্গে নিদ্রার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু তথাপি শিশুর সঙ্গে চন্দ্রের চিরন্তন সম্পর্কের সূত্র ধরিয়া কোন কোন সময় চন্দ্রের কথাও তাহার নিদ্রার মধ্যে আসিয়া যায়, যেমন—

১৩

নিন আয়রে নিন আয়
মোর বাপোইটা নিন যায় ॥
ওরে বাঁশের পিতারী নাড়ছে
চান্দ বাপোই দেখি হাসেছে
মোর বাপোই মোর
কনাত নিন যায় ॥
বাপোই চুড়া থুইস্থ
চকির তলত—নিন আয়।
বাপোই দুধের একটা
ঢুগী থুইস্থ নিন আয় ॥—জলপাইগুড়ি

ঘুমের আবাহন সূচক ছড়াগুলি আধুনিক কালে যে কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া রোমাণ্টিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহার দুই একটি নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা যায়। আর এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই ইহাদের বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে—

১৪

ঘুম আয় ঘুম
নিশিথ নিঝুম
এই বেলা ছেড়ে খেলা দিয়ে যারে চুম্।
খোকন আমার যুদ্ধে যাবে
লাল ঘোড়াতে চড়ে
আনবে কত টাকা মোহর
দেশ বিদেশে ঘুরে।
ঘুমের পরী আসে যায়
আঁধার ঘরের আঙ্গিনায়
চুপি চুপি আয়রে ঘুমের পরী
খোকা খুকুর চোখে ঘুম নাই।
খুকুন আমার আজকে যাবে।

নতুন শ্বশুর বাড়ি
পরবে কত সোনা দানা
রং-বেরং-এর শাড়ী।
পরীর পাখায় হাওয়া লেগে
ঘরের যারা ছিল জেগে
ঢুলে ঢুলে মায়ের কোলে
ঘুম আয় ঘুম ॥—ঢাকা

১৫

নিষুত রাত্তি নাইরে সাড়া
ঢুল ঢুল ঢুল নয়ন তারা
কুল কুল বইছে নদী
ঘুমের জোছনায়।
আয়রে ঘুম আয়রে
তোরা আয় ॥—২৪ পরগণা

হিন্দী ভাষাতেও বাংলারই অনুরূপ ঘুমের আবাহন মূলক ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, একটি নিদর্শন উল্লেখ করা যায়—

১৬

আজারে নিদিয়া তু আজারে আ—
আজা নিদিয়া আজা ; তেরে বালে যো হ্যায় বাট,
সোনেকে হ্যায় পায়ের পিস্‌মে রূপেকে হ্যায় খাট।
মখ্‌মল্‌কে হ্যায় লাল বিছৌনা, তাকিয়া ঝালর দার
মতিকে হ্যায় ঝালর যিস্‌মে লোট্‌কে লাল হাজার।
আজারে নিদিয়া……
চারি বহু সাওয়ে বালে কো—
দো গোরী দো কালী,
দো ঝুলাবে দো খিলাবে
লে সোনেকো থালি।
আজারে নিদিয়া……

ঘুম যারে

ঘুমের আবাহনের পরই ঘুমের অনুরোধ, 'ঘুম যারে' বিষয়ক ছড়াগুলি ইহার অন্তর্গত। শিশু আদেশ মানে না, শিশুকে আদেশ কেহ করেও না; কারণ, আদেশ বিষয়টি বাস্তব জীবনের নিতান্ত রূঢ় ব্যবহারিক বিষয়, আমাদের জীবনের কঠোর কর্তব্যের মধ্যে তাহা আমরা করি এবং তাহা মানি। কিন্তু শিশুর জগতের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। সেইজন্য শিশুকে ঘুমাইতে আদেশ করি না, কেবল সস্নেহ অনুরোধ করি মাত্র; এই বিষয়ক ছড়াগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই অনুরোধের সঙ্গে কত আশ্বাস ও প্রলোভন জড়িত হইয়া থাকে, তাহার অন্ত নাই। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, ঘুম হইতে উঠিলে শিশুকে ননী দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হইতেছে—

১

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমের বাছামণি।
ঘুমরথুন উঠিলে বাছা, তই খাইও ননী॥—চট্টগ্রাম

২

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি।
ঘুমরথুন উঠিলে যাদু কত খাইবা ননি॥
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি।
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোনার বাজুমণি॥
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমরথুন উঠিলে বাছা ননী দিমু মুই॥—ঐ

দ্বিতীয় ছড়াটির ননী ব্যতীতও আরও একটি দুর্লভ বস্তুর আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা একটি সোনার বাজুমণি। বাজু জিনিসটি বুঝি, কিন্তু বাজুমণি জিনিসটি কি? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, শিশুর রাঙা পায়ের লাল জুতা যেমন লাল জুতুয়া, তেমনই শিশু-অঙ্গের বাজুও বাজুমণি; বাছামণির সঙ্গে বাজুমণি একাকার হইয়া আছে। স্নেহের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, ছড়া স্নেহের ভাষায় রচিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকিলেও, তাহা সর্বদাই অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক নহে, একটু ব্যবধান আছেই।

সেইজন্য আমাদের নিত্য সংসারের পরিচিত জুতা জুতুয়া হইয়া যায়, বাজুও বাজুমণি বলিয়া পরিচিত হয়।

দ্বিতীয় ছড়ায় আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য। শিশুকে এখানে চাতকীর বাছা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। চাতক পক্ষীটি সম্পর্কে পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাই বলুন না কেন, বাংলা সাহিত্যে ইহার যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ইহা চির তৃষ্ণার্ত এবং কেবলমাত্র মেঘের জলেই ইহার তৃষ্ণার নিবারণ হয়। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে শিশুকে কেন যে এই তৃষ্ণার্ত চাতক পক্ষীর সন্তান বলিয়া নির্দেশ করা হইল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইতেছে না। চাতক যখন আছে, তখন তাহার সন্তানও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি আমাদের সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। চাতক নভশ্চর পক্ষী, আকাশের মেঘের জলের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক, মর্ত্যের ধূলি মলিন কাদাজল পান করিয়া তাহার তৃষ্ণার মিবারণ হয় না। শিশু সদ্য স্বর্গলোক হইতে আগত, তাহার পবিত্র শুচিশুভ্র আচরণের সঙ্গে মর্ত্যবাসীর আচরণের যোগ নাই। সুতরাং এই উপমাটির একটি সার্থকতা দেখা যায়। কিন্তু সহসা শিশু সম্পর্কে একটি ছড়ার মধ্যে এই চিত্ররূপ কি করিয়া আসে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এত গভীরভাবে বিচার করিয়া কোন শিশুধাত্রী এই পদটি এই ছড়ার মধ্যে যোগ করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই মনে হইতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার করিয়া কেহ এমন কথা কোন কবিতায় কিংবা ছড়ায় যোগ করিতে পারে না; তাহা আপনি আসিয়া যায়। শিশুর সরলতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে যাহার মনে একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়, তাহার কল্পনা হইতে এমন চিত্র আপনি আসে। এখানে ভাবনা চিন্তা জ্ঞান বুদ্ধির সহায়তা লাভ নিতান্তই অর্থহীন হইয়া যায়।

কিন্তু আশ্বাস পাইয়াও শিশুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তথাপি কিছুতেই সে ঘুমাইতে চাহিতেছে না—

৩

ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই।
নাকুয়া কলাত পড়্‌গে বাদুড় ধাফাই আইয়ম মুই॥
না কান্দিও দুধর বাছা না ভাঙ্গিও গলা।
গলা ভাঙ্গার দাবাই আছে কাঁচগুলার আগা॥

সোনার দিয়ম ঢুলন বানাই রূপার দিয়ম কাছি।
চাইর কিনারে চাইর দাসী দিয়ম ঢুলনর পসরি ॥—ঐ

দুঃসহ গ্রীষ্মের জ্বালায় শিশু ঘুমাইতে পারিতেছে না। অমনি ধাত্রী তাহার জন্য একজন 'পাঙ্খাকরণী' নিযুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া স্নেহ আশ্বাস দিয়া তাহাকে ঘুমাইয়া পড়িতে অনুরোধ করিলেন—

৪

ঘুম যারে ঘুমর বাছা ঘুম যারে তুই।
তোর মা গেইয়ে পইড়ত পড়ি ঘুম যা ॥
সোনার দিয়ম ঢুলনরে বাছা রূপার দিয়ম দড়ি।
চাইর কোড়ে দিয়ম বাছার চাইর বান্দী দাসী ॥
আরো একজন দিয়ম বাছার পাঙ্খাকরণী ॥—চট্টগ্রাম

কেবলই আশ্বাস—দিব, দিব, দিব আর দিব। কিন্তু যে উপস্থিত গ্রীষ্মের দুঃসহ যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারিতেছে না, এমন কি, যে শিশুর জননীটিও দেখা যাইতেছে, পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন, সে যদি বিদ্রোহ করিয়া উঠে, তাহা হইলে বলিবার কিছুই থাকে না। মা পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন, এ'কথার অর্থ বুঝিতে পারিলে অভিমানী শিশুর কিছুতেই ঘুম আসিত না ; সে কথা বুঝে না বলিয়াই যাহা খুসী তাহা তাহার কানের কাছে বলিয়া যাওয়ার একটি সুবিধা আছে। এই শ্রেণীর ছড়ায় তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হইতেছে। সুতরাং এই সকল আশ্বাস সকল দিক দিয়াই অর্থহীন। কিন্তু আশ্বাসের বহর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতে থাকে। যেমন আরও দেখা যায়—

৫

অলি অলি বাঁশ পাতার অলি।
উত্তর দক্ষিণর অলি বাছা ঘুম যা ॥
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্ দুয়ারে বসি খাইও।
সোনার ঢুলন টাঁকি দিয়ম্ সুখে নিদ্রা যাইও ॥
আয়রে পুতানির অলি বাছা ঘুম যা ॥—ঐ

৬

খোকো ঘুমালে দিব দান,
পাব ফুলের ডালি।

কোন্ ঘাটে ফুল তুলেছে,
ওরে বনমালী।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে,
তুলে ধরো ডালি॥
খোকো আমাদের ধন,
বাড়িতে নটের বন।
বাহিরবাড়ি ঘর করেছি
সোনার সিংহাসন॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

অনেক সময় শিশুর নিদ্রার প্রধান অন্তরায় তাহার জননীর কর্মব্যস্ততা। শিশুর সম্পর্কে জননী যে কাজ অতি সহজেই নিষ্পন্ন করিতে পারেন, অন্যে তাহা পারে না। জননী কর্মান্তরে ব্যস্ত থাকিবার জন্য শিশুর নিদ্রার ভার অন্যের উপর দিয়া যান, সেই সকল ক্ষেত্রে ছড়ার মধ্যে শিশুর নিকট জননীর অনুপস্থিতির একটি ব্যাখ্যা দিতে হয়। যেমন,

৭

ঘুম যারে ঘুম যা
বাদুড়ানির ছা।
তোর মা গিয়ে পানির লাই
পড়িয়া ঘুম যা॥—চট্টগ্রাম

জল আনা সংসারের একটি নিত্য কর্ম। জননী সেই কর্ম নিষ্পন্ন করিতে গিয়াছেন বলিয়া এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এমন আরও আছে—

৮

হোলই হোলই হোলই কাল বাদুড়ের ছাও।
তোমার মা ঘাটে গেছে শুয়ে ঘুম যাও॥—পাবনা

৯

ওরে বাদুড়ানির ছা!
তোর মা গিয়ে পানির লাই,
পড়িয়া ঘুম যা॥—চট্টগ্রাম

১০

ঘুম যারে ঘুম যা
বাদুড়ানির ছা।
বাদুড়ানি ত ঘরত নাই
পড়িয়া ঘুম যা ॥—ঐ

উদ্ধৃত ছড়াগুলি হইতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ অনুপস্থিত জননীর ক্ষেত্রে সর্বত্রই শিশুকে বাদুড়ানির ছা বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। বাদুড়ানি ইহার দুগ্ধপোষ্য শিশুশাবককে একা রাখিয়া আহারের সন্ধানে চলিয়া যায়,—জীব-জগতের এই বিশেষ প্রকৃতিটির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই এই ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে। পূর্বে দেখিয়াছি, শিশুকে একবার চাতকীর বাছা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; সেখানে জননী অনুপস্থিত নহেন, কিন্তু এখানে সর্বত্রই যে শিশুকে বাদুড়ানির ছা বলা হইতেছে, তাহা যে বাদুড়ানির প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ লোক বাদুড়ের মধ্যেও অন্যান্য পক্ষীসুলভ আচরণই প্রত্যাশা করিয়া থাকে, কিন্তু বাদুড় যে ডিম পাড়ে না বলিয়া ডিমে তা দিবার অভ্যাসের মধ্য দিয়া অন্যান্য পক্ষীর মত শিশু পালনের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে পারে না, তাহা সাধারণ লোক মনে করিতে পারে না। সেইজন্য যে জননী শিশুকে একাকী ফেলিয়া রাখিয়া কিংবা অন্যের হাতে দিয়া কার্যান্তরে সময়ক্ষেপ করে, তাহাকে বাদুড়ানি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই সাধারণ নিদ্রালু শিশু মাত্রকেই বাদুড়ের ছাও বা শাবক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

বাদুড়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি জীবের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যে কি, পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তবে তাহার অর্থ বাদুড় হইতে পারে—

১১

অলি অলি অলিরে মোর ধুম কহলের ছা।
তোর মা গেইয়ে পানীর লাই, পড়ি ঘুম যা ॥—চট্টগ্রাম

পাখীর নাম ধুম কহল, বাস্তব জগতে ইহার কি পরিচয়, তাহা জানা যাইতেছে না ; মনে হয়, ছড়ার অন্যান্য অনেক পাখীর মতই ইহাও স্বপ্ন জগতের

জীব। সুতরাং শিশুর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এত সহজেই স্থাপিত হইতে পারিতেছে।

স্বপ্নরাজ্যের আরও কোন কোন পাখী শিশুর আসন্ন নিদ্রায় মুহূর্তে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে—

১২

আয়রে পাখী লটকুনা,
ভেজে দিব তোরে বর-বটনা।
খাবি আর কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুকে ঘুম পাড়ানো জননীই হউক, কিংবা অন্য কোন শিশু ধাত্রীই হোক, কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে; সে স্বপ্ন রাজ্য হইতে আসিয়াছে, সুতরাং স্বপ্ন জগতের সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক। সেইজন্য লটকুনা নামক স্বপ্নরাজ্যের এক পাখীর উপর তাহাকে ঘুম পাড়াইবার ভার দেওয়া হইল। কিন্তু সে স্বপ্নরাজ্যের পাখী হইলে কি হয়, পার্থিব প্রলোভনকে সেও জয় করিতে পারে নাই। সেইজন্য তাহাকে বর-বটনা ভাজার আশ্বাস দিতে হইল। এমন কি, অনেক সময় আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন খাদ্যেও এই শ্রেণীর পাখীর অরুচি দেখা যায় না।

১৩

আয় ত পাখী বস্‌ত ডালে,
ভাত খেয়ে যা সোনার থালে।
খাবি দাবি কলকলাবি,
খুকুকে ঘুম পাড়াবি।—২৪ পরগণা

১৪

আয়রে পাখী লেজ ঝোলা,
খেতে দিব দুধ কলা।
খাবি দাবি কুলকুলাবি,
খুকুকে নিয়ে ঘুম করাবি॥— মেদিনীপুর

অনেক সময় ঘুমাইবার স্নেহ অনুরোধের মধ্যে কোনও ভীতিপ্রদর্শন কিংবা আশ্বাস কিংবা প্রলোভনের কথা একেবারেই থাকে না। সাধারণ ছেলেখেলার ছড়ার মত ইহারা অকারণ আনন্দের উৎসস্বরূপ হইয়া থাকে। যেমন,

১৫

অলি অলি অলি।
বাঁশ পাতার ঝলি॥
দাইর্গ্যা পুঁটি ধৈর গে উজান।
মণি ঘুম যাইত বুলি॥—চট্টগ্রাম

'দাইর্গা' এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, পুঁটির চাইতেও আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু বর্ষার নূতন জল পাইলে ইহাদের যে উল্লাস প্রকাশ পায়, তাহা আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। সুতরাং ইহা একটি আনন্দোল্লাসের চিত্র, প্রকৃতি লোকের এই সুখচিত্রটির সঙ্গে শিশুর নিদ্রার সুখচিত্রটির অতি সহজেই যোগ স্থাপিত হইতে পারে। আরও একটি ছড়ায় দেখা যায়—

১৬

উলু বনে থাকে রামা
খুলুং খুলুং কাসে।
উলু বান্ধে ঝাড়া দিয়া
সুনন্দার ডাকে॥
সুনন্দা উঠিয়া বলে রামা কই।
সুখে নিদ্রা যাইব রাজা সুনন্দারে লই॥—চট্টগ্রাম

এখানে চিত্রটি খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। নিদ্রার রাজ্যের কোন চিত্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না; তথাপি ইহার মধ্যে যে রস আছে, তাহাই ইহার আবেদন সৃষ্টি করিতে সার্থক হইয়াছে।

আধুনিক নাগরিক জীবনের ক্রমাগত প্রভাবের ফলে ছড়ার ব্যবহার যে সকল সমাজে ইতিমধ্যেই লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই যথাস্থানে যথাযথ ছড়াটি ব্যবহার হয় না। ইহা বিশেষ সমাজে লোক-সাহিত্যের উপকরণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার প্রথম লক্ষণ। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছড়া যথার্থ ঘুমাইবার অনুরোধ সূচক ছড়া নহে, স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছড়ার মধ্যে ইচ্ছামত এক একটি পদ মাত্র যুক্ত করিয়া ইহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে মাত্র। যেমন—

১৭

খোকা ঘুমারে, আয় আয় আয়—
ও বিড়াল কাল খেয়েছে মাছের মুড়ো
আজ এসেছে লোভে।
ঘরে আছে খোকার বাবা
কোমর ভেঙ্গে দিবে ॥—২৪ পরগণা

১৮

খোকা ঘুমারে—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাইরে ভেজে কে ?
দাবায় আছে ছেঁড়া শার্সি
টেনে মাথায় দে।
চালে আছে চাল বাখারি
হাত বাড়িয়ে নে,
বাটায় আছে সাজা পান
গালে পুড়ে দে—
খোকা ঘুমারে, আয় আয় আয় ॥—২৪ পরগণা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে ঘুমপাড়ানি ছড়ার বিশেষতঃ নিদ্রার অনুরোধ সূচক ছড়ার সুরটি শুনিতে পাওয়া গেলেও, ইহার চিত্রটি পূর্বোদ্ধৃত ছড়াগুলির মত নিদ্রার অনুকূল নহে, তথাপি এই ছড়াটিও এই উপলক্ষেই আবৃত্তি করা হইয়া থাকে—

১৯

সনা বায়ানি সনা বায়ানি
গাই চরিতে যাবা।
মা বাপো যে গাল দিবে
সন্ন্যাসী হবা ॥
ভোগ লাগিবে কি খাইবু
কাশিয়াড়ির ফল।

ঘুম ধরিলে বাই শুইবু
গাইর গোড়তল ॥—মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির ভাব এবং ছন্দে আধুনিকতার লক্ষণ আরও স্পষ্ট; কি ভাবে যে ছড়াগুলি আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

২০

হাইনা আস্‌সে বাঘ আস্‌সে পড়্‌তে যাবনি।
মুড়ি খায়্যা শুইয়া পড়্‌ব ঘুম ধরবে নি ॥—মেদিনীপুর

লেখাপড়ার মত ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্যবোধের ইঙ্গিত হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ইহার সঙ্গে শিশুর স্বপ্ন জগতের সম্পর্ক কিছুই নাই। তবে আধুনিক ছড়া রচয়িত্রীদিগের মনে তাঁহাদের শিশু সম্পর্কে এই চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাঁহাদের হাতে প্রলোভনের সামগ্রী নাই, শাসনের দণ্ড আছে।

শিশুর জাগ্রতকালীন আচরণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই শ্রেণীর ছড়াগুলি রচিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা স্বভাবতঃই তালপ্রধান রচনা—সুরপ্রধান রচনা নহে। যেখানে নিদ্রা একান্ত আসন্ন, কিংবা সমাগত, সেখানকার ছড়াগুলি সুরপ্রধান—তালপ্রধান নহে। 'ঘুম যারে' ছড়াগুলির ভিতর দিয়া জননীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কারণ, শিশুর কাছে অনুরোধ সর্বদাই নিষ্ফল—অনুরোধ অমান্য করাই তার ধর্ম। সেইজন্য শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য জননীর অবশেষে নিদ্রালোকের দূতীকে আহ্বান জানাইতে হয়—এই নিদ্রালোকের দূতী-ই ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি। তাহার কথা একটু পরেই আরও বিস্তৃত করিয়া বলিব। তাহার পূর্বে বাস্তব জগতের দুই একটি বিষয় উল্লেখ করিতে চাই।

ঘুম যায়

ঘুমন্ত শিশুর রূপ বর্ণনা করিয়া উচ্চতর সাহিত্যেও যে অনেক সময় কবিতা রচিত হইতে দেখা যায়, ঘুমপাডানি ছড়ার বিশেষ একটি অংশ হইতেই তাহার প্রেরণা আসিয়া থাকে বলিয়া মনে হইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিষয়ক একটি কবিতা সর্বজন পরিচিত। কিন্তু বাংলার ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, ইহাও বাংলার ছড়ার একটি সাধারণ বিষয়। উচ্চতর কবিতা পাঠ করিয়া পল্লী কবিগণ যে ইহাদের রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা নহে—নিরক্ষর এবং অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন প্রত্যেকের মনের মধ্যেই সাধারণ সৌন্দর্য-বোধ যে সক্রিয় থাকে, তাহার মধ্যেই ইহার প্রেরণার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ছড়াগুলিকে সাধারণ-ভাবে 'ঘুম যায়' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ক দুইটি ছড়ার সন্ধান দিয়াছেন। প্রথমটি এই প্রকার—

১

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা।
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় মস্ত হাতি ঘোড়া॥
ছাই গাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর।
খাট পালঙে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর॥
আমার কোলে ঘুম যায় খোকামণি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিদ্রার রাজ্যে কুকুর, শিশু ও ঠাকুর একাকার হইয়া বাস করে। যদিও দৈনন্দিন জীবনের কর্মকোলাহলের মধ্যে একটি খেঁকি কুকুর কেবলমাত্র যে অবজ্ঞেয় তাহা নহে, অস্পৃশ্য ও অশুচি, তথাপি নিদ্রার জগতে ইহা খাট পালঙ-শায়ী ষষ্ঠী ঠাকুরটির সঙ্গে অভিন্ন রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকেন—ছাই গাদার ঘুমন্ত খেঁকি কুকুরের চিত্রটির উপর হইতেই খাট পালঙে ঘুমন্ত ষষ্ঠী ঠাকুরের উপর আসিয়া দৃষ্টি পতিত হইতেছে। ইহাতে প্রথম চিত্রটির সম্পর্কে কোন অপবিত্রতা বোধ সৃষ্টি হইয়া দ্বিতীয় চিত্রটির ভক্তি ও আনন্দরস উপলব্ধিতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ছড়ার জগৎ সর্বত্র সমদর্শীর জগৎ, ইহাতে ঠাকুর

কুকুরে পার্থক্য দূর হইয়া গিয়া এক অখণ্ড আনন্দজগৎ সৃষ্টি করে। ইহাতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সঙ্কীর্ণতা বোধ নাই বলিয়াই এক উদার মহাকাশের নীচে ইহাদের সহজ প্রাণের পুষ্টি সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথের আরও একটি সংগ্রহ এই প্রকার—

২

নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে গাছের পাতড়ি।
ষষ্ঠী তলায় নিদ পাড়ে বুড়ো মাথারি॥
খেড়ো ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর।
আমাদের ঘরে নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এখানেও কুকুর এবং ঠাকুর একাকার হইয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্য কোন ক্ষেত্রেই কুকুরের প্রবেশের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। কেবলমাত্র ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যেই ইহার একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ, ইহা নিদ্রার রাজ্য, নিদ্রিত শিশু এবং ঘুমন্ত কুকুরের আচরণের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই, কেবল ইহারা উভয়েই যখন ক্ষুৎ পিপাসার তাড়নায় জাগিয়া উঠে, তখনই একজন মাতৃক্রোড়ে আর একজন ছাই গাদায় আশ্রয় লয়। মৃতের যেমন কোন জাত নাই, নিদ্রিতেরও কোন জাত নাই। সুতরাং নিদ্রিত খোকা ঠাকুরটি অতি সহজেই ছাই গাদার অশুচি কুকুরটির সঙ্গে একাকার হইয়া দেখা দেয়।

প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির আরও একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার প্রথম পদটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। 'ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা।' 'ঘুমতা' শব্দটির ভিতর দিয়া একটি স্নেহ কোমল নিদ্রার পরিবেশ রচিত হইয়াছে। মনে হয়, 'ঘুমতা ঘুমায়' কথা দুইটির একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাদেবী তাঁহার স্নেহ কোমল দুইখানি কল্যাণ হস্ত বিস্তার করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন। ছড়ার শব্দ অনেক সময় আপাত অর্থহীন। কিন্তু অর্থের বিচার করিয়া ছড়ার জগৎ কোনদিন চলিতে পারে না, শব্দের ধ্বনি হইতে রস এবং মাধুর্য আহরণ করিয়া তাহার উপলব্ধির মধ্যেই ছড়া আস্বাদন করা হইয়া থাকে। কোন্ স্নেহশীলা শিশু-ধাত্রী 'ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায়' এই শব্দ কয়টির রচয়িত্রী, তাহা কে জানে? কিন্তু ইহাদের ভিতর দিয়া যে একটি স্নেহ

কোমল আস্বাদন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নিদ্রাতুর শিশুর চক্ষু দুইটি যেন জুড়াইয়া দিয়াছে। সংসারের বহু তাপ ও জ্বালা আমরা কেবল মাত্র বাক্যের মাধুর্য দ্বারাও জুড়াইয়া থাকি, সে বাক্য অর্থহীন হইতে পারে; কিন্তু সংসারের জ্বালা ও তাপ জুড়াইবার জন্য অর্থপূর্ণ বাক্যই সর্বদা প্রয়োজন হয় না; আপাত দৃষ্টিতে যাহার অর্থ নাই, এমন স্বর আমাদের কানে প্রবেশ করিয়া অকারণ আনন্দ রসের সৃষ্টি করে। এখানেও অর্থহীন শব্দ দুইটি দ্বারা তাহাই সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্র-সংগ্রহের আরও একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

৩

ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে ঘুমের লতাপাতা।
দুই দুয়ারে ঘুম যায়রে দুটি মোগল পাতা॥
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুদের কুমারী॥—ঐ

চিত্রের রস এখানে আরও নিবিড় হইয়াছে। ভ্রমরা ভ্রমরী কিংবা শুধু ভ্রমর বাংলার লোক-সাহিত্যের সাধারণ চিত্ররূপ; সেই সূত্রেই তাহাদের কথা এখানে আসিয়াছে। কিন্তু ঘুমপাড়ানি ছড়ার সূত্রেই এখানে ভ্রমর ভ্রমরীর ঘুমন্ত রূপটির কথা উল্লেখিত হইয়াছে। এখানে ঘুমাইবার স্থানটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিজ্ঞ কোন কবি হইলে তিনি এমন অকবিজনোচিত স্থানকে ভ্রমর-ভ্রমরীর নিদ্রার স্থান বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। সুপরিচিত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে উল্লেখ করিয়াছেন,

তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে।

এখানেও তাহারই ব্যবস্থা হইত। হেঁসেল ঘরে কেহই পুষ্প-মধুবিলাসী ভ্রমর দম্পতির নিদ্রার শয্যা রচনা করিতে যাইতেন না। কিন্তু ছড়ার রাজ্যে অসম্ভবই সম্ভব হয়। সেইজন্যই ভ্রমর ভ্রমরীর নিদ্রার জন্য হেঁসেল ঘরের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার আরও একটি কারণ আছে—যিনি ছড়ার রচয়িত্রী, তাঁহার সঙ্গে হেঁসেল ঘরের সম্পর্ক প্রতি মুহূর্তের, অনেক সময় কর্মের অবকাশে সেখানেই তাহার বিশ্রামের শয্যাও রচিত হইয়া থাকে। অনেক সময়, হাতের কাজ যখন ফুরাইয়া যায়, অন্যত্র গুরুজনদের আনাগোনার বিরাম হয় নাই, সেই সময়ে

অনেক বধূ হেঁসেল ঘরেই পীঁড়ি পাতিয়া নিদ্রার আয়োজন করিয়া থাকেন। সুতরাং হেঁসেল গৃহ যে নিদ্রার একেবারেই ক্ষেত্র নহে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেই সূত্রেই নিদ্রার স্থান রূপে হেঁসেল ঘরের কথা আসিয়াছে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন বলিয়া থাকেন, অবচেতন এবং অচেতন লোক হইতে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন টুকরা স্বপ্নের মধ্য দিয়া আসিয়া জোড়া লাগিয়া যায়, ছড়ার মধ্যেও তাহাই হইয়া থাকে। ছড়া রচয়িত্রীর জীবনের বহু বিস্মৃত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ছিন্ন টুক্‌রা ছড়ার মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। সেইজন্য অনেক সময় ইহাদের মধ্য দিয়া সঙ্গতি এবং ভাব ও অর্থের পারম্পর্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এখানেও হেঁসেল ঘরের চিত্রটি জীবনের এক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এবং ভ্রমর ভ্রমরীর যুগ্ম চিত্রটি জীবনের আর এক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এবং সর্বশেষে হেঁসেল ঘরে নিদ্রা যাইবার চিত্রটি জীবনের আরও একটি নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে আসিয়া একত্র যুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য অতি সহজেই এই আপাত বিসদৃশ চিত্রটি ছড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

তারপর ছড়াটির সর্বশেষ পদটি উল্লেখযোগ্য। তাহা 'মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুদের কুমারী।' শিশুর নিদ্রার এমন পবিত্র চিত্র জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে রূপদান করিতে জগতের কত শিল্পী, কত ভাস্কর সমগ্র জীবনের সাধনা নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু কি সহজ ভাষায় ছড়ার মধ্যে এই ভাবটি প্রকাশ পাইল, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়! 'দুদের কুমারী' শব্দ দুইটির সাধারণ অর্থ দুগ্ধপালিত শিশুকন্যা। কিন্তু 'দুদের কুমারী' শব্দ দুইটি কেবল মাত্র এই অর্থটিই প্রকাশ করিতে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে—ইহাদের মধ্যে মাতৃস্নেহের সমস্ত ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কেহ ছড়া রচনা করে না। মানুষ যেমন ভাবিয়া চিন্তিয়া নিঃশ্বাস ফেলে না, ইহাও যেন তেমনই। ইহা আপনা হইতেই মন হইতে কি ভাবে বাহির হইয়া আসে, তাহা কেহ অনুভবও করিতে পারে না। ছড়ার ভাষা এই ভাষা। ছেলেভুলানো ছড়ার ভাষা মাতৃস্নেহের ভাষা, সেইজন্য ইহা আন্তরিকতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল। নিদ্রার এমন সুখচ্ছবি উচ্চতর সাহিত্যে প্রকাশ পাইতে পারে না। কারণ, সেখানে ভাবিয়া চিন্তিয়া শব্দ প্রয়োগ, বার বার বিচার করিয়া বাক্যের সৃষ্টি। ছড়ার সব কিছুই অনায়াস সৃষ্টি বলিয়াই ইহাদের রূপে সহজাত লাবণ্যের বিচ্ছুরণ দেখা যায়।

শিশুর সঙ্গে বাদুড়ের ছানা সম্পর্কটি কি ভাবে জড়িত হইয়াছে, তাহার কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। ঘুমন্ত শিশুর চিত্রের মধ্যেও কোন সময় বাদুড় ছানার রূপটি ফুটিয়া উঠে—

৫

আবু ঘুমায়রে কাল বাদুড়ের ছাও।
দুইলা ঢুপী মইরা রৈছে দেখ্যা আইয়া যাও ॥—মৈমনসিং

ইহার অর্থ কালো বাদুড়ের ছানার মত শিশু (আবু, সংস্কৃত অবোধ হইতে) ঘুমাইতেছে। দেখিলে যেন মনে হইতেছে, দুইটি ঘুঘু (ঢুপী) মরিয়া পড়িয়া আছে, তোমরা আসিয়া দেখিয়া যাও।

শিশুর অকাতর নিদ্রার রূপটির সঙ্গে দুইটি মৃত ঘুঘুর তুলনা যে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত হইয়াছে, এই কথা কেহ বলিবেন না। শুধু অলঙ্কার শাস্ত্র কেন, ইহা কোন রসশাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত হইবার যোগ্য নহে। ঘুমন্ত শিশুর পবিত্র রূপের সঙ্গে দুইটি মৃত পাখীর চিত্রের তুলনা সৌন্দর্যবোধকেও পীড়িত করে। কিন্তু এই ছড়াটির মধ্য দিয়া এ কথাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমাদের সুমার্জিত রস ও সৌন্দর্যবোধ বিসর্জন দিতে না পারিলে ছড়ার অপরিচ্ছন্ন শিল্প প্রয়াসের তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিব না এবং অনেক সময় আমাদের নাগরিক রস ও রুচি আমাদের দেশের ছড়াগুলি হইতে আমাদের পক্ষে সহজ রসোপলব্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করে। ছড়ার ভাষার মধ্যেই যে গ্রাম্যতা থাকে, তাহাই নহে—চিত্ররূপের মধ্যেও আমাদের অনভ্যস্ত বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে আমাদের অভ্যস্ত সৌন্দর্যবোধ অনেক সময় পীড়িত হয়। কিন্তু ছড়ার যাঁহারা রচয়িতা কিংবা প্রতিপালক, তাঁহাদের সহজাত রুচি বোধ ইহা দ্বারা কদাচ পীড়িত হয় না।

'আয় ঘুম' বিভাগের ছড়াগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-সংগ্রহ হইতে যে একটি ছড়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একটি পদ এই—

বাগ্‌দিগের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে।

এই ছড়াটির চিত্ররূপ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইলেও বর্তমান প্রসঙ্গে ইহা স্মরণযোগ্য। এই চিত্রটির মধ্য দিয়া নিদ্রার গাঢ়তার যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষা সার্থক করিয়া কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে উদ্ধৃত এই আর একটি ছড়া এই প্রসঙ্গেও উল্লেখযোগ্য—

আয় যায় ঘুম যায় ঘুম ঘুম।
ঘুমাল গাছের পাতা,
হেঁস্যাল ঘরে ঘুম যায়রে
মাগুর মাছের মাথা॥
খিড়কির দুয়ারে ঘুম যায়রে
কালো কুকুর।
বিছানাতে ঘুম যায়রে বাপের ঠাকুর॥—২৪-পরগণা

ঘুমন্ত পুরীর নিঃস্তব্ধতার রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে এখানে সম্ভব অসম্ভব নানা চিত্রেরই সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ, জাগ্রতের জগতে ব্যবহারিক আচারের মধ্যে যাহা অসম্ভব, সুষুপ্তির জগতে তাহা অসম্ভব নহে। নিদ্রার জগতে সম্ভব অসম্ভব, শুচি অশুচি সকলই একাকার হইয়া বাস করে। সেইজন্য এখানেও হেঁসেল ঘরের মাগুর মাছের মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া বিছানার উপর শায়িত বাপের ঠাকুরটি পর্যন্ত এক কল্পনার সূত্র দ্বারা বিধৃত হইয়াছে। ঘুম কথাটির ভিতর দিয়া নিদ্রার একটি আমেজ ফুটিয়া উঠে। সেই জন্য সুখনিদ্রার এই চিত্রটির মধ্যে বার বার ঘুম কথাটি উচ্চারিত হইয়া ইহার উপর যেন একটি কোমল মায়াঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। অতএব চিত্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্নতা কিংবা অসম্ভাব্যতাই থাকুক না কেন, ইহাদের মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড রস সৃষ্টি হইয়াছে। রসের অখণ্ডতার মধ্য দিয়াই ছড়ার সার্থকতা প্রকাশ পায়, বিষয়ের বৈচিত্র্য কিংবা বিভিন্ন ধর্মিতা ইহাকে আঘাত করিতে পারে না। এখানেও তাহাই হইয়াছে।

ঘুমন্ত শিশুর রূপ বর্ণনা করিয়া খুব অধিক সংখ্যক ছড়া যে রচিত হইয়াছে, এমন মনে হয় না। ইহার একটি কারণ আছে. তাহা এই যে, ঘুমন্ত শিশু জননীর কোন সমস্যা নহে। সেইজন্য ইহা লক্ষ্য করিয়া জননীর ছড়া রচনার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে নাই। ছেলেভুলানো ছড়াগুলি প্রধানতঃ প্রয়োজনীয়তার তাড়নায় রচিত হইয়াছে; অকারণ শিশুসৌন্দর্যের উপলব্ধি হইতে সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু 'ঘুম যায়' পর্যায়ের ছড়াগুলি ঘুমন্ত শিশুর সৌন্দর্য বর্ণনা মাত্র, মাতৃহৃদয়ের ইহারা অকারণ আনন্দের সহজ অভি-ব্যক্তি কিন্তু ইহাদের রচনার অবকাশ খুব প্রচুর নহে।

বর্গী এল দেশে

বাংলার একটি সুপরিচিত ঘুমপাড়ানি ছড়ায় বুলবুলি পাখীর উপর যে ভাবে এক মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ছড়া কখনও বস্তুজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় না; সুরের অনুরোধে অনেক ক্ষেত্রেই নির্মমভাবে ইহাদের অর্থ বিসর্জিত হইয়া থাকে। ছড়াটি এই—

১

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥—বাঁকুড়া

এই ছড়াটি সম্পর্কে পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রথম এবং প্রধান আপত্তি এই যে, বুলবুলি পাখী কদাচ শস্য খাদক (corn eater) নহে, সাধারণতঃ পাকা ফলের রস, ফুলের মধু, ছোট ছোট উড়ন্ত পোকা মাকড় খাইয়াই বুলবুলি জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহার ঠোঁটের গঠনই এমন যে, ইহা শস্যের শক্ত দানা কিছুতেই ভাঙ্গিয়া আহার করিতে পারে না, কিংবা তাহা গিলিয়াও খাইতে পারে না। বাংলা দেশে যে-সকল বুলবুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই—Common in gardens and light scrub jungle, both near and away from human habitations. Large numbers collect to feed on banyan and pipal figs and winged termite swarms. Has no song such, but its joyous notes and vivacious disposition make it a welcome visitor to every garden. Its pugnacity make it a favourite with fanciers as a fighting bird, and large stakes are wagered on bulbul fights. *Food*: Insects, fruits, and berries, peas and such like vegetables and flower nector. (Salim Ali, *The Book of Indian Birds*, Bombay, 1955, p. 9.)

সুতরাং বাংলার ছড়া রচয়িত্রীগণ বুলবুলি পাখী সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীতই কেবল মাত্র বুলবুলি শব্দটির ধ্বনিগুণে আকৃষ্ট হইয়া ইহার বিষয়ক এই ঘুমপাড়ানি ছড়াটি রচনা করিয়াছিলেন। এখানে 'ঘুমালো'

'জুড়ালো' 'এলো' কথাগুলির সঙ্গে বুলবুলি শব্দটি স্বরের দিক হইতে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, বস্তুজ্ঞান বিসর্জন দিয়াও কেবল মাত্র স্বরটি রক্ষা করিবার জন্য জননী এবং ধাত্রীগণ তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা বস্তু সচেতনতা একেবারেই বিসর্জন দিতে পারেন নাই, তাঁহারাই ছড়াটিকে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন; প্রধানতঃ এই কারণেই এই ছড়াটির সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার পাঠ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামে ইহার এই পাঠটি শুনিতে পাওয়া যায়।

২

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
টিয়া পাখী ধান খাইয়াছে খাজনা দিবে কিসে॥—চট্টগ্রাম

পাবনা জিলা হইতেও ইহার এই রূপটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—

৩

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আ'ল দ্যাশে।
টিয়ায় ধান খাইলে খাজনা দেবো কিসে॥—পাবনা

কিংবা ২৪ পরগণা জিলা হইতে ইহার আর একটি পাঠ যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে প্রখরতর বাস্তব জীবনবোধ হইতে তাহা সংশোধন করিয়া লইবার প্রেরণা দেখা যায়—

৪

আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গী এল দেশে।
চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥

—২৪ পরগণা

এই কথা সকলেই জানেন যে, ক্ষেতের ধান যখন পাকিয়া আসে, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখী আসিয়া সেই পাকা ধান খাইয়া যায়; টিয়া পাখীর হাত হইতে পাকা ধান রক্ষা করা কৃষকের পক্ষে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া যখন বাংলার কোন কোন অঞ্চলের পল্লীসমাজ এই ছড়াটি শুনিয়াছে, তখন অতি সহজেই বুলবুলির নামটি বাদ দিয়া সেখানে টিয়া পাখীর নামটি গ্রহণ করিয়াছে, বুলবুলির উপর এই মিথ্যা অপবাদ তাহারা সহ্য করতে পারে নাই। কারণ, তাহারা নিত্যই প্রত্যক্ষ করে যে,

বুলবুলি এক অতি নিরীহ পাখী, ইহা কাহারও অনিষ্ট করে না ; মাথায় ঝুটি ও রাঙা কণ্ঠীটি লইয়া কেবল নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়—ফুলের মধু, ফলের রস খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

শস্যনাশকারী পক্ষী হিসাবে টিয়ার পরই চড়ুই। এমন কি, টিয়া অপেক্ষা চড়ুই-ই ধান্য শস্যের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক। এইজন্য চীনদেশে চড়ুই পাখী নির্মূল করিবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার ফলে এমন মনে হইতেছে, আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র চীনদেশে আর চড়ুইয়ের অস্তিত্ব থাকিবে না। এই বস্তুজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই ২৪ পরগণায় ছড়াটি 'চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে' এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, চট্টগ্রাম, পাবনা অপেক্ষা ২৪ পরগণা জিলার অধিবাসীদিগের বস্তুজ্ঞান আরও প্রখর। ইহা দ্বারা বুলবুলির জীবনাচরণ সম্পর্কে যেমন তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, চড়ুই সম্পর্কেও তাহাদের সেই প্রকার বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায়, সুরই যদিও ছড়ার লক্ষ্য, তথাপি একটি বস্তু-সচেতন মনও সর্বদা ইহার সৃষ্টিমূলে সক্রিয় হইয়া থাকে, বাস্তবে এবং কল্পনায় ইহা মিশ্রিত হয় বলিয়াই ইহা যথার্থ সাহিত্যের শক্তি লাভ করে। নতুবা একান্ত বাস্তব হইলে ইহা তথ্য বিবরণী হইত এবং একান্ত কল্পনা হইলে ইহা ধূলি মাটির সম্পর্কবিহীন হইয়া অলৌকিক হইয়া পড়িত।

বুলবুলি সম্পর্কিত বস্তু সচেতনতার জন্যই এই ছড়াটি আরও নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ ধান খাওয়া বিষয়ে বুলবুলি সম্পর্কে অভিযোগ কেহই সহজে স্বীকার করিতে চাহে নাই ; যেমন, চট্টগ্রামে প্রচলিত আর একটি ছড়ায় পাওয়া যায়—

৫

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে ॥—চট্টগ্রাম

ছড়ার মধ্যে শব্দ অপেক্ষা সুরের প্রয়োজন অধিক। বুলবুলি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই ছড়াটিতে বুলবুলির নামটি ব্যবহারের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে সুরটি ধ্বনিত হইয়া থাকে, 'গুল্‌গুলিয়ে'র

মধ্যে তাহাই রক্ষা পাইয়াছে। এখানে বস্তুজ্ঞানেরও মর্যাদা রক্ষা পাইল, অথচ সুরটিও বিসর্জিত হইল না। তারপর 'গুলগুলি'য়ে শব্দ দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ পাইল, তাহার বিচারে ছড়ার শ্রোতা কিংবা আবৃত্তিকারিণী কাহারও কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবলমাত্র বিজ্ঞজনের প্রয়োজন, কিন্তু ছড়ার রাজ্যে বিজ্ঞজনের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং 'গুলগুলি' দ্বারাও কাজ চলিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেখানে বস্তুজ্ঞান অস্বীকার করিয়া ছড়া রচিত হয়, সেখানে ছাড়া পরিবর্তিত হইবারও সম্ভাবনা সর্বাধিক প্রকাশ পায়। কারণ, সুরের রসে বস্তুর ক্ষুধা মিটে না, ইহা জীবনেও যেমন সত্য, সাহিত্যেও তেমনই সত্য। তবে একান্ত বস্তুজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রথম প্রেরণা দেখা দেয় না। সেইজন্য ছড়াটি প্রথম রচনার মধ্যে বস্তুজ্ঞানের অভাব দেখা দিয়াছিল; তারপর সমাজের মধ্য দিয়া ইহার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক অঞ্চলেরই রুচি, রসবোধ ও বস্তুজ্ঞান দ্বারা তাহা সবদা মার্জিত হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্যই বুলবুলি চট্টগ্রামে গিয়া টিয়া পাখী এবং চব্বিশ পরগণায় গিয়া চড়ুই পাখীতে পরিণত হইয়াছে। তবে চট্টগ্রাম অপেক্ষা চব্বিশ পরগণার অধিবাসী যে অধিকতর বস্তু-সচেতন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বাংলার এই সুপরিচিত ছেলেভুলানো ছড়াটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। দেখা যায়, কোন কোন অঞ্চলে গিয়া ছড়াটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়িত হইয়াছে অর্থাৎ আরও কয়েকটি পদ মূল ছড়াটির সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা ছড়াসম্পর্কিত সাধারণ নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে। তবে কি উপায়ে ইহার এই দীর্ঘীকরণ হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ রাজসাহী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই ছড়াটির এই প্রকার একটি পাঠ পাওয়া যায়, এই পাঠটি অন্যত্রও প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায়, তবে প্রত্যক্ষভাবে আর কোথা হইতেও তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। রাজসাহী অঞ্চলের পাঠে শুনা যায়—

৬

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এ'ল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরুলো পান ফুরুলো খাজনার উপায় কি?
আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।—[১]রাজসাহী

১ আবুল হায়াত, 'সাহিত্য পত্র' (রাজসাহী, ১৩৬৬), বরেন্দ্রভূমির লোক-সঙ্গীত পৃঃ ৭২।

ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে বিশেষ কোন একটি কথা যদি কানে লাগিয়া যাইবার মত থাকে, তবে তাহাই বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ নূতন কোন বিষয় কিংবা চিত্র ইহার মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিতে পারে না। কিংবা কোন কোন সময় স্বতন্ত্র ছড়ার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ আসিয়া ইহাতে জুড়িয়া যায়। এখানে দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় পদের খাজনা দেওয়ার ব্যাপারটিই পরবর্তী নূতন দুইটি পদে দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে।.

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে কেবলমাত্র 'ধান' কথাটিকে আরও দুইটি পদের মধ্যে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—

৭

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এ'ল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥
খাউ ধান থাকুক লাড়া।
ধান কাটবে বত্রিশ আড়া॥—২৪ পরগণা

ধান বুলবুলিতে খাইয়া গিয়া খাজনা দিবার পথ বন্ধ করিয়াছে বলিয়া খাজনা পরিশোধ করিবার যে উপায়ান্তরের সন্ধান করা হইয়াছে, তাহা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। খাজনা দিবার দুর্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়া যে এই ছড়া রচিত হয় নাই, তাহা ইহার মূল পাঠটি অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, নূতন দুইটি পদের মধ্যেও এই দুর্ভাবনার কোন ছাপ আসিয়া পড়িতে পারে নাই। সুতরাং খাজনা দেওয়ার সমস্যা নিরূপণ ইহার আদৌ লক্ষ্য নহে। কয়েকটি শব্দ লইয়া একটু মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা শিশুর নিদ্রার একটি কোমল পরিবেশ সৃষ্টি করাই ইহার লক্ষ্য। শেষোক্ত নূতন পদ দুইটির মধ্য দিয়া ছড়াটির এই বিশেষ গুণটি রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কোন কোন সময় নূতন ছড়ার স্বতন্ত্র পদ বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে আসিয়া অন্য আর একটি ছড়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। ইহারও দুই একটি ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে, যেমন—

৮

ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ,
ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে।
টিয়া পাখীতে ধান খাইছে,
খাজনা দিব কিসে॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুট্যাছে মা বড় ধন॥—চট্টগ্রাম

২৪ পরগণা জিলা হইতেও ইহার এই প্রকার একটি পাঠ পাওয়া যায়—

৯

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এ'ল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা যে বড় ধন॥—২৪ পরগণা

ইহার শেষের পদ দুইটি স্বতন্ত্র একটি ছড়ার সম্পূর্ণ স্বাধীন দুইটি পদ। ইহাদের সঙ্গে প্রথমোদ্ধৃত পদগুলির ভাব ও চিত্রগত কোন সম্পর্ক নাই। তবে সুরগত সম্পর্ক আছে, এই মাত্র। এই সূত্র ধরিয়াই ইহারা এই ছড়াটির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তবে এ কথা সত্য, ইহারাও ঘুমপাড়ানি ছড়া, প্রথমোক্ত পদগুলির মত ইহাদের সুরের মধ্য দিয়াও একটি নিদ্রার আবেশ সৃষ্টি হয়। সেই সূত্রেই অতি সহজেই ইহা উক্ত সুপরিচিত ছড়াটির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে।

এই প্রকার আরও দৃষ্টান্ত আছে—

১০

আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গী এ'ল দেশে।
চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে লক্ষ্মী নারায়ণ॥
সাত স্বর্গে সিঁড়ি দিতে রাবণ রাজা মরে।
খোকার মুখে স্বর্গ নামে যখন ঘুমের ঘোরে॥—২৪ পরগণা

ইহার মধ্যে দেখা যায়, আরও দুইটি পদ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, তাহাতে দুইটি পদের ছড়াটি ষট্‌পদী হইয়াছে। এই দুইটি পদও স্বতন্ত্র একটি নূতন ছড়া,

ইহাও ঘুমপাড়ানি সুরের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া মূল ছড়াটির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

'বর্গী এল দেশে' এই মূল ছড়াটির বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পাঠ বাঁকুড়া জিলা হইতে এবং পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পাঠ চট্টগ্রাম জিলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও মানভূম কিংবা সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল হইতে ইহা সংগৃহীত হয় নাই, তথাপি মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জিলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইহা প্রচলিত থাকা সম্ভব। বর্গীর আক্রমণের সময় কিংবা তাহার পরবর্তী কালে যে সকল পরিবার পশ্চিম বাংলার উপদ্রুত অঞ্চল হইতে জীবনের নিরাপত্তার সন্ধানে পূর্ব বাংলায় চলিয়া গিয়াছিল, তাহারাই সঙ্গে করিয়া এই ছড়াটিও লইয়া গিয়া পূর্ব বাংলায় প্রচার করিয়াছে। পূর্ব বাংলায় বর্গীর আক্রমণ হয় নাই। সেইজন্য বর্গী শব্দটির সঙ্গেও সাধারণ পূর্ববঙ্গবাসীর পরিচয় হয় নাই। সুতরাং ইহা যখন সেখানে প্রচার লাভ করিল, 'বর্গী' শব্দটির বিশুদ্ধতা তাহাদের মধ্যে রক্ষা পাইল না, কিন্তু ইহার সুরটি কানে লাগিয়াছিল বলিয়া তাহা রক্ষা পাইয়া গেল। এই ভাবেই 'বর্গী' শব্দটি 'গোরকি' তে পরিণত হইল। 'গোরকি' কোন নূতন শব্দ নহে, বর্গী শব্দেরই ইহা উচ্চারণ-বিকৃতি মাত্র। এই ভাবেই 'বুলিবুলি'র পরিবর্তে 'গুলগুলি' শব্দটিও কোন কোন অঞ্চলে গৃহীত হইয়াছে। তবে বুলবুলি শব্দটি বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত, কিন্তু তথাপি ইহার পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; ইহার কারণ বুলবুলির ধান খাওয়া বিষয়ে আপত্তি।

একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিয়াছেন, চট্টগ্রামে প্রচলিত ছড়াটিতে যে 'গোর্কি আইল দেশে' উল্লেখ দেখা যায়, তাহার 'গোর্কি' শব্দটি আরবি শব্দ, অর্থ প্রলয়। কিন্তু ছড়ায় অপরিচিত বিদেশী শব্দ কদাচ ব্যবহৃত হয় না। ছড়া শিশুর ভাষা, বিজ্ঞের ভাষা নহে; সুতরাং মুসলমান সমাজেও ছড়ায় অপ্রচলিত আরবি শব্দের কদাচ ব্যবহার হইতে পারে না। কারণ, বাঙ্গালী মৌলভি মৌলানার শিক্ষণীয় ভাষা আরবি হইলেও মুসলমান শিশু কিংবা তাহার জননীর ভাষা সহজ বাংলা; আরবি ভাষায় তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। বিশেষতঃ বর্গী শব্দটির সর্বত্র প্রচলন দেখিয়া এ কথা মনে করা কিছুই অসঙ্গত নয় যে, 'গোর্কি' তাহারই উচ্চারণ বিকৃতি মাত্র। ছড়ায় অনুরূপ নিদর্শনের কিছুমাত্র অভাব নাই।

'বর্গী এল দেশে' ছড়াটির মধ্য দিয়া আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কেবল মাত্র সুরবোধের অখণ্ডতার উপর নির্ভর করিয়া বিষয়নিরপেক্ষ হইয়া ছড়া সহজেই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করিতে পারে। বর্গী সম্পর্কিত কোন প্রকার বাস্তব জ্ঞানের অভাব কিংবা শব্দটির দুর্বোধ্যতা ইহার ব্যাপক প্রচারে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যে লোক-চলাচল যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, চট্টগ্রামে সংগৃহীত বর্গীর আক্রমণ সংক্রান্ত ছড়াটি তাহার বিশেষ একটি প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। চট্টগ্রাম হইতে ইহার আরও কয়েকটি পাঠ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও এখানে উল্লেযোগ্য।

১১

মণি ঘুমাইল পারা,
ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে।
গুল্‌গুলিয়ে ধান খাইয়াছে,
খাজ্‌না দিব কিসে॥ —চট্টগ্রাম

১২

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিবে কিসে॥
ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে।
টিয়া পাখী ধান খাইছে খাজনা দিব কিসে। —চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে বর্গীর নামও নাই, বুলবুলির নামও নাই, তবে খাজানা না দিতে পারার কথা এবং চড়ুইর নাম আছে এবং বুলবুলির স্থলে ধানুয়া পোকা নামক এক প্রকার শস্যনাশকারী পতঙ্গের উল্লেখ আছে, তথাপি ছড়াটির মধ্যে যে 'বর্গী এল দেশে'র সুরটিই শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

১৩

ধান খাইল ধানুয়া পোকে
গরু খাইল জোঁকে।
আর বছরের খাজানা দিয়ম্
চড়ইয়ার বউয়ারে॥ —ঐ

স্থতরাং ইহাকেও 'বর্গী এল দেশে' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। এই প্রকার দৃশ্যতঃ অনেক ছড়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও, দেখা যায় অন্য কোন নূতন ছড়ার বহির্মুখী স্বতন্ত্র রূপের মধ্য দিয়া তাহা বাঁচিয়া আছে। 'আগডুম বাগডুম' ছড়াটি যে 'আইকম বাইকম' ছড়াটির মধ্য দিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহা পরে আলোচনা করিব। উপরি উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়াও তাহাই হইয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত এই ছড়ার একটি আধুনিক রূপের মধ্য হইতে বর্গীর নাম লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে তাহাতে নাগরিক জীবনের শিশুর ত্রাস ছেলেধরার নাম প্রবেশ করিয়াছে—

১৪

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো কানাচে ঐ কে ?
ঐ রে বাবা ছেলেধরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
চোখ দু'টো তার ভাটার মত গালভরা দাড়ি।
ছেলে ধরা ঝুলি নিয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি॥ ——মেদিনীপুর

ইহার মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ অস্পষ্ট হইয়া নাই। সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে অতি সহজেই যে ছড়াগুলি বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসে মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, নাগরিক জীবনের বিকৃতির জন্য তাহাদের মধ্যে আজ সেই প্রাণশক্তির অভাব দেখা দিয়াছে। মূল ছড়াটি হইতে উদ্ধৃত ছড়াটির প্রধান ব্যতিক্রম এই যে, মূল ছড়াটিতে যে একটি নিদ্রার স্নেহ কোমল পরিবেশ রচিত হইয়াছে,—বর্গীর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহার বর্ণনা কিংবা চিত্র কোন দিক দিয়াই যেমন ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে নাই, এখানে তাহা দেখা যায় না। শিশুর সম্মুখে ত্রাস সৃষ্টি করাই ইহার লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য 'চোখ দুটি তার ভাটার মত, গাল ভরা দাড়ি' এই বর্ণনার ভিতর দিয়া একটি ভয়াবহ চিত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। মূল ছড়াটির মধ্যে বর্গীর উল্লেখ থাকিলেও, তাহা বাস্তব জীবন অনুসরণ করিয়া তাহাতে আসে নাই, সুরের রেশ-টুকু অনুসরণ করিয়াই আসিয়াছিল। সেইজন্যই তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি

সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল জুড়িয়া যে কালক্রমে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মূলে রামায়ণ মহাভারত মঙ্গল গানের যেমন প্রভাব সক্রিয় ছিল, তেমনই বাংলার ছড়াগুলির প্রভাবও সক্রিয় ছিল। পূর্বভারতের সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং মনসা-মঙ্গলের পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তেমনই ইহার মধ্যে ছেলে ভুলানো ছড়াগুলিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সূত্রে বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলের শিশুজগৎ এবং পূর্বপ্রান্তবর্তী শিশুজগৎ এক অখণ্ড ভাব ও রসের ঐক্য দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়াছিল। এই বিষয়টি 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' ছড়াটির ভিতর দিয়া যত সহজে বুঝিতে পারা যায়, আর কোন ছেলে ভুলানো ছড়ার ভিতর দিয়া তত সহজে বুঝিতে পারা যাইবে না। কারণ, ইহার বিস্তারই সর্বাধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যদিও পূর্বভারতের বঙ্গ ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার প্রাদেশিক রূপভেদ দেখা যায়, তথাপি ইহা যে একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। যেভাবে রামায়ণ, মহাভারত মঙ্গলকাব্যগুলি এ'দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়াছিল, তেমনই এই ছড়াগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়াছে; তথাপি রামায়ণ মহাভারত মঙ্গলকাব্যের মত লিখিত সাহিত্যে ইহাদের যে আঞ্চলিক রূপভেদ দেখা যায়, সেই তুলনায় মৌখিক ছড়াগুলির বিশেষ কিছুই পাঠ-ভেদ দৃষ্ট হয় না বলিয়াই মনে হইবে। কারণ, শিশুর জগৎ সহজে পরিবর্তিত হয় না, বিশ্বব্যাপী শিশু সম্পর্কেই এ'কথা প্রযোজ্য; সুতরাং একই ভাষাভাষী অঞ্চলে তাহার ব্যতিক্রম হইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

রবীন্দ্র-সংগ্রহে এই ছড়াটির এই চারিটি পাঠ গৃহীত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন চারিটি অঞ্চলে যে এই চারিটি পাঠ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন্ পাঠটি কোন্ অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন নাই। তথাপি মনে হয়, চারিটি অঞ্চলের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান খুব বেশি নাই; কারণ, ইহাদের মধ্যে প্রায় বিশেষ অনৈক্য নাই। আরও মনে

হইতে পারে যে, চারিটি ছড়াই ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষায় রচিত। ছড়াগুলি এই—

১

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো।
শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে ব'সো॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুত করে যেয়ো॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

২

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাদের বাড়ি যেয়ো।
খাট নেই পালঙ নেই খোকার চোখে ব'সো।
খোকার মা বাড়ি নেই শুয়ে ঘুম যেয়ো,
মাচার নীচে দুধ আছে টেনে টুনে খেয়ো,
নিশির কাপড় খসিয়ে দেব বাঘের নাচন চেয়ো,
বাটা ভরে পান দেব দুয়োরে বসে খেয়ো।
খিড়কি দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুত ফুড়ুত যেয়ো॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৩

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো॥
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো।
শীতলপাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো॥
আব-কাঁটালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে॥
দুই দুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে।
উলকি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়িভরা দই॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৪

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি যেয়ো।
সরু সুতোর কাপড় দেব ভাত রেঁধে খেয়ো॥

আমার বাড়ির যাদুকে আমার বাড়ি সাজে।
লোকের বাড়ি গেলে যাদু কোঁদলখানি বাজে ॥
হ'ক কোঁদল ভাঙুক খাড়ু।
দু'হাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু ॥
ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে।
পাড়ার ছেলেগুলো কেড়ে এসে খেলে ॥
গোয়াল থেকে কিনে দেব দুদও'লা গাই।
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই ॥
দুদওলা গাইটে পালে হল হারা।
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা।
তাই দিয়ে যাদুকে ভোলা রে ভোলা ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এই চারিটি ছড়ার মধ্যে দুইটি বিভাগ স্পষ্টই অনুভূত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ছড়াটিতে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির নিষ্ক্রমণের পথটি সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, তিনি পক্ষী জাতীয় কোন জীব ; কারণ, খিড়কির দুয়ার দিয়া তিনি ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া গিয়া থাকেন। বিশেষতঃ দুইটি ক্ষেত্রেই খোকার চোখের উপর তাহাকে আসন পাতিয়া বসিতে বলা হইতেছে। যে গৃহে বাটা ভরা পান, মাচার নীচে দুগ্ধ ভাণ্ড আছে, সেই গৃহে যে অতিথিকে বসিতে দিবার মত একটি আসনের অভাব আছে, এ'কথা কে স্বীকার করিবে ? ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি স্বপ্ন ও নিদ্রার জগতের দূতী, সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনের যে উপকরণ, তাহা তাহার প্রয়োজনে লাগিতে পারে না ; সেইজন্য খোকার চোখই তাহার আসন। এই কল্পনাটির মধ্যে একটি উচ্চ কবিত্বও প্রকাশ পাইয়াছে। নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী যিনি দেবী, তিনি যদি শিশুর চোখের উপর আসন পাতিয়া বসেন, তবেই শিশুর নিদ্রা সহজে আসিয়া যাইতে পারে, নতুবা তাহা সম্ভব নহে, তিনি মর্ত্যের মানবী নহেন, অলোক একটি ভাবস্বপ্ন মাত্র—এইজন্য এই কল্পনার ভিতর দিয়া একটু কবিত্বের স্পর্শ অনুভব করা গেল।

উক্ত দুইটি বিশেষত্বের গুণে প্রথম ও দ্বিতীয় ছড়াটি একই পর্যায়ভুক্ত, একই অঞ্চলে ইহাদের প্রচলন থাকা কিছুই আশ্চর্য নহে। কিন্তু তৃতীয় এবং চতুর্থ ছড়া দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। তৃতীয় ছড়াটির মধ্য দিয়া যে একটি সুনিবিড়

নিদ্রার পরিবেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী ছড়া দুইটিতে পাওয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে ভাব ও রসগত যে অখণ্ডতা আছে, চতুর্থ ছড়াটিতে তাহা নাই। সুতরাং দুইটি ছড়াকেই অন্তঃপ্রকৃতির দিক হইতে একই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। চতুর্থ ছড়াটির মধ্যে নিদ্রার পরিবেশটি যে সুনিবিড় নহে, তাহা সকলেই অনুভব করিবেন। তাহাতে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির আবাহন মন্ত্রের মধ্য দিয়াও কেবল যে কোঁদলের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই নহে, কোঁদলের ভাষাও শুনা যাইতেছে—

হোক কোঁদল ভাঙুক খাড়ু।
দু'হাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু॥

ইহা কোঁদলের ভাষা, নিদ্রাগামী শিশুর সম্মুখে উচ্চারণের ভাষা নহে। সুতরাং নিদ্রার চিত্ররস ইহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি'র আবাহন দিয়াই এই ছড়ারও সূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হইতে পারে যে, বিভিন্ন ছড়ার বাহিরের দিক হইতে কিছু কিছু ঐক্য আছে, তথাপি ইহাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সেখানেই ইহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক সময় স্পষ্ট হইয়া আছে। হয়ত একই অঞ্চলে প্রচলিত এই চারিটি ছড়ার মধ্যে যদি এই অনৈক্য থাকে, তবে বিস্তৃততর ব্যবধানে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য যে আরও স্পষ্ট হইবে, তাহা স্বাভাবিক। তাহা সত্ত্বেও এ'কথা কেহই বলিবেন না যে, ইহাদের প্রত্যেকটিই স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে—ইহারা যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অভিন্ন উৎস হইতেই যে ইহাদের উৎসার, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ইহার অন্যান্য পাঠগুলি এই প্রকার :—

৫

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও॥
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা।
দু দুয়োরে ঘুম যায় দুটী মোগল পাতা॥
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী—বর্ধমান

৬

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো ॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।

অন্নপূর্ণ দুধের সর।
কাল যাব মা পরের ঘর ॥

পরের বেটা মেলে চড়।
কাঁন্‌তে কান্‌তে বাপের ঘর ॥

মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ি।
শীঘ্রি মা বিদেয় কর দাদা আস্‌চে বাড়ী ॥—বাঁকুড়া

নিঁদ মাউসী নিঁদ মাউসী চালে বাড়ে থা।
আমার খোকন কাঁদনে যে গো নিদ দিই যা ॥

আঁক গাছের ঝাঁক নাগো বেঁইচ গাছের পেড়ি।
চাঁপা যান শাশুঘর মাকে মাগেন পেড়ি ॥

আজ থা মা মোর ক্ষীরী কাকরা খাই।
কাল যাবু মা মোর বুকে পাথর দিই ॥

মা কেনে কাঁদ গো সিড়ি দুয়ারে বসি।
কাল যে মা দুধ দি থিল মন ভর্তি করি ॥

খুড়ি কেনে কাঁদ গো মুড়ি ভাজি ভাজি।
কাল যে খুড়ি মুড়ি দিথিল আঁটা ভর্তি করি ॥

দাদা কেনে কাঁদ গো ফুলের ডালা ধরি।
কাল যে গো ফুল দিথিল মাথা ভর্তি করি ॥

বৌ কেনে কাঁদ গো অন্ন হাঁড়ি ধরি।
কাল যে বউ অন্ন দিথিল থালা ভর্তি করি ॥

ভাই কেনে কাঁদ গো পনিখ বেঁটা ধরি।
কাল যে ভাই গাল দিথিল কাটি দিমু বলি ॥—মেদিনীপুর

৮

আয় রে আয় নিদালু মাসি মোদের বাড়ী আয়।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।
যত ঘরের ঘুম আছে মোদের খোকার চোখে দিও।—মেদিনীপুর

৯

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ী এসো,
খাট নাই মাদুর নাই খোকার চোখে বসো।
চাল কড়াই ভাজা দেব, যত খেতে পারো,
দাঁত না থাকিলে তোমা করে দেব গুড়ো।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
ফোকলা মুখের ঠোঁটটা মাসি রাঙা করে যেয়ো।—মেদিনীপুর

১০

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি
ঘুম দিলে ভালবাসি।
এমন ঘুম দিবে
যেন কেটে যায় নিশি॥—২৪ পরগণা

১১

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি
ঘুমের বাড়ি এসো,
খাট নাই পালঙ নাই
খোকনের চোখে বস।—ঢাকা

১২

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আঁরো বাড়ীত যাইও,
খাট নাই পালং নাই খোকার চোখের উয়র বইও।—চট্টগ্রাম

১৩

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ী যেও,
শান্তি সুখে নিদ্রা দিও ধন মাণিকের চোখে।
কোথায় পাব এমন নিদ্রা আমি কাঙালিনী,
দয়া করে দেবেন নিদ্রা প্রাণ দিয়াছেন যিনি!—পাবনা

১৪

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাগো বাড়ী যাইও,
ঠাই নাই পিঁড়ি নাই খোকার চোখে বইও।
বাটা ভইরা পান দিমু গাল ভইরা খাইও,
চাউল কড়াই ভাজা দিমু যত খাইতে চাও।
দাঁত থাকে নাতো গুড়াইয়া দিমু ভয় নাহি পাও।
যত ছেলের চোকের ঘুম খোকার চোকে দ্যাও।—বরিশাল

১৫

নিন্দল মাসি
নিন্দল মাসি
কাল বাতুড়ের ছাও।
একটি কলাই
মাটিত প'লো
ধুইয়া ধুইয়া খাও।
আর খাইও না
ফেউ ডাক্যাছে।
দুইটি চিতলের মাছ
তাল ধর্যাছে।
একটি নিল পবন ঠাকুর
একটি নিল টিয়া।
টিয়ার বিটির বিয়া
লাল শাড়ীখানা দিয়া
লাল শাড়ী নিব না
তসর কিনে দাও।
তসর করে খসড় মসড়
গরদ কিনে দাও।
নিন্দল মাসি
নিন্দল মাসি
কাল বাতুড়ের ছাও।—ঢাকা

১৬

ঘুম্‌নি পিসি
ঘুম্‌নি পিসি
নিন্দ্‌ দিয়া যাও।
মান্দার টলমল্যা নিন্দ
চক্ষু ভর‍্যা দাও
হাটের নিন্দ্‌
ঘাটের নিন্দ
মান্দার টলমল্যা নিন্দ্‌
চক্ষু ভর‍্যা দাও।—ঢাকা

১৭

ঘুমপাড়ানি মাসি গো
আমার বাড়ী এসো
জল পিড়ি দেব তোমায়
পা ধুয়ে বোস
চাল ছোলা ভাজা দেব
যত পার খেও
আমার খুকুর চোখে
ঘুম দিয়ে যেও।—২৪ পরগণা

১৮

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি
ঘুম দিয়ে যেও,
চাল কড়াই ভাজা দেব
পেট ভরে খেও।
বাটা ভ'রে পান দেব
গাল ভরে' খেও,
যত ছেলের চোখে
ঘুম দিয়ে যেও।

খিড়কি দিয়ে ফুরুত করে'
গলে চলে যেও ॥—২৪ পরগণা

১৯

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি
মোদের বাড়ি যেও,
খাট নেই পালং নেই
খোকার চক্ষু পেতে বোসো।
এই গালে দিনু চুমো
দেরে ঐ গাল
ঘুমে ঘোর খোকা মোর
চুমোর মাতাল।—২৪ পরগণা

এই ছড়াগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সর্বত্রই এখানে মাসিপিসি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই একটি বিষয়ে এই ছড়াগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, শুধু একস্থলে কেবল পিসি বলিয়া সম্বোধন করা আছে, উহার কথা পরে বলিব।

অন্যত্র আমি বলিয়াছি ('বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খণ্ড) যে, যদিও এখানে এই ছড়াগুলির মধ্যে মাসিপিসি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি ইহাদের উদ্দেশ্য কেবল মাসি—পিসি কথাটি মাসির সঙ্গেই আসিয়াছে, উহার অন্য কোন অর্থ নাই ; কারণ, ছড়ায় আত্মীয়ের দিক হইতে মা, মামী, মাসিকেই আমরা পাই, পিসিকে পাই না। বিশেষতঃ কতকগুলি ছডার মধ্যে কেবল মাসিই আছে, পিসি নাই। ইহার মধ্য দিয়া মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী ছড়াগুলিতে আমরা দেখিব, নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মা বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে। সুতরাং এখানেও সেই সূত্রেই মাসিই লক্ষ্য, পিসি কিছু নহে। তবে একটি মাত্র ছড়াতে যে এখানে ঘুমনি পিসি উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা ঘুম্‌নি মাসিরই একটি আধুনিক রূপ মাত্র. হয়ত বিস্তৃততর ভাবে সন্ধান করিলে ঘুমনি মাসি পাঠটি পাওয়া যাইতে পারে। শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়াই ছড়া প্রধানতঃ রচিত হয়, শব্দই ছড়ার প্রাণ-স্বরূপ, অর্থ ইহার গৌণ মাত্র। ঘুম্‌নি মাসি এবং ঘুমনি পিসি কথা দুইটির মধ্য দিয়া এমন কোন উচ্চারণগত পার্থক্য আছে, যাহার জন্য একটি আর একটির স্থলে গ্রাহ্য

বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সর্বদাই যে রচনায় অনুপ্রাসের ব্যবহার গ্রহণীয় তাহা নহে, কোন কোন সময় স্থর বৈচিত্র্য স্থষ্টির জন্য তাহা বর্জনীয়ও হইতে পারে, ঘুমনি মাসির পরিবর্তে ঘুমনি পিসির মধ্যে অনুপ্রাস যে বর্জিত হইয়াছে, তাহা স্থরের বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে এই বিষয়ের কোন নজির গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। তথাপি স্বীকার করিতে হয়, ঘুমপাড়ানি ছড়ার রাজ্যে ইহা একটি মাত্র ব্যতিক্রম, ইহার আর কোন নিদর্শন্ কোথা হইতেও পাওয়া যায় না।

উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যেও দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ছড়ার কোন কোন অংশ আসিয়া ইহাদের মধ্যে যুক্ত হইয়াছে। তাহাতে নিদ্রার স্থনিবিড় পরিবেশটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রথম তুইটি পদ সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন রহিয়াছে—ইহাদের পরবর্তী পদগুলি সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই। যে সকল অঞ্চলে সামাজিক জীবনের সংহতি নিতান্ত শিথিল, সেই সকল অঞ্চলেই ছড়ার এক একটি দৃঢ় সংবদ্ধ রূপের অভাব দেখা যায়। সেইজন্য উদ্ধৃত ছড়াগুলির কোন কোন আঞ্চলিক রূপ নিতান্ত শিথিলবদ্ধ এবং তাহা বিভিন্ন ছড়ার সমাবেশে গঠিত হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় সংগৃহীত ৬ সংখ্যক ছড়াটির প্রথম তুই পদের পরই খেলার একটি ছড়া ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, তাহাতে নিদ্রার পরিবেশটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত ৭ সংখ্যক ছড়াটিরও তাহাই হইয়াছে, ইহার মধ্যে কন্যার পতিগৃহে যাত্রা বিষয়ক একটি ছড়া আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। কোন বিষয়ে একটি স্থদৃঢ় সংস্কার গড়িয়া উঠিতে না পারিলেই সেখানে অনিশ্চয়তা এবং শিথিলতা দেখা যায়, এই ছড়াটি সম্পর্কে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।

এই ছড়াটি সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু সকল অঞ্চল হইতেই তাহা সংগৃহীত হয় নাই। বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল সমূহে ইহার এক একটি প্রাচীন রূপ রক্ষা পাইবার কথা, সেই দৃষ্টি লইয়া ইহার অনুসন্ধান করা হইলে ইহার সম্পর্কে আরও নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল হইতে ইহার যে একটি রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার কথা এখন বলিব।

নিদ্রালি মা

পূর্ববাংলার প্রান্তিক অঞ্চল সমূহে এই ছড়াটিরই যে কয়েকটি রূপ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির পরিবর্তে নিদ্রালি মার কথাই কেবল শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে মাসিপিসির কোন উল্লেখ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়াগুলির প্রাচীনতম রূপ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলার প্রান্তিক অঞ্চল সমূহেই রক্ষা পাইয়াছে; সেইজন্য এই ছড়াগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে পূর্বে মা-ই ছিলেন, মাসিপিসি ছিলেন না, তারপর ক্রমে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার মধ্যে নানা আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক আসিয়া স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ মা-ই শিশুর আদিম এবং প্রথম আত্মীয়। সুতরাং শিশুর ছড়া মাকে লইয়া সৃষ্টি হওয়া যত সহজ, অন্য কাহাকে লইয়া রচিত হওয়া তত সহজ নহে। সেইজন্য এই ছড়াগুলির মধ্যে শিশুনিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননী স্বয়ং, আর কেহ নহে। ছড়াগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

১

নিদ্রালি মাউরে, আঙার বাড়ীত আইও,
খাট নাই পালঙ্ নাই, পিড়ি দিতাম জাগা নাই,
আমার মণির চক্ষের উপর বৈস॥
ও নিদ্রালি মা আমার বাড়ীত আইও।
গাল ভরি সুপারি দিয়ম,
বাটা ভরি পান দিয়ম
বাছার চক্ষুর উপর বৈও॥
ডাইল দিয়ম্ চাউল দিয়ম্ রসাই করি খাইও॥—চট্টগ্রাম

২

নিদ্রালী মা বাপরে আঙারো বাড়ীত আইও।
উঠানেত শঙ্খ নদী, পা পাহালিয়া যাইও॥
হাতিনাতে কানির বোচকা, পা মুছিয়া যাইও।
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা, মাথাত তৈক্যা দিও।
সোনার ঢুলন পাড়ি দিয়ম পড়িয়া ঘুম যাইও॥—চট্টগ্রাম

৩

নিদ্রালী মা মুই (মাসি) আমার মাথা খাইও
আসন দিতাম শক্তি নাই পাগলার,
চোখে বইও ॥
উতরথুন্ আইয়ের্ অলি চান্দ্যা ঘোড়াত্ চড়ি
দক্ষিণথুন্ আইয়ের্ অলি লাল্যা ঘোড়াত্ চড়ি
পূবেথুন্ আইয়ের্ অলি কাল্যা ঘোড়াত্ চড়ি
পশ্চিমথুন্ আইয়ের্ অলি সাদা ঘোড়াত্ চড়ি
জাদুর মা সুতা কাটে ডিঁয়লে ডিঁয়লে নাল
জাদু গেইএ ঘোড়া দৌড়াইত,
দিঘির উতর পার ॥
এক ঘোড়া কালা, এক ঘোড়া ধলা,
এক ঘোড়া কপালে চান (চান্দ)
জাদুর মারে জিজ্ঞ্যাস্ কর কন্ ঘোড়া,
করিব দান ॥—চট্টগ্রাম

৪

ও নিদ্রালি মারে তুই আমারো
বাড়ীত্ আয়্ ।
আমারত্ আছে গুরা বাছা,
লগে ঘুম যা ॥
ডাইলও দিয়ম্ চাইলও দিয়ম্,
রসাই করি খাইও ।
বড়রে নেহালি দিয়ম্,
শুইয়া নিদ্রা যাইও ॥—চট্টগ্রাম

৫

নিদ্রালি মাউরে আমার বাড়ীত্ আইস ।
খাট নাই পালঙ নাই,

পিঁড়ি দিতাম জাগা নাই,
আমার মণির চখের উপর বৈস ॥—চট্টগ্রাম

৬

ও নিদ্রালির মা, আমার বাড়ীত আইও।
গাল ভরি সুপারি দিয়ম,
বাটা ভরি পান দিয়ম্,
বাছার চক্ষুর উপর বৈও।
ডাইলও দিয়ম্,
চাইলও দিয়ম্,
রসাই করি খাইও ॥—চট্টগ্রাম

৭

নিন্‌রাওয়ালী মাইয়া গো
কালবাতুড়ের ছাও।
পাইল্যা লাইল্যা শিয়ান করলাম
ফড়িং ধইর‍্যা খাও ॥—মৈমনসিং

হলি হলি হলি গো কালবাতুড়ের ছাও,
বাতুড় গেছে মধু আন্‌তো
শুইয়া নিদ্রা যাও ॥—মৈমনসিং

হলি ললিরে কাল বাতুড়ের ছাও,
পাক্‌না কাঁঠাল ভাঙ্গ্যা দিয়াম ডালে বইসা খাও।—মৈমনসিং

১০

নিন্দুওয়ালীর মা আমার বাড়ী যাইও।
বাটা ভরি পান দিমু গাল ভরি খাইও ॥
এক ডালা ধান দিমু চিড়া কুটি খাইও।
ইগ্‌গা চিড়া উনা অইলে তেলী বাড়ী যাইও ॥

তেলী দিব তেলীর ছাতা মালী দিব ফুল।
আমার বাড়ী শেমাই লাতু লাখ টাকার মূল ॥—শ্রীহট্ট

এই ছড়াগুলির সঙ্গে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি শ্রেণীর ছড়াগুলির রস ও ভাবগত পার্থক্য কিছু মাত্র নাই, পার্থক্য কেবলমাত্র নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিচয় লইয়া; অন্যত্র যেখানে তাহা মাসিপিসি, এখানে তাহার পরিবর্তে মা স্বয়ং। এই ছড়াগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, মার পরিবর্তে প্রথমোক্ত ছড়াগুলিতে যে মাসিপিসির নাম আসিয়াছে, তাহার কেবল মাত্র ছন্দের অনুরোধেই প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। যে সুর ও ছন্দে উক্ত ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক অক্ষর বাচক (monosyllabic) শব্দের স্থান হইতে পারে না। তাহা হইলে মা শব্দটিকে ভাঙ্গিয়া চারি মাত্রায় পৌছাইতে হয়, তাহার পরিবর্তে চারি মাত্রিক শব্দ মাসিপিসি অতি সহজেই ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে। অর্থ বিসর্জন দিয়া ছড়ার মধ্যে সুরই রক্ষা করা হইয়া থাকে; সেইজন্য পশ্চিম বঙ্গের ছড়াগুলির মধ্যে মার পরিবর্তে মাসিপিসি আসিয়াছে। সুতরাং মাসিপিসির অর্থও এখানে মা—অন্য কিছু নহে।

এই ছড়াগুলির আরও একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পশ্চিম বঙ্গের ছড়াগুলির মধ্যে যেমন কোন কোন সময় স্বতন্ত্র প্রকৃতির সুদীর্ঘ ছড়ার অংশ আসিয়া ইহাদের মধ্যে যুক্ত হইয়া ইহাদের রসনিবিড়তা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, এখানে তাহা হয় নাই। এই বিষয়ে ইহাদের রক্ষণশীলতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এখানেও খাট পালঙ্কের অভাবের কথার বর্ণনা আছে, নিদ্রালী জননীর জন্য গৃহে স্থানাভাবের উল্লেখ আছে, পান সুপারি চাউল ডাইল সিধা দিবার প্রলোভন আছে, সুতরাং অন্যান্য কোন বিষয়েই 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি' শ্রেণীর ছড়ার সঙ্গে ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। এক জায়গায় যেমন 'ভাত রেঁধে খেও' বলিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে, অন্যত্র তেমনই 'রসাই করি খাইও' বলিয়া নির্দেশ আছে; সুতরাং ইহারা অন্যান্য কোন বিষয়েই ভিন্ন নহে। মা শব্দটির স্বরোচ্চারণ দীর্ঘায়িত হইবার জন্য এখানে সুমধুর নিদ্রার যে একটি আবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, মাসিপিসি শ্রেণীর ছড়াগুলিতে তাহা হইতে পারে নাই। সুতরাং নানা কারণেই মনে হইতে পারে যে, ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বাংলার প্রান্তবর্তী একটি সমাজ-জীবন আশ্রয়

করিয়া ইহা আত্মরক্ষা করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের প্রাচীন পরিচয়টি এখানে রক্ষা পাইয়াছে।

মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত তিনটি ছড়ার মধ্যে দুইটিতে নিদ্রালী মায়ের পরিবর্তে একটি অভিনব সম্বোধন সূচক পদ শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাও নিদ্রালী মা-রই অর্থবাচক। ইহার স্বরধ্বনির মধ্যে যে সুনিবিড় নিদ্রার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহার জন্যই ইহাতে প্রত্যক্ষ অর্থবাচক মা শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে ইহাই গৃহীত হইয়াছে। কিংবা এই শব্দটি দ্বারা নিদ্রাতুর শিশুকেও বুঝাইতে পারে। ইহা আদরবাচক সম্বোধন, সুতরাং মা কিংবা শিশু উভয়ের উপরই প্রযুক্ত হইতে পারে।

এই ছড়াগুলি হইতে এখানে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রকৃতপক্ষে মাসিপিসির পরিবর্তে মা বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে। সেইজন্যই প্রথমোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি শ্রেণীর ছড়াগুলির মধ্য দিয়া যে মাসিপিসির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদেরও অর্থ মা ছাড়া আর কিছুই নহে।

দ্বিতীয় ছড়াটির মধ্যে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি নদীর উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা শঙ্খ নদী। শঙ্খ নামটির মধ্যে একটু রূপকথার আমেজ আছে। রূপকথার এক রাজপুত্রের নাম শঙ্খকুমার। নিদ্রালী মা এখানে আকাশ পথে উড়িয়া আসিবেন না এবং পার্থিব ধূলি মাটির উপর দিয়া আমাদের নিত্য যাতায়াতের যে পথ রচিত হইয়া থাকে, তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া আসিবেন, সেইজন্য উঠানের শঙ্খ নদীতে তাহাকে পা ধুইয়া এবং বারান্দায় রক্ষিত ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলিটিতে পা মুছিয়া আসিতে বলা হইয়াছে, পা ধুইলেই যে পা মুছিতে হয়, তাহাও ছড়া রচয়িত্রী স্মরণ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহার শিথানের উপাধান রূপে ব্যবহার করিবার জন্য যে বস্তুটির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রচলন সম্পর্কে কেহই নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন না, এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—

'বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা মাথাত তৈক্যা দিও।'

মানকচু পাতা বৃষ্টির ছাতা রূপে ব্যবহার করিতে শুনা যায়, কিন্তু তাহা কেহ মাথার বালিশ রূপে ব্যবহার করিতে পারে, তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু বাস্তবে এবং কল্পনায় মিলিয়াই ছড়ার জগৎ গড়িয়া উঠে, কেবলমাত্র অবিমিশ্র বাস্তবও যেমন ইহাতে থাকে না, তেমনই অবিমিশ্র কল্পনার উপাদানেও ইহা সৃষ্ট

হয় না। সাহিত্য মাত্রেরই ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। সেই গুণেই ইহা সার্থক সাহিত্য।

এই বিষয়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির মধ্যে একটি পার্থক্য দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি যেমন কোন কোন সময় আকাশচারিণী পক্ষিণী, কিন্তু পূর্ববঙ্গে নিদ্রালী মা কখনই তাহা নহেন, তিনি মর্ত্যালোকচারিণী প্রতিবেশিনী, কখনও বা অবাস্তব জগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়; কিন্তু তাঁহার মর্ত্য পরিচয় সে জন্য কখনও অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই। কখনও তিনি শঙ্খনদীতে পা ধুইয়া কাপড়ের পুঁটলিতে পা মুছিয়া আসিয়া সাড়া দেন, কখনও বা তিনি লাল, সাদা, কালো রঙের ঘোড়ায় চড়িয়া আসেন, সুতরাং মর্ত্যের ধূলি মাটির পথই তাহার চলাচলের পথ, তিনি কখনও ফুরুৎ করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া উড়িয়া যান না। মনে হয়, এই প্রকৃতির ছড়াগুলিই প্রাচীনতর।

একটি মাত্র ছড়ায় মা'র সঙ্গে মুই বা মাসীর উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু তাহাও পদ পূরণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে, স্বতন্ত্র কোন অর্থ নির্দেশ করিবার জন্য নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছেলে ভুলানো

ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির সঙ্গে ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির মৌলিক পার্থক্য আছে। উভয়েই জননী কিংবা শিশুধাত্রীর রচিত বলিয়া পরিণত রস-মানসের স্পর্শে সমুজ্জ্বল হইলেও, নিদ্রার প্রয়োজনে এক শ্রেণীর ছড়া রচিত হইয়া থাকে এবং জাগ্রত জীবনের প্রয়োজনে আর এক শ্রেণীর ছড়া রচিত হইয়া থাকে; সুতরাং উভয়ের রস এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির মধ্য দিয়া দীর্ঘায়িত স্বরের বিলম্বিত উচ্চারণ, ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ত মাত্রার দ্রুত স্বরোচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যাইবে। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলি দীর্ঘ মাত্রার পদ দ্বারা গঠিত, তাহাদের তুলনায় সাধারণ ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি অল্প মাত্রার ছন্দে রচিত। সেইজন্য ইহাদিগকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্থান দিতে হইতেছে :

১

খোকন গেছে সেই পাড়া,
ভাত হ'য়েছে কড়কড়া।
ব্যঞ্জন হ'ল বাসি
খোকন আজকে উপবাসী ॥—২৪-পরগণা

২

খোকন এ'ল বেড়িয়ে,
দুধ দাও গো জুড়িয়ে।
দুধের বাটি তপ্ত,
খোকা হ'লেন ক্ষ্যাপ্ত ॥—ঐ

৩

খোকন খোকন ডাক পাড়ি,
খোকন মোদের কার বাড়ি।

আয়রে খোকন ঘরে আয়,
দুধ মাখা ভাত কাকে খায় ॥—ঐ—সুন্দরবন

ইহাদের মধ্যে যে দ্রুত তালের মাত্রা আছে, তাহা যেন ক্ষুদ্র শিশুর চরণ সঞ্চালনের মতই ক্ষিপ্র, অথচ শ্রুতিসুখকর। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলি যেমন একঘেয়ে সুরের জন্য সহজেই ক্লান্তিকর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে, ইহাদের মধ্যে তাহার আশঙ্কা নাই।

ভোজন

শিশুর জীবনে নিদ্রার পরই ভোজনের কথা উল্লেখ করিতে হয়। শয়ন আর ভোজন লইয়াই শিশুর জীবন। শিশুর নিদ্রা যেমন জননীর সমস্যা, তাহার ভোজনও তেমনই। ছড়া দ্বারা ভুলাইয়া জননীর এই সমস্যারও সমাধান হইয়া থাকে।

শিশুর ভোজন বিষয়ক ছড়ার মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের কথা উল্লেখ করিতে হয়; এই বিষয়ক তিনি মোট সাতটি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন, সংগ্রহগুলির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, দুই একটি ব্যতীত ইহাদের প্রায় সকল-গুলিই পশ্চিম বঙ্গ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম ছড়াটির মধ্য দিয়া দুধ খাইতে অনিচ্ছুক শিশুর ক্রুদ্ধ ভাবটি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে—

১

খোকা এল বেড়িয়ে,
দুধ দাও গো জুড়িয়ে ॥
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন খ্যাপ্ত ॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

যদিও লাল 'জুতুয়া' পায় দিয়া নৌকা-ভ্রমণের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি 'খ্যাপ্ত' শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য এখানে তাহার প্রসাধন-কর্ম সম্পর্কে একটু আশ্বাসবাণী শুনাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। দুগ্ধ পান সম্পর্কেও নৌকারোহণের মুখ্য কোন সম্পর্ক ছিল না; তথাপি একই উদ্দেশ্যে এখানে ইহারও অবতারণা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য—

'অবশ্য খোকাবাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, যে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা এবং তাহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে, ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য; কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচমচ শব্দ করিয়া বেড়াই, তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণ যুগলে ছোটো ঘুন্টি দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতো জোড়া, সেটা হইল জুতুয়া। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।'

দ্বিতীয় ছড়াটির মধ্যে একটু আপত্তিকর বিষয় আছে, কিন্তু ইহার সরলতা-গুণে রবীন্দ্রনাথের রুচিও ইহা দ্বারা আহত হইতে পারে নাই।

২

খোকাবাবু চৌধুরী
গাঁ পেয়েছে আগুড়ি।
মাছ পেয়েছে পবা,
আমার খোকামণির বউ ডাকছে,
ভাত খাওসে বাবা ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

খোকামণির বউ খোকামণিকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, স্বামীর প্রতি এই প্রকার সম্বোধন শিষ্ট সমাজে প্রচলিত নাই; কিন্তু শিশুর জগৎ-সংসারের রীতি নীতি স্বতন্ত্র, তাহা দ্বারাই এখানে তাহার বিচার করা আবশ্যক।

পরবর্তী ছড়াটির ভাষা ও বিষয় বিচার করিয়া ইহা পূর্ববঙ্গের সংগ্রহ বলিয়া মনে হইতে পারে—

৩

খোকা আমাদের কই
জলে ভাসে খই।
শুকোল বাটার পান
অম্বল হল দই ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

সকল মৎস্য বাদ দিয়া খোকাবাবুকে কেন যে কই মাছের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না; তবে 'কই' শব্দের অর্থ যদি পূর্ববঙ্গের ভাষা অনুযায়ী কোথায় বলিয়া ধরিয়া লই, তথাপি তাহার সহসা এখানে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খোকা এখানে খাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়, বাটার পান শুকাইতেছে, দই অম্ল হইয়া গিয়াছে।

পরবর্তী ছড়াটি নানা ভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তবু রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে একটু অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

৪

খোকা খোকা ডাক পাড়ি,
খোকা বলে, 'মা শাক তুলি'।
মরুক মরুক শাক তোলা,
খোকা খাবে দুধকলা॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

সহসা মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া খোকা যে কেন উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে নামিয়া শাক তুলিবার ক্লান্তিকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। সুতরাং মনে হয়, মা-ই এখানে শাক তুলিতে গিয়া খোকার আহারের বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন; সেইজন্য নিজের অপরাধের কথা শিশুর উপর আরোপ করিয়া এই ছড়ার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুধকলা কথাটির সঙ্গে এমন একটি বিশ্বাসঘাতক সরীসৃপ জাতীয় জীবের সম্পর্ক বহুকাল যাবৎই স্থাপিত হইয়াছে যে, তাহার সঙ্গে খোকার নামোল্লেখ খুব সুখকর হয় নাই।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর সম্পর্কেও যে ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও তাহাকে অনেক সময় অন্নভোজী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশু যখন দুগ্ধ পান ত্যাগ করিয়া অন্নাহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তখন তাহাকে খাওয়াইবার জন্য আর ছড়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শিশুর ছড়ায় যে ভাত খাওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত পক্ষে দুগ্ধ পান ছাড়া আর কিছুই নহে। রবীন্দ্র-সংগ্রহে একটি ছড়া এই প্রকার—

৫

খোকা আমার কী দিয়ে ভাত খাবে,
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ির বেগুন দিয়ে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

বেগুন দিয়া চিংড়ি মাছের ঘণ্ট খাইবার বয়স যখন হয়, তখন শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন ছড়া ব্যতীতই শিশু খাদ্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারে ; সুতরাং এখানে চিংড়ি মাছ কিংবা বেগুন ইহাদের প্রকৃত অর্থে গৃহীত হইবে না। ইহারা দুগ্ধেরই রূপক মাত্র।

খোকার খাওয়া বিষয়ক আরও দুইটি ছড়া রবীন্দ্র-সংগ্রহে এই প্রকার—

৬

আয় রে পাখি টিয়ে,
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ।

টিয়ার সঙ্গে পান খাওয়ার উল্লেখের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সকলেই জানেন টিয়ার ঠোঁট লাল, সুতরাং টিয়া পাখীর ঠোঁটের দিকে তাকাইলে মনে হয়, ইহা সদ্য পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়াছে। সুতরাং খোকাই যখন টিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হয়, তখন তাহার পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিবার চিত্রটি অতি সহজেই ইহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

তারপর—

৭

কে রে কে রে কে রে,
তপ্ত দুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দে রে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

খোকার খাদ্যকে আস্বাদ্য করিবার ইহা একটি চিত্র মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শিশু যাহা খায়, ইহা তাহা নহে—তাহা হইতে কিছু অতিরঞ্জিত। তথাপি ছড়াটির সুরে এবং ছন্দে যেন একটি সহজ আনন্দ বাঁধা পড়িয়াছে।

শিশুর ভোজন সম্পর্কিত ছড়ার মধ্যে রবীন্দ্র-সংগ্রহের পরই মেদিনীপুরের সংগ্রহের কথা উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ক মোট আটটি ছড়া মেদিনীপুর জেলা

হইতে সংগৃহীত হইলেও কয়েকটি ছড়া রবীন্দ্র-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য এক আধটুকু পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া তাহাও উদ্ধৃত করা হইল। কলিকাতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের প্রভাব ইহাদের উপর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হইবে।

মেদিনীপুরে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে শিশুর উদরের আয়তনটির উপর একটু বক্র দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে—

৮

কুড়াই পারা পেট,
তাইক তাইক নাট।
লোক পহরিবে ছিঁড়া কাতরা,
বাবু পহ্নিবে পাট ॥—মেদিনীপুর

দুধ ছাড়া শিশু আর সকল খাদ্যই খাইতে চাহে; সেইজন্য তাহাকে ছড়ার মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—

৯

বাপ ভনরি।
কি খাইতে সাধ করেছ, চালদা মুসুরী ॥
বাপ নন্দলাল।
কি খাইতে সাধ করেছ, গাছপাকা তাল ॥—মেদিনীপুর

চালদা মুসুরী কিংবা গাছপাকা তাল ছাড়াও ত কত খাদ্য আছে, তাহাও শিশুর খাইতে সাধ যায় এবং ইহার সঙ্গে আরও কত যে সাধ জড়াইয়া থাকে—

১০

আমার আশা ঘর যাইবা গো,
হদই পুকুরের ভোদই চিঁড়ি
কে ধরিবা গো,
কে খাইবা গো।

আমার আশা ঘর যাইবা গো,
হাটবারেতে টপকা সিন্দুর
কে কিনিবা গো,
কে পরিবা গো।
আমার আশা ঘর যাইবা গো,
বড় বাঁধেতে আমার ছেগলি
কে বাঁধিবা গো,
কে লড়িবা গো
আমার আশা ঘর যাইবা গো।—মেদিনীপুর

১১

কুতুর কুতুর ময়না,
ভাত খাবি ত আয় না।—মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি ২৪ পরগণা অঞ্চলে সংগৃহীত ছড়ারই একটি আঞ্চলিক রূপ। ছড়ার বিভিন্ন পাঠগুলি পরিবর্জনীয় নহে, বরং গ্রহণীয়। কারণ, প্রত্যেকটি পাঠ বিশিষ্ট সমাজ-মানসের ধারক। এই খণ্ড খণ্ড পরিচয়ের ভিতর দিয়াই অখণ্ড সমাজ-মানসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি পাঠই আমাদের গ্রাহ্য। এখানেও দেখা যায়, সামান্য হইলেও অনুরূপ অন্যান্য ছড়ার সঙ্গে ইহার কিছু না কিছু পার্থক্য আছে।

১২

খোকা এলো বেড়িয়ে, দুধ দাও গো জুড়িয়ে।
দুধের বাটি তপ্ত, খোকা হলেন খ্যাপ্ত।
খোকা যাবেন নাইয়ে, লাল জুতো পায়ে।—মেদিনীপুর

এখানে যে রবীন্দ্র-সংগ্রহের 'নায়ে'র জায়গায় 'নাইয়ে' এবং 'জুতুয়া'র জায়গায় 'জুতা' হইয়াছে, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে; কারণ ব্যতীত যথেচ্ছভাবে ছড়া কদাচ পরিবর্তিত হইতে পারে না। এখানে সেই কারণ বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ নাই, কেবল এইটুকু বুঝিলেই চলিবে যে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের কোন ভ্রান্তি নহে, বিশেষ আঞ্চলিক সমাজেরই সৃষ্টি। সুতরাং ইহা উপেক্ষণীয় নহে।

১২

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
খোকন গেছে কার বাড়ি।
ওখানে খোকন কি করে?
ডাল ভাঙ্গে আর ফুল পাড়ে।—মেদিনীপুর

ইহার সম্পর্কেও পূর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই প্রযোজ্য।

১৩

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি, খোকন গেছে কার বাড়ি?
আয় রে খোকন ঘরে আয়, দুধ মড়ি তোর হুলা খায়।—মেদিনীপুর

পরবর্তী ছড়াটিতে আবার সেই শিশুরূপী টিয়ার পান খাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু পান খাইবার জন্য খোকাবাবুকে যে দাম দিতে হইল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে এই পান খাওয়ায় আনন্দ অপেক্ষা লজ্জাই বেশি—

১৪

টিয়ারে টিয়া
বাবু যে মোর পান খাবে
তার শাশুকে বাঁধা দিয়া।—মেদিনীপুর

এই ছড়ার আবৃত্তিকারিণী যদি শিশুর জননী হইয়া থাকেন, তবে খোকার শাশুড়ী তাঁহার সম্পর্কে বৈবাহিকা বা বেয়ান, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কৌতুকের সম্পর্ক (joking relationship) বর্তমান আছে। অতএব ইহাতে সমাজ-নিন্দার কিছু নাই। কিন্তু নিজের শাশুড়ীর সম্পর্কিত এই লজ্জাকর ব্যবস্থায় খোকাবাবু যে কিছুমাত্র বিচলিত হইয়াছেন, ছড়ায় তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে চট্টগ্রাম হইতে এই বিষয়ক ছড়ার সংগ্রহই সর্বাধিক হইয়াছে। এই ছড়াগুলির আরও একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহাদের উপর পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছড়াগুলির প্রভাব এক প্রকার নাই বলিলেই চলে; সুতরাং বাংলার শিশুর ছড়ার বিশেষ একটি পরিচয় ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বাংলা ভাষাভাষী এই প্রান্তিক

অঞ্চলের ছড়া বলিয়া ইহাদের প্রাচীনত্বও অবিসংবাদিত। তবে প্রাদেশিক ভাষার অন্তরায় দূর করিয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক সময় ইহাদের রসোদ্ধার করা কঠিন। প্রথম ছড়াটির মধ্যেই এই অঞ্চলের ছড়ার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িবে।

১৫

পুকুরের চারিপারে লাগাইছে খাজুর।
খাজুর খাইয়া ছোচা পেলা বিদেশ্যা বাদুড়।
পুকুরের চারিপারে লাগাইয়াছে বট।
বিয়া করি এড়ি গেইএ মাথার মুকুট॥
পুকুরের চারিপারে লাগাইয়াছে ধন্যা।
বিয়া করি এড়ি গেইএ জগতের কন্যা॥
পুকুরের চারিপারে লাগাইয়াছে কলা।
পত্র কাটি ভাত দিয়ম্ ডাইক্যা ভাইঙ্গঅম গলা॥—চট্টগ্রাম

রস এবং রূপের দিক দিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুভূত হইবার যোগ্য। ইহার মধ্যে যেমন বর্ণনার বিস্তার ও পারিপাট্য আছে, পশ্চিমবঙ্গের এই বিষয়ক ছড়ায় তাহা নাই। অথচ সহজাত কবিত্বের স্পর্শে যে ইহা সমুজ্জ্বল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পরবর্তী ছড়াটির মধ্যে বরং এই বিষয়ক ছড়ার সাধারণ ধর্ম আরও স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে—

১৬

মোর পাগলা মোহন গাজী
ভাত কঁ অক্তে খাবে।
ছ'কুড়ি বউএর ন কুড়ি খাটাল
ঘুম কঁ অক্তে যাবে॥—চট্টগ্রাম

শিশুর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য-জীবনের সম্ভব এবং অসম্ভব, বাস্তব এবং অবাস্তব বহু পরিকল্পনা জননীর স্তরের মধ্যে উঁকি দেয়, ইহাতে তাহারই প্রকাশ দেখা যায় মাত্র। খোকার ছয় কুড়ি বউ যে সত্যই নয় কুড়ি খাটালে কোনদিন দুঃসহ জীবন যাপন করিবে, তাহা অসম্ভব; কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের

ঐশ্বর্যের স্বপ্ন প্রকাশ করিবার পক্ষে ইহা সহায়ক। শিশুকে এখানে পাগলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন, শিশু ভোলানাথ। ভোলানাথ পাগল, গৃহত্যাগ করিয়া শ্মশানে বিচরণ করিয়া থাকেন, শিশুও তাহাই,—সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলায় তাহার বিহার। ভাত খাইতে তাহার অনিচ্ছা, নিদ্রায় তাহার বৈরাগ্য, এই ভাবটি প্রকাশ করিবার সার্থক ভাষা এখানে শুনিতে পাওয়া যাইবে।

১৭

বাছা গিয়ে উতর পাড়া,
ভাত হইয়ে যে কড় কড়া
বেজন হইয়ে বাসি।
বাছারে ডাকিয়া আন দিনান্তের উপাসী।—চট্টগ্রাম

শিশু ভাতও খায় না, ব্যঞ্জনও স্পর্শ করে না ; কিংবা দিনান্তের উপবাসী থাকিবারও তাহার সাধ্য নাই। তথাপি স্নেহশীলা জননীর অশুভ এই আশঙ্কা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রকার আরও কত আছে—

১৮

আমার বাছা ন খাইব খই ন খাইব দই
ন খাইব দুধর পুলি।
বিদেশত সংবাদ দিই আমার বাছা
বাড়ীত আসত বুলি॥—চট্টগ্রাম

১৯

মণি পান্তা ভাতর শনি,
অম্বল বড় ঝাল ;
মাছ পাতরি দেখ্যে মণি ;
তিনটি দিয়ে কাল॥—চট্টগ্রাম

মাছ পাতরি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের বয়স্কের মুখরোচক খাদ্য, শিশু ইহা কদাচ আহার করিতে পারে না। কারণ, ইহাতে মৎস্যের সঙ্গে লঙ্কা এমন পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে, অভ্যস্ত খাদকের পক্ষেও তাহা বিপজ্জনক। তথাপি আমরা

যেমন আমাদের নিজেদেরই খাদ্য দিয়া দেবতার ভোগ নিবেদন করি, শিশু-দেবতার ভোগের নিমিত্তও তাহারই কল্পনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি।

তারপর আরও শুনিতে পাওয়া যায়—

২০

সুধা ন খায় হুদা ভাত,
গোয়াল্যা ন দে দই।
পিছ পিরা দি হরিণ ধাইল,
সুধার মারে লই॥—চট্টগ্রাম

২১

হাড়ি ঢুর্ ঢুর্ পাতিলা ঢুর্ ঢুর্
হরা হৈয়ে কাইত্।
সকলর বাটা সকলে থাইয়ে,
ও আমার পাগলার বাটা কই?
পাগলার বাটা বিলাইয়ে থাইয়ে,
ও আমার পাগলার আপদ বালাই লই॥—চট্টগ্রাম

কোন কোন সময় গৃহপালিত মার্জার শিশু ভোলানাথের দুধের বাটিটি নিঃশেষ করিয়া পান করিয়া যায়। তাহার মধ্যেও উক্ত সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

২২

ঠাকুর পোঅরির্ টুগুর মাছ্উ্আ,
মোচরি ভাঙ্গম্ কৈঁটা।
তেলতুর্ন্ তুলি ঝোলত্ দিলুম,
বাছা মণির বাটা।
বাছার বাটা কৈ?
ছিক্কা ছিঁড়ি বিলাইয়ে খাইয়ে,
বাছার বালাই লই। —চট্টগ্রাম

২৩

খুকুন বালা টাকার ছালা
মট্‌কী ভরা ঘি,
খুকুর ভাতে ভোজ হল না
ছি ছি ছি।—চট্টগ্রাম

খুকুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভাণ্ড ভরা ঘৃত গৃহে মজুত থাকা সত্ত্বেও যে কেন ভোজ হইল না, তাহার কোন কারণ নির্দেশ করা হয় নাই ; কিন্তু ইহাতে যে শিশুচিত্ত কিছু মাত্র বিচলিত হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সাঁওতাল পরগণা হইতে মাত্র একটি এই বিষয়ক ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শিশুর ভাত খাইবার অনিচ্ছার কথা এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে—

২৪

নুনু গেইছে খেলা কর্তে খেল কদমের তলা।
ডাকলে নুনু রা দেয় না ভাত খাবার বেলা॥—সাঁওতাল পরগণা

বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলের এই বিষয়ক ছড়াগুলিও নানাদিক দিয়া বিশেষত্ব পূর্ণ ; তবে ইহারাও ভাগীরথী তীরের প্রভাব হইতে সর্বত্র সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই কিছু কিছু বৈষ্ণব প্রভাবও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

২৫

পটল গেছেরে খেলাতে তেলি মেলিদের পাড়া।
তেলি মেলিরে গাল দিয়েচে এল মাখনচোরা॥
ননী খেয়েচে ভাঁড় ভেঙ্গেচে তার দেব গো দাম।
নেচে আয় রে মাখনচোরা তুই কি গলার হার॥—বাঁকুড়া

২৬

খুকু গিয়েছে বেড়াতে
দুধ দিয়েছি জুড়োতে।
দুধে পড়লো মাছি
খুকু খাবে চাঁছি॥—বীরভূম

২৭

খোকা যাবেরে শ্বশুর বাড়ী
কি দিয়ে ভাত খেয়ে ?
লাঙ্গল হাটার চিংড়ী মাছ
বাকুলের বেগুন দিয়ে ॥
খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী
খেয়ে যাবে কি ?
লাভপুরের ময়দা আর
শিউড়ির ঘি।
(আর) বোলপুরের কড়াই এনে
লুচি ভেজে দি ॥—বীরভূম

২৮

খোকা গিয়েছে কোন্ খানে ?
বিন্দ রাজার বিল পানে
সেখানে খোকা কি করে ?
কাদা ঘাঁটে আর মাছ ধরে ॥
মরুক মরুক মাছ ধরা,
খোকা খাবেরে দুধ কলা ॥—বীরভূম

মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে যে একটি মাত্র ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বিশেষত্বহীন বলিয়াই বোধ হইবে। নানা দিক হইতে ইহার সমাজ-জীবনে যে প্রভাব অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ফলে ইহার ছড়া স্বকীয় কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে নাই—

২৯

খোকা এল বেড়িয়ে দুধ দাওগো জুড়িয়ে,
দুধে পড়ল মাছি, কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল বাঁকা, কামার দিয়ে দেখা।
কামার বলল পারবো না, খোকা বলল ছাড়ব না।—মুর্শিদাবাদ

ভাগীরথী তীরের ছড়াগুলির মধ্যে ভাব ও রসগত একটি অখণ্ড ঐক্য অনুভব করা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে চিত্রগত বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নাই—

৩০

কেরে কেরে কেরে।
তপ্ত দুধে মণ্ডা ফেলে দেরে॥
মণ্ডা গলে গলে যায়।
খোকন তুলে তুলে খায়॥—হুগলি

৩১

এ দুধ খায় কেরে
সোনা মুখ যাররে।
ঘন দুধের ছানা,
সবাই বলে দেনা দেনা।
দিলে যে মোর ঘর চলে না,
সেই কথাটি কেউ বোঝে না।—২৪ পরগণা

৩২

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি।
খোকন গেছে কার বাড়ী॥
শিকায় মণ্ডা বাটায় পান।
আমার খোকাকে ডেকে আন॥
আয়রে খোকা ঘরকে আয়।
তোর দুধ মাখা ভাত বেড়ালে খায়॥—২৪ পরগণা

৩৩

খুকি খুকি ডাক ছাড়ি,
খুকি গেছে কার বাড়ী।
দে খুকীর পায়ে বেড়ী,
আয় রে খুকি ঘরে আয়!
তোর দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
ঘরে বসে খেলা করবি।—২৪ পরগণা

৩৪

কোন্ বনে গিয়েছিলে,
ওরে রামকানু ?
আজ কেন চাঁদ মুখে
শুনি নাই বেণু ?
ক্ষীর সর ননী দিলাম
আঁচলে বাঁধিয়া,
কিছু বুঝি খাও নাই
শুকায়েছে হিয়া।—২৪ পরগণা

ঢাকা অঞ্চলের এই বিষয়ক সে সামান্য কয়টি ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

৩৫

কা-কা-কা-কাকের ছানা,
দুধ খায় না খোকন ধনা।
খোকন আমার পেটের বাছা
চাঁদ পানা মুখ।
গাল বেয়ে দুধ পড়ে
টুপ টুপ টুপ ॥—ঢাকা

৩৬

সোনামণি সোনা,
আদা দিয়ে মুগের ডাল
ঘন দুধের ছানা !
চাঁনবদনী চাঁদের কণা
সবাই বলে দে না—দে না;
দিলে যে আমার দিন চলে না,
সেই কথাটি কেউ বোঝে না।—ঢাকা

সাধারণতঃ দেখা যায়, বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে যে ছড়ার একটি বিশেষ রূপ আছে, মধ্যবর্তী অঞ্চল সমূহে তাহা নাই। প্রান্তিক অঞ্চলে ছড়ার রূপ যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, মধ্যবর্তী অঞ্চলে নাগরিক ও শিল্পজীবনের প্রভাববশতঃতাহা তত দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে হইতে তাহা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়।

কান্না

শিশুর কান্না ছড়ার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কান্না ছড়ার একটি বিষয় হইলেও শিশুর হাসি ছড়ার কোন বিষয় বলিয়াই গণ্য হয় নাই। কারণ, কান্না নিবারণ করিবার জন্য ছড়া বলিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু হাসি নিবারণ করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, শিশু আপনি হাসে বলিয়া তাহা ফুটাইবারও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। রবীন্দ্র-সংগ্রহে তিনটি কান্নার ছড়া স্থান পাইয়াছে, কিন্তু হাসির ছড়া একটিমাত্র স্থান পাইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে একটি ব্যতীত শিশুর হাসি ফুটাইবার আর কোন ছড়া নাই; অথচ কান্না রোধ করিবার ছড়া আছে অজস্র।

শিশু অকারণে কাঁদে, অকারণে হাসে। শিশুর কান্না অকারণের বলিয়া জাগতিক কোন নিয়ম অনুসরণ করিয়া সে কান্না রোধ করা যায় না—শিশুর সকল আচরণের মধ্যেই যেমন ছড়া প্রকাশ পায়, এই ক্ষেত্রেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। মাতৃকণ্ঠ উচ্চারিত ছড়া শুনিয়া শিশু কান্না ভুলিয়া যায়; অকারণের কান্না ভুলাইতেও বেশি বিলম্ব হয় না।

কিসের জন্য যে শিশু কাঁদে, তাহার রহস্য কেহ বুঝিতে পারে না, রাজার ঐশ্বর্যও শিশুর কান্না রোধ করিতে ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত এই ছড়াটির মধ্য দিয়া এই সহজ ভাবটি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে—

কিসের লেগে কাঁদ খোকা, কিসের লেগে কাঁদ,
কিবা নেই আমার ঘরে।
আমি সোনার বাঁশি বাঁধিয়ে দেব,
মুক্তা থরে থরে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

থরে থরে মুক্তা দিয়া বাঁধানো সোনার বাঁশীর প্রলোভন যদি শিশু জয় করিয়া থাকে, তবে এইবার শিকেয় তোলা ননীতে কি ফল হয়, তাহা দেখা প্রয়োজন—

২

রাণু কেন কেঁদেছে,
ভিজে কাঠে রেঁধেছে ॥
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট।
কিনে আনব শুকনো কাঠ ॥
তোমার কান্না কেন শুনি ॥
তোমার শিকেয় তোলা ননি ॥
তুমি খাও না সারা দিনই ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

অনেক সময় জননী কিংবা ধাত্রীবা মনে করিয়া থাকেন যে, শিশুকে কাঁদাইবার জন্য এক শ্রেণীর অপদেবতা আছে। তাহারাই তাহাকে অকারণে কাঁদাইয়া নিজেরা কী এক সুখ পায়। সুতরাং ইহাদের বিরুদ্ধে কোন একটা ব্যবস্থা করিতে না পারিলে শিশু নিজে কাঁদিয়া জননীরও নিশীথ-নিদ্রা দূর করিবে—

কাঁদনে রে কাঁদনে কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদবে বলে মনে করেছ আশা ॥
হাত ভাঙব পা ভাঙব করব নদী পার।
সারারাত কেঁদো না রে জাদু ঘুমো একবার ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শেষের পদটির মধ্যে স্নেহের পরিবর্তে জননীর অনিদ্রাজনিত বিরক্তির সুরটি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল।

এতটুকুন শিশুর হাসিকান্নার সঙ্গে জননীর সুখ-দুঃখ যে কি ভাবে জড়িত হইয়া থাকে, বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত এই ছড়াটি তাহার সুন্দর নিদর্শন।

পুঁটু যদি রে কাঁদে।
আমি ঝাঁ[illegible] দেব রে বাঁদে
পুঁটু যদি রে হাসে।
উঠব হেসে হেসে ॥

পুঁটু নাকি রে কেঁদেচে।
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁদেচে ॥
এবার যাব হাট।
কিনে আনব রাঙ্গা খাট ॥—বাঁকুড়া

একটি রাঙ্গা খাটের অভাবেই যে শিশু ভোলানাথ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন, তাহা কে বলিবে? মায়ের কোল যে তাহার রাঙ্গা খাট হইতেও আরামদায়ক, মা তাহা জানেন; তথাপি তাঁহার কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তিনি তাঁহাকে কতক্ষণ তাঁহার সান্নিধ্যের আনন্দ দিতে পারেন? একটি রাঙ্গা খাটের আশ্বাস পাইয়া পুঁটু যে কান্না নিবারণ করিলেন, তাহা নহে—মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়া তিনি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু পুঁটুর কান্নাও যে মায়ের আনন্দ, তাহার অশ্রুতে মুক্তা ঝরে। যখন পুঁটু ছিল না, তখনকার রিক্ততার কথা ভাবিয়া জননী এখনও শিহরিয়া উঠেন—

৫

পুঁটু আমার কেঁদেচে,
কত মুক্তো পড়েচে ॥
যখন পুঁটু আমার হয় নাই।
ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই ॥
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে।
ভিখারীতে ভিখ নিয়েচে ॥—বাঁকুড়া

এমনই আরও কত শুনিতে পাওয়া যায়—

৬

আড়ারে ঘোড়া।
শিমূলের তুলা ॥
শিমূলের ছেলেগুলো পথে বসে বসে কাঁদে।
কেঁদ না কেঁদ না বাছারা চাল-কড়াই ভাজা দেব।
ফেরবার কাঁদিলে বাছা তুলে আছাড়িব ॥
সোনাকুড়ে পড়বি।
না ছাইকুড়ে পড়বি ॥—বাঁকুড়া

৭

খিদেয় গোপাল কাঁদে,
দে গো মা তুই নবনী।
কেঁদো না কেঁদো না বাপা কোলে এস আপনি।
তুমি আমার ধন।
কোলে করে নিয়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন॥—বাঁকুড়া

২৪ পরগণা জিলা হইতেও এই ছড়াটি সংগৃহীত হইয়াছে। পরিণত মনের রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের কস্তুরীচন্দনের সৌরভ আসিয়া মিশিয়াছে। গৃহের পবিত্রতা ও মাতৃস্নেহের সজীবতা আস্বাদন করিবার জন্যই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জননীর সন্তান হইয়া মর্ত্যগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্য স্পর্শে গৃহ পবিত্রতর, মাতৃস্নেহ মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ছড়ার মধ্যেও তাহার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

৮

আয়রে 'রে আয়।
কি নেগে কাঁদিস্‌রে বাছা কি ধন তোর চাই॥
খাওয়াইব ক্ষীরখণ্ড মাখাইব চুয়া।
পাকা পাকা পান দিব সরেস গুয়া॥
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া॥
তুলে এনে দিব গগনফুল।
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল॥
সে ফুলে গড়াব হার সোনার।
(আমার) যাদু রে কেঁদ না আর॥ —বাঁকুড়া

রাজকন্যা বিবাহ করাইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া শিশু যে কান্না নিবারণ করিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই; ইহাতে শিশু সম্পর্কিত জননীর স্বপ্ন-সাধ মাত্র অভিব্যক্তি লাভ করিল। নতুবা ভোলানাথ প্রলোভনে নির্বিকার। এমন কি, রাজকন্যা সম্পর্কেও যেমন নির্বিকার, চালভাজা সম্পর্কেও তেমনই—

৯

আঁটুল বাঁটুল।
শ্যামলা শাঁটুল॥
শামলা গেল হাটে।
শামলাদের মেয়েগুলি পথে বসে কাঁদে॥
আর কেঁদো না আর কেঁদো না চালভাজা দেব।
আর যদি কাঁদ তবে তুলে আছাড় দেব॥—বর্ধমান

২৪ পরগণা জিলার সুন্দরবন হইতেও ছড়াটির সম্পূর্ণ এই রূপ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ছড়াটির মধ্যে একটু নির্মমতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ছড়াতে প্রায়ই ইহা শুনিতে পাওয়া যায় না। চাল ভাজার প্রতিশ্রুতি দিয়া শামলাদের হ্যাংলা মেয়েগুলির পথে পথে বসিয়া কান্না রোধ করিতে বলা হইল, কিন্তু সামান্য চাল ভাজায় যদি তাহারা পরিতৃপ্ত না হয়, তবে তাহাদের বিষয়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইল, তাহা শিশুজগতের নিয়ম বিরোধী। ইহা ভীতিপ্রদর্শন মাত্র, কিন্তু ছড়ায় ভীতিপ্রদর্শনের নিদর্শন বেশি পাওয়া যায় না। তবে বলা বাহুল্য, শিশু ভোলানাথ যেমন রাজকন্যা লাভের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নির্বিকার, তুলিয়া আছাড় দিবার ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে তেমনই নির্বিকার। তথাপি তাহার সম্পর্কিত শেষোক্ত কল্পনা পীড়াদায়ক। রবীন্দ্র-সংগ্রহেও একটি ছড়া আছে—

১০

খোকা খোকা ডাক পাড়ি,
খোকা গিয়েছে কার বাড়ী।
আন গো তোরা লাল ছড়ি,
খোকাকে মেরে খুন করি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

১১

কেঁদ নারে নীলমণি—কাঁদলে গলা ভাঙ্গবে।
রাত পোহালে বাঁশী দেব যত সোনা লাগবে॥—বর্ধমান

শিশুর কান্না থামাইবার ইহাই নিয়ম, নানা অসম্ভব বস্তুর প্রতিশ্রুতি ইহার লক্ষ্য। কারণ, এই সকল প্রতিশ্রুতি পালন করিবার মত দুশ্চিন্তা কাহারও কোন দিন পোহাইতে হয় না। সুতরাং ভীতিপ্রদর্শনের পরিবর্তে আশ্বাস দানই এই শ্রেণীর ছড়াতে প্রধানতঃ শুনিতে পাওয়া যায়।

১২

আতুলে কুঁতুলের মাসী কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড আশা॥
হাতে না মেলাম ভাতে না মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার।
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটিবার॥—বর্ধমান

সরস্বতী নদীর তীরবর্তী আন্দুল গ্রামের কোন্ শিশু-ত্রাসকারিণী রমণী একদিন কুঁতুলে মাসীরূপে সমাজে পরিচয় লাভ করিয়া ঘুমপাড়ানি মাসীর সতিনী হইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহার সম্পর্কে যে ব্যবস্থাটি অবলম্বন করা হইল, তাহা কঠোর বলিয়া নিন্দা করা যায় না।

১৩

সাঁঝের প্রদীপ নড়ে চড়ে।
খোকনকে যে খোঁড়ে—তার মুখটি পোড়ে॥
আর যে খোঁড়ে মনে মনে।
পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে॥—বর্ধমান

জননী মনে করেন, খোকনের কান্নার একটি কারণ হয়ত এই যে, তাহাকে সকলেই সবদা খোঁড়ে, সেইজন্য তাহার মন হইতে অসন্তোষ কিছুতেই দূর হয় না। গ্রাম্য জীবনের সংস্কারে ইহা একটি সামাজিক অপরাধ, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, অপরাধীকে ধরিবার ত কোন উপায় নাই, কারণ, এই কর্মটি মনে মনে সাধিত হইয়া থাকে, প্রকাশ্যে হয় না; সুতরাং কে যে এই দুষ্কার্য করে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, সেইজন্য শিশুর অসন্তোষও কিছুতেই দূর হয় না। কিন্তু যে-ই এই কাজ করুক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কঠিন অভিশাপ উচ্চারিত হইবার যোগ্য।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি যে দুইটি ছড়ার যুক্ত রূপ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রথমাংশ ছেলে ভুলানো ছড়া হইলেও দ্বিতীয় অংশ ছেলে খেলার ছড়া।

১৪

আটুল বাঁটুল,
শিমলে সাঁটুল,
শিমলে গেছে হাটে

গুয়া কাট কাটে।
মালীদের মেয়ে গুলো,
ঘাটে বসে কাঁদে,
আর কেঁদো না,
আর কেঁদো না,
কলাই ভাজা দিব,
আর কাঁদলে,
দাদাকে বলে দিব।
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি,
দাদা গেছে কার বাড়ী,
ও পথেতে যেওনা গো,
বঁধূ এসেছে,
বঁধুর পান খেওনা গো,
ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল
ফুটে রয়েছে,
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলাম,
দাদা রয়েছে,
দাদার হাতের বাজু বন্ধন,
ছুঁড়ে মেরেছে
উহু হু বড্ড লেগেছে।—হুগলি

স্থানে স্থানে যে ছড়ার রূপ কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ।

১৫

পুঁটু পুঁটু ডাক ছাড়ি,
পুঁটু গেছে কার বাড়ী,
নিয়ে আয়গো ফুলের ছড়ি।
পুঁটু কেন কেঁদেছে,

ভিজে কাটে রেঁধেছে,
কাল যাবো মা গঞ্জের হাট,
কিনে আন্‌বো শুক্‌নো কাট,
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত।—হুগলি

১৬

আঁটুল বাঁটুল শামলা শাঁটুল
শামলা গেছে হাটে,
শামলাদের ছেলেগুলো পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না আর কেঁদো না ছোলা ভাজা দেব।
এবার যদি কাঁদ তবে তুলে আছাড় দেব।—হুগলি

পূর্ববর্তী একটি ছড়ায় এই কান্নার মধ্যে মেয়ের গলা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, এইবার ছেলের গলা শুনিতে পাওয়া গেল।

২৪ পরগণা হইতে সংগৃহীত একটি মাত্র ছড়ায় রোরুদ্যমান শিশুর কান্না নিবারণের জন্য তাহাকে একটি রাঙা বৌ আনিয়া দিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে—

১৭

কেঁদো না আর যাদুমণি
আন্‌বো তোমার বৌ,
সোনা হেন রংটি তার
ঠোঁটে আল্‌তা পোলার ঢেউ।—২৪ পরগণা

কট্‌কটে নামক এক অদৃশ্য উপদেবতা দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করিয়া যে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শিশুর কান্না রোধ করিবার প্রয়াস দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত সর্বত্র খুব সুলভ নহে। সর্বত্র আশ্বাসের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, ভীতির কথা নহে। স্নেহে আশ্বাস, শাসনে ভীতি,—শিশু স্নেহের পাত্র বলিয়াই আশ্বাসের কথা আসে, শাসনের পাত্র হইলে ভীতির কথা আসিত। সুতরাং এই শ্রেণীর ছড়া বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না—

১৮

কট্‌কটেটা বলে আমি এই গাছে আছি,
যে ছেলেটা কাঁদে তার জুলপী ধরে নাচি—

আমার আঁধার ঘরের মাণিক,
নড়বোও না, চড়বোও না দেখবো খানিক খানিক।

—বীরভূম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি ইহারই অনুরূপ—

১৯

একনেড়ে কুলে বেঁড়ে তাল গাছে থাকে,
যে ছেলেটা কাঁদে তার কানে ধরে নাচে।—বীরভূম

মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত এই বিষয়ক দুইটি ছড়ায় গ্রাম্যজীবন সুলভ সরলতার পরিচয়টি উল্লেখযোগ্য।

কচি শিশুটি শ্বশুর বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার জন্য তাহার কোন ব্যবস্থা না করিয়া যখন তাহাকে কাঁঠাল, দুধ, দুধ খাইবার গাই, গাই রাখিবার রাখাল, পাশার গুটি কিংবা ছিট্ কাপড়ের ছাতা দিবার আশ্বাস দেওয়া হইল, তখন শ্বশুর গৃহের সঙ্গে ইহাদের সুদূর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শিশুর কান্না যে বিরাম লাভ করিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না—

কচিয়া কেনি কাঁন্দরে শুস্‌রা ঘরকে যাইতে।
আম দুব কাঁঠাল দুব কনে বুগ্গা খাইতে॥
হাল করতে হালিয়্যা দুব দুধ খাইতে গাই।
রাখাল রাখিতে দব শ্যামের ছোট ভাই॥
ঘেঁচি ঘেঁচি কৌড় দুব পাশা খেলিতে।
ছিট্ কাপড়ের ছাতা দুব মাথায় দিতে॥—মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়াও কান্নাহাসির লীলা-প্রসঙ্গ অত্যন্ত সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—

২১

নানা ভাই টানারে
মোর কথাটি শুন।
বিলের মাছ চিল খাইলা
পাটা খঁড়িয়ে নুন॥

পাটা গেলা ভাসি রে,
দড়ি গেলা খসি।
নানা ভাই কাঁদনা কাঁদে
হিড় মুড়ায় বসি।
হিড় মুড়ায় উঠি নানা ভাই
ঢেঁকিশালে বসি,
গুড়ি কুলাটা দেখিলে না ভাই
হপর হপর হাসি।—মেদিনীপুর

চট্টগ্রামের ছড়াগুলির মধ্যে সর্বদাই আমরা একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, এই বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যেও তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

২২

কান্দেরে কালাবির পোয়া,
জালা মিঠার লাগিয়া।
অপূর্ব সন্দেশ বান্ধে
কামাইর লাগিয়া॥—চট্টগ্রাম

২৩

ও বাছা ন কান্দিও ন ভাঙ্গিও গলা।
কাইল বেহানে আনি দিয়ম্ চক বাজারর লোলা॥
চক বাজারর দক্ষিণ দিগে,
তোমা'র মাতা কান্দের, যে চিকণ চিকণ গলা।
হাটুআ লোকে কয় যে
ই তার বাড়ীত্ কি।
ই তার বাড়ীত্ এক জনরে বান্ধি এড়্ গে
মৈষর লড়াই দি॥—চট্টগ্রাম

২৪

মণি কান্দে কিঅর লাই।
চিকণ তেলর ভাতর লাই॥
অ্যাউট্যা দুধর সরর্ লাই।
সুন্দর এক্গুআ জামাইর লা'ই॥—চট্টগ্রাম

২৫

ও বাচা ন কান্দ্য রে ন ভাঙ্গ্যরে গলা
বাপে কান্দের দর্গ্যার হুকুম,
দর্গ্যাও লড়ে।
ভাইএ কান্দের্ বেলকিতলে ;
বেলপাতা পড়ে।
চক বাজারর দখিন দি,
জম্মিলাব্ কান্দের্ যে
চিকণ চিকণ গলা ;
একখান ছাম্মান যার্রে
নৌকা কাঁড়ি দি,
হিন্দু বেটা ছুয়ান ধৈর্গ্যে
পাছায় আঙুল দি।
ডুম্ ডুম্ তালত ভাই,
যমুনা কান্দের্ কিঅর লাই ॥—চট্টগ্রাম

২৬

ভ্যাং কাঁদুনে ফেউয়ার মা
ঢাকা মুখে যাইও না
পাশের পিঠা খাইও না।—চট্টগ্রাম

বরিশাল জিলা হইতে যে দুইটি মাত্র এই বিষয়ক ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহারা উভয়েই বৈচিত্র্যহীন বলিয়া বোধ হইবে।

২৭

আল্লাদির পোঁটলা
কাইন্দো না।
চিড়া খাইয়া শুইয়া থাকো
রাইঙ্কো না।—বরিশাল

২৮

কান্দিও না কান্দিও না খোকা, প্যাদায় ধইরা নেবে,
তোমার বাবা সওদাগর, বালা গড়াইয়া দিবে।—বরিশাল

মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত এই বিষয়টি একটি মাত্র ছড়ায়ও কোনও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

২৯

আবওয়ানি ঝুলে রে
বাইঙ্গন পাইড়্যা তুলে রে,
আবু কান্দে আয় আয়,
বাইন্যা বেটায় নিতো চায়,
বাইন্যা বেটা নে রে
হাত্ করাইয়া দে রে ॥—মৈমনসিংহ

প্রহারের সঙ্গে কান্নার একটি সম্পর্ক আছে, যদিও শিশুজগতেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তথাপি শিশু কাঁদিলেই মনে হয়, কেহ তাহাকে প্রহার করিয়াছে; সেইজন্য কল্পিত প্রহারকারীর বিরুদ্ধে জননী নানা অভিশাপ উচ্চারণ করিয়া শিশুকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পান—

৩০

কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল,
খোকার গুণের বালাই নিয়ে
মরে যেন সে কাল ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৩১

মনারে কনে মারেগে যে, কনে ধৈরগে যে,
কনে হাড়গে যে চুল।
এক লড়া চুলর মাঝে লক্ষ টাকার মূল ॥—চট্টগ্রাম

একটি মাত্র যে হাসির ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। ইহার মধ্যে আধুনিকতার হস্তস্পর্শও একটু অনুভূত হইবে। সুতরাং ইহা সাধারণ ছড়ার বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

৩২

কে হাসেরে কে হাসেরে মণি হাসেরে।
কার হাসিটি এমন মধুর মণি হাসেরে ॥
কে ঘুমাল কে ঘুমাল মণি ঘুমাল।
কার ঘমটি এমন মধুর পাড়া জুড়াল ॥

ঘুমিয়ে হাসে কে ওরে তুই আমার রতন মণি।
ঐ হাসিটির দাম দেবে কে আছে এমন ধনী ॥—হুগলি

রবীন্দ্র-সংগ্রহে শিশুর আরও একটি হাসি-বিষয়ক ক্ষুদ্র ছড়া স্থান পাইয়াছে, তাহা এই—

৩৩

খোকার আমার নিদন্তের হাসি,
আমি বড়ই ভালবাসি।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

দন্তহীনের হাসির একটু বৈশিষ্ট্য আছে, শিশুর হাসি সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এমন কি, যে দন্তহীনের দন্ত পুনরুদ্গমের আশা নাই, তাহার হাসি এক, আর যে দন্তহীনের দন্ত-উদ্গম আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাহার হাসি আর—প্রথমোক্তটির মধ্যে জীবনের বিজয়া এবং শেষোক্তটির মধ্যে জীবনের আগমনী ঘোষিত হইয়াছে, সেইজন্য একের হাসিতে বেদনা এবং অন্যের হাসিতে আনন্দ ধরা পড়ে। শিশুর হাসি সেই আনন্দেরই হাসি।

নৃত্য

শিশুর নৃত্য বাংলা ছড়ার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সম্পর্কিত যে সকল ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পূর্বালোচিত যে কোন বিষয় হইতেই অধিক। শিশুর নৃত্য ত আর কিছুই নহে, ইহা তাহার দাঁড়াইবার অভ্যাস, নতুবা যে শিশু হাঁটিতে শিখে নাই, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তাহার নৃত্যের কোন কথাই আসিতে পারে না। মা শিশুকে দুই হাতে তুলিয়া দাঁড় করাইতে চাহেন, শিশুর দুইখানি ক্ষুদ্র চরণ বার বার মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে চাহে, জননী তাহাকে শূন্যে ধরিয়া রাখেন, শিশু বার বার মৃত্তিকার উপর দ্রুত কোমল পদাঘাত করিতে থাকে—ইহাই শিশুর নৃত্য; ইহা জননী ও শিশু উভয়ের নির্মল আনন্দের কারণ; সেইজন্য এই প্রসঙ্গে জননীর মুখে ছড়া ও শিশুর মুখে হাসি ফুটিতে থাকে।

রবীন্দ্র-সংগ্রহে এই সম্পর্কিত আটটি ছড়া পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি ছড়াই বিশেষত্বপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শিশুর নৃত্যের স্থান এবং নৃত্যকালীন আচরণ—ইহাদের উভয়ের মধ্যেই একটু বিশেষত্ব দেখা যাইবে। যেমন—

১

খোকা নাচে কোন্ খানে;
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে খোকা চুল ঝাড়ে,
থোকা থোকা ফুল পড়ে।
তাই নিয়ে খোকা খেলা করে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শতদলের মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া খোকা নৃত্য করিতে করিতে সহসা তাহার মাথার চুল ঝাড়িবার আবশ্যকতা কেন বোধ করিল, সে সম্বন্ধে কোন নৃত্যকলাকুশল ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করেন, তবে তাহার জবাবে কিছুই বলিতে পারা যাইবে না। তবে তাহার চুলঝাড়াকালীন থোকা থোকা ফুল ঝরিয়া পড়িবার যে দৃশ্যটি দেখা যাইবে, তাহাতেই হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তারপর নৃত্য ভুলিয়া সেই থোকা থোকা ফুলগুলি লইয়া যখন খোকা খেলা করিতে বসিবে, তখন তাহার নৃত্য সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নই মনে উদয় হইবে না।

২

পুঁটু নাচে কোন্‌খানে।
শতদলের মাঝখানে॥
সেখানে পুঁটু কী করে।
চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে।
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে॥ —রবীন্দ্র-সংগ্রহ

পূর্ববর্তী ছড়াটিতে শুনিয়াছি, শিশু শতদলের মাঝখানে নৃত্য করিতে করিতে সহসা চুল ঝাড়িবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন এবং চুলঝাড়াকালীন যে থোকা থোকা ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল, সহসা নৃত্য ত্যাগ করিয়া তাহা লইয়াই খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাও শুনিতে পাওয়া গেল, শিশু যে কেবল পুষ্পবিলাসী মাত্র, তাহা নহে—সে-ভোজন বিলাসী; কারণ, সে শিশু হইলেও বাঙ্গালী; সুতরাং বাঙ্গালীর প্রিয় ভোজনের বিশেষ একটি সামগ্রীই সে গোপনে সন্ধান করিয়া বেড়ায়। 'ডুব দিয়ে জল খাওয়া' বলিয়া যে একটি বাংলা প্রবাদ আছে, তাহার একটি রূপ হয়ত, 'ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরা।' তাহাই এই ছড়ার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়া থাকিবে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শিশুর নৃত্য-স্থানটি অপ্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছে; তাহা বুকের মধ্যস্থল, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে—অনুভূতি-সাপেক্ষ মাত্র। কিন্তু অপ্রত্যক্ষলোকে শিশুর নৃত্যানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইবার সময় প্রত্যক্ষলোকে যে একটি ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার রূঢ় বাস্তবতা যে-কোন অনুভূতিশীল ব্যক্তিকেই আঘাত করিতে পারে—

খোকা নাচে বুকের মাঝে,
নাক নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
ওরে বোয়াল ফিরে আয়,
খোকার নাচন দেখে যা।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নাক যদি বোয়াল মাছে প্রকৃতই লইয়া যায়, তবে ডাকিলেই সে ফিরিয়া আসিয়া কেবল মাত্র খোকার নৃত্যদর্শনের বিনিময়েই তাহা ফিরাইয়া দিতে পারে, এমন আশা কেবল শিশুরাজ্যেই সম্ভব।

বাংলার গৃহে গৃহে শিশু মাত্রই বাল গোপালের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়, সেইজন্য ছড়ার মধ্যেও সেই ভাব প্রকাশ পায়। এখানে শিশু কৃষ্ণ মুরলীবদন এবং ব্রজাঙ্গনার প্রাণধন বলিয়া অনুভূত হইয়াছেন—

৪

একবার নাচো চাঁদের কোণা,
আমি মুরলী বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা,
আবার তোমার নাচন আমি জানি, জানে না ব্রজাঙ্গনা।

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

যে নাচ ব্রজাঙ্গনারাও জানে না, মাত্র একজন জানেন, সেই একজন কে এবং সেই নাচই বা কি? সুতরাং ইহা শ্রীকৃষ্ণের কদম্বতলায় বংশীধ্বনি করিয়া নৃত্য নহে, ইহা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নিত্য অনুষ্ঠিত শিশুর নৃত্য এবং এই নৃত্যের রহস্য যিনি জানেন, তিনি জননী ছাড়া আর কেহই নহেন।

শিশুর নৃত্যের অবলম্বন কেবল মাত্র ত চরণ যুগলই নয়, তাহার সর্বাঙ্গ—

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মুখের নাচন,
নাটা চোখের নাচন, কাঁটালি ভুরুর নাচন,
বাঁশির নাকের নাচন, মাজা বেঙ্কুর নাচন,
আর নাচন কী,
অনেক সাধন ক'রে জাদু পেয়েছি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

জননীর বাৎসল্য রস ইহার ভিতর দিয়া যেন শত ধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িয়াছে। শিশুসন্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি অনুভব করেন, শিশু যেন সর্বাঙ্গ দিয়া নাচিতেছে,—সে হাত দিয়া নাচিতেছে, পা দিয়া নাচিতেছে, বাটা মুখে নাচিতেছে, নাটা চোখে নাচিতেছে, কাঁটালি ভুরু দিয়া নাচিতেছে, বাঁশীর মত নাক দিয়া নাচিতেছে, সুডৌল কটিদেশ দিয়া নাচিতেছে, দেহের আর কোন্ অঙ্গ বাকি রহিল? এত কথা বলিয়া জননী যেন পরমা তৃপ্তিতে গোপন মনের কথাটি নিজের মনে তাহার নিজেকেই বলিলেন, 'অনেক সাধন ক'রে যাদু পেয়েছি।' সন্তান যে বড় সাধনার ধন, কঠিন দুঃখতপস্যায় সিদ্ধি, মাতৃত্বের ভিতর দিয়া নারী তাহাই অনুভব করে।

জননীর স্বপ্নে শিশুর সম্বন্ধে কত সম্ভব অসম্ভব চিত্র ভাসিয়া বেড়ায়—

৬

থেনা নাচন থেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে খালো চিনা,
ছাগলে খালো ধান।
সোনার যাদুর জন্যে যারে,
নাচনা কিনে আন ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর রাজ্যে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই; এমন কি, প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য হাটে 'নাচনা' বা নৃত্যও কিনিতে পাওয়া যাইবে। এই ছড়া শুনিয়া সকলেই ছড়ার রস উপলব্ধি করিবে, কিন্তু ইহার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন করিবে না।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির অসম্ভাব্যতা আরও উৎকট, কিন্তু শেষাংশের চিত্রটি অত্যন্ত বাস্তব—

৭

আয় রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে ॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে ॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

টিয়া আকাশচারী পক্ষী, নৌকাবিহার তাহার পক্ষে কল্পনাতীত, যদিও বা তাহা কোন প্রকারে সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তথাপি ইহাকে যে নৌকায় ভরা দিয়া আসিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোয়াল মাছে লইয়া যাইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া সহসা ভোঁদড় নামক মৎস্যাশী জীব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিতে পারে, তাহা কাহারও বুদ্ধিতে উদয় হয় না। অথচ শিশুর জগতে সবই অতি সহজে সম্ভব হইয়াছে।

এখানে ভোঁদড় আর শিশু অভিন্ন, শিশুর ক্ষুদ্র বক্ষটির তুলনায় ঈষদুন্নত উদরটি দেখিলে তাহাকে ভোঁদড় বলিয়াই মনে হইবে। ভোঁদড় যখন কখনও দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আহারের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন তাহাকে মানবশিশু বলিয়াই ভ্রম হয়; সুতরাং শিশুকে ভোঁদড়রূপে কল্পনার মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরও একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে ছেলে খেলার ছড়ার একটি মিশ্রণ হইয়াছে, ইহার শেষ দুইটি পদ শিশুর নৃত্যবিষয়ক ছেলে ভুলানো ছড়া, কিন্তু প্রথমাংশের পদগুলি ছেলে খেলার ছড়ার অন্তর্গত। সেইজন্য ইহার রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

৮

উলু কেতু দুলু কেতু নলের বাঁশি।
নল ভেঙেছে একাদশী॥
একা নল পঙ্কদল।
কে যাবি রে কামার সাগর॥
কামার মাগী কেরকেরানি
যেন পাটরাণী॥
আক বন ডাব বন।
কুড়ি কিষ্টি বেড়াবন॥
কার পেটের দুয়ো।
কার পেটের সুয়ো॥
ব'লে গেছে চডুই রাজা।
চোরের পেটে চালকড়াই ভাজা॥
কাঠবেড়ালি মন্দা মাগী কাপড় কেচে দে।
হারদোচ খেলাতে ডুলকি কিনে দে॥
ডুলকির ভিতর পাকা পান।
ছি হিঁদুব সোয়ামি মোচরমান॥
এক পাথর কলাপোড়া এক পাথর ঝোল।
নাচে আমার খুকুমণি বাজা তোরা ঢোল॥ —রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ছড়াটির আত্মোপান্ত পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার শেষ পদ দুইটি ব্যতীত সম্পূর্ণ অংশই কিশোরমনের নিজস্ব সৃষ্টি। সেইজন্য ইহার চিত্রে যেমন অসঙ্গতি, রসে তেমনই বিক্ষিপ্ততা, ইহাতে জননীর পরিণত জীবন-অভিজ্ঞতার স্পর্শ নাই। কেবলমাত্র শেষ দুইটি পদই প্রকৃত পক্ষে ছেলেভুলানো ছড়া অর্থাৎ জননী কর্তৃক রচিত শিশুর নৃত্য বিষয়ক ছড়া। এইভাবে শৈশবে শিশু জননীর মুখ হইতে যাহা শুনিতে পায়, তাহা লইয়াই পরবর্তী জীবনে খেলার ছড়া রচনা করে।

৯

একবার নাচো চাঁদের কোণা।
আমি মুরলী বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা॥
আবার তোমার নাচন আমি জানি, জানে না ব্রজাঙ্গনা॥

—২৪ পরগণা

রবীন্দ্র-সংগ্রহেও ছড়াটি পাওয়া যায়, সুতরাং মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ২৪ পরগণা অঞ্চল হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শিশুর নৃত্যের তালে তালে যেন বিশ্বসংসার নাচিতে থাকে বলিয়া জননী অনুভব করেন—

১০

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥
ক্ষীর খিরাস ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা।
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত গোপের বালা।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে।
তাদের হাতে নড়ি, কাঁধে ভাঁড়—
নাচে থেয়ে থেয়ে॥—২৪ পরগণা ও হুগলি

১১

সোনার নূপুর পায়।
খুকু নেচে নেচে যায়॥
হাতে নিয়ে শবরী কলা।

চুষে চুষে খায় ॥
খুকু ফিরে ফিরে চায়।
আর নেচে নেচে ধায় -২৪ পরগণা

১২

খোকা নাচে পায়,
খুঁদ কুড়াটি পায়।
খোকার মা আদুরী,
নিত্য পিঠে খায় ॥
একটুখানি পিঠের তরে
খোকারে কাঁদায় ॥—২৪ পরগণা

১৩

বাড়ীর বেগুন পুকুরের মাছ,
তাই খেয়ে কি ভালুক নাচ।
ভালুক নাচে থর থর
দুধ খেয়ে ফেলেছি সর
ভালুক নাচে গোটা গোটা
মাছ খেয়ে ফেলেছি কাঁটা।—২৪ পরগণা

১৪

তাক থুড়া থুড় থুড়া,
ভাঙ্‌লো গাছের গোড়া।
নামলো হাতের থোপ,
খোকার নাচন দেখ্‌তে এলো
সওদাবাদের লোক।
সওদাবাদের ময়দারে ভাই,
বহরমপুরের ঘি,
খাসা করে লুচি ভেজে
খোকার মুখে দি।—২৪ পরগণা

১৫

সোনার যাদুর জন্যে যারে নাচ্‌না কিনে আন।
নাচোরে নাচো যাদু নাচনখানি দেখি ॥—ঐ

মনে হয়, ইহা এই বিষয়ক সুদীর্ঘ ছড়ার একটি অংশমাত্র।

১৬

ধেইত বাঁদর নাচ করে,
কুঁচনীর মত পদ করে।
বাড়ীর বেগুন পুকুরের মাছ,
তাই খেয়ে কি ভোঁদড় নাচ।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা,
খোকার নাচন দেখে যা।—২৪ পরগণা

১৭

সোনা নাচে কোণা
মনা বাজায় ঢোল
সোনার বৌ রেঁধে রেখেছে
ইলিশ মাছের ঝোল।—২৪ পরগণা।

১৮

আয়রে পাখী আয়
কালো জামা গায়
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
সোনার নূপুর যায়।—২৪ পরগণা

পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়ার অংশ কি ভাবে যে আর একটি ছড়ার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একটি নূতন ছড়ার সৃষ্টি হইয়াছে, এখানে তাহা দেখা যায়—

১৯

ভোঁদড় নাচে,
ভোঁদড় নাচে কোন্‌খানে।
শতদলের মাঝখানে,
সেখানে ভোঁদড় কি করে,
ডুব গেলে গেলে মাছ ধরে।—হুগলি

২০

নাচিয়ে কাঁদিয়ে বাবা কি পেয়েছ দান।
বড় বড় বস্তর ঘরে আধ কাঠা ধান ॥—হুগলি

কৃষিভিত্তিক সমাজ-জীবনে রচিত ছড়ায় কৃষিজীবনের চিত্রও মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠে—

২১

দোল তুলতে এলো বান,
হেজে গেল জলার ধান,
যাক ধান থাকুক নাড়া,
নাড়া কেটে দিব রাঙ্গা ধাড়া,
রাঙ্গা ধাড়া পাটের থোপ,
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।—হুগলি

পরিণতবুদ্ধি জননীর রচনা বলিয়াই ইহাতে প্রতিবেশিনীদের ঈর্ষা করিবার কথা আসিয়াছে, নতুবা রাঙ্গা ধাড়াই হউক, কিংবা পাটের থোপই হউক, তাহা যে ঈর্ষা করিবার কিছুমাত্র বস্তু নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু জননীর ইহা ভাবিয়াই আনন্দ যে, যে-বস্তু দিয়াই তিনি তাঁহার সন্তানকে সাজাইয়া রাখুন না কেন, তাহাতেই পাড়ার লোক ঈর্ষা করিয়া মরে।

পূর্বে যে শিশুকে ভোঁদড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে দেখিয়াছি, এখানে তাহার পরিবর্তে দেখা যায়, তাহাকে শিয়ালের যে একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে, তাহার সন্ধান কোনও জীব-তত্ত্ববিদ্ বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ—

২২

আক্ বাড়ীর পাশে।
ভুঁড়শিয়ালী নাচে ॥
বাড়ীর বেগুন ডোবার মাছ।
তা খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ ॥—বাঁকুড়া

ভুঁড়শিয়ালী জীবটি কি? বাংলা দেশে ত এই শ্রেণীর কোন জীবের সন্ধান পাওয়া যায় না! ভোঁদড় এবং শিয়াল এই দুইটি শব্দ একত্র হইয়া ভুঁড়শিয়ালী

হইয়া থাকিবে। ছড়ায় শিয়ালী শব্দটিই সাধারণতঃ প্রচলিত, শুধু শিয়াল নহে : যেমন—

এক ছিয়ালী রান্ধে বাড়ে আর ছিয়ালী খায়।
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ি যায়॥

ভুঁড়শিয়ালও সেই সূত্রেই ভুঁড়শিয়ালী হইয়াছে। পশুর প্রকৃতি সম্পর্কে যে ছড়ায় বাস্তব জগৎকেই অনুসরণ করা হয় না, কল্পনায় সেখানে জীবন ও জগতের নূতন নূতন রূপ প্রকাশ পায়, বুলবুলির ধান খাওয়ার ব্যাপারে তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখানেও দেখা যায়, ভোঁদড়-শিয়ালীকে একদিকে যেমন মৎস্যাহারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই আবার শাকাহারী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভোঁদড়ই হউক, কিংবা শিয়ালই হউক, কেহই যে শাকাহারী নহে, ছড়ার রচয়িত্রী তাহা বিচার করিবার অবকাশ পান না।

বাঁকুড়া জিলার বনবিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে সেখানকার ছড়াগুলির মধ্যে স্বভাবতই বৃন্দাবনের কস্তুরী চন্দনের সুরভি মিশ্রিত হইয়াছে—

২৩

ধেই ধেই চাঁদের নাচন।
বেলা গেলে চাঁদ নাচ্‌বি কখন॥
নেচে নেচে কোলে আয়।
সোনার নেপুর দিব পায়॥
নেচে আয়রে নীলমণি।
তোমার নাচন দেখ্‌ব আমি॥—বাঁকুড়া

শিশুর সঙ্গে চাঁদের তুলনা করিতে সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নৃত্যশীল চাঁদের কথা কে কল্পনা করিতে পারে? আকাশের চাঁদ স্থির হইলেও মায়ের কোল জোড়া করিয়া যে চাঁদটি মাটিতে নামিয়া আসিয়াছেন, তাহার চঞ্চল নৃত্য জননীর আনন্দ-উৎস।

কখনও কখনও জননী শিশুকে নাচাইবার জন্য একটি সুন্দরী কন্যার প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন। মায়ের মনে শিশু সম্পর্কে কত স্বপ্ন ভাসিয়া

বেড়ায়, একদিন তাহাকে বিবাহ করাইয়া একটি সুন্দরী বধূ গৃহে আনিয়া তুলিবেন, সেই স্বপ্নও তিনি দেখিয়া থাকেন—

২৪

মাণিক মাণিক মাণিক
নাচে দাঁড়ারে খানিক।
কত কত সুন্দর কনে আস্‌বে আপনি ॥—বর্ধমান

একটি সুন্দরী কন্যার প্রলোভন পাইয়া শিশুটি যে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিল, এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই, ইহার ভিতর দিয়া সন্তান সম্পর্কে জননীর একটি আনন্দের অভিলাস ব্যক্ত হইল মাত্র।

২৫

হাতি ঝুলু ঝুলু আইল বান।
ভাজিয়া গেল জলার ধান ॥
হাতি যাবে রে বর্ধমান।
হাতির কঁপায় পাকা পান ॥
কে খাবেরে গঙ্গারাম
গঙ্গারামের পঙ্গা ফাটে
তা ধেই ধেই কল্কা নাচে।—মেদিনীপুর, কাঁথী

২৬

আশত গাছে পুতলা নাচে
তাই ঝুম ঝুম নেপুর বাজে
কাল মামু ঘরে মানসা পূজা
বাবু খাবে মোর উখড়া ভুজা।—মেদিনীপুর

ছড়ায় কতকগুলি বাস্তব জীবনের মানব-চরিত্রেরও নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে একজন যেমন শিব সদাগর, আর একজন নন্দ ঘোষ। পরবর্তী আলোচনা হইতে জানা যাইবে, শিব সদাগর কোন ব্যক্তি নহে, ইনি একটি পশু—শিয়াল। নন্দ ঘোষও শ্রীকৃষ্ণের পালক-পিতা নহেন, এমনই কোন চরিত্র হইবেন; পশু পক্ষী লইয়াই ছড়ার সূচনা হইলেও অনেক সময় তাহা গিয়া

মনুষ্যের পরিচয়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ,' 'আমি বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দেরে'—এই সকল ছড়ার নন্দ ঘোষই যে এখানে উল্লেখিত হইয়াছেন, তাহা সহজেই মনে হইতে পারে।

২৭

আতা তলা, বাতা তলা
তা ধিন ধিন ফুলের মালা
ফুল বাগানে কেরে—
নন্দ ঘোষের বৌরে ॥—মুর্শিদাবাদ

২৮

কুকুর বাজায় টুমটুমি
বানর বাজায় ঢোল,
টুনটুনিয়ে টুন টুনালো
ইন্দুর বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি
চেয়ে দেখরে খোকন মণি ॥—রাজসাহী ও পাবনা

'সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়' বৈষ্ণব পদাবলীর এই পদটির মূল উৎসটি হয়ত এখানেই পাওয়া যাইতেছে—'সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি'। এই দৃশ্য শিশুর উপভোগ্য নহে; কারণ, শিশু ইহার সুগভীর তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিবে না, জননীরই অবচেতন মনের একটি চিন্তা এই পদটি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

২৯

সোনা নাচে কোণা
বলদ বাজায় ঢোল,
সোনার বউ রেঁধে রেখেছে
ইলিশ মাছের ঝোল ॥—ঢাকা

বধূর ইলিশ মাছের ঝোল রান্না করাই যদিও সোনার নৃত্য করিবার মুখ্য কারণ, তথাপি বলীবর্দ নামক ভারবাহী পশুর আকস্মিক বাদ্যচর্চার প্রেরণা অনুভব করিবার কোন মুখ্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

বাংলার উপকথায় জোলা শুধু দরিদ্র নহে, বুদ্ধিহীনও বটে; অবশ্য বুদ্ধিহীনতার জন্যই দরিদ্র। কিন্তু জোলা পরিবারে যে কোনদিন নৃত্যের ব্যাপক অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না; জগতে যাহার দৃষ্টান্ত নাই, ছড়ায় তাহার উল্লেখ আছে, সুতরাং এখানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, এই সর্বব্যাপী পারিবারিক নৃত্যানুষ্ঠানে জোলার তাঁতের নালটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই, কেবল মাত্র চরকিগুলি তাহাদের নৃত্য প্রদর্শনীর জন্য একটি দিন চাহিয়া লইয়াছে; কিন্তু তাহাদের একদিনের সময় চাহিয়া লইবারই যে কি আবশ্যক ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—

৩০

জোলা নাচে জুলনী নাচে নাচে জোলার নাল,
সব চরকি উইঠ্যা বলে আমরা নাচব কাল।—ফরিদপুর

উলঙ্গ শিশু যেন একটি শিশু মল্ল, তাহার নৃত্যও মল্লের নৃত্য—

৩১

নাচেরে মাল, চন্দনী কপাল,
ঘৃত মধু খায়া তোমার টোবা টোবা গাল।—ফরিদপুর

শিশুর গাল দুইটি টোবা টোবা—মাতৃস্তন্যের ঘৃতমধু পান করিয়া তাহা পরিপুষ্ট; ইহাই জননীর আনন্দের উৎস।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শিশুর নৃত্যবিষয়ক যত ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রামের। চট্টগ্রামে সংগৃহীত অন্যান্য বিষয়ের ছড়ার মত ইহারাও নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৩২

নাচনি গিয়ে নাচনি পাড়া
দেয়াএ আন্যে ঝড়।
কেয়া রে নাচনি, ভিজি যাওর,
ফুলর ছাতি ধর্।
ফুলর ছাতি, বেতর বান
নাচনিরে ঘরত্ আন॥—চট্টগ্রাম

নর্তকী নর্তকীপাড়ায় গিয়াছে, এদিকে আকাশে ঝড় দেখা দিয়াছে, হে নর্তকী, তুমি ভিজিয়া যাইতেছ, মাথায় ফুলের ছাতা ধর। ফুলের ছাতাটিতে বেতের বাঁধ রহিয়াছে, নর্তকীকে গৃহে লইয়া আস। ছড়াটির ইহাই অর্থ। এখানে নাচনি অর্থে যে নৃত্যরত শিশুকেই বুঝাইতেছে, তাহা অতি সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

ইহার আর একটি পাঠ এই প্রকার—

৩৩

নাচনী গেইএ কাচনি পাড়া,
দেআএ আন্‌ছে ঝড়।
কেয়া রে নাচনী ভিজব কেয়া,
চিকন ডালা ধর।
চিকন ডালা ভাসি যায়,
সোনার ডালা ধর।—চট্টগ্রাম

শিশুর সঙ্গে মাতৃক্রোড়ের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া এখানে যে ছড়াটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ছন্দ তাল ও সুর সকলই অনুপম—

৩৪

সাইর নাচে শালিক নাচে,
মাদার পুষ্প খাইয়া।
দুধর ছাবাল নাচে,
মায়ের কোল পাইয়া॥—চট্টগ্রাম

সাইর শব্দের অর্থ সারিকা বা স্ত্রী-শালিখ। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিবেন, ইহাদের প্রকৃত খাদ্য কি—ইহারা পুষ্পখাদক কিংবা কীটপতঙ্গ খাদক, কিন্তু ছড়ার রচয়িত্রী ইহাদিগকে মাদার পুষ্পের খাদক বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন এবং ইহাতেই যে ইহাদের চিত্তের সর্বাধিক উল্লাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই ভাবটিও গোপন করেন নাই। শালিখ-সারিকার নিকট মাদার ফুল যাহা, শিশুর নিকট মাতৃক্রোড়ও তাহাই। পূর্ব বঙ্গে মাদার ফুল বলিতে এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষের গাঢ় রক্তবর্ণ পুষ্প বুঝায়, পশ্চিম বঙ্গে মাদার বলিতে অন্য জাতীয় বৃক্ষ বুঝাইয়া থাকে।

শিশু যে কেবল মাত্র মাতৃক্রোড়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চায় না, বরং তাহার পরিবর্তে প্রকাশ্য সভায় নৃত্যানুষ্ঠান দেখাইবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করে, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে—

৩৫

বাছা নাচের আইলর কাছে,
আইলরে খাইয়ে ছুছুম মাছে।
ছুছুম মাছটি মারতুম্,
বাছা ভোজন করাইতুম্।
চন্দন গাছর ছাকু দি,
বাছা নাচের নাক দি।
চন্দন গাছ ভাঙ্গাম্ বাঁশে ;
বাছা আমার নাচিতে চায়
সভার মাঝে॥—চট্টগ্রাম

শিশুর নৃত্যে ক্লান্তি নাই, সাত হাত ধুতি পরিয়া নাচিতে নাচিতে তাহার গায়ে ঘাম দেখা দেয়—

৩৬

বাছা গীত গাইয়ে নাট গাইয়ে,
আর গাইয়ে পুঁথি।
সিন্দুকর কোণতুন্ নিকলাই দিয়ে
সাত হাত্যা ধুতি॥
নাচিতে নাচিতে বাছার বাইয়া পড়ে ঘাম।
বিদেশর তুন্ আস্‌তে বাছার না পুড়ে পরাণ॥—চট্টগ্রাম

কিন্তু বাছা বিদেশে কখন গেল এবং সেখান হইতে আসিতেই বা কেন তাহার মন কেমন করে না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

একটি গজমোতি হারের এবং একটি বাঁশীর প্রলোভন দেখাইয়া জননী শিশুকে এখানে নৃত্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, পার্থিব জগতের ভোগোপকরণের কথা

জননীর মনে আসে, শিশুর মনে আসে না ; সে ভোলানাথের মত দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেই আনন্দ পায়—

৩৭

নাচ তো নাচ মণি
নাচ একবার।
নাচিলে করাইয়া দিয়ম্
গজমস্ত হার॥
হাজিলে তোয়াইয়া দিয়ম্
বাঁশীত ত তোমার॥—চট্টগ্রাম

সুদূর চট্টগ্রামের পার্বত্য ও আরণ্য অঞ্চলে গিয়াও নন্দরাণীর আহ্বান পৌঁছিয়াছে, বাংলায় যেমন 'কানু ছাড়া গীত নাই', তেমনই নন্দ যশোদা ছাড়াও ছেলে ভুলানো ছড়া কমই আছে—

৩৮

তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে বলে নন্দরাণী,
হাতত্ তালি দিয়া নাচের আণ্ডার যাদু বাছামণি।—চট্টগ্রাম

সুন্দরী বধূর প্রলোভন জীবনের একটি বড় প্রলোভন, শিশু ভোলানাথও তাহা জয় করিতে পারেন না, সুতরাং এই প্রলোভন পাইবামাত্র তাহার মধ্যে উদ্দাম নৃত্যের উল্লাস দেখা যায়—

৩৯

এঙ্গ্যা নাচের বেঙ্গ্যা নাচের
আলু কচু খাই।
সোনা পাগলা নাচন করের্
সুন্দর বউ পাই॥—চট্টগ্রাম

৪০

নাচন চড়ইয়া,
বৈল বীচি বড়ইয়া।
সুন্দর কামিনী নাচে লটকন পেলাইয়া॥—চট্টগ্রাম

বকুল ও কুলবীচি খাইয়া চড়ুই পাখী নাচিতেছে। বেণী দুলাইয়া সুন্দরী কামিনী নাচিতেছে। এখানে সুন্দরী কামিনী যে খুকুরাণী তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইতেছে না।

শিশুকে কোলে লইলে সে যাহার ক্রোড়ে আরোহণ করে, তাহার নাকটি দন্তহীন মাড়ি দিয়া কামড়াইয়া ধরে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কমলমণির শিশুপুত্র সতীশের নাসিকা ভক্ষণের একটি সরস বর্ণনা দিয়াছেন, ছড়ার মধ্যেও তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে—

৪১

টুরু নাচে আইলাম কাছে,
নাক খাইছে ছুছুম মাছে।—চট্টগ্রাম

টুরু নামক শিশুটির নৃত্য দেখিবার জন্য নিকটে আসিলাম, কিন্তু আমার নাকটি ছুছুম বা শুশুক মাছে কামড়াইয়া খাইল। বলা বাহুল্য, এখানে ছুছুম মাছ, নাসিকাহারী মানব-শিশু ছাড়া আর কেহই নহে।

ইহারই একটি স্বতন্ত্র পাঠে স্বতন্ত্র একটি চিত্র পাওয়া যায়—

৪২

টুক্যা নাচের আইলর্ কাছে,
আইল ভাঙ্গিল্ ছুছুম মাছে।
ছুছুম মাছ তুলাইলুম।
গাছর্ তেতুল পাড়াইলুম্।
ধেয়ন গাইটি দোহাইলুম্;
চিকন টেল্‌গুণ্ কাড়াইলুম্,
টুক্যা ভোজন করাইলুম্।—চট্টগ্রাম

ক্ষেতের আলের কাছে টুক্যা নামক শিশুটি নৃত্য করিতে লাগিল, ছুছুম মাছে আল ভাঙ্গিয়া দিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখানে শিশুর নাসিকা সেবনের কোন কথা নাই। তারপর টুক্যার ভোজনের একটি বর্ণনা শুনিতে পাওয়া গেল, তাহা ঘ্রাণের পরিবর্তে শ্রবণেই অর্ধভোজনের কাজ হইল।

৪৩

অলি ফুলের কলি,
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলের সাইর,
মোর নাচে ঠাণ্ডা মণি ॥
কার হুনাইয়া কার সোনাইয়া,
কনে থুইয়ে চুল।
চুলের ভিতর বৈলর মালা,
লাখ টাকার মূল।—চট্টগ্রাম

চুলের ভিতর বকুল ফুলের যে মালাটি শোভা পাইতেছে, তাহার মূল্য লক্ষ টাকা। লক্ষ টাকার অর্থ অমূল্য। পল্লীবাসিনী ছড়া-রচয়িত্রী যে কোন্ জিনিসটির কি মূল্য, তাহা বুঝিতে ভুল করেন না, তাহা এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৪৪

অলি ফুলের কলিরে,
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলে সাইর নাচে,
অলি ঘুম যাইতো ॥—চট্টগ্রাম

শিশুকে এখানে অলি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে; পূর্ব মৈমনসিংহ এবং শ্রীহট্টের ছেলে ভুলানো ছড়াতেও শিশুকে অলি বা হলি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। এখানে ছড়াটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার সৌরভে চারিদিক আকীর্ণ হইবার মত। ক্ষুদ্র শিশুটি পুষ্প-কলিকা সদৃশ কোমল এবং পবিত্র, কিংবা যেন বকুল ফুলের একটি মালিকা। শিশুটি ঘুমাইবার জন্য চম্পা পুষ্পের উপর সারি বা সারিকা পক্ষী নৃত্য করিতেছে। পল্লীর ভাষাও যে সুগভীর সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ করিবার অযোগ্য নহে, এই ছড়াটি তাহারই প্রমাণ।

৪৫

এরন্ গোটা ভেরন্ গোটা,
তিন গোদর ভাই।
তিনও গোদে যুক্তি করের্,
বৈদ্য বাড়ীত্ যাই।

উঠ উঠ বৈদ্যরে, ভাত দেওরে খাই।

শীতল পাটী বিছাই দেও, গোদারে নাচাই॥—চট্টগ্রাম

সুস্থ শিশুর দেহটি স্থানে অস্থানে স্থূল এবং মাংসল, পা দুইটিও করভ শুণ্ডের মত ক্রমশঃ সরু হইয়া আসে নাই, হয়ত মাংসল। সেইজন্যই তাহাকে গোদা বলিয়া সম্বোধন করিয়া জননী চিত্তের উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন।

ইহার একটি পাঠান্তর এই প্রকার, তাহাতে গোদার নাম নাই। এখানে শিশুকে বউ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে; মনে হইতেছে, শিশুটি কন্যা সন্তান—

৪৬

ভেরন্ গোটা পান্যা গোটা,
ভাই ভাইএ যুক্তি করের্,
বৈদ্য বাড়ীত্ যাই।
তেল দেওরে স্নান করি,
ভাত দেওরে খাই।
শীতল পাটী বিছাই দেও,
বউঅরে নাচাই॥—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটি চট্টগ্রাম হইতে আগত এক কলিকাতাবাসিনীর নিকট হইতে সংগৃহীত। সেইজন্য ইহাদের ভাষায় সাধুরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—

৪৭

নেচে আয়রে নেচে আয়রে
আয়রে চাঁদের কণা
মুরলী গড়ায়ে দেবো
যত লাগে সোনা।—চট্টগ্রাম

৪৮

পরের ছেলে ছেলেটা, খায় যেন এতটা
বেড়ায় যেন বাঁদরটা,
নিজের ছেলে ছেলেটি, খায় যেন এতটি
নাচে যেন ঠাকুরটি।—চট্টগ্রাম

সর্বশেষ ছড়াটিতে আত্মপরের যে বিভেদ নির্দেশ করা হইল, তাহা কেবলমাত্র পরিণত-বুদ্ধি সম্মত; ইহার মধ্যে কতকটা প্রবাদের ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে।

খোকা যাবে

কতকগুলি ছড়ার বিষয় শিশুর অভিযান, কিংবা শিশুর একটি দুঃসাহসিক কার্যে যাত্রা করিবার সংবাদ। কার্যটি সে নিষ্পন্ন করিবার পূর্বেই তাহা শিশুর পক্ষে জননী কিংবা শিশুধাত্রী তাহা প্রকাশ করিতেছেন। কার্যটি শিশুর পক্ষে দুঃসাহসিক হইলেও অন্যের পক্ষে কৌতুককর। রবীন্দ্র-সংগ্রহেই এই শ্রেণীর ছড়া সর্বাধিক পাওয়া গেলেও, চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত ইহার বিস্তার হইয়াছে দেখিয়া ইহাও যে বাংলা ছড়ার একটি নিজস্ব বিষয়, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ইহাদের মধ্যে 'খোকা যাবে মাছ ধরিতে' এবং 'খোকা যাবে নায়ে' এই দুইটি বিষয়ই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর জীবনে শিশুর মৎস্য শিকারে যাত্রার কথা নিতান্ত স্বাভাবিক সূত্রেই আসিয়াছে, কিংবা নদীমাতৃক দেশে শিশুর পক্ষে নৌকাযাত্রাও কিছু মাত্র অস্বাভাবিক কিংবা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই সকল কার্যের মধ্য দিয়া শিশু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবে, তাহা অত্যন্ত বিচিত্র; তাহা এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকার এবং তাহার মধ্য দিয়াই কৌতুক রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ছড়ার একটি প্রধান অংশ 'খোকা যাবে বিয়ে করতে' বিষয়ক কিন্তু ইহাদের রস স্বতন্ত্র বলিয়া ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—শিশুর অভিযান সম্পর্কিত ছড়াগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। একে একে ছড়াগুলি নীচে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১

খোকা যাবে মাছ ধরিতে গায়ে নাগিবে কাদা।
কলুবাড়ি গিয়ে তেল নেও গে, দাম দেবে তোমার দাদা॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

খোকার মাছ ধরিতে যাইবার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা কৌতুক রস বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু মাছ ধরিতে গিয়া যদি তাহার গায়ে কাদা লাগিয়া যায় এবং তাহা লাগা খুবই স্বাভাবিক, তবে শূন্য হাতে কলুবাড়ীতে গিয়া যে দাদার নামে বাকি লেখাইয়া সেখান হইতে তৈল সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহার মধ্যেই কৌতুক ও বিস্ময় রসের প্রেরণা রহিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে শিশুর সামান্য দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলেও, ইহাতে যে খাদ্যের প্রলোভন আছে, তাহা দ্বারা দুঃসাধ্য কার্যও সহজসাধ্য হইয়া উঠিবার কথা। কিন্তু বাঙ্গালী শিশুর খাদ্য গমের রুটি কেন, তাহা কে বলিবে? ছড়ায় একটা কিছু বিস্ময়ের বিষয় থাকেই, সুতরাং ইহা দ্বারাও সেই বিস্ময় রসের সৃষ্টিরই প্রয়াস দেখা যায়, নতুবা ঘি মাখা গমের রুটি খাওয়া এবং মোষ চরাইতে যাওয়া বাঙ্গালী জীবনের সুলভ চিত্র নহে—

২

খোকা যাবে মোষ চরাতে খেয়ে যাবে কী।
আমার শিকের উপর গমের রুটি তবলা ভরা ঘি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ছড়াটি ২৪ পরগণা জিলা হইতেও স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহও এই অঞ্চল হইতেই হওয়া সম্ভব।

৩

খোকা যাবে রথে চড়ে বেঙ্ হবে সারথি,
মাটির পুতুল নটর পটর পিঁপড়ে ধরে ছাতি,
ছাতির উপর কোম্পানি, কোন্ সাহেবের ধন তুমি॥
—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর রথারোহণে যাইবার মধ্যেও অভিনবত্ব কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে সারথিটি এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তবে যে রথের সারথি মণ্ডূক, তাহার ছত্রধর যে পিঁপড়ে এই কল্পনাটি অবশ্যই সার্থক।

৪

খোকা যাবে মাছ ধরিতে ক্ষীর নদীর বিল।
মাছ নয় গুগুলির পেছে উড়ছে দুটো চিল॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

লোক-সাহিত্যের নদ-নদীর মধ্যে ক্ষীর নদী প্রধান, সেখানে গঙ্গা ভাগীরথী নাই। কিন্তু ক্ষীর নদীতে যখন দুইটি চিল উড়িতে থাকে, তখন লোক-সাহিত্যের স্বপ্নজগৎ আর উচ্চতর সাহিত্যের বাস্তব জগৎ একাকার হইয়া যায়।

বাঙ্গালী শিশুর গরু চরাইতে যাইবার চিত্রটির মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই; কারণ, বাংলার শিশুমাত্রই বাল-গোপাল।

৫

আমার খোকা যাবে গাই চরাতে,
গাইয়ের নাম হাসি।
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব,
মোহন চূড়া বাঁশি ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

অনেক সময় ছড়া অবলম্বন করিয়া যে আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত পর্যন্ত রচিত হইয়া থাকে, তাহার একটি প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান (রাণীগঞ্জ) অঞ্চলে যে ভাদুগান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার একটি গানে আছে —

নদীর ধারে গাই বিয়োল
বাছুরের নাম হাসি গো,
রাখালটাকে বানিয়ে দেব
পিতল বাঁধা বাঁশী গো।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত উক্ত ছড়াটি উপরি-উদ্ধৃত ভাদুগানটির ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬

খোকা যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে,
পাঁচ-শ টাকার মলমলি থান,
সোনার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করে দিব আলো ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুটি যে কালো, মা এ'কথা আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, তবে পাটনাই হলুদ গায়ে মাখাইয়া তাহার গায়ের রঙ ফিরাইয়া দিবেন, এই আশা পোষণ করিতেছেন ; দেশীয় হলুদের পরীক্ষা এই বিষয়ে যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহাও ইহার মধ্য দিয়া গোপন থাকিতেছে না।

খোকা যাবে নায়ে, রোদ লাগিবে গায়ে,
লক্ষ টাকার মলমলি থান সোনার চাদর গায়ে।
তাতে লাল গোলাপের ফুল
যত বাঙালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি,
একটু বিলম্ব করো খোকাকে লুচি ভেজে দি ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

লক্ষ টাকার মলমলি থান, সোনার চাদর, তাহাতে লাল গোলাপ ফুল লাগাইয়া খোকা যখন নৌকা-ভ্রমণে যাইবেন, তখন যত বাঙ্গালের মেয়ে ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া দেখিবে, আর যাহারা বাঙ্গালের মেয়ে নহে, তাহারা অবিচলিত চিত্তে গৃহকর্ম করিতে থাকিবে, এমন মনে করা কি সঙ্গত হইতে পারে ?

খাদ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া ছড়ায় অন্যত্রও সয়দাবাদের ময়দার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বহরমপুরের অন্তর্ভুক্ত সয়দাবাদ অঞ্চলের ময়দার কোন প্রসিদ্ধি আছে, তাহা মনে হয় না। বরং মনে হয়, ময়দার সঙ্গে মিল রক্ষা করিবার জন্যই সয়দাবাদের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, ছড়ার রাজ্যে ইহা প্রায়ই হইয়া থাকে। আরও দুইটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

উলোর তুঁয়ের ময়দা রে সয়দাবাদের ঘি।
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৯

খোকা গেছে মাছ ধরতে দেবতা এল জল।
ও দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন আসুক ঘর ॥
কাজ নাইকো মাছে, আগুন লাগুক মাছে
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

খোকা যে প্রকৃতই মাছ ধরিতে গিয়াছে, তাহা নহে—তবে ইহাতে যে কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হইবে যে, শিশু প্রকৃতই যেন মাছ ধরিতে গিয়া হঠাৎ বৃষ্টিতে কাদায় দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে, দেবতার নিকট প্রার্থনা সেইজন্য এতখানি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

ছড়াটি ২৪ পরগণা জিলা হইতেও স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথও ২৪ পরগণা জেলা হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

১০

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিম্নোদ্ধৃত স্বতন্ত্র একটি ছড়া প্রথম দুই পদবিশিষ্ট উপরি উদ্ধৃত ছড়াটির শেষাংশে যুক্ত হইয়া গিয়াছে—

থকন থকন পায়রাটি কোন্ যে বিলে চরে।
থকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড়ে॥

সেইজন্যই শেষ দুইটি পদের সঙ্গে প্রথম দুইটি পদের ভাব এবং রসগত সঙ্গতি নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন ছড়ার অংশ একসঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়া যেখানে নূতন ছড়ার সৃষ্টি হয়, সেখানে অনেক সময়ই এই প্রকার সুর ও রসগত সঙ্গতিতে বাধা সৃষ্টি হয়।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে বৃন্দাবনের কস্তুরীচন্দনের সুরভি আসিয়া যুক্ত হইয়াছে—

১১

খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।
তেলিমাগীরা মুখ করেছে কেন্ রে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননী খেয়েছে আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশী কেড়ে নেব॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

তেলিমাগীদের পাড়ায় ননীমাখনের সন্ধান পাইবার কথা নহে; কিন্তু তথাপি খোকাবাবু সেখানে গিয়াই তাহার সন্ধান করিয়াছেন এবং সেখানে গিয়া যে দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, তাহার কেবলমাত্র ভাগবতেই নজীর পাওয়া যাইবে।

১২

চিংড়ি মাছের থপথপানি
তপ্‌সে মাছের দাড়ি,
কোন্ পথ দিয়ে খোকন যাবে
দাত্নের বাড়ি।
একটা কঞ্চি দু'টা কঞ্চি
কঞ্চি বড় পাকা,
খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী
সঙ্গে যাবে কাকা॥—২৪ পরগণা

ছড়ায় কাকার উল্লেখ নাই বলিলেই চলে, সুতরাং ইহার মধ্যে যে আধুনিকতার স্পর্শ দেখা যায়, তাহা অনস্বীকার্য। আত্মীয়ের মধ্যে মামার উল্লেখই প্রাচীনতার নিদর্শন। সে কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

১৩

আয়রে পাখী আয়,
তোর কাল জামা গায়।
সেই জামাটি খুলে দেব
আমার খোকনের গায়॥
খোকন যাবে বিয়ে করতে
লাল ঘোড়ায় চড়ি,
সঙ্গে আনবে টুকটুকে বউ
হাতে পরে ঘড়ি।—২৪ পরগণা

এখানেও ঘড়ির উল্লেখ আধুনিকতার পরিচায়ক। ২৪ পরগণায় সংগৃহীত ছড়াগুলি যত দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে, বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলের ছড়াগুলি তত দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে না; ইহার কারণ, কলিকাতা মহানগরী কেন্দ্র করিয়া ২৪ পরগণা অঞ্চলেই সামাজিক জীবনের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। লোক-সাহিত্য সমাজ-জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারও পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

১৪

খোকন যাবে নায়
পাঁচশো টাকার মলমলের থান
জরির জুতো পায়।—২৪ পরগণা

পূর্বোদ্ধৃত অনুরূপ একটি ছড়ায় লক্ষ টাকার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, এখানে তাহাই পাঁচ শত টাকায় নামিয়া আসিয়াছে; কিন্তু ইহাতে খোকাবাবুর আভিজাত্য যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই, ছড়ায় লক্ষ টাকাও যাহা পাঁচশত টাকাও তাহা।

১৫

খোকা যাবে রথে চড়ে, ব্যাঙ হবে সারথি।
মাটির পুতুল নটর পটর, পিঁপড়ে ধরে ছাতি॥
ছাতির উপর কোনপানি, কোন সাহেবের ধন তুমি।
—২৪ পরগণা

ইহাও রবীন্দ্র-সংগ্রহেরই সামান্য একটু পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

১৬

মাছ ধরতে গেল পটল রঙ্গ রসের বিল,
মাছ নিলে চোঁড়া সাপে।
বড়্শি নিলে চিলে॥
হে দেবতা, পায়ে পড়ি পটল আসুক দেশে॥—বাঁকুড়া

কয়েকটি বিভিন্ন ছড়ার সংমিশ্রণে যে ইহা রচিত, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ টাকা যেমন একটি ছড়ায় পাঁচশত টাকা হইয়াছে, তেমনই লাল মলমল এখানে লাল গামছা হইয়াছে; কারণ, পল্লীজীবনে মলমল অপেক্ষা গামছাটি আরও প্রত্যক্ষ—

১৭

আমার খোকা যাবে নায়ে
রোদ লাগবে গায়ে;
হাজার টাকার লাল গামছা দিব খোকার গায়ে।
—মুর্শিদাবাদ

১৮

মাণিক যাবে রঙ্গে
বাঘ ভালুকের সঙ্গে।
সেখানে গিয়া কি করবে ?
কাদা খুঁচ খুঁচ মাছ ধরবে ॥—রাজসাহী

বাঘ ভালুকের সঙ্গে গিয়া অবশেষে কাদা খুঁচ খুঁচ মাছ ধরিবার মধ্যে মাণিকের বাঙ্গালীত্বই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রায় কোন ছড়াতেই গোপন নাই।

১৯

খোকা যাবে কোন্‌খানে,
হাতীবাঁধার মাঝখানে।
সেখানে খোকা কি করে ?
চুল ঝাড়ে আর ডুব পাড়ে ॥—ঐ

উদ্ধৃত ছড়া দুইটিতে দেখা গেল, খোকা এক স্থলে বাঘ ভালুকের সঙ্গী হইয়া ও অপর স্থানে হাতীবাঁধার মধ্যস্থলে গিয়াও যে আচরণ করিতেছে, তাহা কোন মতে বাঘ ভালুক কিংবা হস্তীর সাহচর্য গ্রহণের মত দুঃসাহসিক কার্যের অনুকূল নহে—কারণ, বাঘ ভালুকের সঙ্গী হইয়াও এক স্থলে সে মাছ ধরিতেছে, অন্যত্র হাতীবাঁধার মাঝখানে গিয়াও চুল ঝাড়িতেছে মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর ঘরের কথাই ছড়ার মূল কথা ; সেইজন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া সকল বিষয়ই সেখানে আসিয়া শেষ হয়।

এই বিষয়ক ছড়া চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে অধিক সংগৃহীত হয় নাই, তবে যে দুইটি মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বিশেষত্ব বর্জিত নহে। মনে হয়, ইহারাও পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিস্তার লাভ করিয়া সেখানকার জন-জীবনে স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছে—

২০

মণি যাইব দূর দেশে খাইব দাইব কি।
গামছা বান্ধা চিকন চূড়া ভাণ্ড ভরা ঘি ॥—চট্টগ্রাম

পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়ার তবলা ভরা ঘি-ই এখানে ভাণ্ড ভরা ঘি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গামছা বান্ধা দইয়ের কথাই আমরা শুনিয়াছি, গামছা

বান্ধা চুড়া বা চিড়ার কথা ত কখনও শুনি নাই। তবে দধির সঙ্গে চিড়ার যে একটি নিকট সম্পর্ক আছে, তাহার সূত্র ধরিয়াই এখানে গামছা বান্ধা দধির পরিবর্তে গামছা বান্ধা চিড়ার কথা আসিয়াছে।

অন্যান্য ছড়ায় যেমন যাইবার কথা আছে, ইহাতে না যাইবার অনুরোধ আছে; অবশ্য যেখানে যাইবার কথা বলা হয়, সেখানেও প্রকৃতই যে যাওয়া হয়, তাহা নহে; এমন কি, গেলেও কেহ খুশী হয় না, সুতরাং সেখানেও না যাইবারই অর্থ প্রকাশ পায়—

২১

মণি, পুকুরত্ ন যাইস্ তুই।
ঝুটা ময়না এ ধরি নিব তোয়াই মরিম মুই॥

কিন্তু এখানে যাহার ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহা প্রকৃত ভীতিজনক নহে বলিয়াই ছড়ার রস অক্ষুণ্ণ আছে। কারণ, 'ঝুঁটি বাঁধা ময়না' যে ধরিয়া লইয়া যাইবার পাখী নয়, তাহা ছড়ার রচয়িত্রী জানে, শ্রোতারাও বুঝে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি চট্টগ্রাম হইতে আগত একজন কলিকাতাবাসিনীর নিকট হইতে সংগৃহীত, সেইজন্য ইহার মধ্যে ভাষায় কিছু পরিপাট্য সৃষ্টি হইয়াছে—

২২

খোকন যাবে নায়ে
সোনার ঘুঙুর পায়ে—
পঁচিশ টাকার জামা জোড়া খোকন ধনের গায়ে,
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে, খোকন রাজার পায়ে।

—চট্টগ্রাম

শিশুর অভিযান এখানেই শেষ হয় নাই। তাহার শ্বশুর বাড়ী অভিযানের চিত্রগুলি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইবে।

বিয়ে

ছেলে ভুলানো ছড়ার একটি অংশ খোকাখুকুর বিবাহের আশা ও আশ্বাস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। শিশু যখন বয়সে এতটুকু মাত্র—কেবলমাত্র বিবাহের বিষয় কেন, জীবনের কোন বিষয় সম্পর্কেই তাহার কোন জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতার জন্ম হয় নাই, তখন হইতেই জননী তাহার বিবাহের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। বিশেষতঃ শিশু যদি কন্যাসন্তান হয়, তবে তাহার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে নানা আশা ও আশঙ্কা তখনই জননীর মনে উদয় হইতে থাকে, ছড়ার মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়।

অন্যান্য বিষয়ক ছেলে ভুলানো ছড়া যেন মাতৃহৃদয়ের অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র, বিবাহ বিষয়ক ছড়াগুলি তেমন নহে। কারণ, শিশু কন্যাই হোক, পুত্রই হোক, বিবাহ তাহার একদিন হইবেই এবং মধ্যবিত্ত বাংলার সমাজ-জীবনে বিবাহ কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেরই ব্যাপার নহে, ইহার কল্পনার মধ্যে একটু বেদনা ও আশঙ্কার ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ সে যদি কন্যাসন্তান হয়, তবে তাহার বিবাহ সম্পর্কিত কল্পনা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেরই প্রেরণা দেয় না, তাহার মধ্যে সর্বদাই বেদনা ও আশঙ্কার ভাব যুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কন্যাসন্তান সম্পর্কিত বিবাহ-বিষয়ক ছড়ার সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক—পুত্রের বিবাহ-সম্পর্কে ছড়ার সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক অল্প।

অনেক সময় এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে বৈষয়িক কথাও প্রকাশ পাইয়া ছেলে ভুলানো ছড়ার স্বাভাবিক ধর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কারণ, বিবাহ বৈষয়িক ব্যাপার, কেবলমাত্র শিশুর নিদ্রা-ভোজন ও নৃত্যের মত আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার নহে। সেইজন্য ব্যবহারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক কথাও ইহাদের মধ্যে অতি সহজেই প্রবেশ করে। সুতরাং ইহারা অনেক সময় সুকঠিন বিষয়বুদ্ধির ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া যায়।

কন্যাসন্তান সম্পর্কিত বিবাহের কথা স্মরণ হইলেও তাহার মধ্যে জননীর আসন্ন বিচ্ছেদের ভাবটিও আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়; এমন কি, অনেক

সময় একটি চাপা কান্নার স্বর ইহাদের মধ্য হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এই ছড়াগুলির মধ্য দিয়াই জননীর হৃদয়ে আসন্ন কন্যাবিদায়ের বেদনার আভাস সর্বপ্রথম সূচিত হয়।

বিবাহ বিষয়ক ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে কয়েকটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, একটি অশ্রুতপূর্ব দেশে কন্যাসন্তানটিকে বিবাহ দেওয়া হইবে। দেশটির বিভিন্ন নাম, কিন্তু একই সূত্র হইতে যে বিভিন্ন নামগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। রবীন্দ্র-সংগ্রহে দেখা যায়, দেশটির নাম হটমালার দেশ।

১

খোকামণির বিয়ে দেব হটমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে।
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে ;
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে,
খোকার দিদি কোনায় বসে আছে।
কেউ দুটি চাইতে গেলে, বলে, আর কি আমার আছে॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রূপকথায় আমরা মধুমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, মালঞ্চমালা ইহাদের এবং ইহাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু হটমালার দেশের কথা শুনি নাই। তবে বুঝিতে পারি, ইহাও রূপকথারই দেশ ; কারণ, নামটির মধ্যে রূপকথার আমেজ রহিয়াছে। কিন্তু সে দেশের যে চিত্রটি দেখা গেল, তাহা যে কোনমতেই রূপকথার রাজ্যের চিত্র নহে, তাহাও সকলেই স্বীকার করিবেন। কারণ, গাই বলদ কিংবা রুইমাছ পালঙ শাকের কথা রূপকথার রাজ্যের কথা নহে, ইহা আমাদের নিত্য পরিচিত জীবনের কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখানে স্বপ্নের সঙ্গে সত্য আসিয়া মিশিয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, বিবাহ ব্যবহারিক জীবনের একটি বাস্তব সত্য, খুকুমণির সম্পর্কে আজ তাহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু একদিন তাহা সত্য হইবে। ছোট্ট কন্যাসন্তানটিকে চোখের সামনে রাখিয়া মা যখন ছড়াটি আবৃত্তি করেন, তখন তাহার সম্মুখ হইতে তাহার বিবাহের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে না। সেইজন্য হটমালার

দেশ বা স্বপ্নরাজ্যের কথা দিয়া ছড়াটির সূত্রপাত হইলেও সহজেই তাহা আবার বাস্তবের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানে বিবাহের আশঙ্কাটি জননীর মনের মধ্যে বাস্তব হইয়া দেখা দিয়াছে।

সকলেই আশা করে, আমার কন্যাসন্তানটিকে যখন বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইয়া দিতেই হইবে, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কোনও উপায়ই নাই, তখন সমৃদ্ধির মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রাচুর্যের মধ্যে তাহার বিবাহ দিব। জননীর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সমৃদ্ধির যে চিত্র উদয় হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু খোকার দিদির ব্যবহারটি এখানে কেমন? এই সমৃদ্ধির মাঝখানে চুপ করিয়া একটি কোণায় বসিয়া থাকিয়া কেবলই যে নিজের কিছু নাই, এই ভাবটি দেখাইয়াছে, তাহা এই আশা ও আনন্দের চিত্রটিকে যেন ম্লান করিয়া দিল। এই ভরা প্রাচুর্যের মধ্যে তাহার মুখে নাই নাই রব যেন বাস্তব জীবনেরই কোন অজ্ঞাত সূত্র ধরিয়া উদয় হইয়াছে। কারণ, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যই স্বপ্ন এবং অভাবই সত্য—সেইজন্য প্রাচুর্যের স্বল্পকল্পনার মধ্যেও নাই নাই রব হাহাকার করিয়া উঠিল।

তবে বাঁকুড়া জিলা হইতে ছড়াটির যে আর একটি পাঠ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে হটমালার দেশে খোকামণির বিবাহের কথা না থাকিলেও, তাহার দিদির নাই নাই রবটি শুনিতে পাওয়া যায় না—

২

পুটু রাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে॥
তারা সোনায় দাঁত ঘষে।
রুই মাছ পটল কত ভারে ভারে আসে॥—বাঁকুড়া

হটমালার দেশই যে এখানে হপ্তমালার দেশে পরিণত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কারণ, উভয় দেশের সমৃদ্ধিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, সামান্য পার্থক্য এই যে হটমালার দেশের লোকেরা যেমন হীরায় দাঁত ঘষে হপ্তমালার দেশের অধিবাসীরা তাহার পরিবর্তে সোনায় দাঁত ঘষিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে হীরায় যেমন কেহ দাঁত ঘষে না, সোনায়ও কেহ দাঁত ঘষে না, ইহা কেবলমাত্র সমৃদ্ধির পরিচায়ক বিশেষার্থক শব্দগুচ্ছ (idiom); সুতরাং ব্যবহারিক অর্থের দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না।

কিন্তু বর্ধমানে গিয়া শুনিতে পাওয়া গেল, ছড়াটির মধ্যে পূর্বশ্রুত সেই নাই নাই রবটি আবার উঠিয়াছে। কিন্তু এ'বার খোকামণির দিদি নহেন, স্বয়ং জননীই এই রবটি তুলিয়াছেন—

৩

খুঁকু রাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে।
হীরেয় দাঁত ঘসে।
রুই মাছ পটলের শাক ভারে ভারে আসে॥
তার মা কোণে বসে বসে বাচে।
পাড়া প্রতিবাসী চাইতে এলে—
বলে আর কি আমাদের আছে॥—বধমান

মুর্শিদাবাদ গিয়া ছড়াটির মধ্য হইতে হীরা কিংবা সোনায় দাঁত ঘষিবার অসম্ভব চিত্রটি বাদ পড়িয়া গেল, রুই মাছের পরিবর্তে বাংলার আর একটি প্রিয় মৎস্যের নাম শুনিতে পাওয়া গেল; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্য হইতে খুকির মার নাই নাই ভাবটি দূর হইল না।

৪

আমার খুকির বিয়ে দেব হাপুকমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে—
ইলসে পালঙের শাক ভারে ভারে আসে।
কেও দুটো চাইতে গেলে খুকির মা ফ্যাকনা দিয়ে বসে।
—মুর্শিদাবাদ

হাপুকমালার দেশও হটমালার দেশের পথ ধরিয়াই আসিয়াছে, ইহার মধ্যেও স্বপ্ন রাজ্যের রূপকথার আমেজটি রহিয়াছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অবশিষ্ট চিত্রটি নিতান্ত বাস্তবধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এত প্রাচুর্য, ভারে ভারে ইলসে মাছ পালঙের শাক ভেট আসিতেছে, সেখানে খুকির মার এই সঙ্কীর্ণতা-কেবলমাত্র প্রতিবেশী কিংবা প্রার্থীরই নয়, আমাদের মনকেও আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সেদিন জীবনে প্রাচুর্য ছিল স্বপ্ন, অভাবই ছিল সত্য; সেইজন্য উদারতার পরিবর্তে সঙ্কীর্ণতাই হইয়াছে স্বাভাবিক।

ঢাকা হইতে সংগৃহীত ছড়াটিতে এই ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না—

৫

খোকন মণির বিয়া দিমু
হট্টমালার দেশে,
তারা গাই-বলদে চষে
তারা হীরায় দাঁত ঘসে,
রুই মাছ কাত্‌লা মাছ
ভারে ভারে আসে ;
তাই দেখে খোকার মা
পিছন ফিরে বসে।—ঢাকা

কিন্তু সেখানকার প্রচলিত আর একটি ছড়ায় হট্টমালার দেশ নামটির উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াই একটি নূতন দেশের নাম কল্পিত হইয়াছে এবং তাহার ভিতর হইতে খোকার মার অনুদারতার অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে—

৬

খোকা যাবে বিয়ে করতে হস্তী রাজার দেশে,
তারা রূপার খাটে পা রেখে, সোনার খাটে বসে।
ঘন আওটা দুধের উপর পুরু সর ভাসে।
খোকামণিকে সোহাগ করে যৌতুক দিবে কি ?
শাল দিবে, দোশালা দিবে, দিবে রূপবতী ঝি ?—ঢাকা

কিন্তু এই পরিবর্তনের একটি নিগূঢ় কারণ আছে। এখানে খুকুমণির বিবাহ দেওয়া নয় বরং তাহার পরিবর্তে খোকাবাবুর বিবাহ করিতে যাওয়া। একটিতে একজনকে বিদায় দেওয়ার বেদনা, আর একটিতে একজনের উপর অধিকার লাভের আনন্দ ; সুতরাং দুইটিরই রস অভিন্ন হইতে পারে না। সেইজন্য এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা যায়, বেদনা কিংবা তজ্জাত সঙ্কীর্ণতার কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে গিয়া এই ছড়াটিতে কেবলমাত্র খুকুমণির নামটিতে একটু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; দেশের নামটিতে যে পরিবর্তনটি দেখা

যায়, তাহাতে স্বপ্নরাজ্যের ধর্ম বিনষ্ট হয় নাই; কারণ, হটমালার দেশও যেমন সূর্যালোকিত পৃথিবীর উপর নাই, উজানতলীর দেশও নাই—উভয়ের অধিষ্ঠান স্বপ্নলোকে। সেইজন্য ইহার এই পরিবর্তিত দেশের নামটি ছড়াটির রসভঙ্গ করিতে পারে নাই—

৭

নার্‌গিসকে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে।
তারা গাই বলদে চষে।
তারা পায়ে টাকা ঘষে॥
এত টাকা নিমু না
নার্‌গিস্‌কে বিয়া দিমু না॥—ঢাকা

এই ছড়াটির মধ্যে বিশেষভাবে দুই একটি কথা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। শিশুকন্যাটিকে সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্যের মধ্যে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প মনে উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নিতান্ত নিষ্ঠুর সত্য জননীর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল; তাহা এই যে, অর্থের বিনিময়ে শিশুকন্যাটিকে একদিন 'বিক্রয়' করিতে হইবে। ইহা একটি আদিম বিবাহ-প্রথা, ইংরেজিতে ইহাকেই বলে marriage by purchase. মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছড়াগুলির মধ্য দিয়া অনেক সময়ই যে ইহাদের আদিম রূপ রক্ষা পাইয়াছে, এই ছড়াটি তাহার প্রমাণ। কারণ, এই আদিম সামাজিক প্রথাটির উল্লেখ এই বিষয়ক আর কোন ছড়াতেই নাই। এই প্রথা বর্তমান উচ্চতর হিন্দু কিংবা মুসলমান সমাজে প্রচলিত নাই, কিন্তু একদিন যখন ইহা এই দেশের সর্বস্তরের সমাজের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তখনই ছড়াটি রচিত হইয়াছিল। কালক্রমে উচ্চতর সমাজ হইতে প্রথাটি দূর হইয়া গিয়াছে, তথাপি উচ্চতর সমাজ ইহার সংস্কার তাহার স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করিতেছে। কন্যাবিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা কন্যার অভাব ঘুচিতে পারে না; বরং সেই অভাব গভীরতর বেদনাদায়ক হয়, সেই কন্যার বিবাহের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কথা ভাবিয়া জননী শিহরিয়া উঠেন। সেই সময়ের মত মনে মনে এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করেন যে—

এত টাকা নিমু না।
নার্‌গিসকে বিয়া দিমু না॥

কিন্তু কালস্রোতে এই সঙ্কল্পের বাঁধ ভাসিয়া যায়, টাকা গুণিয়া লইয়া পিতা পরের হাতে কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার নামে বিক্রয় করিয়া দেন। অতীত সমাজ-জীবনের বহুকাল বিস্মৃত ইতিহাসের ছিন্ন টুকরা পাতা এইভাবে ছড়ার মধ্য দিয়া অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য ছড়া ছেলে ভুলানো বিষয় মাত্র নয়, পরিণত বয়স্কেরও প্রয়োজনীয় জীবনতথ্য ইহাতে রহিয়াছে।

সামাজিক জীবনে বিবাহের সমস্যা যত জটিল হইয়াছে, বিবাহ-সম্পর্কিত ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি ততই যৌতুক সামগ্রীর তালিকায় পূর্ণ হইয়া দীর্ঘায়িত হইয়াছে। ঢাকা হইতে সংগৃহীত এই বিষয়ক এই ছড়ায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

৮

খুকীক বিয়া দিব
দিবর রাজার ছ্যাশে।
তারা বাইশ বলদে চষে॥
তারা উঁচল টঙ্গীতে বসে।
তারা ঘূর্ণী কবুতর পোষে॥
ছোট ছোট কড়ি নিব
আত্রাই পার হৈতে।
আম কাঁঠালের বাগিচা দিব
ছায়াতে যাইতে।
বড় বড় কড়ি দিব
ধুলা লাগিতে।
দুধের পুষ্কর্ণী দিব
সাঁতার খেলিতে॥
দুধের বাটি বিব
তৃষ্ণা মিটাইতে।
আগাপাছা দাসী দিব
চামর ঝুলাইতে॥
বড় বড় পাঙ্গংএর শাক
ভারে ভারে আসে।
বড় বড় রুই-এর মাছ
ভারে ভারে আসে॥—ঢাকা

এখানে একটি নূতন দেশের নাম শুনা গেলেও ইহার স্বপ্নধর্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে। এই প্রকার আরও একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

৯

বুল বুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।
খোকা যাবে
কিরণমালার ভ্যাশে।
কিরণ দ্যায় ফুলের মালা
খোকার গলে।
বুল বুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।—ঢাকা

এখানে দেশের নামটির মধ্যেই মাত্র পূর্ববর্তী ছড়াগুলির একটু সুরের রেশ লাগিয়া আছে, ইহার অন্যান্য অংশ হইতে তাহা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছে।

হটমালার দেশের কথা বাদ দিলে আর কোন বিশেষ দেশে খোকামণির বিবাহ দিবার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু যে দেশেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হোক না কেন, সর্বত্রই ব্যাপারটি যে সমান ব্যয় এবং আয়াসসাধ্য, তাহা প্রায় সকল ছড়াতেই শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, কন্যার শৈশব জীবন হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ বিবাহকালে কি ভাবে যে তাহার শাশুড়ীকে ভুলাইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ীর জীবনে যথাসম্ভব শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, সেই বিষয়ে জননীর মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। সেইজন্য অন্যান্য ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন বস্তুজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হয় না, ইহাদের সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না; এই বিষয়ক ছড়াগুলি সেইজন্য প্রায়ই বাস্তব জীবনধর্মী হইয়া উঠে। রবীন্দ্র-সংগ্রহে একটি ছড়া এই—

১০

খোঁকামণি দুধের ফেনি ডাবলোর ঘি,
খোকার বিয়ের সময় করব আমি কী।
সাত মাগী দাসী দেব পায়ে তৈল দিতে
সাত মিনসে কাহার দেব দুলান দুলাতে,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব নাগর খেলাতে,
রসকরা নাড়ু দেব শাশুড়ী ভুলাতে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এখানে ছড়ার সহজ-স্ফূর্ত আনন্দ খোকামণির ভবিষ্যৎ বিবাহ দিনের দুশ্চিন্তায় যে অনেকখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতেছে। 'খোকার বিয়ের সময় করব আমি কী'—ইহা আনন্দের অভিব্যক্তি নহে, বরং নিজের অসহায় অবস্থারই প্রকাশ—তারপর যে বস্তুতালিকার উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই হতাশার মনোভাব কোথা হইতে আসিয়াছে। এমন কি, 'সরু ধানের চিঁড়ে' কিংবা 'রসকরা নাড়ু' পাইয়াই যদি নাগর কিংবা শাশুড়ী সত্য সত্যই ভুলিয়া যাইত, তবুও এত দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকিতে পারিত না।

কিন্তু অশুভ চিন্তা অনেক সময় মনের ভিতর উদয় হইলেও তাহা মুছিয়া দিতে হয়; সেইজন্য অনেক ছড়াতেই ব্যবহারিক জীবনের এই দুশ্চিন্তার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। যেমন,—

১১

খুকুমণি দুধের ফেনি বও গাছের মউ।
হাড়ি ডুগডুগানি উঠান ঝাড়ানি মণ্ডা খোকার বউ॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

আরও একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

১২

খুকুনমণি দুধের ফেনী
কৌ গাছে মৌ;
সব ছেলেকে বল্‌বো খুকুন
হাঁড়িখাকীর বৌ!
আমার মনুরাণীর বে!
খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন;
বাজ্‌না শোনো সে।—ঢাকা

'হাঁড়িখাকীর বৌ' গালিগালাজের ভাষা হইলেও এখানে সে অর্থে ইহার ব্যবহার হয় নাই—এখানে ইহা আহ্লাদের ভাষারূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা গোপন করিয়া খুকুনমণির বিবাহোপলক্ষে যে বাদ্য

ভাণ্ডের আয়োজন করা হইবে, তাহার সম্ভাব্য উৎকর্ষেরই এখানে উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র।

পরবর্তী ছড়াটির মধ্যেও শিশুকন্যার বিবাহ-সম্পর্কিত নানা আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

১৩

খাঁদির বর এসেছে গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা নেবো না,
খাঁদির বিয়ে দেবো না।
খাঁদিকে দেবো সাজিয়ে,
টাকা নেবো বাজিয়ে।—২৪ পরগণা

'খাঁদির বিয়ে দেবো না' বলিলেই ত সমাজ-ধর্মের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই, বিবাহ দিতেই হইবে, শেষ পর্যন্ত সমাজের নির্দেশই মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। সেইজন্য টাকা বাজাইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পূর্বে যে একটি ছড়ায় সমাজের এক আদিম বিবাহ-পদ্ধতির কথা শুনা গিয়াছিল, এখানে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল মাত্র।

গামছা মাথায় দিয়া বরের আগমন সংবাদ আরও দুই একটি ছড়ার মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়—

১৪

ছাঁদনাতলা দিয়ে
ওই আসছে নিতে পাগলা গামছা কাঁধে নিয়ে।
ও গামছা নেবো না মেয়ের বিয়ে দেবো না
মেয়ে দেবো সাজিয়ে টাকা নেবো বাজিয়ে॥—নদীয়া

১৫

হলদি কোটা মরিচ কোটা জোড় পুতুলের বিয়া,
ঐ আসছে নূতন জামাই গামছা মাথায় দিয়া॥—২৪ পরগণা

কন্যার শৈশব কালেই জননীর হৃদয়ে কখনও কখনও তাহার বিবাহের দিনের আনন্দ-চিত্রটি জাগিয়া উঠে—

১৬

উলু উলু উলু
লক্ষ্মীমণির বিয়ে
ধনমণিকে ডেকে আন
হলুদ বাট্‌সিয়ে।
মুটো মুটো খই
ঝিনুক্ ঝিনুক্ দই।—২৪ পরগণা

বিবাহের ব্যাপার যে নিতান্ত ব্যয়সাধ্য, ছড়ার মধ্যে তাহাও মধ্যে মধ্যে মনে উদয় হয়; কিন্তু একটি সম্পন্ন জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক সকল দুশ্চিন্তাকে ধুইয়া মুছিয়া দেয়—

১৭

হৈ রে বাবুই হৈ, রাঙ্গাধানের খই,
খোকামণির বিয়ে দেব পয়সা কড়ি কৈ?
ফলার হবে সরা সরা থৈ আর দৈ
সারারাত খুঁজে ম'লাম গুড় হাঁড়িটা কৈ?
—২৪ পরগণা

পক্ষীজগতের সঙ্গে শিশুর যে একটি সম্পর্ক আছে, তাহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পাখীর মধ্যেও টিয়া ও বুলবুলির সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক। সেইজন্য শিশুর বিবাহ করিবার চিত্রটির মধ্যে টিয়া পাখীটি যেন আপনা হইতে আসিয়া ধরা দেয়—

১৮

আয়রে আয় টিয়ে,
খোকোন যাবে বিয়ে করতে মাথায় টোপর দিয়ে,
আসমানেতে ফুল ফুটেছে সঙ্গে করে' নিয়ে।—নদীয়া

১৯

আয়রে আয় টিয়ে—
আমার খুকুরাণীর বিয়ে।
আয়রে আয় সাঁঝের বায়
আমার খুকুরাণী ঘুম যায়!—

আমার খুকুর গলে মোতির মালা,
আমার খুকুর হাতে হীরের বালা।
আমার খুকুর কাণে সোনার দুল,
আমার খুকুর খোঁপায় চাঁপার ফুল।
আমার খুকুর মাথায় সিঁথে মোর,
কাল সোনা যাবে শ্বশুর ঘর।—চট্টগ্রাম (আধুনিক)

এ'বার টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুলবুল আসিয়া জুটিল—

২০

বুল বুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।
ও বৌ
ধান কুড়াতে যাবি না ?
বুড়া ভ্যায় লেপমুড়ি
ক্যামনে যাই বল না ?
পরাণ মণ্ডলের ছেলে
তার যে বিয়া
লাল টুক্‌টক বৌ
ঢাক ঢোল দিয়া।
বুল বুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।
হীরুর বিয়ে
মাথায় টোপর দিয়ে
হীরু কত খুসী
বলে খোকার মাসী
বুল বুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।—ঢাকা

২১

বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।
ডাকাত বৌ আসে
খন্তি হাতে নিয়া॥
খোকা করে বিয়া
ডাকাত বৌ মারে
খুন্তি দিয়া।
বুলবুল টিয়া
খোকার দিমু বিয়া।—ঢাকা

পুত্র সন্তানের বিবাহ-বিষয়ক ছড়ার মধ্যে বেদনার পরিবর্তে উল্লাসের একটি ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহার বিবাহ-যাত্রা যেন দিগ্বিজয়ী বীরের দিগ্বিজয়-যাত্রা। সেইজন্য তাহার ভাষা ও চিত্রে আনন্দরস সহজভাবে বিচ্ছুরিত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হয়।—

২২

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে গরম ময়দা শিকেয় আছে ঘি।
একটুখানি দাঁড়াও খোকা জিলিপী ভেজে দি।
খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি মেনা গাইয়ের ঘি।—ঢাকা

২৩

খোকন যাবে শ্বশুর বাড়ী খেয়ে যাবে কি ?
গঙ্গাজল ক্ষীরের পায়স মেনা গাইয়ের ঘি !
একটু সবুর কর্‌রে খোকন লুচি ভেজে দি',
গামছা ফেলে দেরে খোকন কোমর বেঁধে দি।
আগে যায়রে মজুমদার পিছে যায়রে ভারী,
মধ্যে মধ্যে যায় খোকন শ্বশুরদারের বাড়ী।
শ্বশুরদারের বাড়ীতে রে বেতের বাঁধুনি,
তাতে ব'সে খায় পান দুর্গা ভবানী।

দুর্গা ভবানী দুর্গা ভবানী তোমার ছেলের বিয়া,
ঘর করগা ঘর করগা ফুলের মালা দিয়া।
ফুলের মালা গন্ধের ডালা কোন্ সোহাগের বউ,
হরি দাদার চৌচালা ঘর কুসুম ফুলের মৌ।—রাজসাহী

কিন্তু এখানে ত আর সত্যকারের বিবাহ যাত্রা নহে, সুদূর ভবিষ্যতের একটি সুখ-কল্পনারই স্বপ্নদর্শন, কিংবা একটি বিষয় মাত্র অবলম্বন করিয়া শিশুর কর্ণে জননীর সুধাবর্ষণ। শিশুর নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গেই জননী-কণ্ঠের সকল বাচালতা নীরব হইয়া যায়—

২৪

দোল্ দোল্ দোল্ দোল্
কিসের এতো গোল?
খোকা আসছে বিয়ে করে,
সঙ্গে দু'শো ঢোল।
থাম্লো ঢোলের রব,
খোকনমণি ঘুমিয়ে প'ল শান্ত হ'ল সব।—ঢাকা

দোলনায় শায়িত শিশুকেও জননী বিবাহের আশ্বাস দিয়া শান্ত করিয়া রাখেন—

২৫

খোকন দোলে
মাথায় সোনার টোপর দিয়া,
খোকন দোলে,
আজ তার বিয়া,
ফুলের মালা গলাত্ দিয়া।
সানাই বাজে
বৌয়েরা দেয় উলু।
খোকন দোলে
বৌ আসবে বুলবুলু॥—ঢাকা

কিন্তু বধূটির গায়ের রঙ্টি সম্পর্কে জননী যে সংবাদ দেন, তাহা শুনিয়া শিশু কেবল মাত্র কিছু বুঝিতে পারে না বলিয়াই চুপ করিয়া থাকে,—

২৬

তোল্ তোল্
পাল্কী তোল্
খোকামণির বৌটি ভাল
সব ভাল তার রঙটি কালো।—ঢাকা

কিন্তু এই কথা শুনিয়া সে যদি মনে মনে কিছু বুঝিতে পারে, তবে শিশু তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া তাহার প্রতিবাদ জানায়; তখন জননীর তাহাকে আশ্বাস দিবার প্রয়োজন হয়—

২৭

ফিঙফিঙেটি বাবুই হাটি কোন্ খানে তোর বাসা।
আমার যাদুর বিয়ে হবে বউটি হবে খাসা॥—২৪ পরগণা

২৮

খোকন মোহন চে
বউটি হ'বে সুন্দরী।
একটু ন্যাকা হাবা,
রেঁধে বেড়ে ডাক্‌বে খোকায়
ভাত খাওসে বাবা।—ঐ

শেষোক্ত ছড়াটির মধ্যে খোকনের একটু ন্যাকা হাবা বধূটি তাহার খোকা স্বামীটিকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করিল, তাহা কোন পত্নীর পক্ষে পতির উপর প্রয়োগ করিবার শিষ্টজন সমাজে প্রচলিত নজির নাই সত্য, তথাপি ছড়ার রাজ্যে আর বাস্তবের রাজ্যে পার্থক্য আছে বলিয়াই বধূর এই বুদ্ধিহীনতাকে সহজেই সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখিবে।

২৯

আর কেঁদো না যাদুমণি
আনবো তোমার বৌ,
সোনা হেন রংটি তাহার
ঠোঁটে আল্‌তা পলার ঢেউ।—ঢাকা

জননীর পক্ষে এই আশ্বাস দিবার কোন বাধা নাই, কারণ, তাহা পূর্ণ হইবার এখনও অনেক বাকি। শিশুকন্যা কাঁদিয়া উঠিলে ছড়ায় তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার আশ্বাস দেওয়া হয়;

৩০

বাবু কেনে কাঁদেরে শাশু ঘর যাইতে,
লাল ঝুমকা পিতাম ঝারি,
নেপুর দিব সাথে।
হাঁসা ঘোড়ায় পলক দিব
বাট চরা যাইতে।
পেড়ি দিব খঁচ খঁচ
বাঘনখ খেলিতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দিব
ঘাটে বসি খাইতে।
সুরু ধানের চিড়া দিব
শাশুকে ভুলাইতে।—মেদিনীপুর'

কিন্তু সেখানেও শাশু বা শাশুড়ীর বিভীষিকা যে বর্তমান আছে, তাহাও বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

৩১

মুনু কেনে কান্দেরে শ্বশুর ঘর যেতে।
রাঙ্গা রাঙ্গা টুকী দিব শাশুড়ী ভুলাতে॥
আম কাঁঠালের বাগান দিব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দিব পথে জল খেতে॥

—সাঁওতাল পরগণা

ঘুমপাড়ানি ছড়ার একটি পদ ইহার মধ্যে আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িলেও তাহাতে ইহার ছেলে ভুলানোর বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় নাই।

সুন্দরী বধূর আশ্বাস সুদূর চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া যাইতেছে—

৩২

জয়কালীর হাটর্ কলা লালা হাটর্ তেল্।
টুন্যার লাই একগুআ সুন্দর বউ
আন্‌তে সারা রাতখান্ গেল্।—চট্টগ্রাম

অবোধ শিশুকে যে কোন কথা বলিয়াই আশ্বাস দেওয়া যায়, ইহার সম্পর্কে এই একটি পরম সুবিধা। সেইজন্য জয়কালীর হাটে গিয়া শিশুর জন্য একটি সুন্দরী বধূ কিনিয়া আনিবার মত অসম্ভব আশ্বাস এখানে শুনা গেল। কিন্তু কে ইহার প্রতিবাদ করিবে, করিলেই বা কে শুনিবে?

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরও শুনা যায়—

৩৩

উতরে ঢুন্ ঢুন্ পূবে বিয়া,
ভাগিনা লক্ষ্মণ যোড়া দিয়া।
লাতউয়ার মা বুড়ী,
হাঁইছত বঁই ঝুরি।—চট্টগ্রাম

৩৪

ধেছুয়া ধেছুরুত লাতুরির বিয়া।
হুঁইচ দি হিঁয়া বড়কি দি টান।
তহিঁরে ন দিল এক খিলি পান॥—চট্টগ্রাম

আয় চাঁদ

সকল দেশের ছেলে ভুলানো ছড়াতেই চাঁদের সঙ্গে শিশুর একটি সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহার প্রচলন অধিক দেখা যায়; ইহার কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র অর্থাৎ দিন অপেক্ষা রাত্রিই অধিক রমণীয়। আকাশের সূর্যের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার উপায় নাই; এমন কি, তারকাগুলিও এত ক্ষুদ্র যে তাহাও শিশুর লক্ষ্যগোচর হইতে পারে না, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র স্থির জ্যোতিতে আকাশে উদিত হইয়া কেবলমাত্র যে নিজেই সকলের দৃষ্টি স্নিগ্ধ করিয়া দেয়, তাহা নহে—জগৎ সংসারও উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। শিশু স্থির হইয়া ইহাকে চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পায়। বাংলার শিশুর সম্পর্কে চাঁদ মাতুল; কারণ, বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে মাতুলই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়—'মামার সমান কুটুম নাই।' বাংলার শিশু চাঁদকে তাহার শ্রেষ্ঠ আত্মীয়ের মর্যাদা দিয়া থাকে। শিশুর মধ্যে যখন এই আত্মীয়তাবোধের উন্মেষই হয় না, তখনই জননী আকাশের চাঁদের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া নানা ছড়া বলিয়া তাহাকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন।

ইহাদের মধ্যে চাঁদের আবাহন সূচক ছড়ার সংখ্যাই বেশি। চাঁদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেই শিশু ক্রন্দন ভুলিয়া যায়, দুইখানি ক্ষুদ্র মুষ্টি আকাশের দিকে তুলিয়া নিজেই চাঁদকে ডাকিতে থাকে, জননী তাহার সেই সময়কার মনোভাবটি যে ছড়ায় প্রকাশ করেন, তাহাই চাঁদের আবাহনসূচক ছড়া। 'আয় চাঁদ' দিয়াই এই ছড়াগুলির প্রধানতঃ সূচনা হইয়া থাকে। ইহাদের ভিতর দিয়া আকাশস্থ দেবতার সঙ্গে মর্ত্যের কুটীরের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

নানা পার্থিব ভোগ্যবস্তু উপহার দিবার প্রলোভন দেখাইয়াই চাঁদকে আহ্বান জানান হয়,—

১

আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান বানলে কুঁড়ো দেব,

কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশু ও চাঁদ—একটি আকাশের চাঁদ, আর একটি মর্ত্ত্যের চাঁদ। এক চাঁদের কপালে আর এক চাঁদ টী দিয়া যাইবার জন্য আহ্বান জানান হইতেছে। এই ছড়া আবৃত্তি শেষ হইলে জননী ডান হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি একত্র করিয়া শিশুর ললাট স্পর্শ করেন, ইহাই টী দেওয়া; আকাশের চাঁদের হইয়া নিজেই তিনি শিশুর ললাটে টী দিয়া থাকেন, জননীর স্নেহ-কোমল স্পর্শে শিশুর অন্তরের আনন্দ উথলিয়া উঠে।

এই প্রকার আরও শুনা যায়—

২

আয় চাঁদ বায় দেবো
ধান ভান্‌লে কুড়ো দেব
মাছ ধর্‌লে মুড়ো দেব
কালো গরুর দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ টিক্ দিয়ে যা।—২৪ পরগণা

তারপর আরও আছে,

৩

আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দিব বাড়িয়া
মাছ কেটে মুড়া দেব
ধান কুটলে চিড়ে দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা॥—২৪ পরগণা

বাঙ্গালী গৃহের যাহা সর্বোত্তম খাদ্য যেমন ভাত, মাছের মুড়ো, নূতন ধানের চিঁড়া, তাহারই প্রলোভন দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু সুধাকর চন্দ্র তাহা শুনিয়া কি মনে করেন, কে জানে!

পল্লীজীবনের যে কোন লোভনীয় সামগ্রীই চাঁদের উপহাররূপে কল্পিত হইয়া থাকে,—

৪

আয় আয় রে চাঁদ মামু
নাউ পতিরে যাউ দিমু
বিলকে গেলে তাঁটগা দিমু
খোকার মুড়ে টি দি যা।—মেদিনীপুর

কিন্তু যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে, নশ্বর জীবনের কোন্ ভোগ্যবস্তু তাহার আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে?

কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে সুধাকরচন্দ্রের অভ্যর্থনার যে আয়োজনটি করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি উপেক্ষা না সম্বর্ধনা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না—

৫

আয় চান্দ আয় আয়।
আইলা দেম্, বাইলা দেম্,
মাছ কুটি নেজা দেম্,
চুড়া ঝাড়ি কুড়া দেম্,
কলা ছুলি বাকল দেম্,
চান্দ কপালে পুডুস॥—চট্টগ্রাম

যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, চন্দ্রদেবকে এখানে যে বস্তুগুলি উপহার দিবার প্রলোভন দেখান হইতেছে, তাহা উত্তম সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, মাছ কুটিয়া মাছের মুড়ার পরিবর্তে ইহার নেজা, চিঁড়া ঝাড়িয়া ইহার বর্জনীয় অংশ অর্থাৎ কুড়া, কলা ছুলিয়া ইহার বাকলই চন্দ্রদেবতাকে উপহার দিবার প্রলোভন দেখান হইয়াছে। পূর্বোক্ত ছড়াগুলিতে আকাশের চন্দ্রের সঙ্গে মর্ত্যের মানুষ একাকার হইয়া বাস করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আকাশের চন্দ্রকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে—কারণ, মানুষের যাহা ভোগ্য, তাহা তাহার ভোগ্য নহে বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিংবা ইহার মধ্যে একটু কৌতুকরস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকাও কিছু অসম্ভব নহে। এই ছড়ারই আর একটি রূপ,

৬

আয় চান্ আয় চান্ আয় চান আ,
জাদুর কপালে চান টিপ দিয়া যা।
আইলা দিওম বাইলা দিওম্,
ধান ঝাড়িলে কুড়া দিওম্,
মাছ কুড়িলে মুড়া দিওম্,
গাই বিয়াইলে দুধ দিওম,
দুধ খাইবার বাড়ি দিওম,
জাদুর কপালে চান টিপ দিয়া যা।—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে কেবলমাত্র মোটা ভাতের প্রলোভন ছাড়া আর কিছুই নাই। বাঙ্গালীর গৃহের ভাতই অমৃত, সুতরাং ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ সামগ্রী তাহার আর কিছু দিবার নাই—

৭

আবু আমার পক্ষিটী গো
কোন্ না বিলে চরে,
আবু কৈরা ডাক দিলে—
উড়্যা আইয়া পড়ে॥
আয় চান্দ লৈড়া ভাত দিবাম বাইড়া,
সোনার কপালে আমার
টুক্ দিয়ে যারে।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে আকাশের চাঁদকে হাতিতে চড়িয়া মাটিতে নামিবার জন্য অনুরোধ জানান হইতেছে। ছড়ার রাজ্য অসম্ভব এবং অসঙ্গতির রাজ্য, ইহার মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে না, কেবল শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া যায়। সুতরাং এখানেও এই বিশ্বাসের ভিতরই ইহার আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে—

৮

আয় চাঁদ নড়ে, হাতির উপর চড়ে।
ধান ভানলে কুঁড়া দিব, মাছ কুটলে মুড়া দিব
কালো গরুর দুধ দিব, দুধ খাওয়ার বাটি দিব।
খোকার ঝি পো হলে, দান কোরব।
আমার খোকার কপালে টিপ দিয়ে যা।—মেদিনীপুর

শিশুর যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তখন চন্দ্রকে বিত্তদান করা হইবে, সুতরাং ইহার পর চন্দ্রদেবের মর্ত্যে অবতরণ করিয়া শিশুর কপালে টি দিয়া যাইতে আর কোন আপত্তি থাকিবার কথা নহে।

কতকগুলি ছড়ার মধ্যে শিশুর কপালে টি দিয়া যাইবার কোন সুনির্দিষ্ট প্রার্থনা না জানাইয়াও চন্দ্রদেবকে আকাশ হইতে মাটিতে নামিয়া আসিবার প্রার্থনা জানান হইয়া থাকে, তবে পার্থিব ভোগ্যবস্তুর প্রলোভন সেখানেও থাকে, যেমন—

৯

আয়রে চাঁদ আগড় বাঁধা দুয়ারে বাঁধা হাতি।
চোখ ঢুলঢুল নয়নতারা দেখ্‌সে চাঁদের বাজি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ইহার আর একটি পাঠ সাম্প্রতিক কালে হুগলি জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই—

১০

আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা দুয়ারে বাঁধা হাতি।
চোখ ঢুলুঢুলু নয়নতারা দেখ্‌সে চাঁদের রাতি॥—হুগলি

রবীন্দ্র-সংগ্রহটি প্রায় সত্তর বৎসরের পূর্ববর্তী হওয়া সত্ত্বেও যে এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ইহার বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয় নাই, তাহার ভিতর দিয়াই এই শ্রেণীর ছড়ার প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্র-সংগ্রহ হইতে সাম্প্রতিক সংগ্রহটি উন্নততর, ছন্দ এবং পারিপাট্য ইহাতে অধিক। সুতরাং ছড়া লোক-সমাজে প্রচলিত থাকিয়া সর্বদাই যে অধোগতি লাভ করে না, বরং উন্নতিও লাভ করে, ইহার মধ্য দিয়া তাহারও পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

পার্থিব ভোগ্যবস্তুর মধ্যে কেবল বাঙ্গালীগৃহের খাদ্যই নহে, পরিধেয় অলঙ্কার-সামগ্রীরও প্রলোভন চন্দ্রদেবকে দেখান হইতেছে; কারণ, শিশুর জননী জননী হইলেও নারী, সুতরাং অলঙ্কারের চাইতে প্রিয় বস্তু তাহার আর কি আছে? নিজের মনের সকল কামনা তিনি আকাশস্থ চন্দ্রদেবতার উপর আরোপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছেন—

১১

আয় চাঁদ আয় না,
গড়িয়ে দেবো গয়না।
দুই হাতে বালা দেব,
দুই কানে দুল দেব;
গলে দেব হার—
তোরে কত দেব আর।
ঘুঙুর দেব পায়,
তুই খুকুর কাছে আয়॥—রাজসাহী

বাংলার মায়েরা এমনি ভাবে আকাশের চাঁদকে মাটির মানুষ করিয়া লইয়াছেন। তারপর আরও শুনিতে পাওয়া যায়—

১২

আয় চান্দ্ আয় চান্দ্।
কলা দিম্, মোলা দিম্,
ধেয়ন গাইয়র দুধ্ দিম্।
গাইয়র নাম্ চুঙুরী,
ডেকার নাম ডুঙুরী। পুডুস্॥—চট্টগ্রাম

এখানে 'পুডুস্' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। ছড়াটির আবৃত্তি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জননী তাহার দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলির অগ্রভাব একত্র করিয়া তাহা শিশুর ললাট স্পর্শ করান এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পুডুস্' কথাটি উচ্চারণ করিয়াই ছড়াটি সাঙ্গ করেন। মায়ের কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ পাইয়া শিশু আহ্লাদে গড়াইয়া পড়ে। পূর্বে বলিয়াছি, ইহাকেই টি দেওয়া বলে। চাঁদের আবাহন-ছড়ায় আরও শুনিতে পাওয়া যায়—

১৩

আয় চাঁদ নড়ে,
ভাত দোব বেড়ে।
রাঙা সুতোর কাপড় দোব,
চড়ে বেড়াতে ঘোড়া দোব,

দুধ খেতে গাই দোব,
ধান ভেঙ্গে কুঁড়ো দেব,
আয় চাঁদ আয়।—২৪ পরগণা

১৪

চাঁদ ত কথা শোনে না,
চাঁদ হেসে ভেসে যায়,
আয় চাঁদ আয়।
চাঁপা গাছের উপর দিয়ে,
বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে,
নীল সাগরে সাঁতার দিয়ে,
আয় চাঁদ আয়।
দেবে ধরা চাঁদের ফাঁদে,
নইলে যে রে চাঁদ কাঁদে।
তুই চাঁদের শিরোমণি
ঘুমোরে আমার খোকামণি,
মাটির চাঁদ নয়;
গড়ে দেবো,
গাছের চাঁদ নয়,
পেড়ে দোব,
তোর মতন চাঁদ
কোথায় পাব?—২৪ পরগণা

এই শ্রেণীর ছড়াগুলি আধুনিক কালে কি রূপ লাভ করিতেছে, তাহারও দুই একটি নিদর্শন দেখান যায়—

১৫

আয়রে আয় চাঁদের কোণা,
তুই আমাদের খোকন সোনা।
আকাশের চাঁদ মায়ের কোলে,
খেলনা পেলে খোকন ভোলে।—নদীয়া

১৬

আয়রে আয় চাঁদ,
পেতেছি রে আজ ফাঁদ,
আসলে পরে জ্বালব আলো
সবাই তোরে বাসবে ভালো।
এলে তোরে শিখিয়ে দেব—
হরেক রকম খেলা ;
পাড়ার ছেলে থাকবে সাথে
সারা সন্ধ্যাবেলা।—নদীয়া

১৭

চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মত চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ইহার সঙ্গে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন রচিত কালিকা-মঙ্গলে বর্ণিত 'উমার রূপ' কবিতাটির তুলনা করা যাইতে পারে, বস্তুতঃ মধ্যযুগের বহু গীতি-কবিতার প্রেরণা এই প্রকার ছড়া হইতেই আসিয়াছে।

প্রত্যক্ষভাবে চাঁদকে আবাহন করা ব্যতীতও শিশুর সঙ্গে চাঁদের নানা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া অসংখ্য ছড়া রচিত হইয়াছে। তাহাদের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যায়।

১৮

চাঁদের লেগ্যে কাঁদে শশী,
চাঁদ কি ধরা দেবে ?
আসুক রে তোর পিতা নন্দ,
চাঁদে ধরে দেবে।
আকাশ থেকে পড়বে তুমি
আঁচল পেতে ধরব আমি॥—২৪ পরগণা

যশোদা দুলাল শ্রীকৃষ্ণ যেমন নবঘনশ্যাম, অর্থাৎ নূতন মেঘের মত শ্যামল, বাংলার শিশুর গায়ের রঙেও তাহারই ছায়া পড়িয়াছে,

৯

পুঁটু আমার মেঘের বরণ।
পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ ॥
চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী।
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী ॥
পাড়ার লোক পুঁটুর রূপ কে দেখবি দেখসে আয়।
নব ঘন মিশেছে তায় ॥—বাঁকুড়া

কখনও কখনও শিশু এবং চাঁদ উভয়েই একাকার হইয়া যায়, জননীর স্নেহ-বোধে শিশুই চাঁদ হইয়া ফুটিয়া উঠে—

১০

কোথা গেছ্‌লে রে চাঁদমণি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মলাম আমি ॥
—বাঁকুড়া

শিশুর জন্য জননীর ব্যাকুলতার যে চিত্রটি এখানে প্রকাশ পাইল, তাহার মধ্যে স্বর্গীয়তা না থাকিলেও জীবনের খাঁটি বাস্তব রস মিশ্রিত হইয়াছে।

যে শিশুকে সহজেই আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কখনও কখনও মর্ত্যের ধূলি বালি আসিয়া উড়িয়া পড়ে—

১১

চাঁদ ছেলে গেছে মাছ ধরতে
ভাংলো নদীর বিল।
মাথায় গুগ্‌লির ঝুড়ি, সঙ্গে দুটো চিল ॥
আগুন লাগুক মাছে।
সোনার চরণে আমার কাদা লাগে পাছে ॥—বর্ধমান

বাংলার শিশু মাছ ধরিতে যাইবে এবং মাছের একান্ত অভাবে অন্ততঃ এক ঝুড়ি গুগ্‌লি লইয়া বাড়িতে ফিরিবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু গুগ্‌লির ঝুড়িটি অনুসরণ করিয়া যে দুইটি চিল তাহার বাড়ী পর্যন্ত আসিবে, কেবল ঝুড়িটি

ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূন্যে উড়িতে থাকিবে, ছোঁ দিতে সাহস পাইবে না, এই চিত্রটি এক দিকে যেমন বাস্তব, তেমনই আর এক দিক দিয়া মনোরম। তারপর পায়ে কাদা লাগিবার ভয়ে যে শিশু মাছ ধরিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহাও বাঙ্গালী শিশুরই উপযুক্ত আচরণ।

দুই চাঁদ—আকাশে এক চাঁদ, মর্ত্যে আর এক চাঁদ, ছড়ার মধ্য দিয়া এই দুই চাঁদে কি করিয়া যে মিলন সম্ভব হইয়াছে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

২২

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ,
হিঞ্চে বনে শচী।
ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ,
চাঁদে মেশামেশি॥—বাঁকুড়া

ইহা আকাশের সঙ্গে মাটির মিলন, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলন—ছড়ায় এই মিলন যত সহজে সম্ভব, ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে তত সহজে সম্ভব হয় না।

শিশু যেন বানের জলে ভাসিয়া আসা চাঁদ—যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, সে-ই ইহা কুড়াইয়া পাইয়া ঘরে তুলিয়া লইয়া যায়; আর যাহার ভাগ্য মন্দ, সে দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়া কপালে করাঘাত করে।

২৩

দুলতে দুলতে এল বান।
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ॥
এ চাঁদটি কাদের?
কপাল ভাল যাদের॥—বাঁকুড়া

কিন্তু শিশু কি শুধু বানের জলে ভাসিয়া আসা চাঁদ মাত্র? জননী তাহাকে কত তপস্যায় লাভ করিয়াছেন। এই তপস্যা যদিও সূর্য-তপস্যা নহে, যদি সেই ভাষাতেই বলা যায়, তবে তাহাকে চন্দ্র-তপস্যা বলিতে হয়; কারণ,

২৪

চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে রাত কেটেছে কত;
তাইতো সোনা চাঁদের কণা
পেয়েছি মনের মতো।—রাজসাহী

চাঁদের কণার মুখে চাঁদের হাসিটুকু মাখা, তাহাই দেখিয়া দেখিয়া জননীর আশা আর মিটিতে চাহে না—

২৫

কোথায় আমার চাঁদমণি
মুচ্‌কি হাসি মুখখানি।
ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি না,
গাল ভরে দি হাজার চুমা।
খোকন খোকন গন্ধ কয়,
খোকন ছুঁলে নাইতে হয়।—ঢাকা

এমন কি, খোকনের গায়ের গন্ধটুকুও মায়ের ঘ্রাণশক্তিতে ধরা পড়ে। কিন্তু তাহাকে ছুঁইলে নাইতে হয় কেন? মাতৃহৃদয়ের অর্থহীন উল্লাস যে কত ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠে, ইহার মধ্য দিয়া তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে। কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলিবেন, শিশুর যে শুচি অশুচি জ্ঞান নাই, সে জন্য শিশুকে ছুঁইলে মায়ের স্নান করিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু এখানে সমাজের শাসনের কথা কিছুই নাই, কেবলমাত্র মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থহীন আনন্দের অভিব্যক্তিই আছে।

শিশু জননীর নিকট কত কি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু সকলের শেষে পৌর্ণমাসীর চাঁদ,—

২৬

অলি আয়রে আয়।
বার্গ্যা বাঁশর ঢুলন রে বাছা,
কেরাক্ বেতর বান।
গুরা বাছা ঢুলের রে মোর পূর্ণমাসীর চান॥

—চট্টগ্রাম

শিশু সম্পর্কে জননীর সকল কথার শেষ কথাই হইতেছে, সে পূর্ণিমার চাঁদ।

ধন ধন ধন

সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া এক শ্রেণীর ছেলে ভুলানো ছড়ায় শিশুকে ধন বা সোনা বলিয়া আদর করা হইয়াছে। ধন বা সোনার অর্থ মূলতঃ ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় treasure বা wealth; কিন্তু ব্যবহারতঃ এখানে সেই অর্থটিই যে সুস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হইয়াছে, তাহা নহে। এই ধন শব্দটির সমার্থক কোন শব্দ নাই, ইহা অন্তরের সুগভীর একটি অনুভূতি মাত্র, এই অনুভূতি যে সকলের আছে, তাহা নহে, তবে জননী মাত্রেরই আছে। সন্তানের সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক আস্বাদনের ভিতর দিয়াই এই অনুভূতির প্রকাশ। যে সন্তান জননীর নাড়ীর সঙ্গে একদিন এক হইয়া ছিল, নিজের নিঃশ্বাসে, নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে একদিন যে সন্তানের জীবন প্রথম সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার সম্পর্কে জননীর যে অনুভূতি কি, যে সন্তানের জননী হইয়াছে, সেই তাহা জানে। সুতরাং শুধু মাত্র ধন কিংবা সোনা শব্দটি দ্বারা ইহার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তথাপি এক একটি শব্দ আশ্রয় করিয়াই মনের অনুভূতি প্রকাশ করিতে হয়; সেই শব্দের সেই ভাব বা অনুভূতি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকিলেও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিবার জন্য ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই; ধন কথাটিতেও তেমনই একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাই সিদ্ধ হয়, প্রকৃত ভাবটি কদাচ প্রকাশ পায় না।

ধন শব্দটি দ্বারা জননী যে কি বুঝাইয়া থাকেন, তাহা জননী নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত একটি ছড়াতে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে—

১

ধন ধোনা ধন ধোনা।
চোতবোশেখের বেনা ॥
ধন বর্ষাকালের ছাতা।
জাড় কালের কাঁথা ॥
ধন চুল বাঁধবার দড়ি।
হুড়কো দেবার নড়ি।

পেতে শুতে বিছানা নেই,
ধন ধুলোয় গড়াগড়ি ॥
ধন পরাণের পেটে।
কোন্ পরাণে বলব রে ধন,
যাও কাদাতে হেঁটে ॥
ধন ধোনা ধন ধন।
এমন ধন যার ঘরে নাই,
তার বৃথায় জীবন ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে শিশু ত বিশেষ কিছুই নয়, চৈত্র-বৈশাখে পল্লীর গৃহস্থের নিকট বেনার যে মূল্য, সে তাহাই। বেনা এক প্রকার দীর্ঘ তৃণ, গ্রীষ্মে ছায়া দান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিয়াই যদি তাহার গুণের কথা বলা শেষ হইত, তবে ত আর কথাই ছিল না। সে যে আরও অনেক কিছু এবং এত কিছু বলিয়াও বুঝি তাহার সম্বন্ধে বলা শেষ হইল না।

তাহাকে লইয়া জননী যে কি করিবেন, তাহাও সকল সময় তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এক একবার মনে হয়, সমাজ সংসার সব ফেলিয়া রাখিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া তিনি বনেতে বাস করেন; সেখানে আর কেহই থাকিবে না, শুধু সন্তান আর জননী—

২

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী?
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

জননীর গৌরব এবং গর্ব তাঁহার সন্তান, এই ভাবটিকে প্রচার করিতে না পারিলে তাঁহার মনে শান্তি আসে না; সেইজন্য তাহাকে তিনি প্রতিবেশিনী-দিগের ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া নানা আভরণ সম্ভারে সাজাইয়া রাখিতে চাহেন—

৩

ধন ধন ধনিয়ে,
কাপড় দেব বুনিয়ে।
তাতে দেব হীরের টোপ
ফেটে মরবে পাড়ার লোক ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

পূর্বেই বলিয়াছি, ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি পরিণত মনের রচনা বলিয়া অনেক সময় ইহাদের মধ্যে ঈর্ষা-কলহ-দ্বন্দ্ব-জটিল পরিণত জীবনের ছায়াপাত হইয়া থাকে ; পাড়ার লোক যে ঈর্ষায় ফাটিয়া মরিবে, ইহা ভাবিয়া জননীর হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাৎসল্যরসের অন্তরালেও নারীপ্রকৃতির বিশেষত্বটুকু সজাগ হইয়া থাকে।

৪

খোকা আমাদের সোনা,
চার পুকুরের কোণা।
বাড়িতে সেকরা ডেকে, মোহর কেটে,
গড়িয়ে দেব দানা,
তোমরা কেউ ক'রো না মানা ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশু আমাদের সোনা হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি করিয়া যে সে চার পুকুরের কোণা হইতে গেল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু শিশুর প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়, সুতরাং কার্যকারণের সাধারণ সূত্র ধরিয়া তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই। 'চার পুকুরেব কোণার তাৎপর্যও তাহাই। তারপর সেকরা ডাকিয়া মোহর কাটিয়া যদি সত্য সত্যই কেহ দানা নামক কোন অলঙ্কার নির্মাণ করিয়া অর্থের অপব্যয় এখানে করিত, তবে সত্য সত্যই তাহার প্রতিবাদ হইত ; কিন্তু জননী এখানে কল্পনায় মোহর কাটিতেছেন এবং কল্পনায় দানা গড়িতেছেন ; সুতরাং মানা করিবার এখানে কেহ নাই।

৫

খোকা মাণিক ধন,
বাড়ির কাছে ফুলের বাগান,
তাতে বৃন্দাবন ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ফুলের বাগান যেমন সুন্দর, শিশুও তেমনই সুন্দর ; বৃন্দাবন যেমন পবিত্র, শিশুও তেমনই পবিত্র। কোন্ কথায় যে শিশুর উপমা সব চাইতে সার্থক হয়, মা তাহা খুঁজিয়া পান না। যখন মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই মুখে প্রকাশ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

কখনও কখনও মায়ের মনে হয়,

৬

খোকা আমার ধন ছেলে,
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে।
রাঙা গায়ে ধুলো মাখছিলে,
মা ব'লে ধন ডাকছিলে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর দিকে চাহিয়া জননীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না; কখনও তিনি ভাবেন, এ কোথায় ছিল, কোথা হইতে কি করিয়া আসিল? রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' কবিতায়ও এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের প্রেরণা বহুলাংশে বাংলার এই শ্রেণীর ছড়াগুলি হইতেই যে আসিয়াছে, তাহা অনুভব করা যায়।

অনুরূপ আরও একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

৭

ওরে আমার ধন ছেলে।
পথে পথে বসে কান্‌ছিলে॥
মা ব'লে ব'লে ডাকছিলে।
ধুলো কাদা কত মাখছিলে॥
সে যদি তোমার মা হত,
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কত ভাবে জননী যে সন্তানের প্রতি স্নেহের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহার অন্ত নাই। এখানে চিত্রটি সম্পূর্ণ নূতন রূপ লাভ করিয়াছে—

৮

ওরে আমার সোনা,
এতখানি রাতে কেন বেহন ধান ভানা।
বাড়িতে মানুষ এসেছে তিন জনা,
বাম মাছ রেঁধেলি শোলমাছের পোনা॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

বেহন ধানের অর্থ বীজ ধান। গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ীতে বীজ ধান ভানার সঙ্গে যে শিশুর কি সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা ত বুঝিতে পারা যাইতেছে না। দেখা যাইতেছে, আকস্মিক সংবাদে তিনজন অভ্যাগত বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং তাহাদের আপ্যায়নেরও কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। বাম মাছ মনে হইতেছে বাইম মাছ বা সর্পাকৃতি এক প্রকার দীর্ঘদেহ মৎস্য, ইহাই অসময়ের অতিথি-সৎকারের জন্য যথেষ্ট হইলেও তাহার উপরেও শোলমাছের পোনারও ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু গভীর রাত্রে বীজ ধান ঢেঁকিতে ভানিয়া যে অতিথি-সৎকার করিতে হইতেছে, তাহাই বড় বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কি? ইহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ নাই; আশা করি তাহা কেহ সন্ধান করিয়া শিশুর জগৎটিকে এখানে আবিল করিয়া তুলিবেন না।

৯

খোকন সোনা চাঁদের কোণা
আঁধার ঘরে আলো,
খোকন মণি থাকতে কেন
আবার প্রদীপ জ্বালো।—২৪ পরগণা

তারপর আরও আছে—

১০

খোকন আমাদের সোনা, খোকন আমাদের সোনা,
আর কেঁদো না আর কেঁদো না।
সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দিব দানা।
ওগো মাসিপিসি তোমরা কেউ করো না মানা।
সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দিব দানা,
খোকা আমাদের সোনা॥—২৪ পরগণা

অন্য আর যে কেহই নিষেধ করিলেও মাসিপিসি যে কেন নিষেধ করিবে, তাহা ত বুঝিতে পারা যাইতেছে না! কিন্তু মা যে সকলের চাইতে স্বতন্ত্র, তাহাই এখানে বক্তব্য।

পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়ার মধ্যে নূতন কয়েকটি পদ যুক্ত হইয়া উদ্ধৃত ছড়াটি রচিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রয়াস নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যেও দেখা যায়—

১১

গঙ্গাজলে বিল্বদলে জপ করেছি কত,
তাইতো সোনা চাঁদের কণা
পেয়েছি মনের মত।
ধনকে নিয়ে বনকে যাবো
আর করিব কি ?
বিরলে বসিয়া ধনের মুখটি নিরখি।—২৪ পরগণা

পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়া অন্যত্র গিয়া কি ভাবে যে সামান্য একটু পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

১২

ধন ধন ধন ছেলে,
পথে বসে কি কাঁদছিলে,
মা বলে কি ডাকছিলে ?—হুগলি

ভাবের পারম্পর্য কিংবা কাহিনীর কোন সংহতি নাই বলিয়াই এই শ্রেণীর ছড়ার যে কোন অংশ সহজেই পরিত্যক্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ একটি দুইটি পদেই ছড়ার ভাবটি প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাদের খণ্ডিত অংশগুলিও এক একটি পূর্ণাঙ্গ ছড়ার পরিচয় লাভ করিতে পারে।

জননী যে কেবল মাত্র নিজের আনন্দে নিজেই সুখী, তাহাই নহে—যে এই ধন হইতে বঞ্চিত, তাহার বেদনাও তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের অন্তর দিয়া অনুভব করেন—

১৩

ধন ধন ধন,
বাড়ীতে ফুলের বন ;
এ ধন যার ঘরে নাই,
তার কিসের জীবন।—হুগলি

নিঃসন্তানা নারীর রিক্ত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া সন্তানবতী জননী শিহরিয়া উঠেন এবং নিজের সন্তানকে আরও নিবিড় ভাবে নিজের কাছে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন—

১৪

আয় মণি আয় মণি,
রতন মণির কোলে।—হুগলি

ফুলের বন কথাটি বড়ই অস্পষ্ট ; গৃহস্থের নিকট হলুদ বনটির একটি বিশেষ শোভা আছে—উপরে ঘন সবুজ সতেজ পাতা, মাটির নীচে স্বর্ণাভ ফসল, ইহার একদিকে যেমন মূল্য, আর একদিকে তেমনই সৌন্দর্য ; সেইজন্য জননী তাহার শিশুকে হলুদবনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছেন—

১৫

মোর ধন ধন ধন ধন !
মোর বাড়ী হলদির বন,
মোর ধনকে যে নাই নেয়
পুরি যাউ তার মন।—মেদিনীপুর

সন্তানকে যে অনাদর করে, জননীর অনুচ্চারিত অভিশাপ তাহার দিকে ধাবিত হয়। সন্তান জননীর নিকট যেমন প্রিয়, সকলের নিকটেই তাহাকে তেমনই প্রিয় দেখিতে চাহেন, ইহার ব্যতিক্রম তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে। বরং নিজে তাহাকে শতগুণ আদর দেখাইয়া প্রতিবেশীর ঈর্ষাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তিনি কৌতুক বোধ করেন—

১৬

ধন ধন ধন ধুনিয়ে।
কাপড় দেব বুনিয়ে॥
তাতে দেব ভেড়ার ডোর।
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।
তাতে দেব কালার আঁজি।
ফেটে মরবে পাড়ার বাঁজী॥—বর্ধমান

শিশু জননীর কাছে যেন কাঙালের ধন—

১৭

গোপাল বেড়ায় অলিগলি,
ছাতা ধররে বনমালী।
ছাতার ভেতর কোম্পানি,
কোন্ কাঙালের ধন তুমি ?—বর্ধমান

বনমালী গোপালের মাথায় ছাতা ধরিয়া তাহাকে রৌদ্র হইতে ত্রাণ করুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই ছাতার ভিতর কি করিয়া কোম্পানির অধিষ্ঠান হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না; তবে এই কোম্পানি যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহা সত্য।

নিজের মনের অভিলাস শিশুর উপর আরোপ করিয়াও জননী তৃপ্তি লাভ করেন; শিশুর হইয়া অনেক সময় নিজের কথাই বলেন—

১৮

খোকন আমার ধন, কি খেতে মন ?
পাকা চিংড়ী আর বাড়ীর বেগুন,
আমার তাই খেতেই মন !—বর্ধমান

এই 'আমার' বলিতে যে কাহাকে ইঙ্গিত করা হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ হওয়ার প্রয়োজন নাই; সাধারণ পাঠকও অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জননীর অবচেতন মনের একটি একান্ত অভিলাস ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

জননী নিজেকে দিয়া উপলব্ধি করেন, যাহার ক্রোড় শূন্য, তাহার জীবন গৌরবহীন, তাহার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—

১৯

ধন ধন ধন।
বাড়ীতে নটের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন॥
তারা কিসের গরব করে।
উনুনে পুড়ে কেন না মরে॥—বর্ধমান

কিন্তু আত্মহত্যার যে প্রণালী গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহার নির্মমতা যে কোন পাঠককে আঘাত করিতে পারে। এই প্রকার আরও শুনা যায়—

২০

ধন ধন ধন পায়রা,
ধন পায় গো কারা।
ঘোষপাড়ায় কামনা করে ধন পেয়েছি আমরা॥
এ ধন যাদের নাই ঘরে।
তারা কি নিয়ে গো ঘর করে॥—বর্ধমান

শিশুর সঙ্গে পায়রার তুলনা দেওয়া ছড়ার মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার। অন্য একটি ছড়াতেও আমরা শুনিতে পাই—

থকন থকন পায়রাটি কোন সে বিলে চর।
থকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড়॥

সেই সূত্রেই এখানেও পায়রার চিত্রটি আসিয়াছে। এখানেও সেই পূর্বশ্রুত কথা,—যাঁহাদের গৃহে শিশু জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদের গৃহেই মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছে—নূতন জন্মের মধ্যেই জীর্ণ জীবনের মুক্তি আসে। যেখানে নূতন জন্ম হইল না, মৃত্যু সেখানেই আসিয়া বাসা বাঁধিল—সেই গৃহে শ্মশানের ছায়া পড়িল।

এই শ্রেণীর ছড়াগুলি শিশু-জীবনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিবর্তে জননী-হৃদয়ের অকারণ আনন্দের অভিব্যক্তি-স্বরূপ হইয়া থাকে। এখানেও শিশু-সম্পর্কিত একটি আনন্দ কল্পনা জননী-হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে—

২১

ধনকে নিয়ে বনে যাব, থাকব বনের মাঝে।
আয় দেখিনি নীলমণি তোর কেমন ঘুঙুর বাজে॥
তোরে নাচলে কেমন সাজে।
ঝুনুক ঝুনুক বাজে॥—বাঁকুড়া

ছড়া আবৃত্তির তালে তালে যেন ক্ষুদ্র দুইটি চরণের নূপুর নিক্বণ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

বেশি কথা নহে, অনেক সময় সামান্য দুইটি কথাতেও মাতৃহৃদয়ের সুগভীর স্নেহবোধ প্রকাশ পায়; কারণ, কথার ব্যাপকতার এখানে প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন মাত্র উপলব্ধির গভীরতার। অল্প কথায়ও সকল সময় তাহার অভাব হয় না।

২২

পুঁটু আমার ধনমণিরে সোনা।
আমি গড়িয়ে দেব দানা ॥—বাঁকুড়া

তারপর পূর্বোক্ত কথা নূতন অঞ্চলে গিয়াও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

২৩

ধন ধন ধন
দর্প নারায়ণ ॥
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে।
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে ॥—বাঁকুড়া

শিশু দেবতার আশীর্বাদ, দেবতার প্রসাদী ফুল; পল্লীর জননী মনে করেন, তাহা ষষ্ঠীতলায় কুড়াইয়া পাওয়া সম্পদ। পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়া কি ভাবে স্থানান্তরে গিয়া নূতন একটি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহা এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

২৪

খোকন আমার ধন ছেলে।
পথে বসে বসে কানছিলে
মা বলে বলে ডাকছিলে।
গায়ে ধূলা কত মাখ্‌ছিলে ॥
ষষ্ঠীতলায় এল বান।
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ ॥
আর বার দুই যাব।
আর গোটা চার আন্‌বো ॥—বাঁকুড়া

হয়ত ইহার শেষাংশটি সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন ছড়া, কোনমতে প্রথমাংশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একটি সম্পূর্ণ ছড়ার রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের

মধ্য দিয়া ভাবের যে একটি অখণ্ডতা আছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। জননীর সন্তানের সাধ এখনও মিটে নাই, নিভৃত মনের এই গোপন কথাটি তিনি এখানে অকপটে প্রকাশ করিলেন। ছড়ার রাজ্য লৌকিক লজ্জা সঙ্কোচের রাজ্য নহে, শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কের মধ্যে দ্বিধা সঙ্কোচেরও কোন অবকাশ নাই; কারণ, শিশু স্বয়ং লৌকিক লজ্জা সঙ্কোচ ও বিধিনিয়মের অতীত জগতের দূত। সেইজন্য শিশুর নিকটও মায়ের কোন সঙ্কোচ নাই।

যে ধন রাজার ভাণ্ডারে নাই, শিশু সেই ধন, সাত সাগর মন্থন করা ধন, এই ধন পাইলেও পাওয়ার আশা মিটে না, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে সেই কথা প্রকাশ পাইয়াছে—

২৫

ধন ধন পায়রা।
এ ধন পায় কারা।
কত সাগর মন্থন করে এ ধন পেয়েচি আমরা॥
আবার যদি পাই তো সবাই মিলে যাই।
আমরা সবাই মিলে যাই॥—বাঁকুড়া

শিশুর পবিত্র অঙ্গে যেন চন্দনের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, সেইজন্য চন্দন বনে তাহার বিলাস—

২৬

ধন আমার কোন্‌খানে।
চন্দন বন যেখানে॥
সেখানে ধন কি করে।
ডাল ভাঙ্গে আর ফুল পাড়ে॥—বাঁকুড়া

এই প্রকার আরও শুনা যায়—

২৭

পটল আমার ধন।
যেয়ো না রে বন।
তোমার লেগে গড়িয়ে দিব রত্ন সিংহাসন॥—বাঁকুড়া

শিশু যে মায়ের কাছে কী, তাহা মা ভাষায় বুঝাইয়া কোনদিন বলিতে পারেন না, এক একবার এক এক কথা মনের মধ্যে তাহার উদয় হয় মাত্র—

২৮

পুঁটু আমার লক্ষ্মী সোনা।
আদা দিয়ে চাল ভিজনো গেড়দা গুড়ের পানা॥—বাঁকুড়া

২৯

ধন ধন ধুনিয়া
কাপড় দিব বুনিয়া।
তাতে দিব নীলের টোপ,
জ্বলে মরবে পাড়ার লোক॥—বীরভূম

ইতিপূর্বে ভেড়ার টোপের কথা শুনিয়াছি, এইবার নীলের টোপের কথা শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু নীলের টোপই হউক, কিংবা ভেড়ার টোপই হউক, উভয়েরই প্রতিক্রিয়া পাড়ার লোকের উপর সমান, তাহাদের ঈর্ষ্যায় ফাটিয়া মরা ছাড়া আর গতি নাই।

শিশু সন্তানের দিকে চাহিয়া জননী কখনও ভাবেন, ইহার অঙ্গ কি দিয়া গঠিত হইয়াছে ?

৩০

ধনকে কিসে গড়েছে।
কাঁচা সোনা কুঁদে কেটে,
ছাঁচে ঢেলেছে॥—সাঁওতাল পরগণা

নিজের মনের মধ্যেই যেন তিনি তাঁহার প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পান।

অনেকের ত ধন-ভোগে বৈরাগ্য আসে ; কিন্তু এই ধনে কাহারও বৈরাগ্য আসিতে পারে না,—

৩১

ধন ধন ধন ধন।
ই ধনকে দেখ্‌তে লারে, পুড়ুক তার মন।
ধন ধকড়া টাকার তোড়া ধনের মুরালী।
ই ধন্‌কে দেখ্‌তে লারে কোন্ বিড়ালী॥—সাঁওতাল পরগণা

কারণ, এই ধন জীবনের জ্বালা নয়, এই ধনে জীবনের পরমা শান্তি—

৩২

ধন ধন ধন ধন।
দুখ নাস্থরা খিদ্যাহারা চিত্‌নেবারণ।
ধনকে নিয়ে বনকে যাব রইব বনের মাঝে।
নাচ্‌ দেখিরে নীলমণি ভুর্‌ কেমন ঘুঙুর বাজে॥—সাঁওতাল পরগণা

প্রথম দুইটি পদের পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ছড়ার স্বাধীন দুইটি পদ ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ছড়াগুলি মুখে মুখেই বাংলার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কি ভাবে যে প্রচার লাভ করিয়াও ইহাদের মৌলিক শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, বাংলা ভাষী এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই ছড়াগুলি তাহার প্রমাণ। ইহাদের মধ্য দিয়া অলক্ষিতে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল, সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি।

৩৩

ধন ধন ধন ধন।
বাড়িতে লোট্যার বন।
ই ধন যার ঘরে নাই তার মিছাই জীবন।—সাঁওতাল পরগণা

পূর্বে ফুলের বন ও হলুদের বন শুনিয়াছি, সুদূর সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া তাহাই লোট্যার বন হইয়াছে, কিন্তু শিশুর সম্পর্কে বিশ্বাস ও অনুভূতি অবিচলই রহিয়াছে—'ই ধন যার ঘরে নাই তার মিছাই জীবন।'

৩৪

ধনকে কে মারেছে কে ধরেছে দুধের গতরে।
দুধ লাড়ু কলা পাকা গালের ভিতরে॥
ধনকে কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
(আমার) গগন চাঁদের বালাই নিয়ে মরে যাবেক্‌ কাল॥
—সাঁওতাল পরগণা

শিশুকে কি কেহ প্রহার করে? প্রহার করিলেই কি সে কাঁদে? কারণ, প্রহারের অর্থও ত সে বুঝে না, সুতরাং প্রহার করিলেও সে কাঁদে না। কখনও

কখনও বা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে। সুতরাং প্রহার করিলেই যে শিশু কাঁদে, প্রহার না করিলে যে কাঁদে না, তাহা নহে—শিশু নিজের মনে হাসে—কাঁদে। কিন্তু তাহার কান্না শুনিলেই আমাদের মনে হয়, কেহ তাহাকে প্রহার করিয়াছে, যদি এ' কাজ কেহ করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর জননীর অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৩৫

নুনু নুন্দুরত ;
নুনুকে গড়ায়ে দিব সোনার ঘুঙুরু ॥ —সাঁওতাল পরগণা

স্নেহের ভাষা বিচিত্র—অভিধানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, মাতৃহৃদয়ে সেই ভাষার অধিষ্ঠান, সেখানেই উদ্ভব, সেইখানেই বিকাশ। বাহিরে জ্ঞানীর জগৎ তাহা বিমূঢ় হইয়া শুনিয়া যায় মাত্র।

শিশু সকলের প্রিয়, তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি। জীবনে এমন প্রিয় সম্পদ আর কাহারও কি আছে?

৩৬

খোকা সোনা চাঁদের কণা,
সবাই বলে দেনা দেনা,
এ ধন যার ঘরে নেই
ঘরে তার কিছুই নেই।—নদীয়া

তারপর আরও আছে—

৩৭

কিসের পূজো কিসের আচ্চা
কিসের রে চৈতন।
এদ্দিনিতে জানলাম মুই
খোকন বড় ধন ॥—নদীয়া

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শাশ্বতী জননীর মুখে একই কথা নানা ভাবে শুনিতে পাই—

৩৮

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন,
বার বাড়ীতে গড়িয়ে দেব ফুলের সিংহাসন।
তার মধ্যে খেলবে আমার খোকনমণি ধন ॥—রাজসাহী

চট্টগ্রামের ছড়াগুলিতে ধনের পরিবর্তে মণি কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু অনুভূতির কোন পার্থক্য দেখা যায় না—

৩৯

আম পাতা কাঁঠাল পাতা,
তেল চিবিলে পড়ে,
তোঙার আধার জাদুমণি,
হিলে বিলে দৌড়ে।—চট্টগ্রাম

৪০

সাইর মণি পাগল মণি.
সাইর মোম করে।
এক মন ঠেল্যার জল দি
মোর সাইরগ্যা স্যান করে॥—চট্টগ্রাম

৪১

মণি কোডেঁ মণি কোডে,
হাঁওলা পাতার তলে।
হাঁওলা পাতা উল্টাই চাইলে,
বিজলী ছটক্ মারে॥—চট্টগ্রাম

একটি মাত্র ছড়ায় ধন শব্দটি পাওয়া গিয়াছে—

৪২

ধন কোঁডে ধন কোঁডে ডাকি আন গৈ.
সক্কলর বাঁডা সক্কলে খাইল ধনর বাডা কই॥—চট্টগ্রাম

ধন কোথায়, ধন কোথায়, তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস; সকলের অংশ সকলে খাইয়া গেল, আমার ধনের অংশ কোথায়?

সর্বজনীন অনুভূতির গুণে বিশ্বময় শিশুর রাজ্য একাকার হইয়া আছে।

নন্দকিশোর

চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে বিস্তার লাভ করিবার পর হইতেই বাঙালীর চিন্তারাজ্য ইহার আদর্শ দ্বারা যে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাহারই ফলে বাঙ্গালীর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়া ইহার চিরাচরিত রূপটিতে নানা দিক দিয়া পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। বাংলার লোক-সাহিত্যও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে। একটি প্রচলিত কথা আছে যে, এদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। ইহার অর্থ এই যে, এদেশের সকল সঙ্গীতই কৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত। একথা এই হিসাবে সত্য যে, এদেশে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যে লৌকিক প্রেম-সংগীত প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই নায়ক-নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা। মানভূম জিলার সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে যে বাংলা প্রেম-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারও নায়ক এবং নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা। বাংলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত লৌকিক প্রেম সংগীতেও রাধাকৃষ্ণকেই নায়ক-নায়িকা রূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি প্রধানতঃ, কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত নহে, সেইজন্য অবাধে ইহারা সকল শ্রেণীর সমাজের মধ্যেই প্রচলন লাভ করিতে পারিয়াছে। বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়ার ইহা একটি বিশেষত্ব, ইহা সর্বত্র দেখা যায় না। ছড়ার মধ্যে কোন ধর্মের কথা নাই, আচার-জীবনের কোন আঙ্গিকের উল্লেখ নাই, সম্প্রদায়গত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নাই; এইজন্যই সাহিত্য হিসাবে ইহাদের একটি মূল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাহাই তাঁহার ছেলেভুলানো ছড়া বিষয়ক প্রবন্ধের ভিতর দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু একথা সত্য, অন্যান্য সকল দিক হইতেই আগত সাম্প্রদায়িক প্রভাবকে অস্বীকার করিয়াও বাংলার কিছু কিছু ছড়া বৈষ্ণব প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ইহার কারণ, বৈষ্ণব ধর্ম মানুষের মধ্যেই ভগবানের উপাসনা করিয়াছে। মানুষকে লইয়াই সাহিত্যেরও সার্থকতা প্রকাশ পায়। ছেলে ভুলানো ছড়ার প্রধান লক্ষ্য শিশু। বৈষ্ণব ধর্ম ভগবানের কথা বলিলেও যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভগবত্তা উপলব্ধি করিয়াছে। শিশুকে অস্বীকার

করিয়া সেখানে ভগবৎ চৈতন্যের বিকাশ হয় নাই। ছড়ার শিশু এবং বৈষ্ণবের বাল-গোপালের উপলব্ধিতে কোনও পার্থক্য প্রকাশ পায় নাই; সেইজন্য শিশু শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র না হইয়া লোক-সাহিত্যেরই বিষয় ছড়া হইয়াছে। যে ধর্মচেতনায় দেবতাকে মনুষ্যের মধ্যেই উপলব্ধি করা হইয়া থাকে,—বাৎসল্য, শান্ত, মধুর, সখ্য, দাস্য প্রভৃতি মানবিক ধর্মই যে ধর্ম-সাধনায় ভগবৎ উপলব্ধির সহায়, তাহা আশ্রয় করিয়া যাহা গড়িয়া উঠে, তাহা সাহিত্য পদবাচ্যই হইয়া থাকে; সেই সূত্রে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলার অনবদ্য গীতি-সাহিত্য। বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যেও শিশু শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্য রসের বিকাশ হইয়াছে বলিয়া তাহা দ্বারাও বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি অঙ্গ পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

দোলনার মধ্যে যে শিশুটি মুখ বুজিয়া পাড়িয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু দোল খাইতেছে, জননী তাহার মধ্যে যশোদাদুলালের রূপটিই উপলব্ধি করিয়াছেন—

দোল দোল দোল দোলন হরি,
কে দেখেছে হরি।
ঝোলনাতে ঝুলছে আমার ঐ গিরিধারী॥—বাঁকুড়া

যে শিশুটি ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহার মধ্যেও জননী নন্দকিশোর শ্রীকৃষ্ণের রূপটিই দেখিতে পাইতেছেন—

ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর ধূল লেগেছে গায়॥
ধূলা ঝেড়ে নেবে কোলে প্রাণ জুড়াবে তায়॥—রবীন্দ্র সংগ্রহ

শিশুর রংটি কালো হইলেও তাহারই মধ্যে জননী বৃন্দাবনের কালো শশী নবঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের রূপটি দেখিতে পাইয়াছেন—

বৃন্দাবনের যত রূপসী রূপের যত আলো,
বৃন্দাবনের কালোশশী দেখে এলাম ভালো।

বাংলার গৃহের শিশুমাত্রই গোপাল; জননী যশোদার মাতৃস্নেহমথিত সুধারস সিঞ্চিত নাম গোপাল; এই নামটির মধ্য দিয়াই যেন মাতৃস্নেহের সুধারস মূর্ত হইয়া প্রকাশ পায়, সেইজন্য এই নামটি ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়াই অন্তরের

নিভৃত কন্দরে যেন এক অভাবনীয় আনন্দের শিহরণ অনুভব করিয়া থাকেন—

গোপাল গোপাল গোপাল।
কাঙালিনীর দুলাল ॥
তুমি আমার যোগীর কোশাকুশি।
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশী ॥—বর্ধমান।

স্নেহ-পুত্তলিটিকে কি বলিয়া যে জননী ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শিশুর প্রকৃতি কোনও ব্যাখ্যাতেই ধরা দেয় না; তাহা যে শুধু দুর্জ্ঞেয়, তাহা নহে—তাহার রূপেরও সীমা নাই, কৃষ্ণরূপের মধ্যেও যেন বিদ্যুতের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়—

কোঁড কোঁড[১], শাস্‌নি পাতার তলে,
শাস্‌নি পাতা উল্টাই চাইলাম
বিজলী ছডক মারে,
বিজলী ছড্‌কে দেইখলাম মুখ
অতি তপস্যার ফলে,
অতি তপস্যার নন্দদুলাল
কনে কইত পারে।—চট্টগ্রাম

শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার সন্তান, দধি দুগ্ধ বিক্রয় তাহার ব্যবসায়, সুতরাং তাহাকে পসারীর রূপেও দেখা যায়—

কানাইর মাথাত লাল পাগড়ী,
পাকাইয়াছে ছিক্কা দড়ি।
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ,
কানাইয়ে গণে কড়ি ॥
কানাই, ন যাইও গোপাল পাড়া।
ভাঙিব তোমার হাতের বাঁশী,
ছিঁড়িব তোমার গলার মালা ॥—চট্টগ্রাম

---

[১] কোঁড কোঁড—কোথায় কোথায়?

শিশুর নৃত্য জননীর অন্তরে কি অফুরন্ত আনন্দের উৎস সৃষ্টি করে। শিশুর নৃত্যকে ছেলেভুলানো ছড়ায় কোথাও ভোঁদড়ের নাচের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, কোথাও বা অন্য কোনও স্বপ্নজগতের অপরিচিত জীবের নৃত্যের সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে শিশুর নৃত্য দেখিয়া বাঙ্গালী জননীর গোকুলের গোয়ালা-গৃহে শিশু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের কথা স্মরণ হইয়াছে—

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।
ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা,
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত গোপের বালা,
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে,
তাদের হাতে নড়ি, কাঁধে ভাড় নাচে থেয়ে থেয়ে॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীবাসী অনুভব করে—

নন্দের দুয়ারে আজ কি আনন্দ হইছে,
যশোমতী ভাগ্যবতী গোপাল কোলে পাইছে।

এদেশের জননী মাত্রই স্নেহশালিনী যশোদা, শিশুমাত্রই গোপাল। এই চেতনার ভিতর মাতৃস্নেহের প্রতি এই জাতি যেমন দেব-মর্যাদা দান করিয়াছে, তেমনই শিশুকেও দেব-মর্যাদা দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে। শিশু দেবতা, এই শিশুর যিনি জননী, তিনিও দেবী। বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির মধ্য দিয়া সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থও শিশু এবং জননী সম্পর্কে এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র শাস্ত্র কিংবা সমাজ-নীতিরূপেই এদেশে অস্তিত্ব রক্ষা করে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনের আচরণীয় ধর্মের মধ্য দিয়াও তাহা অনুভব করিয়াছে।

ছেলে ভুলানো ছড়ায় কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার নামটি ক্বচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ, যেখানে বাল-গোপালের বাৎসল্যের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেখানে রাধার নাম উল্লেখ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি দুই এক স্থলে

তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সুতরাং এখানে রাধাকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, কান্তাভাবের অধিকারিণী বলিয়া নহে—

ও' পারেতে কদম গাছটি কদম ঝুরঝুর করে,
তার তলাতে রাধাকৃষ্ণ সদাই নৃত্য করে।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে কাঁদে তরুলতা,
সকল লতা বলে আমার কৃষ্ণ গেল কোথা।
কৃষ্ণ গেল বিষ্ণুপুর না গেল বলিয়ে,
হেন সময়ে এলেন কৃষ্ণ পাচনি হারিয়ে।
পাচনি হারায়ে কৃষ্ণ বেড়ান বনে বনে,
নবীন কুশের অঙ্কুর ফুটিল চরণে।
ডাহিন হাতে তেলের বাটি কানে কদম্বের ফুল,
রাধা গেলেন স্নান করিতে কালীদহের কূল।
কালীদহে গিয়ে রাধা খুলে দিলেন কেশ,
কেশ পানে চেয়ে চেয়ে তন্ত হলো শেষ।
আলি লো মা ডালে কেবা—কৃষ্ণ কেন গাছে।
সকল সখী নৃত্য করে বলরামের কাছে ॥—নদীয়া

উদ্ধৃত ছড়াটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই বর্ণনা ভাগবত সম্মত নহে অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য রসের আধার বাল-গোপাল পরিকল্পনার মধ্যে ভাগবত বা বৈষ্ণব-ধর্ম-বিরোধী ভাব কিছু নাই; কিন্তু এখানে যে চিত্রটি পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত লৌকিক, কিছুমাত্রও পৌরাণিক নহে। বাংলা ছড়ার বিশিষ্ট লক্ষণ ইহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা পাইয়াছে। 'ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে'—এই ছড়াটি অনুসরণ করিয়াই উপরি-উদ্ধৃত ছড়ার প্রথম পদটি অর্থাৎ 'ওপারেতে কদম গাছটি কদম ঝুর ঝুর করে'—রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণ নামটি পরবর্তী পদে থাকার জন্যই লঙ্কা গাছটির পরিবর্তে কদম গাছটির কথা এখানে আসিয়াছে। তারপর কদম গাছটির তলায় রাধা কৃষ্ণ সর্বদা নৃত্য করা সত্ত্বেও কেন যে 'গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে কাঁদে তরুলতা'—তাহা আপাতত বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তার পরই আবার দেখা যায়, কৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষতলায় সদাই নৃত্য করা সত্ত্বেও সহসা তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিষ্ণুপুর চলিয়া

গেলেন এবং সেখান হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল যে তিনি হাতের বাঁশীটি হারাইবার পরিবর্তে হাতের পাচনি বা লাঠিটি হারাইয়া আসিয়াছেন। তারপর এই পাঁচনির শোকে বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরে পাঁচনি হারাইয়া আসিয়াও বনে বনে কেন সন্ধান করিতে গেলেন, তাহাও কিছু প্রকাশ করিলেন না—নবীন কুশাঙ্কুর তাহার রক্তকমল সদৃশ পদতলে ফুটিতে লাগিল। একদিকে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণবিরহে কিছুমাত্র কাতরতা না দেখাইয়া ডান হাতে তৈলের বাটি ও কানে কদম্বের ফুল গুঁজিয়া কালীদহের কূলে গিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া মাথার চুল খুলিয়া দিলেন, তারপর সেই সুনিবিড় ও সুদীর্ঘ কেশের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া নিজের দেহ পাত করিয়া ফেলিলেন। শেষ দৃশ্যে দেখা গেল, কৃষ্ণ একটি বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছেন, সখীগণ কৃষ্ণ-সন্ধানে কোনও তৎপরতা না দেখাইয়া বলরামের চারিপাশ ঘিরিয়া সহসা নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। এই চিত্রগুলির মধ্য দিয়া পরস্পর যে অসংলগ্নতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ছড়ার বৈশিষ্ট্য। এই অসংলগ্ন চিত্রগুলির ভিতর দিয়াও এ'কথা অনুভব করা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ যেমন কোথাও ভাগবত-সম্মত নহে, শ্রীরাধিকার আচরণও তেমনই বৈষ্ণবধর্মানুমোদিত নহে—বরং সাধারণ নায়িকার লক্ষণ-সম্মত।

এই ছড়াটিরই আর একটি রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, ছড়ার ধর্ম রক্ষা করিয়া কৃষ্ণ ও রাধিকাকে সম্পূর্ণ লৌকিক চরিত্ররূপেই উপস্থিত করা হইয়াছে ; যেমন—

ঠাকুর বাড়ীর ফুলগাছটি সদাই ঝুর ঝুর করে,
তারি তলে কিষ্ট-রাধিকা সদাই নৃত্য করে।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে আর কাঁদে লতা।
কিষ্ট আমার একা,
কিষ্ট আমার বাঁকা
কিষ্টর চিতখানি যে আকুল ব্যাকুল,
লোকে বলে ক্ষ্যাপা ॥—ঢাকা

এখানেও 'কিষ্ট-রাধিকা' যুগ্মভাবে সর্বদা নৃত্য করা সত্ত্বেও কৃষ্ণ যে কেন একা, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। এখানেও কৃষ্ণকে

ভাগবতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর লোক-মানসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে মুক্তি দান করা হইয়াছে। বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়ায় শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবেই বিরাজ করিয়াছেন।

এই বিষয়ক একটি ছড়ারই চারটি বিভিন্ন রূপ রবীন্দ্র-সংগ্রহে ধৃত হইয়াছে; মনে হয়, প্রথম দুইটি ছড়া শেষ দুইটি ছড়া হইতে প্রাচীনতর—

১

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর ধুলো মাখা গায়।
ধুলো ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায়—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

২

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি।
কলুবাড়ি যাও তেল আনো গে আমি দিব তার কড়ি॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এখানে উভয় ক্ষেত্রেই নন্দকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে 'ধুলোর দোসর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বাংলার শিশু সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা সার্থক উক্তি আর কিছু হইতে পারে না; কারণ, ধূলার উপর বিহারেই শিশু ভোলানাথের উল্লাস। কিন্তু 'ধুলোর দোসর' শব্দ দুইটিই যখন ধূলায় ধূসর হইয়াছে, তখনই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে আধুনিকতার একটু স্পর্শ লাগিয়াছে—

৩

ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর ধূলা মেখেছে গায়।
ধূলা ঝেড়ে কোলে কর সোনার জাদু রায়॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর ধূল লেগেছে গায়,
ধূলা ঝেড়ে নেরে কোলে প্রাণ জুড়াবে তায়।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

চারিটি ছড়ারই মূল উৎস অভিন্ন; মনে হয়, একই অঞ্চল হইতেই রবীন্দ্রনাথের এই পাঠ কয়টি গৃহীত হইয়াছে। এমন কি, বর্ধমান হইতে সংগৃহীত পরবর্তী পাঠটিতেও বিশেষ কিছু রূপান্তর দেখা যায় না। কেবল মাত্র শেষ দুইটি পদ স্বতন্ত্র ছড়া হইতে আসিয়া ইহাতে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর,
ধুলো লেগেছে গায়।
ধুলো ঝেড়ে লওরে কোলে,
প্রাণ জুড়োবে তায়॥
চণ্ডীতলায় এসেছিল বান।
তাই কুড়িয়ে পেয়েছি সোনার চাঁদ॥—বর্ধমান

মেদিনীপুর গিয়া ছড়াটি আরও বিস্তৃত হইয়াছে মাত্র—

৬

নন্দ কিশোর ধূলায় ধূসর ধূলা মেখেছে গায়,
চোখের কাজল মুখে মেখে পাড়া বুলতে যায়।
পাড়ায় আছে জটা বুড়ি কটমটিয়ে চায়।
শিবের জটা কটি ছাই মাখান গায়।
বৃন্দাবনের যত রূপসী, রূপের যত আলো
বৃন্দাবনের কালো শশী, দেখে এলাম ভালো।—মেদিনীপুর

ইহাতেও স্বতন্ত্র ছড়ার কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ আসিয়া যুক্ত হইয়া গিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি প্রকৃত পক্ষে কান্না বিষয়ক ছড়া। কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে গোষ্ঠ যাত্রার একটি কথা আছে বলিয়া ইহাকে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতেছে।

ভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায়, গোষ্ঠলীলায় বাল-গোপালের সদাই উল্লাস প্রকাশ পাইয়াছে; এমন কি, জননী যশোদা শঙ্কিত হইয়া শিশুকৃষ্ণকে সেই কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু ছড়ায় যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠযাত্রার আদেশ করিয়াছেন, শিশুকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া কাঁদিতে বসিয়া গিয়াছেন, তিনি কিছুতেই গোষ্ঠযাত্রায় সম্মত নহেন; সেইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, যেখানে ভাগবতের বিষয়বস্তু আছে, সেখানেও ভাগবতের কথা নাই, ভাগবতের নামে জননীর নিজের কথাই প্রকাশ পাইয়াছে।

কে মেরেছে কে ধরেছে সোনার গতরে।
আধকাঠা চাল দেব গালের ভিতরে॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাও নি কাল॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে কোঁদল করে আসব আমি কাল॥
মারি নাইকো ধরি নাইকো বলি নাইকো দূর।
সবে মাত্র বলেছি গোপাল চরাও গে বাছুর॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

বাছুর চরাইতে যাইতে গোপালের যে এত কেন আপত্তি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ছড়া হইতে বুঝিতে পাওয়া যাইবে—

৮

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥
ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা,
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত গোপের বালা,
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে,
তাদের হাতে নড়ি কাঁধে ভাঁড় নাচে থেয়ে থেয়ে॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

বাল-গোপালের ভোজনে যে আনন্দ প্রকাশ পায়, গার্হস্থ্য কর্তব্য পালনে তত আনন্দ প্রকাশ পায় না; সেইজন্যই পূর্বে তিনি বাছুর চরাইতে যাইবার কথায় কাঁদিয়া আপত্তি জানাইয়াছিলেন।

গোপাল জননীর যে কি মূল্যবান্ সম্পদ, তাহা মায়ের মুখে শুনা যাইতেছে—

৯

গোপাল গোপাল গোপাল।
কাঙ্গালিনীর দুলাল্॥
তুমি আমার যোগীর কোশাকুশী।
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশি॥

ধন বর্ষাকালের ছাতি।
আঁধার ঘরের বাতি॥
ছেলের হাতের নাড়ু।
পোয়াতীর হাতের খাড়ু॥
কানার হাতের সাটি।
শীতকালের মাটি॥—বর্ধমান

নদীয়ার বিভিন্ন বিষয়ক ছড়ার মধ্যেই কৃষ্ণনাম আসিয়া যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের জন্মভূমি নদীয়ার পক্ষে ইহাই একান্ত স্বাভাবিক। বাংলার যে সকল অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়, সেই সকল অঞ্চলের ছড়াগুলিও বৈষ্ণব ভাব দ্বারা প্রভাবিত।

১০

হায় হায়! হরি-গাড়ির মাঠেরে ভাই পাকা পাকা চুল,
পান কিনিব চূণ কিনিব খাবে নন্দের ভাই।
হায় হায়! নন্দ ডাক পড়েছে নন্দ নাইকো বাড়ী,
সুবল সুবল ডাক পড়েছে সুবল আছে গো বাড়ী।
হায় হায়! আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে
সুবল যাবেন বিয়ে করতে দিঙ্‌নগর দিয়ে।
হায় হায়! দিঙ্‌নগরের দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে,
দুই দিকে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলমছিল ছুঁড়ে মেরেছে—
ইঃ দাদা বড্ড লেগেছে॥—নদীয়া

বিভিন্ন খেলার ছড়া একত্র আসিয়া যুক্ত হইয়া এখানে এক বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে নন্দের ভাই আছে, নন্দ আছে, সুবল আছে, কিন্তু নন্দসুত কানাই নাই। সুবলও ভক্তি সাধনার পথ এখানে পরিত্যাগ করিয়া সহসা দিঙ্‌নগর অতিক্রম করিয়া শ্বশুর বাড়ীর পথে যাত্রা করিয়াছেন। তারপর দিঙ্‌নগরে যে ঘটনা সহসা ঘটিয়া গেল, তাহা তাহার বিবাহ অপেক্ষাও স্মরণীয়।

পরবর্তী ছড়াটির একদিক দিয়া চিত্ররস-ধর্মিতা, আর এক দিক দিয়া ভাব-গভীরতা উভয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১১

ওপারেতে কদম গাছটি কদম ঝুর ঝুর করে,
তার তলাতে রাধাকৃষ্ণ সদাই নৃত্য করে।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে কাঁদে তরুলতা,
সকল লতা বলে আমার কৃষ্ণ গেল কোথা।
কৃষ্ণ গেল বিষ্ণুপুর না বোল বলিয়ে,
হেন সময়ে এলেন কৃষ্ণ পাচনি হারিয়ে।
পাচনি হারায়ে কৃষ্ণ বেড়ান বনে বনে,
নবীন কুশের অঙ্কুর ফুটিল চরণে।
ডাহিন্ হাতে তেলের বাটি কানে কদম্বের ফুল,
রাধা গেলেন স্নান করিতে কালীদহের কূল।
কালীদহে গিয়ে রাধা খুলে দিলেন কেশ,
কেশ পানে চেয়ে চেয়ে তনু হ'ল শেষ।
আলি লো মা ডালে কেবা—কৃষ্ণ কেন গাছে ?
সকল সখী নৃত্য করে বলরামের কাছে।—নদীয়া

ছড়ার মধ্যে যেমন চিত্রের অসংলগ্নতা দেখা যায়, ইহার আনুপূর্বিক বর্ণনার মধ্যেও তাহাই অনুভব করা যায়। কিন্তু চিত্রগুলি পরস্পর অসংলগ্ন হইলেও একটি অখণ্ড সুর ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ; ছড়ার ইহাই বৈশিষ্ট্য। কদম ঝুর ঝুর করা কদম গাছটির নীচে রাধাকৃষ্ণ সর্বদাই নৃত্য করা সত্ত্বেও সহসা কেন যে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; তারপর সহসা বিষ্ণুপুর হইতে হাতের পাচনিটি খোয়াইয়া কেন যে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তাহাও দুর্বোধ্য। কিন্তু তাঁহার 'নবীন কুশের অঙ্কুর ফুটিল চরণে, এই সংবাদটি গোপ-গোপিনীর হৃদয় ব্যথিত করিয়া তুলিল। তারপর কৃষ্ণ-বিরহে কিছুমাত্র কাতরা না হইয়া শ্রীরাধিকা যে তেলের বাটি হাতে করিয়া এবং কদম্বের ফুল কানে গুঁজিয়া কালীদহের কূলে স্নান করিতে গেলেন, তাহাতেও শ্রীরাধিকার পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্ঠা প্রকাশ পাইল না। কিন্তু নিজের কেশগুচ্ছ খুলিয়া দিবা মাত্র যে তাহাতে কৃষ্ণ রূপ দেখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তনু ক্ষীণ করিলেন, তাহার কল্পনাটি মনোরম হইয়া উঠিল।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি বাৎসল্যরস বর্ণনার একটি আদর্শ রচনা। সাধারণতঃ বৈষ্ণব ভিখারীগণ এই শ্রেণীর ছড়া বলিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে—

১২

এক ঝুড়ি মাথে বসে পথে লয়ে একখান্ ডেলে,
'ফল নাওসে ফল নাওসে যত গোপের ছেলে,
বাবা সকল আয়রে তোরা'—বলে বুড়ী ডাকছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে 'ওরে সুবল, বুড়ী ডাকছে ক্যানে?'
'বুড়ী তুই ডাকিস কেন করিস কলরব।
তোর বাণী শুনে আমরা ধেয়ে আসছি সব!'
'ডাকি কেন শোন গোপের বেটা,
আম কাঁটাল পেয়ারা জাম ফল এনেছি গোটা,
কিছু মিছু ধর শিশু মুখে দাও মুখের হোক তার,
ঘর্‌কে গিয়ে মাকে বলে নিয়ে এস গে ধান!'
শুনে বুড়ীর কথা যান হরি যান যদুপতি,
ঘরকে গিয়ে মা বলিয়ে ধরেন যশোমতী।
'সঙ্গে চল মা বাজার পথে কিনে দাও গে ফল,
দিবা কিনা দিবা রাণী সত্যি করে বল।
তোর ভাঙব হাঁড়ি-ভাঙ্‌ব কুঁড়ি ভাঙ্‌ব দুধের হোলা।
ঘর সর্বস্বি ভেঙে দেব তখন পাবি জ্বালা।'
'একি জ্বালা'—বলেন গোপের ঝি।
'হাঁরে লোকের ছেলে কত খাচ্চে তোরাই বা না খাচ্চিস কি?
এমন কথা বল্লে হেথা আমায় দিয়ে দোষ,
পাকা পাকা ফল আনিবে ঘরকে আসুক ঘোষ।
আসুক নন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র, ফল আনিবে পাড়ি,
কিসের জন্য মিছের ঘরে মজাইবে কড়ি।
ঘরে বসে ননী খাও ওরে চাঁদের কোণা!
আমি কুম্ভ কাঁখে যমুনাতে জল আনিগে সোনা!'
নন্দ গেল বাথানে—যশোদা গেল জলে,
খালি ঘর পেয়ে কৃষ্ণ ননী চুরি করে।

ভাণ্ড ভাঙে ননী খায় উদুখলে পা,
যশোদারে দেখে কৃষ্ণের মুখে নাহি রা।
'হারে গোপাল, হারে গোপাল, ননী খেল কে।'
'আমি তো খাইনি, মা, বলাই খেয়েছে।'
রাণী দেখেন চাঁদমুখে ননী লেগে রয়েছে।
'বলাই যদি খেত ননী ডালায় রাখত কড়ি,
সাত পুরুষের ভাণ্ড আমার যাচ্ছে গড়াগড়ি।'
আগে আগে পালান কৃষ্ণ যশোমতী পাছে,
লাফ দিয়ে ওঠেন কৃষ্ণ কদম্বের গাছে।
ডালে ডালে বেড়ান কৃষ্ণ পাতায় দিয়ে পা,
তা দেখে যশোদা কপালে মারে ঘা!
'গাছে হতে নাম, গোপাল, পেড়ে দেব ফুল,
ওখান হতে পড় যদি মজাবে গোকুল।"
'তবে আমি নামি, মা, এই সত্য কর,
নন্দ ঘোষ তোমার বাবা যদি আমায় মার।'—নদীয়া

চিরন্তন শিশু-প্রকৃতি অনুযায়ী দেখা যায়, কৃষ্ণ স্বয়ং ননী চুরি করিয়া খাইয়াও বলরামের উপর মিথ্যা করিয়া তাহার দোষারোপ করিতেছেন। মৈমনসিং হইতে সংগৃহীত আরও একটি ছড়ায় পাওয়া যায়,—

'আমি ত না খাইছি গো ননী
খাইছে বলাই দাদা,
বলাই দাদা খাইছে ননী
ভাণ্ড করছে হুদা।'

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে সুপরিচিত পল্লী গীতিকার সুর শোনা যায়—

১৩

এক বাটিতে অগুরু চন্নন, আর এক বাটিতে তৈল,
ছান করিতে গেলেন রাধে মাথায় মাইখ্যা খৈল।
ছান করিয়া আইস্যা রাধে মেইলা দিলেন চুল,
পিছন হইতে কিষ্টঠাকুর মেইলা মারলেন ফুল।

"অমন ক্যানে কর কিষ্ট, অমন ক্যানে কর ?
যমুনার জলে গিয়া তুমি ডুইব্যা মর।"
"কোথায় পাইমু হাড়ি কলসী, কোথায় পাইমু দড়ি ?
রাধে, তুমি হও যমুনার জল, আমি ডুইব্যা মরি।"—ঢাকা

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মহুয়া পালার সুপরিচিত এই পদ কয়টির প্রভাব ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে—

'লাজ নাইরে নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর,
গলায় বান্ধিয়া কলস জলে ডুব্যা মর।'
'কোথায় পাইবাম কলসী গো কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি,
তুমি হও গহীন গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি।'

সুতরাং রাধা-কৃষ্ণের নামের অন্তরালে যে ইহাতেও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই অনুভূত হয়।

কৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়া রাখাল বালকেরা বাড়ী বাড়ী মাগন মাগিয়া বেড়ায়—

১৪

শ্যাম কই শ্যাম কই,
আমরা আছি ছোল পোল,
জাড়ে কসমা পাই ;
মাঙ্গন গ্যাও বাড়ীত যাই,
খ্যাতা গ্যাও উড়্যা যাই,
ঘোড়া গ্যাও চড়্যা যাই।—বগুড়া

কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে কখনও কখনও রাধার নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

১৫

উপারেতে বোগলা গো চরে খায় কুসুমের ফুল,
জগৎরাণী সিয়ান গো করে পাঁজা পাজা চুল।
চুলগাছি তার আলো ঝালো পিঠে কেনে ধুলা।
গোহাল ঘরে গোবর লিপে বলদে মারে হুঁড়া।
হুঁড়া নাইরে হুঁড়ি নাইরে তব্লা বাঁশের আগা।
সে আগার বাঁশী ভাইরে বলে রাধা রাধা।—ঢাকা

১৬

ঠাকুর বাড়ীর ফুল গাছটি সদাই ঝুর ঝুর করে,
তারি তলে কিষ্ট রাধিকা সদাই নৃত্য করে॥
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে আর কাঁদে লতা।
কিষ্ট আমার একা ; কিষ্ট আমার বাঁকা,
কিষ্টর চিতখানি যে আকুল ব্যাকুল, লোকে বলে ক্ষ্যাপা॥—ঢাকা

ইহা পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়ারই পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপ মাত্র।

কখনও কখনও যেদিন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম কোলে পাইয়াছিলেন, সেদিনের কথা তিনি স্মরণ করেন—

১৭

নন্দের দুয়ারে
আজ কি আনন্দ হইছে।
যশোমতী ভাগ্যবতী
গোপাল কোলে পাইছে রে পাইছে॥—ঢাকা

সুদূর চট্টগ্রাম পর্যন্ত গিয়াও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দ পৌঁছিয়াছে—

১৮

কে বলেরে আমার গোপাল ন্যাড়া
বাঁশনী বাঁশের ঝাড় কেটে
গড়িয়ে দেবো আড়া।—চট্টগ্রাম

১৯

সোনার চুলইন রূপার চুলইন
বোরগ বেতের বান্ধ্।
সে চুলইনে চুলিব যে
পূর্ণ মাসীর চান॥—চট্টগ্রাম

২০

আমার কালা নয়রে—
কালিয়া ধরে নানা বেশ,
আর, গোরা যদি হইতো কালা ন রাখিতো দেশ।

আমার কালাচাঁদে মালা বাঁধে,
ঢালা মিহাৎ দিয়া,
অপূর্ব স্নুন্দরী বৌ পাইলে কালারে
করাইম বিয়া।—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে বাল-গোপালের পরিচয়টি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

২১

হাম্‌গুড়ি আইয়ে হামগুড়ি যায়,
কালা তুলসীর তলে।
বিজলী ছটকে শ্রীহরি দেখিলুম
কন্ তপস্যার ফলে॥—চট্টগ্রাম

২২

খোকা কোঁড়ে খোকা কোঁড়ে
শামলা পাতার তলে,
শামলা পাতা উল্টাই চাইলে
বিজলী ছডক মারে॥
বিজলী ছড়কে দেখিলাম মুখ
অতি তপস্যার ফলে,
অতি তপস্যার নন্দদুলাল
কনে কইত পারে॥—চট্টগ্রাম

২৩

কনাইর মাথাত্ লাল পাগড়ী,
পাকাইয়াছে ছিক্কা দড়ী।
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ,
কানাই এ গণে কড়ি॥
কানাই, ন যাইও গোপাল পাড়া।
ভাঙিব তোমার হাতের বাঁশী,
ছিঁড়িব তোমার গলার মালা॥—চট্টগ্রাম

বিবিধ

কতকগুলি ছেলেভুলানো ছড়াকে সুস্পষ্টভাবে পূর্বোল্লেখিত কোনও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না। ইহারা এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মত। ইহাদের কিছু নিদর্শন উল্লেখ না করিলে এই বিষয়ক আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের সম্পর্কেও এ কথা বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্বোদ্ধৃত ছড়াগুলির ভাব এবং আঙ্গিকের ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহারাও রচিত হইয়াছে। যেমন, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির পূর্বোদ্ধৃত 'ধন ধন ধন' বিষয়ক ছড়ার সঙ্গে ভাবগত সম্পর্ক রহিয়াছে—

১

খোকা আমাদের লক্ষ্মী,
গলায় দেব তক্তি।
কাঁকালে দেব হেলে,
পাক দিয়ে দিয়ে নিয়ে বেড়াব
আমাদের ছেলে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ইহার একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—

২

খোকা আমাদের লক্ষ্মী,
গলায় দেব তক্তি।
কাঁকালে দেব হেলে;
হিল্লা দিয়ে বেড়াব যেন
বড় মানুষের ছেলে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

পূর্বে যে কাঁদুনে মাসি কিংবা শিশুর অনিষ্ট-চিন্তাকারিণী প্রতিবেশিনীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির তাহাদের সঙ্গে একটি সুদূর সম্পর্ক রহিয়াছে—

৩

ষষ্ঠী বাছা পানের গোছা, তুলে নাড়া রে।
যে আবাগী দেখতে নারে, পাড়া ছেড়ে যা রে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্র-সংগ্রহ হইতে গৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির অর্থটি খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না—

৪

কাজল বলে আজল আমি রাঙামুখে যাই,
কালো মুখে গেলে আমার হতমান হয়।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

অথচ পূর্বে বলিয়াছি, ছেলেভুলানো ছড়া পরিণত মনের রচনা বলিয়া ইহাদের অর্থ কোন সময় অস্পষ্ট থাকিবার কথা নহে এবং থাকেও না। তবে কোন কোন সময় স্থানীয় বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে তাহার অর্থ অনুভব করা কালক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অথচ এই ছড়াটি বর্ধমান জিলার একটি স্বতন্ত্র সংগ্রহেও ধৃত হইয়াছে, যেমন—

কাজল বলে উজল আমি গৌরমুখ থেকে।
হতমান হবে আমার গেলে কাল মুখে॥---বর্ধমান

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়া যে একটি ব্যবহার-বুদ্ধি বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহাই ইহার সহজ রস-স্ফূর্তির অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে—

৬

অব তব গিরিসুতা,
মা বলেন পড় পুতা।
পড়লে শুনলে দুধুভাতি,
না পড়লে ঠেঙ্গা লাঠি।
পড়াশুনা করে যে,
গাড়ী ঘড়া চড়ে সে।—২৪ পরগণা

ছড়াটিতে গিরিসুতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার পরের পদেও 'পুতা' কথাটি আছে ; ইহা দ্বারা কি এ'কথা মনে করিতে পারা যাইবে যে, কন্যা সন্তানকে এখানে লেখাপড়া করিয়া ঠেঙ্গার গুতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার কথা বলা হইতেছে ? বলাই বাহুল্য যে, ছড়াটি উচ্চতর শিক্ষার প্রভাবজাত সমাজের সৃষ্টি, সাধারণ নিরক্ষর সমাজের সৃষ্টি নহে। এইপ্রকার আরও আছে—

৭

লেখাপড়া যেমন তেমন,
জামাজোড়া কেমন।
শিমুলে ফুটেছে ফুল লাল পারা কেমন ॥—বাঁকুড়া

লোক-সাহিত্যে ব্রাহ্মণের স্থান সর্বদাই অত্যন্ত নীচে। লোক-কথায় ব্রাহ্মণ সর্বত্রই লোভী ও ভিক্ষুক, ছড়ার মধ্যেও তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ইহার সুগভীর ঐতিহাসিক কারণ আছে। বৌদ্ধযুগ হইতেই জাতক ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থে বৌদ্ধগণ হিন্দু সমাজের কর্ণধার ব্রাহ্মণ এবং দেবদেবীগণকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। ইন্দ্রের ব্যভিচারের কাহিনী বৌদ্ধদিগেরই কল্পনার ফল বলিয়া অনেকেই মনে করেন। সেই সংস্কারের একটি ধারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের জন-মানসের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। বিশেষতঃ লোক-সাহিত্য সমাজের ব্রাহ্মণ-প্রভাব-বহির্ভূত অংশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল; সেইজন্য ব্রাহ্মণ যে তাহাতে কেবল অবহেলিত হইয়াছে, তাহা নহে—অপমানিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার একটি নিদর্শন; কিন্তু এই প্রকার নিদর্শন বাংলা ছড়ায় খুব বেশি নাই—

৮

রাঙ্গা নটে চাপর চটি,
গুড় দিয়ে দিয়ে খালাম নটে.
আয়রে কানাই দাস!
এক কাটা পুঁইয়ের ডাঁটা
ধর্তো বামনের কাণ।—হুগলি

৯

বাঁওন বাঁওন বিলাইয়া,
হাড় ভাঙ্গিল কিলাইয়া।
হাড়র তলে ছকুড়ি বেঙ্‌,
বাঁওনে ছুঁইল গরুর ঠেং।
গরুএ মারল্য লেজর বাড়ি,
বাঁওনা ধাইল চীৎকার ছাড়ি।

এখানেও গুড় দিয়া নটে শাক খাইবার কিংবা পুঁইয়ের ডাঁটার সঙ্গে ব্রাহ্মণের কর্ণ আকর্ষণ করিবার কোন সম্পর্ক নাই ; কিন্তু তথাপি সমগ্র সমাজ-মানসের অবচেতন লোক হইতে যেন অশ্রদ্ধার এই উক্তিটি বহুদিনের সংস্কার আশ্রয় করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

১০

এক ঠগ্ দুই ঠগ্ তিন ঠগের মেলা,
ঠগের গুরু অমুক মোড়ল অমুক তার চ্যালা,
ওপারেতে কদম গাছে ঝুরো ঝুরো ফুল,
অমুক ঠাকুর পূজো করে আগা গোড়াই ভুল।—নদীয়া

এখানেও মূর্খ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্যা-সন্তান সন্তান হইলেও কন্যা ; সেইজন্য একদিক দিয়া যেমন তাহার প্রতি স্নেহও সত্য, আবার আর এক দিক দিয়া তাহার সম্পর্কিত সাধারণের উপেক্ষাও অস্বীকার করা যায় না। সেই ভাবটি নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

১১

আমার বেটি না মাটি,
সোনায় মোড়াব ঝুটি ;
কাজলে মোড়াব চোখ,
যে বলবে বেটী, তার
এমনি বেটী হোক ॥—মুর্শিদাবাদ

ছড়াটিতে একটি বেদনার সুর আসিয়া মিশিয়াছে।

শিশু প্রথম যখন কথা বলিতে শিখে তাহার তখনকার রূপটি জননীর চোখে এইভাবে ধরা পড়ে—

১২

নাটার মত চোখ করে বাটার মত মুখ করে
খোকন আমার কথা বলে।—ঢাকা

চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শিশুর নামকরণের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়—

১৩

অলি অলি অলি রে ছাবনি পাতার ঘর।
ছ মাসর কালে নাম থুইলম যে কমলা লক্ষীন্দর।—চট্টগ্রাম

এইপ্রকার আরও কত শুনিতে পাওয়া যায়—

১৪

কন কন কন ?
চালে তুই গাছ ছন্।
লট্‌কি লেটকি বাতাস করে,
উড়াই নিত মন॥—চট্টগ্রাম

হাল্‌কা বাতাসে মন উড়াইয়া লইয়া যায়, ইহাই পল্লীকবির বক্তব্য বলিয়া এখানে মনে হয়। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির অনুপ্রাস অলঙ্কারটি লক্ষ্য করিবার মত—

১৫

বেল মালতী বলার মা মলা খাবিনি।
দেখ্‌তে মলা লাল্ লাল্ খাতে মলা পোড়ের গাল॥—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির উদ্দেশ্যও খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তবে ইহাতে 'অপূর্ব সন্দেশে'র যে কথা আছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কখনও ভুল হইতে পারে না—

১৬

কালা বসি মলা বাঁধে চাল মিঠা দিয়া।
অপূর্ব সন্দেশ বান্ধে পিতার লাগিয়া॥—চট্টগ্রাম

১৭

ও বোলাএ ন খায় খোলা ইঁচা
ও বোলার গরুএ ন খায় ধান।
ও বোলা তুই পাক্কা মোছলমান॥—চট্টগ্রাম

খোলা চিংড়িমাছ না খাইলে কিংবা নিজের গরুতে পরের ধান না খাইলেই যে 'পাক্কা মোছলমান' হওয়া যায়, এই ছড়া রচয়িত্রীর ইহাই বক্তব্য বলিয়া মনে

হয়। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত ছড়াতেও বাঙ্গালের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইতেছে—

১৮

মণি আইএর্ জাঙ্গালে,
ছাতি ধৈর্‌গে বাঙ্গালে।
ও বাঙ্গাল্যা ও বাঙ্গাল্যা তুমি ধর ছাতি।
ছোট নয় মোট নয় যেন মোহাশর নাতি ॥—চট্টগ্রাম

মণি বলিতে তো চট্টগ্রাম অঞ্চলের ছড়ায় শিশুকেই বুঝায়! তিনি যখন জাঙ্গালে বেড়াইতে যাইবেন, তখন বাঙ্গাল তাহার মাথায় ছাতা ধরিবে। ছাতাটা তুলিয়া ধরিবার জন্য বাঙ্গালকে আদেশ দেওয়া হইল এবং বাঙ্গাল যদি 'মণি'র পদমর্যাদা উপলব্ধি করিতে না পারে—তাহার পক্ষে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারাই স্বাভাবিক—সেইজন্য তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, শিশুটি প্রকৃতপক্ষে ছোট নহে, সে একজন মহাশয়ের নাতি। এখানে বাঙ্গাল বলিতে বুদ্ধিহীন ভৃত্য মনে করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে পারে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটিতে শিশুর রূপ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে—

১৯

হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি।
জাড় গাঁয়ের কালুবায় দিগুড়েতে বাড়ী ॥—বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার জাড়াগ্রামে কালুরায় নামে একজন ধর্মঠাকুর আছেন, তিনি সাদা ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া থাকেন। মনে হয়, উক্ত ধর্মঠাকুরের এই বর্ণনাটি একটি শিশুর উপর এখানে আরোপ করা হইয়াছে।

২০

আমি গেলাম পূবে, পূবে হনুমান্,
তিরি পোকায় বৈঠা মারে পাথরের সমান।—মৈমনসিংহ

কিছু কিছু ছড়ায় আধুনিকতার স্পর্শও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়; কারণ, নাগরিক জীবনের স্পর্শ তাহাদের মধ্যে গোপন নাই—

২১

ছেলে ধরার ভয় হয়েছে খোকন কোথাও যেও না ;
হাত দিয়ে থাবা দেবে বাবা বলতে দেবে না।—২৪ পরগণা

পুরুলিয়া জিলা হইতে সংগৃহীত কয়েকটি ছেলেভুলানো ছড়ায়ও বিচিত্র রসের আস্বাদ পাওয়া যায়—

২২

কত কি হে মজা কসে
দাঁত গাবাব বসে ;
ও বাবারে কালোভূতে
আর যাব না জোছ্‌না রাতে।—পুরুলিয়া

২৩

ছেলের মাকে পিঁড়ায় শুতে মানা,
বুড়া লাকড়াই করে আনাগোনা।
হুলুক বলুক থানা॥—পুরুলিয়া

২৪

'ছেলের মা, ছেলে লুকা
আসছে দুটো হাঁকড়াধরা' ;
'হাঁকড়াধরা লয় গো মোরা
বিষ্টুপুরের পাখ্‌মারা।'
ছেলে ঘুমায়ে গেলিরে—
বিছানা বিছাতে দিলি না॥—পুরুলিয়া

হাঁকড়াধরা শব্দের অর্থ ছেলেধরা, পাখমারা এক শ্রেণীর যাযাবর জাতি, প্রধানতঃ বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়াই তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

২৫

আইরে আইরে যায়,
শিয়াল মাছ খাঁকড়ি খায় ;
বাড়ী না মুখে যাইও শিয়াল
হুক্কা হুয়া গায়।—পুরুলিয়া

চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত এই ছড়াটির মধ্যেও রসের বৈচিত্র্য আছে—

২৬

এক আড়ি বান্ধম্ দুই আড়ি বান্ধম্ ভড়াইর বাপে খায়,
রাত পোহাইলে ভড়াইর বাপ গাছ কাটাত যায়।
গাছ্ নিল চোরে
মোরে মার্ল ভোঁয়রে।
বোড়ে পেলাইম্ বোড়ে লেলাইম্
সিন্দূর গাছের তলে।
সিন্দুর ভায়া দোহাই দিল।
উন্দুরে বোলে ঝাপুর ঝুপুর কুচ্যায় বলে থিয়া,
বাঁদীর পুতে বিয়া করে এক শ টাকা দিয়া।
রাজার পুতে বিয়া করে চোমরী দুলাইয়া॥—চট্টগ্রাম

ছেলেভুলানো ছড়া যে এখানেই শেষ হইল, তাহা নহে; অনেক সময়ে ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গেলেও ইহাদের বিচ্ছিন্ন অংশ অন্যান্য শ্রেণীর ছড়ার মধ্যেও সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। জননীর মুখ হইতে যে ছড়া শিশুরা শৈশবে শুনিতে পায়, তাহার প্রভাব হইতে তাহারা কখনও মুক্ত হইতে পারে না; সেইজন্য পরবর্তী জীবনে যখন তাহারা খেলার ছড়া নিজেরাই রচনা করে, তখনও তাহাদের মধ্যে তাহাদের শৈশব জীবনে শ্রুত ছড়াগুলির বিচ্ছিন্ন অংশ আসিয়া যুক্ত হইয়া যায়। সেই সূত্রেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত খেলার ছড়ার মধ্যেও অংশতঃ অনেক ছেলেভুলানো ছড়ার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তবে স্বাধীনভাবে তাহাদের অস্তিত্ব সেখানে হয়ত আর অনুভব করা যাইবে না। অনেক সময় ছেলেভুলানো ছড়ার অংশ লইয়াই মেয়েলী ব্রতের ছড়াও রচিত হইয়াছে। যথাস্থানে তাহার নিদর্শন আমরা দেখিতে পাইব।

তৃতীয় অধ্যায়

খেলা

'The identity or similarity of children's games through the years and the world testifies to the unity and continuity of culture, in spite of all the vicissitudes and vagaries of time and change and corrupting oral tradition.' পৃথিবী ব্যাপী শিশুর খেলার মধ্যে যে প্রকৃতিগত ঐক্য দেখা যায়, তাহার ফলেই খেলার সঙ্গে সংযুক্ত যে সকল ছড়া আছে (game song), তাহাদের মধ্যেও ভাব এবং চিত্রগত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ঘুমপাড়ানি কিংবা সাধারণ ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে শিশুধাত্রীর ছড়া আবৃত্তি করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রকার অঙ্গসঞ্চালন বা নাট্যিক ক্রিয়া (action) সম্পাদন করিতে হয় না। কিন্তু খেলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত যে সকল ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে এক একটি ক্রিয়া বা action সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য singing game বা ছড়া সংযুক্ত ক্রীড়া এবং game song বা ক্রীড়া-গীতিকে লোক-নাট্যের (Folk drama) আদি উৎস বলিয়া মনে করা হয়। অভিনয়ের মধ্যে যেমন দৈহিক ক্রিয়া (physical action) এবং মৌখিক সংলাপ উভয়েই এক সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ছড়া-যুক্ত খেলাতেও তাহাই করিতে হয় ; সুতরাং ইহার মধ্যেই যে নাটকের আদি রূপ প্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ক্রীড়া-গীতিতে (এখানে গীতি অর্থে ছড়াই বুঝিতে হইবে ; কারণ, ইংরেজি game song-এর অনুবাদ রূপে ক্রীড়া-ছড়া কথা ব্যবহার করা সঙ্গত হয় না) দৈহিক ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করে বলিয়াই ইহার গীতি বা ছড়ার অংশ অনেক সময় গৌণ হইয়া যায় ; এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট যেমন কোন অর্থও প্রকাশ পায় না, তেমনই চিত্রগত সঙ্গতিও রক্ষা পায় না। সুতরাং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত ছড়াগুলির রস এবং সৌন্দর্য অনেক সময় ইহাদের মধ্যে অনুভূত হইবে না। ইহারা তাল-প্রধান রচনা এবং তালকেই একান্ত ভাবে নির্ভর

করিয়া ইহারা বিভিন্ন সঙ্গত ও অসঙ্গত, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ চিত্রের সমাবেশে রচিত হইয়া থাকে। তাল মাত্র ইহাদের লক্ষ্য থাকে বলিয়া ইহাদের বহির্মুখী বস্তু-অবলম্বন নিতান্ত শিথিল, ইচ্ছামত নূতন নূতন বিষয় ও চিত্র অতি সহজেই ইহারা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ফলে ইহারা অতি সহজেই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ঘুমপাড়ানি কিংবা অন্যান্য ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন ইহাদের সুনিবিড় ভাব এবং চিত্ররসের গুণে সারা বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া অতি সহজেই প্রচার লাভ করিয়াছে, ইহারা সে ভাবে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। যদিও ঘুমপাড়ানি কিংবা অন্যান্য ছেলে ভুলানো ছড়া বাংলার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্তের চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন খেলার ছড়া নাই, চট্টগ্রামেও যাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, কোন খেলার ছড়ারই স্বাধীন কোন পরিচয় নাই; ইহা সর্বদাই বিশেষ এক একটি খেলার সঙ্গেই যুক্ত। সুতরাং বিশেষ খেলাটি যদি প্রচার লাভ করে, তবেই তাহার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছড়াটি প্রচার লাভ করিতে পারে; নতুবা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে তাহা কদাচ অন্যত্র প্রচার লাভ করিতে পারে না। অথচ প্রায় একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের রূপ অতি সহজেই নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, খেলার ছড়াগুলি শিশুমানসের নিজস্ব সৃষ্টি। সুতরাং পরিণত-বুদ্ধি জননী বা ধাত্রীর সৃষ্টি ঘুমপাড়ানি এবং অন্যান্য ছেলে ভুলানো ছড়ার মত সাহিত্যগুণ ইহাদের নাই। তথাপি শিশুমনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস ইহাদের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায় বলিয়াও ইহারা নানা দিক দিয়া অনুশীলনযোগ্য।

কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের সঙ্গে সংযুক্ত খেলাগুলি লুপ্ত হইয়া যাওয়ার ফলে ইহারা অংশতঃ রক্ষা পাইয়াছে, পূর্ণতঃ রক্ষা পাইতে পারে নাই। নাগরিক জীবনে শিশু নূতন নূতন পাশ্চাত্ত্য ধরণের খেলার সন্ধান পাইতেছে, ফলে নিজেদের ঐতিহ্য হইতে তাহারা দ্রুত বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং দেশীয় খেলা এবং তাহাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছড়াগুলিও দ্রুত বিকৃত হইতেছে।

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম

খেলার ছড়ার বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' ছড়াটির কথা উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই অঞ্চল হইতে ইহার চরিটি বিভিন্ন পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর ছড়ার বৈশিষ্ট্য বিশদ্‌ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

১

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
লাল মিরগেল ঘাঘর্‌ বাজে॥
বাজতে বাজতে এল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির বিয়েটা।
সূর্যিমামার টিয়েটা॥
হাড় মুড় মুড় কেলে জিরে।
কুসুম কুসুম পানের বিঁড়ে॥
রাই রাই রাই রাবণ॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল।
এক গাচি করে মেয়ে খাঁড়া।
এক গাচি করে পুরুষ খাঁড়া॥
জামাই বেটা ভাত খাবি তো এখানে এসে বস্‌।
খা গণ্ডা গণ্ডা কাঁঠালের কোষ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

২

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥

কমলাপুলির টিয়েটা।
সুর্যিমামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই॥
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্॥
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ. মাথায় কাপড় দে॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৩

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাঁই মিরগেল ঘাঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে প'ল ঠুলি।
ঠুলি গেল কমলাপুলি॥
আয়রে কমলা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই॥
কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল্॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদম তলায় কে রে।
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে রে॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৪

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ডান মেকড়া ঘাঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে পড়ল টুরি।
টুরি গেল কমলাপুরি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্ধৃত এই ছড়ার চারিটি বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—'উপরি উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ কোন্‌টি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং মূল পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না। ইহাদের পরিবর্তন-গুলিও কৌতুকাবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য। "আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে"—এই ছত্রটির কোনো পরিষ্কার অর্থ আছে কিনা জানি না, অথবা যদি ইহা অন্য কোনো ছত্রের অপভ্রংশ হয়, তবে সে ছত্রটি কী ছিল, তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র বিবাহ যাত্রার বর্ণনা। দ্বিতীয় ছত্রে যে বাজনা কয়েকটির উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠে কতই বিকৃত হইয়াছে।"

প্রথমতঃ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছত্রটির পরিষ্কার অর্থটি বুঝিতে না পারিলেও ইহা যে বিবাহ-যাত্রার বর্ণনা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও পল্লীজীবনের অভিজাত পরিবারের বিবাহের শোভা যাত্রা যুদ্ধ যাত্রারই একটি অধঃপতিত (degenerated) রূপ মাত্র ছিল। কারণ, যখন সমাজে বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার প্রথা (marriage by abduction) প্রচলিত ছিল, তখন যুদ্ধযাত্রা এবং বিবাহ-যাত্রায় কোনও পার্থক্য ছিল না। সেইজন্য ছড়াটির প্রথম অংশে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যুদ্ধযাত্রা বর্ণনারই একটি আধুনিক পরিচয় মাত্র। মূলতঃ ইহা যে একটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা ছিল, ইহার প্রথম পদটি অনুসরণ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যেমন আগ্‌ডুম অর্থ অগ্রবর্তী (advance guard) ডোম সৈন্যদল, বাগ্‌ডুম অর্থাৎ বাগ বা পার্শ্বরক্ষী ডোম সৈন্যদল এবং ঘোড়াডুম অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল। একদিন ডোম সৈন্যই বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিত। বিষ্ণুপুর রাজনগর প্রভৃতি স্থানের সামন্তরাজগণ ডোম সৈন্যদল রক্ষা করিতেন। মধ্যযুগের বাংলার লৌকিক সাহিত্য তাহাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সে কথা অন্যত্রও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমান কালে ডোম সৈন্যদলের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা (social function) আর কিছু নাই, সেইজন্য সমাজের স্মৃতি হইতে তাহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই ছড়ার অর্থটি আজ স্পষ্ট

বুঝিতে পারা যাইতেছে না বলিয়াই ইহার অর্থবাচক শব্দগুলি নানারূপে পরিবর্তিত হইতেছে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, 'উপরি উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ' যে কোন্‌টি, তাহা 'নির্ণয় করা অসম্ভব,'—এ'কথাও সত্য। এই শ্রেণীর ছড়াগুলি সুস্পষ্ট কোন ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হয় না বলিয়াই প্রায় রচিত হইবার সময় হইতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং এই পরিবর্তনের ধারা কোথায় কি ভাবে গিয়া যে সমাপ্তি লাভ করে, তাহা অনুমানও করা যায় না; অর্থাৎ কোনও সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া তাহা পরিবর্তিত হয় না। স্বাধীন বাংলার ডোম সৈন্যদলের আমল হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে কি ভাবে এই ছড়াটি ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে হইতে আসিয়াছে, নিম্নের উদাহরণগুলি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু উদাহরণগুলি উল্লেখ করিবার পূর্বে এই ছড়াটির সঙ্গে সম্পৃক্ত খেলাটির একটি বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক; তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত কোন্‌ ছড়াটি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং কোন্‌ ছড়াটিই বা অংশত সংগ্রহ করা হইয়াছে।

কোন বাদলার দিনের অপরাহ্ণে যখন বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারে না, তখন ঘরের মধ্যেই বিস্তৃত মেঝে কিংবা দালানে তাহারা চক্রাকার হইয়া বসিয়া এই খেলা সুরু করে। সকলে আসন পীঁড়ি করিয়া গোল হইয়া বসিলে একজন সর্দার খেলুড়ে ছড়াটির এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া এক একজনের হাঁটু একটির পর একটি স্পর্শ করিয়া যায়; এই ভাবে নিজের হাঁটু দুইটিও স্পর্শ করে। ছড়া আবৃত্তি প্রসঙ্গে যখন ছড়ার শেষ শব্দটিতে আসিয়া পৌঁছিয়া একজনের হাঁটু স্পর্শ করিয়া শেষ শব্দটি সে উচ্চারণ করে, তখন যাহার হাঁটু স্পর্শ করা হইল, সে নিজের হাঁটুটি গুটাইয়া রাখে—পুনরাবৃত্তির সময় তাহা আর স্পর্শ করা হয় না। এই ভাবে ছড়া বলিতে বলিতে যখন সকল খেলুড়েরই দুইটি হাঁটুই সর্দার খেলুড়ে কর্তৃক স্পর্শ করা হয়, তখনই খেলা একবার সাঙ্গ হয়, পুনরায় একই প্রণালীতে তাহার সূত্রপাত হইতে কোন বাধা নাই। এইভাবে হাস্যোচ্ছ্বাস ও আনন্দ-কলরবের মধ্য দিয়া অবসর সময় দ্রুত কাটিয়া যায়।

এই ছড়ার শেষ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট শব্দ ; এই শব্দটি শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া থাকে ; কারণ, কাহার হাঁটুতে গিয়া যে শেষ শব্দটি পড়ে, তাহাই ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় ; তাহা হইলেই তাহার হাঁটুটি মোড়া হইবে এবং দুইটি হাঁটুই এইভাবে তাহার প্রথম মোড়া হইলে সেই জয় লাভ করিবে। সর্বশেষে যাহার হাঁটুতে আসিয়া শব্দটি পড়িবে সেই পরাজিত হইবে। শেষ শব্দটি এইভাবে খেলার ফল নিরূপক বলিয়াই ইহার সম্পর্কিত একটি গুরুত্ববোধ জন্মিয়া যায়। এই ছড়ার শেষ শব্দটি সাধারণত ফুল, ইহার পূর্ববর্তী শব্দটি টগর ; টগর এবং ফুল ইহাদিগকে দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ ধরা হয়। ফুল শব্দটি উচ্চারিত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এখন একজনের হাঁটু মুড়িতে হইবে। সুতরাং যে ছড়াটি ফুল শব্দটি পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই, তাহা যে অসম্পূর্ণ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে এই ছড়া মাত্র একটি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যগুলি অসম্পূর্ণ ভাবেই সংগৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য সংগ্রহেরও অনেকের মধ্যেই এই ত্রুটি দেখা যায়। আরও কয়েকটি সংগ্রহ দেখা যাক—

৫

আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজাতে বাজাতে চললো ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা,
সুয্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই,
পানের খিলি কিনে খাই।
পানটি হলো ভোমরা,
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
হলুদ বনে কলুদ ফুল,
মামার নামে টগর ফুল।—২৪ পরগণা

হুগলি হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিও সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়---

৬

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম
ঘোড়াডুম সাজে।
লাল ঘেগর,
খাগর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে
চল্লো ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়ে টা,
সূর্যিমামার বিয়েটা।
হাড় মড় মড় কেলে জিরে,
কুসুম কুসুম পানের বিড়ে।
চল পিয়ারী হাটে যাই,
হাটে যেয়ে কি খাই।
পান কোশাটা কিনে খাই॥
একটি পান ফোঁপরা,
দু সতীনে ঝগড়া।
শান্তের উপর ধেয়ে নাচে,
জল তোলাবার বয়স আছে।
দিনের ভাগে খায় কি,
কেলে গোরুর দুধ,
তেলে কুচ্‌ কুচ্‌ বেগুন ভাজা, কুচ্‌॥—হুগলি

এই ছড়াটি পড়িলে মনে হয়, পূর্বালোচিত ফুল কথাটিই এখানে 'কুচ' হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে অসম্পূর্ণ বলা যাইবে না। 'ফুল' কথাটিই যে পুরাপুরি সর্বত্র চাই, তাহা নহে; কিন্তু যে পারিবেশের মধ্য দিয়া ফুল কথাটি পূর্বোদ্ধৃত কয়েকটি সংগ্রহে প্রকাশ পাইয়াছে, এখানেও সেই পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং ইহাও অসম্পূর্ণ নহে। বরং এই ছড়াটির মধ্যে অন্যান্য কোন

কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই ছড়ার নিম্নোদ্ধৃত পাঠটির মধ্যে কি ভাবে ঘোড়াডুম যে ঘোড়ার ডিম হইয়াছে, তাহা লক্ষণীয়। শব্দের মৌলিক অর্থ যখন লুপ্ত হইয়া যায়, তখন কেবলমাত্র তাহার উচ্চারণটুকু অবলম্বন করিয়া যে-কোন পরিচিত কিংবা অপরিচিত শব্দ ছড়ায় গৃহীত হইতে পারে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়ায় শব্দের সঙ্গে অর্থের কোনও যোগ নাই, কেবলমাত্র স্বরটুকুতেই তাহাতে প্রয়োজন—

৭

আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডিম সাজে।
লাল ঘোঘর ঘোগড়া বাজে॥
বাজতে বাজতে হ'লো ঢুলি।
ঢুলি গেল কানা ফুলি॥—হুগলি

বলা বাহুল্য ছড়াটি অসম্পূর্ণ।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে 'মুটি' শব্দটি পূর্বোদ্ধৃত 'ফুল' কিংবা 'কুচ' শব্দের কাজ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইহাকেও অসম্পূর্ণ বলা যায় না—

৮

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম কাজে।
ডান মিগড়ি ঘুঁগুর বাজে॥
বাজতে বাজতে পড়লো ঠুলি।
ঠুলি গেল মোর কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা।
সুর্য্যি মামার বিয়েটা॥
হাড় মড় মড় কাল জিরে।
রসুন কসুন পানের বিঁড়ে॥
আয় লঙ্গ হাটে যাই।
পান সুপারি কিনে খাই॥

একটি পান কোঁকড়া।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥
পান খাবি না খিলি খাবি।
টোস্কা মেরে চলে যাবি॥
নাচ দুয়োরে ব্যাঙের কুটী।
ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে একটি মুটি॥—বর্ধমান

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ডোম সৈন্য বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীর সমাজ-জীবনে যত প্রত্যক্ষ ছিল, ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে কিংবা পূর্ববঙ্গবাসীর সমাজ-জীবনে তত প্রত্যক্ষ ছিল না; সুতরাং এই ছড়াটির মৌলিক রূপ পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই যথাসম্ভব রক্ষা পাইয়াছে, অন্যত্র অতি সহজেই পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং 'ফুল' শব্দটির প্রাচীনতর রূপ 'মুটি' হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। এমন কি, হুগলি হইতে সংগৃহীত ছড়াটির 'কুচ' পাঠটিও প্রাচীনতার দ্যোতক।

তারপর ছড়াটি যে কি ভাবে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা এখন লক্ষ্য করা যাইবে—

৯

আঙ্গুঠি পাঙ্গুঠি ঝম্মট কলাই।
মেঘডুমাডুম কদমতলায়॥
কদমতলায় মারলেক ঠুলি।
ঠুলি গেল বিষ্ণুপুরী॥
বিষ্ণুপুরী এন্ দেন্।
ফটিক্ রাজা গুয়াসেন॥
কার হাতেরে রাজার কড়ি॥—সাঁওতাল পরগণা

এই ছড়াটিও অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম কথাগুলি ইহার প্রথম পদ হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেও দ্বিতীয় পদে 'মেঘডুমাডুম' শব্দটির মধ্যে তাহার উচ্চারণ অংশত রক্ষা পাইয়াছে। আরও কিছু শব্দও বিচ্ছিন্নভাবে ইহাতে রক্ষা পাইয়াছে।

১০

আগ্‌ডম্‌ বাগ্‌ডম্‌
সাজে কুজে।
খুকু বাঁধে খুকু খাই,
হেন খুকু দুঃখ পায়।
হেন কা ছুটা পানের বাটা,
তুলে আনগা কাপাস কোটা।
ইলির ডুয়ে দিলি ফুল,
শাক শীতল কামরা॥—মুর্শিদাবাদ

১১

অ্যাংট্রল্‌ ব্যাংট্রল্‌ ঘোড়াট্রল্‌ সাজে।
ঢাল মেঘর ঘোঘর বাজে॥
বাজতে বাজতে চললো ডুলি।
ডুলি গেলো সেই কর্ণফুলি॥
কর্ণফুলির টিয়েটা,
স্যর্ষ্যিমামার বিয়েটা।
অ্যাংট্রল ব্যাংট্রল হাটে যায়।
পান্‌ সুপারী কিনে খায়॥
একটি পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে চোপড়া॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
মামার নামে টগর ফুল॥—ঢাকা

ছড়ার সর্বশেষ শব্দরূপে 'ফুল' এখানেও কোনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। খেলার নিয়মটি অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আবৃত্তি কালীন ছড়াটির সমস্ত ঝোঁক শেষ শব্দটির উপর গিয়াই পড়ে, সেইজন্য ছড়ার অন্যান্য অংশ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও শেষ শব্দটি সাধারণতঃ লুপ্ত হয় না।

১২

আপিল্ চাপিল্ ঘণ্টি মালা
লাল ঘণ্টি ফুলের মালা।
ফুল তুলিতে শিঙ্গি কাঁটা।
শিঙ্গি কাঁটার গন্ধে,
খোকা ধরে নন্দে।
খোকার উপর ধোড়া সাপ,
ফাল দ্যা উঠে বৌ-এর বাপ,
বৌ-এর বাপে তামাক খায়,
নাক বরাবর ধোঁয়া যায়,
ধোঁয়া বড় কালা
বৌ-এর বাপের হালা ॥---মৈমনসিংহ

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চট্টগ্রাম পর্যন্ত গিয়া এই ছড়াটির প্রভাব পৌঁছিতে পারে নাই, কোন রূপেই ইহা চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হয় নাই। অথচ এ কথা সত্য, চট্টগ্রামের ছড়ার ব্যাপক অনুসন্ধান হইয়াছে; চট্টগ্রামের মত দূরাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইতে না পারিবার কারণ, সাহিত্যের কোন বিষয়ই কেবলমাত্র ইহার বহিরঙ্গ পরিচয় অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই বহু দূর পর্যন্ত তাহার বিস্তারও হয় না।

কেবলমাত্র তাল যেমন সঙ্গীতকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, ইহাতে সুরের আবশ্যক হয়, ছড়ার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না—ছড়ায়ও কেবলমাত্র তালই ছড়াকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, ইহাতে সুরেরও আবশ্যক হয়। কেবলমাত্র তালই এই শ্রেণীর ছড়ার অবলম্বন বলিয়া শুধু তালটুকু অবলম্বন করিয়া ইহা যে কোন বস্তু, এমন কি যে কোনও ভাষাও, আশ্রয় করিতে পারে। আধুনিক কালে ইহার মধ্যে ইংরাজি শব্দও অবাধে প্রবেশ করিতেছে—

১৩

আইকম বাইকম তাড়াতুড়ি,
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী।
রেন কাম ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম।

জল সাবু তাতি নেবু,
বলে গেছেন ডাক্তারবাবু।
ইষ্টিশানের মিষ্টিকুল,
শখের বাদাম গোলাপ ফুল।
রাম দুই সাড়ে তিন
অমাবস্তে ঘোড়ার ডিম।—বরিশাল

ইংরাজী শব্দগুলি রোমান অক্ষরে লিখিলেই ইহার অর্থটি সহজবোধ্য হইবে—

I come, ভাই come তাড়াতুড়ি,
যদু master শ্বশুর বাড়ী।
Rain come ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম।

অর্থাৎ আমি ও আমার ভাই তাড়াতাড়ি আসিতেছি, যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছেন ; ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া গেল—পা পিছলাইয়া কাদায় একেবারে আলুর দম হইয়া গেলাম।

'আগডুম বাগডুম'ই যে এখানে 'আইকম বাইকম' হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। এইভাবেই ইংরাজি শব্দের অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল।

১৪

আই কাম ভাই কাম তাড়াতুড়ি।
যদুর মাষ্টার শ্বশুরবাড়ী॥
রেল কাম ঝমাঝম।
পা পিছলে আলুর দম॥
জলসাবু পাতিনেবু।
বলে গেছেন ডাক্তারবাবু॥
ইষ্টিশানের মিষ্টি কুল।
সখের বাদাম গোলাপফুল॥—ঢাকা

পূর্বোদ্ধৃত 'আগডুম বাগডুম' ছড়ার শেষ যে শব্দ দুইটি ছিল টগর ফুল, তাহাই এখানে গোলাপ ফুল হইয়াছে, বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও শেষ শব্দ অর্থাৎ 'ফুল'

শব্দটি অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে survival বলে, ইহা তাহাই। তারপর রেন (rain) কি ভাবে উচ্চারণ সামঞ্জস্যের জন্য রেল (rail) হইয়া গিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এইভাবে সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া পরিবর্তনের ধারা ক্রমাগত অব্যাহত হইয়া চলিতে লাগিল—

১৫

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টারের শ্বশুরবাড়ী।
রেলকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।
ইষ্টিশানের মিষ্টিগুড়
সখের বাদাম গোলাপ ফুল ॥—মেদিনীপুর

১৬

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদুর মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী।
রেলগাড়ী ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম
ইষ্টিশনের মিষ্টি কুল
সখের বাদাম গোলাপফুল ॥—২৪ পরগণা

১৭

রেইন কাম ঝম্ ঝমাঝম্
রোডে হ'ল কাদা—
আই মে নট ফল ডাউন
বাট ফল ডাউন মাই দাদা,
আই এম্ গোইঙ্গ টু দি বাবুর বাজার,
প্লোলের ওপর টিপ্
দেখা যায় মাই কাপড়ে কাদা,
গিভ মি এ সার লিভ।—২৪ পরগণা

তারপর 'আইকম বাইকম'ও পরিবর্তিত হইতে লাগিল—

১৮

একেন্টি বাইকম্,
বাইকম্ বাইকম্।
টুলটানা বিবিয়ানা,
নাটুবাবুর বৈঠকখানা।
আজ বলেছে যাব,
পান সুপারি খাব।
পানে আসে মৌরীবাটা,
ইসক্রুপে চারি আঁটা।—যশোর

১৯

উপেনটি বাইস্‌কোপ
নাইন টেন টেইস্‌কোপ।
চুলটানা বিবিয়ানা—
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
মা বলেছেন যেতে—
পানের খিলি খেতে।
পানের মেঠরী বাটা,
ইস্‌প্রিংয়ে চাবি আঁটা।
ছোট ছোট দাদুমণি
যেতে হবে অনেক খানি।
চুল টানা চিরুণী,
হাজার টাকার গাঁথুনী।—নদীয়া

২০

এপেন্তি বাইস্কোপ,
রয় চাঁদ তেইস্কোপ।
চুল কাটা বাবুয়ানা,
ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানা।

কাল বলেছে যেতে
পান স্থপারী খেতে।
পানের ভিতর মৌরী বাটা,
ইস্কাপানের ছবি আঁটা।
ছোট ছোট দাদুমণি
অনেকটা যেতে খানি
কলিকাতা মেদিনীপুর
মেদিনীপুরের চিরুণী
এমন খোঁপা বেঁধে দেব
বেলফুলের গাঁথনী --২৪ পরগণা

২১

ওপেনটি বাইস্কোপ,
টান টুন টেইস্কোপ।
আমপাতা জোড়া জোড়া,
মারবে চাবুক চড়বো ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে,
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।
অলরাইট ভেরি গুড্‌,
পাঁউরুটি বিস্কুট ॥—ঢাকা

২২

টু টুয়েন্‌টি বাইস্কোপ।
ট্যান্‌ টুন্‌ টেইস্কোপ।
চুলটানা বিবিয়ানা।
লাটুবাবুর বৈঠকখানা।
আজ বলেছে যেতে।
পান স্থপুরি খেতে।

পানের মধ্যে মৌরি বাটা।
ইস্কাবনের ছবি আঁটা।
ইষ্টিসনের মিষ্টি গুড়।
সখের বাদাম গোলাপ ফুল।—হুগলি

২৩

অপেনটি বাইস্কোপ,
বাইটেন টাইস্কোপ।
চুলকাটা বিবিয়ানা,
ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানা।
কাল বলেছেন যেতে,
পানের ভিতর মৌরী বাটা,
ইস্কাপনের ছবি আঁকা,
আমার নাম রেণুবালা
গড়িয়ে দেব মুক্তোর মালা।

এই শ্রেণীর ছড়া সকল দেশে এমনই ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী ইহাদের বহিরঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয় মাত্র। মার্কিন দেশের খেলার ছড়া কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন দেশে যখন ক্রীতদাসপ্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল, তখন সে দেশে শ্বেতাঙ্গ শিশুদিগের মধ্যে এ'দেশের 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' শ্রেণীর যে ছড়াটি ব্যাপক প্রচলিত ছিল, তাহা এই—

Eeny meeny. miny mo,
Catch the Nigger by the toe.
If he hollers let him go,
Eeny meeny, miny mo.

তারপর আধুনিক কাল পর্যন্ত ছড়াটি এইভাবে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে—

Eeny, meeny, miny mo,
Catch a Jap by the toe.
If he hollers make him say.
I surrender U. S. A.

Eeny, meeny, miny mo,
Take old Tojo by the toe,
If the hollers make him say :
I surrender U. S. A.

Eeny, meeny Mussolini.
. Hit him on the bumble beany.

মার্কিন সমাজ বাংলার সমাজ অপেক্ষা অধিকতর রাষ্ট্রসচেতন ; সেই সেই সমাজের শিশু-সমাজও অনুরূপ মনোভাব লইয়াই জীবন গঠন আরম্ভ করে। ছড়াগুলির মধ্যে তাহারই ছায়াপাত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, চলচ্চিত্র আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জীবন-চিন্তার একটি প্রধান অবলম্বন। মার্কিন শিশুর মনে তাহারও ব্যাপক প্রভাব দেখা যায় ; এই ছড়াটির পরিবর্তনের সূত্রেই মার্কিন শিশুর এই বিষয়ক চিন্তা প্রকাশ পাইয়াছে—

One, two, three, four,
Charlie Chaplin went to war.
When the war began to fight,
Charlie Chaplin said, 'Good night'.

One, two, three,
Keep the stars a-going.
Garbo, Dietrich, Shearer,
Cooper, Benny, Mix, Muni, etc.

বাংলার শিশুর খেলার ছড়ায় আজিও রাষ্ট্রচিন্তা কিংবা চলচ্চিত্র চিন্তা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই ; সুতরাং এ দেশের শিশু এখনও শিশুই আছে, সমুদ্রপারের শিশুর মত বিজ্ঞ হয় নাই, ইহা জাতির দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যের লক্ষণ, দেশহিতৈষিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ইকড়ি মিকড়ি

ইকড়ি মিকড়ি বা ইচিং বিচিং খেলার প্রকৃতিটি সামান্য একটু স্বতন্ত্র ; সেইজন্য ইহার ছড়াটিও স্বতন্ত্র। ইহাতে 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' খেলার মতই ছেলেমেয়েরা চক্রাকারে আসন করিয়া বসে ; কিন্তু হাঁটুর পরিবর্তে প্রত্যেকেই হাত দুইটি উপুড় করিয়া মাটির উপর রাখে। তারপর একজন সর্দার খেলুড়ে, ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া ইহার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগটি স্পর্শ করিয়া যায়। ইহার শেষ শব্দটি 'মাথা' ; এই 'মাথা' শব্দটি 'মা-থা' এইভাবে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ 'মা' বলিয়া একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করা হয়, 'থা' বলিয়া আর একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করা হয়। যে অঙ্গুলিটির উপর 'থা' উচ্চারণটি পড়ে, তাহা মুড়িয়া রাখিতে হয়। এইভাবে একই হাতের সকলগুলি অঙ্গুলি মোড়া হইয়া গেলে হাতটি স্বভাবতঃই মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যায় এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতটি পিছনে লইয়া রাখিয়া দেওয়া হয় ; তারপর সকল খেলুড়েরই দুইটি হাতই এইভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইলে প্রত্যেকেই মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি সম্মুখে লইয়া আসে ; তখন সর্দার খেলুড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এই হাতে কি আছে ?' নানা উত্তর প্রত্যুত্তরের পর সর্দার খেলুড়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি যখন 'তরোয়াল' দিয়া 'কাটিতে' উদ্যত হয়, তখন উচ্ছ্বসিত কলহাস্যের মধ্যে খেলুড়ে 'ভুয়া' এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া হাতের মুঠি দুইটি খুলিয়া দেয়। সুতরাং খেলার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ইহা 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুমে'র একটি অন্যতম সংস্করণ মাত্র ; সেইজন্য ছড়াটিও একই সুরে বাঁধা।

রবীন্দ্র-সংগ্রহে এই বিষয়ে মাত্র একটি ছড়া ধৃত হইয়াছে—

১

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি,
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো॥
হিঙুল করে কড়মড়।

দাদা দিলে জগন্নাথ ॥
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাওসে দুপুরবেলা।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি ॥
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটির একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। এই ছড়ার যতগুলি পাঠ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সব কয়টির মধ্যেই যে ইহার সকল পদগুলিই আছে, তাহা নহে; কিন্তু যাহাতেই একাদশ চরণের 'ভাত খাওসে' পদটি পাওয়া যাইতেছে, সেখানেই ইহার পরবর্তী শব্দ দুইটি 'জামাই শালা' রূপে উল্লেখ দেখা যায়; কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত পদেই 'জামাই শালা'র পরিবর্তে 'দুপুর বেলা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথ পূর্বালোচিত একটি ছড়ায় যেমন একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া একস্থলে 'স্বামী খাকি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখানেও তাহাই করিয়াছেন। তবে পূর্বে এই বিষয়ে একটি কৈফিয়ৎ দিয়া লইয়াছেন, এই ক্ষেত্রে বিনা কৈফিয়তেই এই কাজ করিয়াছেন; কারণ, মনে হয়, শালা শব্দটিকে তিনি আপত্তিজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। পদটির প্রকৃত পাঠ, রবীন্দ্রনাথ যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'ভাত খাওসে দুপুর বেলা,' তাহা নহে—বরং তাহার পরিবর্তে 'ভাত খাওসে জামাই শালা।' আধুনিক কোন কোন ছড়ার সংগ্রাহক 'জামাই শালা' শব্দটি আপত্তিজনক মনে করিয়া 'জামাই ভায়া' শব্দ দুইটি তাহার পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা আরও আপত্তিজনক। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে এই ছড়ার অন্যান্য পাঠগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, সর্বত্রই 'জামাই শালা' শব্দ দুইটিই ব্যবহৃত হইতেছে, কোথাও রবীন্দ্রনাথের মত 'দুপুর বেলা' কিংবা অন্য কাহারও মত 'জামাই ভায়া' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইতেছে না—

২

ইকির মিকির চাম চিকির,
চামে কাটে মজুমদার !
ধেয়ে এল দামুদার
দামুদারের হাঁড়ি কুঁড়ি,
গইলে বসে চাল কুড়ি।
কুড়তে কুড়তে হলো বেলা,
ভাত খাওসে জামাই শালা।
ভাতে পড়লো মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হোল ভোঁথা,
খাও শিয়ালের মাথা।—২৪ পরগণা

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত ছড়ায় 'দুয়োরে' বসিয়া চাল কাড়িবার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, এখানে তাহাই 'গইলে' বা গোয়ালে বসিয়া 'চাল কুড়ি' হইয়াছে; বলাই বাহুল্য, গৃহদ্বারই হোক কিংবা গোশালাই হোক, কোন স্থানেই চাল কাড়িবারই হোক কিংবা চাল কুড়িবারই (কুটিবার) হোক কাহারও পক্ষে প্রশস্ত নহে। কিন্তু তথাপি এই কথারই পুনরুক্তি হইতেছে—

৩

ইকির মিকির চাম চিকির
চাম কাটা মোচনদার।
ধীরে এস বরের দাদা।
বরের দাদার হাঁড়ি কুঁড়ি
গোয়ালে ব'সে চাল কুড়ি।
চাল কুটতে হ'ল বেলা
ভাত দেনা রে জামাই শালা।
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হ'ল বোঁথা
খেঁক্ শিয়ালের পঁচা মাথা॥----২৪ পরগণা

৪

ইকির মিকির চাম চিকির
চাম কাটতে হ'ল বেলা।
ভাত খানা রে জামাই শালা,
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁছি,
কোদাল হ'ল বোঁথা,
কামার ঘর কোথা।—২৪ পরগণা

এখানে চামড়া কাটিবার যিনি মালিক, তাঁহার পরিচয়টির উল্লেখ না থাকিলেও, তিনি যে মজুমদার ব্যক্তি, তাহা আর সকল ছড়াতেই শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কেন যে তাহার এই দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল, ছড়ায় তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি তাহার এই অনধিকার চর্চার জন্যই তিনি বাংলার ছড়ার মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

৫

ইকির মিকির চাম চিকির
চাম কৌটা মজুন্দার,
ধেয়ে এলো বরের বাপ।
বরের বাপের হাঁড়ি কুঁড়ি
গোয়ালে বসে চাল কুড়ি;
চাল কুড়তে হলো বেলা,
ভাত খাবি আয় জামাই শালা,
ভাতে পড়লো মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হলো ভোঁতা
খা কামারের মাথা।—হুগলি

ছড়াগুলি স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া অনেক বিষয়েই কিছু কিছু পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু জামাইর সঙ্গে যে নূতন সম্পর্কটি এখানে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা সর্বত্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে—

৬

ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড়।
চাম কৌটা মজুমদার।
ধেয়ে এলো দামুদার॥
দামুদারের হাঁড়ি কুঁড়ি।
চার দুয়োরে চাল কাঁড়ি॥
চাল কাঁড়তে হলো বেলা।
ভাত খেসেরে জামাই শালা॥
ভাতে পড়্‌লো মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি॥
কোদাল হলো ভোঁতা।
খা কামারের মাথা॥—বর্ধমান

উদ্ধৃত ছড়াগুলি অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ যে পদটি 'ভাত খাওসে দুপুর বেলা' রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহার প্রকৃত পাঠ 'ভাত খাওসে জামাই শালা।' কারণ, এই পাঠই সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে, 'দুপুর বেলা' পাঠ আর কোন স্থান হইতেই সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই পরিবর্তন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি ছড়ার একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তন করিতে গিয়া এক সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে বিনা কৈফিয়তেই এই কাজটি তিনি সাধন করিয়াছেন; কারণ, শব্দটি তাঁহার নিজের কাছে আপত্তিজনক মনে হইয়াছে। কিন্তু ইহার যে বিভিন্ন পাঠগুলি উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে দেখা গেল, ইহা সমাজের কাছে, এমন কি, শিশুসমাজেও আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; যদি তাহা হইত, তবে অভিভাবকেরাও ইহা আপত্তি করিয়া ছেলেমেয়েদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন। সুতরাং এই শব্দটির দ্বারা কাহারও ব্যক্তিগত রুচি আহত

হইলেও ইহাতে সামগ্রিক ভাবে সামাজিক সমর্থন ছিল। ইহার একটি সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে, তাহা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি।

আত্মীয়তার সম্বোধনসূচক পদ (kinship term) হিসাবে 'শালা' শব্দটি আপত্তিজনক বিবেচিত হইতে পারে না। স্ত্রীর ভ্রাতাকে শালা বলিয়া সম্বোধন করা হয়, ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না। তবে 'শালা' শব্দটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা দাদা, দিদি, মা, মাসি পিসির মত ব্যবহার করা চলে না, অর্থাৎ এই সকল আত্মীয়তার সম্বোধনসূচক শব্দগুলি যেমন আমরা অনাত্মীয়ের উপরও ব্যবহার করিতে পারি, শালা শব্দটি তেমন পারি না। যে আত্মীয়তা সূত্রে শালা নয়, তাহাকে শালা বলিয়া সম্বোধন করিলেই গালি বুঝায়। কিন্তু কোন অনাত্মীয়কে দাদা, দিদি, মা, মাসি বলিয়া সম্বোধন করিলে গালি বুঝায় না। ইহারও একটি সমাজতত্ত্বমূলক নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে (এই বিষয়টি আলোচনার জন্য মৎ সম্পাদিত 'বাইশ কবির মনসা মঙ্গল,' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থের [দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ৩৮৬-৭] টীকায় 'শালা' শব্দ দ্রষ্টব্য)। এখানে জামাইকে কেন শালা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, এখানে 'শালা' পাঠই যথার্থ ; অন্য কোন পাঠই গ্রাহ্য নহে।

জামাইয়ের সঙ্গে পরিবারের যে সম্পর্ক, তাহাতে একটু জটিলতা আছে। শ্যালক কিংবা শ্যালিকাদিগের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক, তাহা বাহির হইতে দেখিলে হাস্য পরিহাস বা ঠাট্টার সম্পর্ক বলিয়াই মনে হইবে, ইংরেজিতে ইহাকেই joking relationship বলে। কিন্তু এই হাসিঠাট্টার সম্পর্কটি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহা দ্বারা তাহার সঙ্গে একটি শত্রুতার (enmity) সম্পর্ক গোপন করা হইতেছে। কারণ, জামাই পরিবারের একটি কন্যার 'অপহারক' বা abductor। বর্তমান ব্যবস্থায় এই 'অপহরণ' বা abduction-এর কার্যটি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিলেও জামাইর এই আচরণের বিরুদ্ধে পরিবারের অন্তর্মুখী আক্রোশ কিছুতেই সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে না ; তাহাই বাহির হইতে হাস্য-পরিহাসের একটি রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। 'জামাই ঠকান' ব্যাপারটি সেই আক্রোশ মিটাইবারই একটি আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্মত উপায়। বাংলা প্রবাদেও আছে, 'জন

জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা।' ইহার মূলেও জামাইর প্রতি প্রচ্ছন্ন শত্রুতা বোধেরই পরিচয় আছে। বাসর ঘরে জামাইর লাঞ্ছনার মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে সমাজের প্রচ্ছন্ন শত্রুতার পরিচয়ই প্রকাশ পায়। কারণ, চিমটি কাটিয়া কিংবা কান মলিয়া রক্তপাত করা কেবল মাত্র কৌতুকের বিষয় নহে, ইহাদের মধ্যে শত্রুবোধে গুরুতর আঘাত করিবার মার্জিত একটি রূপ মাত্র ধরা দেয়। সুতরাং উদ্ধৃত ছড়াটির পাঠ যে জামাই শালা হইবে, ইহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই ; বিশেষতঃ এই কথাটির উপরই ছড়াটির বিশেষ একটি ঝোঁক (force) বিশেষ প্রবল ভাবে গিয়া আঘাত করিতেছে। অতএব এই শব্দটিকে 'দুপুর বেলা' কিংবা 'জামাই ভায়া' রূপে পরিবর্তিত করিলে ইহার মূল শক্তিটিই বিনষ্ট হয়। কারণ, এই শব্দটির ভিতর দিয়াই জামাইর প্রতি প্রচ্ছন্ন আক্রোশের ভাবটি যত সহজে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কোন শব্দ দ্বারা তাহা পাইতে পারে না।

তারপর অন্যদিক হইতেও জামাইকে শালা বলিয়া সম্বোধন করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিচার করিয়া দেখা যায়। যাহার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপিত হইতে কোন সামাজিক বাধা নাই, তাহাকে সেই আত্মীয়তা সূচক শব্দ (kinship term) দ্বারা উল্লেখ করিতেও কোন বাধা নাই। কারণ, ভগ্নীপতির ভগ্নীকে বিবাহ করিতে কোন সামাজিক বাধা নাই, অর্থাৎ জামাই বা ভগ্নীপতিও শালা হইতে পারে (potential wife's brother)। সুতরাং সমাজতন্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ভগ্নীপতিকে শ্যালক সম্বোধন করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। তবে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্কের উপরেও বয়সের একটি বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। ভগ্নীপতি যদি বয়সে প্রবীণ হন, তিনি যদি মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্বামী হন, তবে তাঁহাকে এমন সম্বোধন নিন্দনীয় ; সেখানে সম্মান দেখান হয় বয়সের, আত্মীয়তার নহে। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, ছড়াগুলির মধ্যে যে শব্দগুলি ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া ও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া জন সমাজে প্রচলিত হইয়া আসে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুসি মত পরিবর্তনীয় হইতে পারে না।

ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, এই ছড়ার 'ইকির মিকির' এই প্রারম্ভিক শব্দ দুইটি 'ইচিং বিচিং' শব্দ দুইটিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং অন্যান্য বিষয়ে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইল ; এমন কি, যে 'শালা' কথাটি লইয়া উপরে এই সুদীর্ঘ

আলোচনা হইল, তাহাও ইহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই শ্রেণীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার যে অবক্ষয়ের পরিচয় প্রকাশ পাইল, তাহার ফলেই ইহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া আসিল।

৬

ইচিং বিচিং।
জামাই চিচিং।
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং॥
মাকড়েরা লড়ে চড়ে।
সাত কুম্ড়ার ডিম পাড়ে॥
এলের পাত, বেলের পাত ;
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ॥
জগন্নাথের হাঁড়ি কুঁড়ি।
দুয়ারে বসে' চাল কাঁড়ি॥
চাল কাঁড়িতে হ'ল বেলা।
খল্‌সে মাছের চোকা।
উড়ে বসে পোকা॥
এক পাতা সুশুনি শাগ চালে শুখায়।
নন্দাইকে ভাত দিতে কাঁকাল দুখায়॥
নন্দাই হে নন্দাই ডুমোর পেড়ে দাও।
ডুমোর খায়েঁ পেট ভর্‌ল সাঙ্গা করে দাও॥
হেই নন্দাই হেই নন্দাই মারো্যা না আমলার ছড়ি।
কাটন কাটায়েঁ দিব খাজনার কড়ি॥
বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুর্ ঝুর্ করে।
সদাই বিরালীর বিটি লিণ্ডি লিয়াই করে॥
ফাল লিবি না কোদাল লিবি সত্য করে বল।
নাইত ভাশুর ভাতার ধর॥—সাঁওতাল পরগণা

দেখা যায়, উদ্ধৃত ছড়াটির দুইটি অংশ—প্রথম অংশটিই প্রকৃত 'ইকির মিকির' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, ইহার শেষাংশে স্বতন্ত্র একটি ছড়া আসিয়া ইহার

সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ 'ইকির মিকির' ছড়ার যে প্রকৃতির কথা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে এই ছড়ায় ইহার শেষাংশের কোন স্থান নাই। অতএব মনে হয়, সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে কেবল মাত্র ছড়াটি গিয়াই পৌছিয়াছিল, ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খেলাটি গিয়া পৌছিতে পারে নাই; যদি তাহা হইত, তবে শেষাংশটি ইহাতে আসিয়া যুক্ত হইতে পারিত না। এই ছড়ার শেষাংশ পারিবারিক জীবনাশ্রিত স্বাধীন একটি ছড়া বলিয়াই গণ্য করিবার যোগ্য।

তারপর দেখা যায়, পূব বাংলায় গিয়া ছড়াটি যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই—

৭

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তায় পল্লো মাকড় বিছিং।
মাকড়েরা লড়ে চড়ে,
সাত কুমড়ার ডিম পাড়ে।
এলের পাত্ বেলের পাত্
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়ি কুড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাড়ি।
চাল কাড়তে হলো বেলা—
খলসে মাছের চোকা,
উড়ে বসে পো-কা॥—ঢাকা

কি কারণে যে ঢাকায় সংগৃহীত এই ছড়াটির মধ্যে সাঁওতাল পরগণার প্রভাব দেখা যাইতেছে, অথচ ২৪ পরগণার কোন প্রভাব দেখা যাইতেছে না, তাহা অনুমান করাও এই ক্ষেত্রে কঠিন। অনেক সময় সংগ্রাহকের ত্রুটিতে এই প্রকার দুর্বোধ্য বিষয় প্রকাশ পায়।

এই ছড়াগুলির মধ্যে যে জগন্নাথ নামটি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ জগন্নাথ ধাম বলিয়াই মনে হইতেছে। বাংলার ছড়ায় আর একজন জগন্নাথের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি অশ্বারোহী—

এক ছিয়ালী রান্ধে বাড়ে আর ছিয়ালী খায়।
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ি যায়॥

মনে হয়, পুরীর জগন্নাথ আর বাংলার ছড়ার এই অশ্বারোহী জগন্নাথ একাকার হইয়া গিয়াছেন।

৮

ইচিং বিচিং জামাই ক্ষিচিং
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং।
মাকড়েরা নড়ে চড়ে;
এলের পাত বেলের পাত—
ঠাকুর দিলেন জগন্নাথ।—ঢাকা

বাংলার আর কোন অঞ্চল হইতে এই ছড়াটি আনুপূর্বিক সংগৃহীত হয় নাই এবং ঢাকার সংগ্রহ দুইটিও নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা হইতে মনে হয়, পূর্ব কিংবা উত্তর বাংলায় ছড়াটি অপ্রচলিত ছিল।

কিন্তু পূর্ব বাংলার কোন অঞ্চল হইতেই আনুপূর্বিক উপরি-উদ্ধৃত ছড়াটি আবিষ্কৃত না হইলেও নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে এই ছড়ারই একটি সম্পূর্ণ পদ এবং ইহার সঙ্গে ছন্দ, সুর এবং তালগত যে ঐক্য অনুভব করা যায়, তাহা দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব বাংলায় গিয়া এই খেলার ছড়াটি নিম্নোদ্ধৃত রূপ লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির সঙ্গে যে খেলাটি পূর্ববঙ্গে সংযুক্ত আছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গের খেলাটিরই সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং ছড়াগুলিও যে মূলতঃ একই ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়—

৯

ইছন বিছন দরগা বিছন,
উঠ উঠ বউ গো,
মোমের ছাতি ধর গো;
মোমের ছাতি উভরা,
ফাল দিয়া ধর দু'ঘরা।
এল পাত বেল পাত,
নেও গো তোমার সোনার হাত।—মৈমনসিং

এখানকার 'ইছন বিছন'ই পূর্বোদ্ধৃত 'ইকড়ি মিকড়ি'। এমন কি, পূর্বোদ্ধৃত ছড়ার 'এলের পাত বেলের পাত' পদটি ইহাতেও 'এল পাত বেল পাত' রূপে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং দুইটি ছড়াই যে একই গোত্রসম্ভূত, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। এই প্রকার আরও আছে—

১০

অঙ্কুরে মাড়ি লড়ে বরে,
কুরকুয়া উঠ্যা ঠোকর মারে।
ঠোকর মাইরা গাই দোয়ায়,
গাই দোয়াইয়া দুধ খায়।
গাইয়ের নাম শেওড়া,
বল্‌দের নাম কেওড়া।
এল পাত্ গেল পাত,
তোল তোমার দুই হাত।—ঐ

১১

এছকি মেছকি সাগু দানা,
রবু গেল পাইট পাড়া।
পাইর আদি বাড়া ভানে,
শির গো আদি তেল তোল।
ডেইলের উপরে ভাঙ্গে বোরা,
চাল্‌তা আন্‌নিও না।
মা গো মা তোর মামা গেছে কামাইত,
ছত্রী ধইর‍্যা নামাইত।
ছত্রীর মধ্যে কাউয়ার ঠেং,
লাফ দিয়া উঠ্‌ল ঘাউয়া বেঙ।
ফকীরা দোয়ায় তিন বারাতে
মাইছ রাঙায় মাছ মারে।
ঢোরা সাপে লেজ লাড়ে,
এল ভাই দেল ভাই,
রাজায় কইছে হাত ছুরত বাট।—ত্রিপুরা।

'এলের পাত বেলের পাত' এখানে শেষ পর্যন্ত 'এল ভাই দেল ভাই' হইয়াছে।

হা-ডু-ডু

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ [illegible] অনুমান করেন যে, [illegible] পৃথিবীর [illegible] প্রচলিত খেলা মাত্রই আদিম সমাজের গোষ্ঠীসংগ্রামের অবশেষ (remnant) মাত্র। ইহাদের মধ্যে আত্মরক্ষা (defence) এবং আক্রমণের (attack) যে সকল পদ্ধতি দেখা যায়, তাহা যুদ্ধনীতি-সম্মত। বাংলার হা-ডু-ডু খেলাও তাহাই। সেইজন্য বাংলার কিশোর ও যুবকদিগের ইহাই একমাত্র খেলা, যাহার মধ্য দিয়া এখনও একটু পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মেয়েরা আদৌ অংশ গ্রহণ করে না; সেই জন্য ইহার মধ্যে কিংবা ইহাতে যে সকল ছড়া ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে মেয়েলি ঘরকন্না এবং সংসার জীবন সম্পর্কে কোন উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, কেবলমাত্র ততক্ষণ ধরিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে হয়, সুতরাং ইহারা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা প্রাণরসে সঞ্জীবিত। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে এই শ্রেণীর ছড়া একটিও নাই, অথচ একমাত্র ইহাদের মধ্য দিয়াই বাংলা ছড়ায় যে পৌরুষের ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিলে বাংলা ছড়ার বৈচিত্র্য সম্পর্কেও কোন ধারণা সৃষ্টি করা যায় না। ছড়া যে কেবলমাত্র মেয়েলি রচনা মাত্রই নহে, একমাত্র ইহারাই তাহার প্রমাণ; তবে ইহারা যে বহুলাংশে কবিত্বগুণ বর্জিত, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কয়েকটি এই শ্রেণীর ছড়া এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

১

এক হাত বোল্‌তা তিন হাত শিং।
উড়ে যায় বোল্‌তা ধা তিং তিং ॥—২৪ পরগণা

বহির্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (outdoor) ছড়ামাত্রই কবিত্বগুণ বর্জিত, তবে এক দিক দিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আবৃত্তি করিবার দায়িত্ব, অপর দিকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন, এই সকল কারণে ইহাদের মধ্যে কখনও ভাবরস নিবিড়তা লাভ করিতে পারে না।

দলের একটি খেলুড়ের যখন 'মর' হইয়া গেল, অর্থাৎ সে যখন 'মরিয়া' গেল, তখন বিজিত পক্ষ এই ছড়া বলিয়া পুনরাক্রমণ করিয়া থাকে—

২

আমার খেড়ু মারিয়ে,
কোথা যাস্ পালিয়ে।
শেয়াল শকুনে খায়,
গন্ধে গন্ধে পরাণ যায়॥ -২৪ পরগণা

নিজের বীরত্বের অর্থহীন আস্ফালনই এই সকল ছড়ায় সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়।

৩

চি চাট্কা আমের বোল,
গাছে উঠি মারি শোল।
শোলের কপালে ফোঁটা,
খেড়ু মারি গোটা গোটা॥—ঢাকা

যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিঃশ্বাস শেষ হইয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল শেষ শব্দটি প্রত্যেক ছড়াতেই বার বার করিয়া আবৃত্তি করা হইতে থাকে, যেমন 'গোটা গো—টা।' এমন কি, যখন বিপক্ষ দলকর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তখনও তাহার মুখে 'গোটা গোটা গোটা' শুনিতে পাওয়া যায়; তারপর যদি 'মরিয়া' পড়িয়াও যায়, তখনও শেষ বারের মত 'গো—টা' শব্দটি তাহার নিঃশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা হইবে। এই খেলায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া যে ভাবে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহাতে একদিক দিয়া শরীর চর্চা এবং অপর দিক দিয়া বুদ্ধিবৃত্তিরও অনুশীলন হইয়া থাকে।

তারপর প্রায় এই প্রকারই শুনিতে পাওয়া যায়—

৪

সাই কাবাডি বৃন্দাবন,
ঘড়ি বাজে ঠনঠন্।

ঘড়ির কপালে ফোঁটা,
মইষ মারে গোটা গোটা ॥—ঢাকা

পূর্ববর্তী ছড়ায় বীরত্বের মধ্যে গাছে উঠিয়া শোল মাছ মারিবার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে মহিষ বধ করিবার কথা শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু উভয়েরই ফলাফল অভিন্ন; কারণ, শোল মাছই হোক, কিংবা মহিষই হোক, তাহাদের গাও কেহ স্পর্শ করিবে না, সুতরাং এই সকল উক্তির উপর কেহ গুরুত্ব আরোপ করিবে না।

এখানে যে 'কাবাডি' কথাটি শুনিতে পাওয়া গেল, তাহা 'কপাটি' শব্দটিরই অপভ্রংশ, কপাটি শব্দের অর্থ হা-ডু-ডু খেলা। মৈমনসিং জেলার পূর্বাঞ্চল হইতেই এই বিষয়ক ছড়া সর্বাধিক সংগৃহীত হইয়াছে—

৫

চাপিলা চুপিলা,
ঘন ঘন মজিলা।
শালের হুক্কা নলের বাঁশি
নল ঘুরাইতে একাদশী ॥—মৈমনসিং

ইহারই আর একটি রূপ এই প্রকার—

৬

চাপিলা চুপিলা ঘন ঘন মচ্ছিলা।
রামের হুক্কা শ্যামের বাঁশী ॥—মৈমনসিং

খেলার ছড়ার ভাব কিংবা অর্থের কোনও সঙ্গতি থাকে না, হা-ডু-ডু খেলার ছড়ায় তাহাদের আরও অভাব দেখা যায়; তথাপি দুই একটি ছড়ার মধ্যে যে অসমসাহসিকতা এবং বীরত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অলক্ষ্যগোচর থাকে না। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

চি মারুম শিকলের গোটা,
হাতি মারুম মোটা মোটা।

মৈষ মারুম্ লাফে,
তেউরাল কাঁপে।
তেউরালের ঝিকিমিকি
বাবুই নাচে·········॥—মৈমনসিং

হা-ডু-ডু খেলার ছড়াগুলি যে একেবারে কবিত্ববর্জিত এমন কথা সকল ছড়া সম্পর্কেই যে বলা যায় না, উপরি-উদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ। 'তেউরালের ঝিকিমিকি বাবুই নাচে'—পদটি অপূর্ব তাৎপর্যপূর্ণ। তীক্ষ্ণধার তরবারির উন্মুক্ত গাত্রে সূর্যকিরণ ঝক্‌মক করিতে থাকিবে, তাহা দেখিয়া বাবুই পক্ষী নৃত্য করিবে, এই পরম কবিত্বব্যঞ্জক উক্তিটি হা-ডু-ডু খেলার পরুষ আচরণের মধ্য দিয়াও গোপন থাকিতে পারে নাই, তাহা এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তারপর আরও শুনিতে পাওয়া যায়—

৮

হাতে লাঠি কান্ধে বাঁশ, আমি আইলাম কালিদাস,
বাঘ মারি বাঘানি মারি, ভৈষ ভালুকের মুণ্ডু ছিঁড়ি,
ঠাডা জিল্‌কি দুই হাতে ধরি।
আসমানে লাটি, জমিনে কাটি, পর্বতের মাথায় লাথি,
হাতীর কাঁধে রাম দা ধারাই, আমি বাঙ্গারামের নাতিরে,
আমি বাঙ্গারামের নাতি। —মৈমনসিং

৯

অইয়ারে অইয়া,
কি কর বইয়া।
ডাল ভাঙ্গাইছি ডালে বইয়া,
বুক বান্ধাইছি পাথর দিয়া,
পাথর নিল চোরে,
(আমার) বুক ধড়্‌ফড় করে,
(আমার) বুক ধড়্‌ফড় করে॥—মৈমনসিং

উপরি উদ্ধৃত ছড়াটির 'বুক বান্ধাইছি পাথর দিয়া' পদটির মধ্য দিয়া যে বীরত্বের প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা 'আমার বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে' উক্তির ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ বিসর্জিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর বীরত্ব বড় ক্ষণস্থায়ী ; তাহা কার্যেও যেমন প্রকাশ পায়, খেলায়ও তেমনই প্রকাশ পায় ; সুতরাং এই প্রকার বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তি কেবল মাত্র বাঙ্গালী জীবনের পটভূমিকার মধ্য দিয়াই গ্রহণ করিবার যোগ্য।

১০

উতুরী ধুতুরী কৈতরী ভাজা,
ভাংনা মাছে ধর্‌ছে খাজা।
ভাংনা মাছের ঘাড়ে তেল,
রান্ধ্‌তে রান্ধ্‌তে পরাণ গেল।—মৈমনসিং

বাঙ্গালী ছেলের খেলার মধ্যেও খাইবারই চিন্তা। মাছ খাইবার পরই দই খাইবার কথা—

১১

আমি গেলাম ওই
খাইয়া আইলাম দই।
কি ধান বুন্‌ছরে ভাই,
ঝাঁকির জলই।—ঐ

বীরত্বের কথাও যে ইহার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ না পাইয়াছে, তাহা নহে—

১২

ছি ছি খেলা আচ্ছা খেলা,
দশ বারটা মারিয়া ফেলা।
দশ বারটা এং চেং,
কুড়ালে কাটিল ঠেং॥—ঢাকা

১৩

ছি ছিত্তর বৃন্দাবন,
ঘড়ি বাজে টন্‌ টন্‌।

ঘড়ির কপালে ফোঁটা,
খেইলা মারুম মোটা মোটা,
ঘড়ি বাজে টন্ টন্ ,
খেইলা মার্‌তে কতক্ষণ।—ঢাকা

কিন্তু পরক্ষণেই আবার বাঙ্গালী সুলভ গার্হস্থ্য জীবনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

১৪

ছি ধর কটরা ধর,
বাণ্য বাড়ীর পুলা ধর।
পুলার হাতে বল্লার চাক,
ওরে পুলা বাপ ডাক।—মৈমনসিং

হা-ডু-ডু খেলার অধিকাংশ ছড়াই আকারে যেমন নিতান্ত ক্ষুদ্র, অর্থ এবং ভাবের দিক হইতেও তেমনই বিশেষত্বহীন—

১৫

তাক তেরে কিটি।
যে কাঁদে তারে মার প্যাকাটি॥—২৪ পরগণা

তবে আঘাত করিবার অভিপ্রায়টি প্রায় সকল ছড়াতেই প্রকাশ পায়। যেমন—

১৬

চু বে আং তাং।
বাঁধ্‌বো পিতুলে ডাং॥
মারবো ডাঙ্গের বাড়ি।
পাঠাবো যমের বাড়ী॥—২৪ পরগণা

প্রতিপক্ষকে নানাভাবে অপমানকর উক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিবারও প্রয়াস দেখা যায়—

১৭

হা-ডু-ডু পেয়ারা পাতা।
তু' গালে তুটি ছেঁড়া জুতা॥—ঐ

খেলোয়াড় কখনও কখনও নিজের বিজয়ের সম্ভাবনায় নিজেই উল্লাস প্রকাশ করে, তখন বাংলা হিন্দীর আর কোন জ্ঞান থাকে না—

১৮

জিত দাগকে জিতে গা।
হারমণি তবলা বাজায় গা॥—ঐ

১৯

জিত পট্টি জিতেঙ্গা,
তগ সাথে খেলেঙ্গা।—ঢাকা

কখনও কখনও বিপক্ষের পরাজয়ের উপরও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়া থাকে—

২০

ইস্ মিস্ ধান শিস্।
তুই বোকা হেরেছিস্॥—২৪ পরগণা

২১

ডুগ ডুগ ভাইয়া,
তোরে যাইয়াম খাইয়া।
তোরে যাইয়াম্ লইয়া॥—মৈমনসিং

২২

হা-ডু-ডু খেল্‌তে গেলাম কুড়িয়ে পেলাম বেল।
বেলের ভিতর লেখা আছে হা-ডু-ডু খেল॥—২৪-পরগণা

যে খেলায় শারীরিক ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করে এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রকাশ পায়, তাহার ছড়া কিছুতেই ঘুমপাড়ানি ছড়ার মত ভাবরস-ঘন হইতে পারে না।

অন্যান্য

কয়েকজন সমবয়সী ছেলেমেয়ে যখন একত্র হইয়া 'চোর চোর' খেলিতে চাহে, তখন প্রথমেই একজনকে 'চোর' নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হয়। ছড়ার এক একটি শব্দ বলিয়া সর্দার খেলাড়ু এক একজনকে স্পর্শ করে, শেষ শব্দটি যাহার উপর পড়ে, সে চোর হইবার দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ পায়। বার বার ছড়াটি বলিবার পর যে ছেলে কিংবা মেয়ে শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিয়া যায় অর্থাৎ যাহার গায়ে একবারও শেষ শব্দটি আসিয়া পড়ে না, তাহাকেই 'চোর' হইতে হয়। তারপর যে খেলা সুরু হয়, তাহাতে সকলই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া আত্মগোপন করে, 'চোর'কে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, সুতরাং খেলার এই অংশে ছড়া বলিবার আবশ্যক হয় না।

এই ছড়াগুলির একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে, ইহারা সাধারণতঃ বর্তমানে ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদিগের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত বলিয়া ইহাদের মধ্যে নির্বিচারে ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়; ইতিপূর্বেও ইংরেজি শব্দের ব্যবহার আমরা ছড়ায় দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে তাহার ব্যবহার আরও ব্যাপক। ছড়াগুলি একে একে উল্লেখ করা যায়—

১

আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারব চাবুক চড়্‌ব ঘোড়া॥
ওরে বিবি সরে দাঁড়া।
আসছে আমার পাগ্‌লা ঘোড়া॥
পাগ্‌লা ঘোড়া ক্ষেপেছে।
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে॥
অল্‌রাইট ভেরি গুড্‌।
মেম খায় বিস্কুট॥—২৪ পরগণা

এখানে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জোড়া জোড়া আমপাতার সঙ্গে চাবুক মারিয়া ঘোড়া চড়িবার কোন সম্পর্ক নাই। তারপর শেষ পর্যন্ত

মেম সাহেবের বিস্কুট খাইবার যে চিত্রটি দেখা গেল, তাহা এই সম্পর্কে আরও অবান্তর। কিন্তু মেম সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—

২

আমপাতা জোড়া জোড়া,
ওরে বিবি সরে দাঁড়া।
য়াচ্ছে আমার পাগলা ঘোড়া
অলরাইট্ ভেরি গুড,
পাউরুটি বিস্কুট।—২৪ পরগণা

এখানে জোড়া জোড়া আমপাতাও কোথায় উড়িয়া গেল।

৩

আয় টিনের বাক্সো
ভ্যাডাং ভ্যাডাং ডেক্সো
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
কাল বলেছে যেতে,
পান-সুপারী খেতে।
পানের ভেতর মৌরি বাটা
ইস্কাবনের চাবি আঁটা॥—২৪ পরগণা

উবুর ডুবুর পান মৌরী।
হিচকা নাথের ঘর চৌরী॥
সারি কি গুয়া
কার পেটে গুয়া॥
আহাদরে বাজল ঢোল।
ড্যাংরা কাবা হইল চোর॥
চোর পালিল হরি বোল।
গাছে না পেটে?—মেদিনীপুর

৫

এন্টি বেন্টি পাপা টেন্টি
টান টুন টেষ্টা ;
তুই বেটা চোর হলি
চোখে হাত দিয়ে খেঁসটা ।—মুর্শিদাবাদ

কতকগুলি ছড়ায় স্কুল এবং মাষ্টার মহাশয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ; মনে হইতেছে, আধুনিক কালে এই শব্দগুলি ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কারণ, ক্রীড়ার আনন্দের মধ্যেও শিশুচিত্ত স্কুল ও মাষ্টার মহাশয়ের আতঙ্ক হইতে মুক্ত থাকিতে পারিত না।

৬

কচি কচি পালকিগুলো।
তার ভিতরে দুষ্টুগুলো ॥
দুষ্টুদের পাড়ায় যেয়ো না।
ওদের দেওয়া পান খেয়ো না ॥
পানেতে মৌরী বাটা।
স্কুলেতে চাবি আঁটা ॥
স্কুলের জল গন্ধ।
খিড়কী পুকুর বন্ধ ॥—মেদিনীপুর

স্কুলেতে যে চাবি আঁটা এই চিত্রটি কল্পনা করিয়াও সুখ আছে। বাল্যকালে বিদ্যালয় একদিন ছুটি থাকিলে যে আনন্দ পাওয়া যাইত, সেই আনন্দ আর কোথায় পাওয়া যায় ? বিদ্যালয় সম্পর্কে শিশুচিত্ত সর্বদাই বিরূপ ভাবাপন্ন ; সেইজন্য চাবি আঁটা স্কুলের জলও গন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা ভাবিয়া উল্লসিত হয়।

৭

মাষ্টার মশায় মাষ্টার মশায় পেট কেমন করে,
পেটের ভিতর বিড়াল ছানা মেউ মেউ করে।—২৪ পরগণা

৮

মাষ্টার মহাশয় নমস্কার
আপনি বড় পরিষ্কার।
গোলাপ ফুলের গন্ধ
হাই স্কুল বন্ধ।—২৪ পরগণা

এইবার স্পষ্ট ভাষাতেই বিদ্যালয় বন্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল।

ও ছেলে তোর নাম কি ?
পেয়ারা পাতা জিলিপি।
নেবুর পাতা গন্ধ।
হাই স্কুল বন্ধ।—২৪ পরগণা

গোলাপ ফুলের গন্ধ এইবার নেবুর পাতায় আসিয়া লাগিল। কখন কোন্ চিত্র আশ্রয় করিয়া যে ছেলেরা তাহাদের অন্তরের উল্লাস ব্যক্ত করে, তাহার ঠিকানা নাই। এখানেও তাই স্কুলের জল হইতে নেবু পাতা পর্যন্ত গোলাপ ফুলের গন্ধ আসিয়া ঠেকিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলিও অনুরূপ একটি খেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—

১০

উলুকুটু ধূলুকুটু নলের বাঁশী,
নল ভেঙ্গেছে কি দেশী।
একা নল পঞ্চ দল,
কে যাবিরে কামার শাল,
কামার মাগী ঘের ঘেরাণী,
অর্পণ দর্পণ
কুঁড়ে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ।—হুগলি

সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করা ইহাদের উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই ইহারা কেবল মাত্র সুরটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শব্দের দিক দিয়া নানাভাবে পরিবর্তিত হয়—

১১

উলটুকু ধুলটুকু নলের বাঁশী ॥
নল ভেঙ্গেছে একাদশী ॥
একা নল পঞ্চদল।
কে যাবিরে কামার শাল ॥
কামার মাগী খাঁড় ভাঙ্গানি।
খাঁড়ার উপর তোলে পানি ॥
অর্পণ দর্পণ।
কুড়ি কিষ্টি ব্রাহ্মণ ॥---বর্ধমান

১২

উল্‌কি ভুল্‌কি বামুন কাঁশি,
নিল কব্‌জা একাদশী।
হরিণ মরিল করিস কাই ;
দাদার কোলে দিদিকে দিস।
ঠারে ঠোরে উনিশে বিশ,
বড়ির মা টেক্ টুক্ টকাস্।—২৪-পরগণা

১৩

এক দিল ভুদোল দিল কি মাদল,
বাঁইচ কঁচ ভাঙ্গা পিতল।
অরিচ মরিচ খরিচ কে,
দাদার কোলে দিদিরে দে।
ধারে ধুরে উনিশা বিশ,
গাছে না পেটে ?—মেদিনীপুর

শিশুদিগের মধ্যে প্রচলিত কানামাছি খেলাটি সর্বজন পরিচিত, সুতরাং তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহারও দুই তিনটি ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। চোখ বাঁধিয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে হয় বলিয়া

ছড়ার পরিবর্তে আত্মরক্ষার নিরাপত্তার দিকেই খেলোয়াড়ের দৃষ্টি থাকে, সুতরাং এই ছড়াগুলি সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে—

১৪

ইল্‌টি বিল্‌টি চ্যাক্ চুঁই।
যাকে পাই তাকে ছুঁই॥—২৪ পরগণা

১৫

আনি মানি জানি না।
পরের ছেলে মানি না॥—ঐ

১৬

কানা মাছি ভোঁ ভোঁ।
যাকে পাবি তাকে ছোঁ॥—২৪ পরগণা

১৭

আন্ধা গোন্ধা ভাই।
আমার দোষ নাই॥—ঢাকা

ওড়িয়া ভাষায়ও এই শ্রেণীর একটি ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই—

১৮

আস ভাই লুচোকরি খেড়িবা।
ঢরি ঢরি হসি গীত গাইবা॥—উড়িষ্যা

ঘুড়ি উড়াইবার কয়েকটি ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—

১৯

ঘুড়ি উড়াব লটুই নিব সঙ্গে যাবে যাদু,
প্যাঁচ লাগাব ঘুড়ি কাটব হেরে যাবে কাদু।—২৪ পরগণা

ইহাও খেলা এবং এই খেলায়ও হার জিত আছে। বিজয়ের উল্লাস ছড়ার ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে ;—

২০

লাল রঙা ঘুড়ি আয় না উড়ি,
নীল রঙা ঘুড়ি আয় না উড়ি,

করছে কেমন যেন গাটা,
পড়লি তবে তুই কাটা।
ভো-কাটটা ভো কাট-টা ভো কাট-টা রে,
ভো মারা ভো মারা ভো-মারা রে।—মুর্শিদাবাদ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়া সূতায় মাঞ্জা দিবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

২১

কইতরীর মা ঘরো গো
মুর্গীর ঠেঙ্গো ধর গো,
মুর্গীর ঠ্যাং কা-লা।
ছায়বানি বড় ভা-লা।
ও ছায়বানি সূতা কাট্
কাইল আইয়ে গঞ্জের আট্ ;
গঞ্জের আটো যাইব না,
কেড়কী-মাঞ্জা দিবঁ না ॥—মৈমনসিংহ

পূর্ব মৈমনসিংহের হিন্দু মেয়েদের মধ্যে উত্তম ঠাকুরের ব্রতে একটি ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

উত্তর ঠাকুর ভা-লা।
ছোট্ ঠাকুর কা-লা॥ ইত্যাদি

এই ছড়াটির মধ্যে সেই ভাষা সুর ও ছন্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রতের ছড়া ও খেলার ছড়া অনেক সময় একাকার হইয়া যায়।

মেয়েলি ঘুঁটি খেলার একটি ছড়া এখানে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে এক একটি পদ পুনরাবৃত্তির মধ্যে যে গীতিসুর ফুটিয়া উঠে, তাহা ছড়াটির একটি বিশেষ আকর্ষণ ; কেবল খেলাটিই দেখিবার মত নহে, ছড়াটিও কান পাতিয়া শুনিবার মত। ইহাতে এক হইতে গণনা করা হইয়াছে, কিন্তু রচনার গুণে ধারাপাতের নামতা কবিতা হইয়াছে—

২২

ফুল ফুল ফুলটি।
একে দোলটি।
দোলটি।
ঝাম ঝাম ঝামটি।
একে জোর ঝামটি।
কদম কদম কদমটি।
একে জোর কদমটি।
বকুল বকুল বকুলটি।
একে জোর বকুলটি।
সুসম সুসম সুসমটি।
একে জোর সুসমটি।
মুখপচ্চা মুখপচ্চা মুখপচ্চাটি।
একে জোর মুখপচ্চাটি।
হাত চাপড়া বেগুন পোড়া।
হাত চাপড়া বেগুন পোড়া।
হাত চাপড়া বেগুন পোড়া।
ও নণ্টে ভাত ঘণ্টে।
ও নণ্টে ভাত ঘণ্টে।
ও নণ্টে ভাত খণ্টে।
ও হাঁড়িকে বদলে
বদলে
বদলেটি।
পঞ্চে পাখা মেঘে ঢাকা।
ছয়ে রেখা সাতে সাত সমুদ্র।
আটে অষ্ট বসু।
নয়ে নোতুন ঘোড়া।
দশে পড়ল জোড়া।
এগারোয় এক ফুলি।

বারোয় ক্ষীরের পুলি।
তেরোয় তেরছি কাটা।
চোদ্দয় রূপোর বাটা।
পনেরোয় পানের পাতা।
ষোলোয় শোলোক লতা।
সতেরোয় সতরঞ্চি।
আঠেরোয় বাঁশের কঞ্চি।
উনিশে লাখ
বিশে ঝাঁক।—হুগলি

এই প্রকার খেলার ছড়া আরও আছে—

২৩

হেনা হেনা হেনা।
তপ্ত দুধের ফেনা॥
চিনি চাটা চাটা।
বেগুন কোটা কোটা॥
হর পার্বতী,
লক্ষ্মী-সরস্বতী।
রামসীতার বিয়ে,
সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে।
ও অলকা,
বুক ঝলকা॥—হুগলি

পূর্ব বাংলায় গিয়া ছড়াটি সামান্য পরিবর্তিত হইলেও ইহার রূপ এবং রস অক্ষুণ্ণ আছে—

২৪

আনা আনা আনা,
তত্ত দুধের ফেনা।
সিম গোটা গোটা,
বেগুন চটা চটা।

ডান কানে সোনা,
বা কানে রূপো।
রাম সীতার বিয়ে,
নাকে নোলচ দিয়ে।
সিঁথায় সিঁদুর দিয়ে,
অলকা বুক ঝলকা।—ঢাকা

মূল সুরটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ছড়া বাহিরের দিক হইতে কিছু কিছু করিয়া যে কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, ইহা হইতে তাহাই দেখা যাইবে।

হাতে একটি নুড়ি মুঠা করিয়া প্রত্যেকের কোলে সেই হাত দিতে দিতে এই ছড়াটি বলা হয়,—

২৫

একম্ চেকম্ নারগিলতা,
শিক দিয়া ভাই বেনিয়ামুঠা।
ওল ঢোল পুন্না চোর,
গাছে না পেটে?—কাঁথি, মেদিনীপুর।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শিশুদিগের খেলার ছড়ার মধ্য দিয়া জীবনের রূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না; সেইজন্য ইহারা কাব্যগুণবর্জিত। বিশেষতঃ মেয়েলি খেলার ছড়ার মধ্যে ঘরকন্নার জীবনের একটু ইঙ্গিত থাকিলেও ছেলেদের খেলার ছড়ার মধ্যে তাহার একান্ত অভাব দেখা যায়। তথাপি শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুভব করিবার জন্য ইহাদেরও অনুশীলন অনাবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে না। কি ভাবে শিশুমনে চিন্তার উদয় হয় ও তাহা বিকাশ লাভ করে, অনাগত জীবনের আশা ও স্বপ্ন কি ভাবে তাহাদের অপরিণত জীবনের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়াও পূর্বাভাস দিয়া যায়, তাহা ইহাদের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায়। মানুষের কোন সৃষ্টিই অর্থহীন নহে, শিশুরও নহে। শিশুজীবন হইতে পরিণত জীবন পর্যন্ত এক অখণ্ড চিন্তার প্রবাহ মানুষের অন্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়। ইহাতে তাহারই একটা রূপ ধরা পড়ে মাত্র।

প্রশ্নোত্তরবাচক

খেলার দুইটি প্রধান বিভাগ—একটি বাহিরের (outdoor) খেলা, আর একটি ঘরের (indoor) খেলা। বৃষ্টি বাদলার দিনে কিংবা সন্ধ্যার অন্ধকারের পর যখন বাহিরে যাইবার কোন উপায় থাকে না, তখন ছেলেমেয়েরা ঘরের ভিতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়াও যে খেলা খেলিয়া থাকে, তাহাকেই ঘরের খেলা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই খেলার মধ্যে শরীর চালনা হয় না সত্য, কিন্তু মস্তিষ্কজাত বুদ্ধিদ্বারা শরীর চালনার অভাব পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং এই খেলা প্রধানতঃ কথার খেলা। স্বল্প দীপালোকিত শয়নগৃহে বিছানার উপর বসিয়া শুইয়া রাত্রির আহারের জন্য কিংবা নিদ্রার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে শিশুরা এই খেলা খেলিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ছড়ার মত করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহাদের উত্তর দেওয়া হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রশ্নোত্তরবাচক খেলা বলা যায়। এই ছড়ার একটি প্রধান অংশকে 'ঘুঘু সই' বলিয়া উল্লেখ করা যায় ; কারণ, সর্বপ্রথম পদে ঘুঘু পক্ষীকে সই বলিয়া সম্বোধন করিয়া এই ছড়াগুলি সাধারণতঃ আবৃত্তি করা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়ায় বাংলার পাখীর মধ্যে ঘুঘুর একটি বিশেষ স্থান আছে, এখানে এ'কথা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্র-সংগ্রহেও এই শ্রেণীর একটি ছড়া স্থান পাইয়াছে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। 'ঘুঘু সই' শ্রেণীর অধিকাংশ ছড়াই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলেও পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই এই শ্রেণীর ছড়া প্রচলিত আছে।

'ঘুঘু সই' শ্রেণীর ছড়াগুলি প্রধানতঃ জননীর সঙ্গে শিশুর খেলা ; যে শিশুর মুখে এখনও ভাষা ফুটে নাই, কেবল হাসি ফুটিয়াছে, ইহা তাহারই সঙ্গে খেলা। এখানে জননীই প্রশ্নকর্ত্রী এবং জননীই উত্তরদাত্রী। জননী বিছানার উপর শুইয়া শিশুকে দুই হাঁটুর উপর বসাইয়া হাঁটু দুইটি দুলাইতে দুলাইতে এই ছড়া বলিয়া থাকেন। ছড়াটি যখন শেষ হইয়া যায়, তখন হাঁটু দুইটি কাত করিয়া শিশুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সোনা কুড়ে পড়বি, না ছাই কুড়ে ?' শিশু কিছুই বুঝে না ! জননী শিশুকে তখন বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠেন, 'সোনা কুড়ে পড়লি।'

ঘুঘু মেতি সই।
পুত কই ?
হাটে গেছে।
হাট কই ?
পুড়ে গেছে॥
ছাই কই ?
গোয়ালে আছে॥
সোনা কুড়ে পড়বি ?
না ছাই কুড়ে পড়বি ?—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কোন কোন সময় সোনা কুড় ছাই কুড়ের পরিবর্তে অন্য কথাও বলা হয়। কিন্তু সর্বত্রই ঘুঘুর ডাক শুনা যায়—

২

ঘুঘু ঘুঘু !
কি ছেলে ? বেটা ছেলে;
ছেলে কোথা ? মাছ ধরতে গেছে।
মাছ কোথা ? চিলে নিল,
চিল কোথা ? ডালে বসল
ডাল কোথা ? ভেঙে পড়ল।—মুর্শিদাবাদ

ছড়াটি প্রয়োজন মত দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্বত্র উদ্দিষ্ট পক্ষী ঘুঘু। এখানে প্রথম পদটিব মধ্যে যেন ঘুঘূর ডাকটি শুনিতে পাওয়া গেল—

৩

ঘুগ্ ঘু—ঘু।
ঘুগ্ ঘু—ঘু॥
কি ছ্যালা হইল ? ব্যাট্টা হইল।
ব্যাট্টা কঁই ? মাছ মার্‌তে গেল।
মাছ কই ? চিল্লেহ্ লিল।
চিল কই ? উইড়া ধুইড়া গেল।

ধোবার মাগো ধোবার মা। কাঠ কুড়াতে গেলি॥
দু-খান কাপড় পেলি। দু' বহুকে দিলি।
আপনি মলি জাড়ে। ঠিক ঠিক দুপ্পহরে॥
লাল ঘোড়ার বাছারি। তুল্যা তুল্যা আছাড় দিই॥—রাজসাহী

ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই মাছ ধরিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। তাহা না হইলে আর বাঙ্গালীর ছেলে বলিবে কেন? কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের ভাগ্যহীনতাও তাহাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া চলিল; কারণ, মাছটি ধরিয়া তুলিবা মাত্র তাহা ছোঁ দিয়া চিলে লইয়া গেল।

৪

ঘুঘু সই—দা কই?
দা দিয়ে করবি কি?—পাত কাড়ুম।
পাত দিয়ে করবি কি?—বউ ভাত খাইবে।
বউ কোথায়?—জলে গেছে।
জল কোথায়?—ডাউকে খাইছে।
ডাউক কোথায়?—তারাবনে গেছে।
তারাবন কোথায়?—পুড়িয়া গেছে।
ছাই মাডি কোথায়?—ধোবায় নিছে।
ধোবা কোথায়?—যুদ্ধে গেছে।
যুদ্ধ কোথায়?—ভাইঙ্গা গেছে।
ভাঙ্গা যুদ্ধা ভাইঙ্গা গেছে,
বুড়ীর ঘরে আগুন লাগ্‌ছে।—বরিশাল

এই শ্রেণীর ছড়া যে আয়তনে কত দীর্ঘ হইতে পারে, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিই তাহার প্রমাণ। কারণ, যেখানে প্রশ্নের অন্ত নাই, সেখানে জবাবেরও অর্থ নাই।

৫

ঘুঘু সই, বাসা কই?
শিমূল গাছে—শিমূল গাছ কই?
সূতারে নিছে—সূতার কই?
পিঁড়ি চাছে—পিঁড়ি কই?

বৌ ভাত খায়।—বৌ কই ?
জলে গেছে।—জল কই ?
ডাউকে খাইছে।—ডাউক কই ?
বনে গেছে।—বন কই ?
পুইড়া গেছে।—ছাই মাটি কই ?
ধোপায় নিছে।—ধোপা কই ?
হাটে গেছে।—হাট কই ?
মিইল্যা গেছে।
বুড়ি লো বুড়ি ! (তোর) হাঁড়ি পাতিল সরা।
কোন্ খাট ?—সোনার না রূপার ?
সোনার !—এই পড়্ল। —বরিশাল

একই ঘুঘুর ডাক চট্টগ্রাম এবং মৈমনসিংহ হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৬

ঘু-ঘু-র-ঘু মইষর ছা।
মইষ কডে চরে ?—খালে নালে।
দুধ কঁতাইন পায় ?—থোরা থোরা।
বেচে কি দর ?—কড়া কড়া।
গা কা মেড়া ?—ভাতে মেড়া।
ভাত কনে ন দেয় ?—বউএ ন দেয়।
বউয়রে ধরি মারিত না পারস্ ?—পোআ ছা কাঁদে।
পোআর নাম কি নাম ?—অলম্ মলই।
তোর নাম কি নাম ?—নাউট্টা চড়ই।—চট্টগ্রাম

এই খেলা শিশুর খেলা নহে—বরং মায়েরই শিশুকে লইয়া খেলা। ইহার ভিতর দিয়া মাতৃহৃদয়ের সহজ উল্লাস যে ভাবে ব্যক্ত হয়, শিশুর উল্লাস তদপেক্ষা বেশি কিছু ব্যক্ত হয় না।

৭

ঘুঘুর চই, ঘুঘুর চই,
গেছিলি কই ?—নম্বর বাগে।
খাইছ কি ?—আম জাম গুড়া।
দ্যাখ্‌ছে কেডা ?—মইধ্যা চোরা।
মইধ্যার মা দা-হান দে,
দা-হান দিয়া কি করিবি ?—পাত কাটমু।
পাত দিয়া কি করবি ?—বউ ভাত খাওয়ামু।
বউ কই ?—ডাউকে নিছে।
ডাউক কই ?—ইত্যাদি—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে ঘুঘুই যে কি ভাবে ঝিঁঝিঁ হইয়া গিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য—

ঝিঁ ঝিঁ সই, তোর পুত কই ?
আম গাছে।—কি কাজ করে ?
পিঁড়ি চাঁছে।—কার পিঁড়ি ?
ছোট বউর পিঁড়ি।—ছোট বউ কো ?
ঘাটে গেছে।—ঘাট কো ?
ডাহু খাইছে।—ডাহু কো ?
বনে গেছে।—বন কো ?
পুইড়া গেছে।—ছাই কো ?
ধোপায় নিছে।—ধোপা কো ?
হাটে গেছে।—হাট কো ?
ভাইঙ্গা গেছে।—বুড়ি লো বুড়ি !
কি লো ?—তইলা পাইলাগুলি সরালো।
ক্যা লো ?—তালগাছটা পইল।
ঢিপ্‌পুস ! —ফরিদপুর

'টিপ্ পুস' উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জননী নিজের হাঁটু দুইটি কাত করিয়া শিশুকে নরম বিছানার উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিবেন। শিশু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনরায় আসিয়া মায়ের হাঁটুর উপর বসিবে; এই ভাবে ক্রমে ক্লান্ত শিশুর চোখে নিদ্রা জড়াইয়া আসিবে।

'ঘুঘু সই' শ্রেণীর ছড়া আর কোন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয় নাই; কিন্তু মা ও শিশুর এই খেলাটি বাংলার সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

আর এক শ্রেণীর প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়াকে 'ব্যাঙের মাথা' শ্রেণীভুক্ত করা যায়; কারণ, ইহার উত্তরের মধ্যে 'ব্যাঙ' কিংবা 'ব্যাঙের মাথা' জবাবটি সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। তবে এই শ্রেণীর খেলা জননী এবং শিশুর পরিবর্তে সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়—

৯

একটি কথা আছে।—কি কথা?
ব্যাঙ লতা।—কি ব্যাঙ?
তুড়ি ব্যাঙ।—কি তুড়ি?
বামুন বুড়ী।—কি বামুন?
চণ্ডী বামুন।—কি চণ্ডী?
পিটে গণ্ডী।—কি পিটে?
তাল পিটে।—কি তাল?
খেজুর তাল।—কি খেজুর?
পিক্ মজুর।—কি পিক্?
সোনা পিক্।—কি সোনা?
গোবর খা না।—তুই আদ্দেক ভাগ নে না!—বর্ধমান

১০

এক জেগা যাবি?
কোথা?— ব্যাঙ মাথা।
কি ব্যাঙ?—সরু ব্যাঙ।
কি সরু?—বামুন সরু।

কি বামুন ?—চণ্ডী বামুন।
কি চণ্ডী ?—পিঠা চণ্ডী।
কি পিঠা ?—তাল পিঠা।
কি তাল ?—সোনার তাল।
কি সোনা ?—গোবর খা না।—মেদিনীপুর

কোন কোন ছড়ায় গোবর অপেক্ষাও এক অখাদ্য বস্তু খাইবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা এত অখাদ্য যে তাহার নামও এখানে উচ্চারণ করা যাইতেছে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই ছড়া পূর্ববর্তী ছড়াগুলির মত মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে পারে না—কেবল মাত্র সমবয়স্কদিগের মধ্যেই ইহা প্রচলিত থাকিতে পারে।

সুদূর চট্টগ্রামেও এই ছড়ার প্রতিধ্বনি গিয়া পৌছিয়াছে—

১১

কি কথা ? বেঙের মাথা।
কেমন বেঙ ? স্রুরু বেঙ।
কেমন স্রুরু ? বামন স্রুরু।
কেমন বামন ? ভাট বামন।
কেমন ভাট ? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া ? আচ্ছা ঘোড়া।
কেমন আচ্ছা ? বাঁদর বাচ্চা।
কেমন বাঁদর ? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া ? পাতা মুড়া।
কেমন পাতা ? মিছা কথা॥—চট্টগ্রাম

বরিশাল অঞ্চলেও শোনা যায়—

১২

দিদিলো দিদি, একটা কথা,
কি কথা ? ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ ? সরু ব্যাঙ।

কি সরু? বামন গরু।
কি বামন? ভাট বামন।
কি ভাট? গুয়া কাট।
কি গুয়া? চিকি গুয়া।
কি চিকি? সোনার চিকি।
কি সোনা? ছাই সোনা।
তার অর্ধেক ভাগ নে না।
ভাগ নিয়ে করব কি?
তোর ভাগ তোরে দি।—বরিশাল

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে ব্যাঙের মাথা কিংবা ব্যাঙের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ছড়াটির সুরে এবং তালে কিংবা খেলার প্রণালীর মধ্যে পূর্বোক্ত ছড়াগুলির সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই—

১৩

ফেছকি লো ফেছকি, কই গেছ্‌লি?
পূবে গেছ্‌লাম,—ধান কেমন?
ছড়া ছড়া। চাউল কেমন?
বগুলার পাক্‌। তোর নাম কি?
গুরাই নরাই; বৌ-এর নাম কি?
ছুছ্‌রি বিলাই। ফউরের নাম কি?
লাইঠ্যা গদাই, হুইল্যা বিলাই॥—মৈমনসিংহ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতেও ব্যাঙ কিংবা ব্যাঙের মাথা নাই, কিন্তু এই শ্রেণীর ছড়ার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে—

১৪

ও গোউআ তোর মৈষ কঁডে চড়ে?—মুড়ার উপর।
কি খেড় খায়?—কানাইয়ার আগা।
তোর মৈষে লাদে কেমেন?—গেরুয়া ভরা।
দুধ দে কেমেন?—হাতয়া ভরা।

ও গোউআ······ক্যা মরা ?—ভাতে মরা।
ভাত কনে নদে ?—বউ এ নদে।
বউঅরে ধরি মারিত্ ন পারস্ ?—পোআএ কান্দে।
পোআর নাম কি নাম ?—আকই বাকই।
বউঅর নাম কি নাম ?—নাটুয়া চড়ই।
কেমেন নাচিবি নাচত চাই ॥—চট্টগ্রাম

১৪

মাউ কহিএ দা দিতা।—দা কি লাই।
খুঁট্য কাটতাম্।—খুঁটা কি লাই ?
ঘর বাইনতাম্।—ঘর কি লাই ?
বৌ আনতাম্।—বৌঅর নাম নক্কুনি।
পোআ হইএ এক্কুনি ॥—চট্টগ্রাম

১৫

ওপারে কেরে ?—আমি খোকা।
মাথায় কিরে ?—আমের ঝাঁকা।
খাস্নে কেনরে ?—দাঁতে পোকা।
বিলোস্নে কেনরে ?—ওরে বাপরে বাপ !—ঢাকা

খাইতে না পারিলেও বিলাইবার কথা শুনিবা মাত্র খোকা যে ভাবে শিহরিয়া উঠিল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই অনুদার ভাবের মধ্যে পরিণত বুদ্ধির স্পর্শ রহিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে একটু জীবন-রস ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে দেখা যাইতেছে, একটি কাঁসা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শাশুড়ীর ভয়ে একটি বউ নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই অবস্থায় আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই বলিয়াই বধূকে এই পরম পথই অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ছড়াটির মধ্য দিয়া যেন সেই পলায়িতা বধূকে অনুসন্ধান করিবার ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

১৬

তেঁতুল গাছে বাঁসা, বৌ ভাঙছে কাঁসা।
সে বৌ কা-ই ?—জল আনতে যাইছে।

সে জল কা-ই ?—সাপ ছুঁই দিইছে।
সে সাপ কা-ই ? বনকে পালাইছে।
সে বন কা-ই ?—ধোবা কাটি লিইছে।
সে ধোপা কা-ই ?—কাপড় কাচতে যাইছে।
সে কাপড় কা-ই ?—রাজা পিঁধি যাইছে।
সে রাজা কা-ই ?—পাখী মারতে যাইছে।
সে পাখী কা-ই ?—গগনে গগনে উড়িছে। —কাঁথি, মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জিলা হইতে এই ছড়াটিরই একই নাগরিক পাঠও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিজ্ঞ সংগ্রাহক না হইলে অনেক সময় তাঁহারাও ছড়াগুলি সাধুভাষায় রূপান্তরিত করিয়া থাকেন। অনুরূপ আর একটি ছড়ায় শোনা যায়—

১৭

সে না কই ?—গঙ্গায় ডুবিছে।
সে গঙ্গা কই ?—শুকায়ে গেছে।
সে বালু কই ?—খই ভাজিছে।
সে খই কই ?—বাওই খাইছে।
সে বাওই কই ?
বড় ঘরের কানছি দিয়্যা উড়্যা গেছে।—পাবনা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে দেখা যায়, তেলি ঘরের দুইটি বৌ বট ও অশ্বত্থ গাছের লড়াই দেখিবার নাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে—

১৮

অশথ গাছে বট গাছে যুদ্ধ লেগেছে,
তেলি ঘরে দুইটি বৌ দেখতে বেরিয়েছে।
সেই বৌ কোথা না জল আনতে গেছে,
সেই জল কোথা না সাপে খেয়ে গেছে।
সেই সাপ কোথা না বনে চলে গেছে,
সেই বন কোথা না আগুন লেগে গেছে।

সেই আগুন কোথা না ধোপা নিয়ে গেছে,
সেই ধোপা কোথা না কাপড় কাচতে গেছে।
সেই কাপড় কোথা না রাজা পরে গেছে।
সেই রাজা কোথা না পাখী মারতে গেছে।
সেই পাখী কোথা না ফুরুৎ করে উড়ে পালিয়েছে॥—মুর্শিদাবাদ

এই শ্রেণীর ছড়ার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই ধোপার একটি অংশ আছে, সেই অংশটিও প্রায় সুনির্দিষ্ট ; কোন একটি বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সে প্রায়ই জ্বালানি কাঠ, আগুন কিংবা ছাই বা ক্ষার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই বিষয়টির মধ্য দিয়া এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে একটি ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে। উপরি-উদ্ধৃত ছড়ায় তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

রবীন্দ্র-সংগ্রহেও প্রায় এই প্রকার একটি ছড়া গৃহীত হইয়াছে,

১৯

হ্যাদেরে কলমি লতা,
এতকাল ছিলে কোথা ?
এতকাল ছিলাম বনে,
বনেতে বাগ্‌দি ম'ল,
আমারে যেতে হ'ল।
তুমি নেও কলসী কাঁখে,
আমি নিই বন্দু হাতে,
চলো যাই রাজপথে ;
ছেলের মা গয়না কাঁখে,
ছেলেটি তুড়ুক নাচে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিম্নোক্ত ছড়া দুইটি প্রধানতঃ গদ্য সংলাপের রূপ লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের অন্তর্মুখী পরিচয় অভিন্ন—

২০

আমাদের বাড়ীর মিনি কি তোমাদের বাড়ী গেছে ?—গেছে।
রাজার পাতের দুধ ভাত কি খাইছে ?—খাইছে।
রাজার খাটের তলায় কি শুইছে ?—শুইছে।

তাকে দিয়ে কি আসবে ?—আসবে।
আয় মিনি মিনি মিনি মিনি।—বরিশাল

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি একই আঙ্গিকের সহায়তায় রচিত হইলেও, ইহার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক গৌণ—ইহা গল্প বলার খেলা মাত্র। ইহার মধ্য দিয়া ছড়া রচয়িত্রীর যে বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হইবে যে, ইহাতেও পরিণত-বুদ্ধির স্পর্শ রহিয়াছে ; ইহা নিতান্তই শিশুর সৃষ্টি নহে। ছড়াটি একটি ভূমিকা দ্বারা এইভাবে সূত্রপাত করিতে হয়। এই প্রকার খেলার মধ্য দিয়াই জীবনের শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

২১

এক চাষা হাট থেকে ষোলটা কৈ মাছ কিনে আনে। চাষা বৌ লোভের বশে পনরটা খেয়ে ফেলে। চাষা খেতে বসে পাতে একটা কৈ মাছ দেখে রেগে গিয়ে স্ত্রীর কাছে হিসেব চায়। চাষা বৌ কিন্তু খুব চালাক—

চাষা—ষোল কৈ শুনিয়ে,
বৌ—দুটো গেল তবে পালিয়ে।
চাষা—তবুতো রইল চৌদ্দ ?
বৌ—দুটো নিয়েছে খোকার বৈদ্য।
চাষা—তবুতো রইল বারো ?
বৌ—হারিয়ে গেল দুটো আরো।
চাষা—তবুতো রইল দশ ?
বৌ—দুটো দিয়ে কিনেছি রস
চাষা—তবুতো রইল আট ?
বৌ—দুটো দিয়ে কিনেছি কাঠ
চাষা—তবুতো রইল ছয় ?
বৌ—ঘরে আছে রোগা ছেলে,
তার জন্য দুটো রয়।
চাষা—তবুতো রইল চার ?
বৌ—পাশের বাড়ী গিন্নি এসে
দুটো নিয়েছে ধার

চাষা—তবুতো রইল দুই ?
বৌ—মোর জন্য একটা থুই।
চাষা (রেগে)—তবুতো রইল এক ?
বৌ (হেসে)—চক্ষু চেয়ে পাতের দিকে ত্যাখ।
আমি হই বড় মান্ষের ঝি।
তাই একে একে তোকে হিসেব দি।
আর তুই যদি হোস্ বড় মান্ষের পো।
কাঁটাটুকু খেয়ে মাছটুকু আমার জন্য থো।
—২৪ পরগণা

নিম্নোদ্ধৃত অনুরূপ ভাবাপন্ন ছড়া দুইটির মধ্যে প্রশ্নটি শুনিতে পাওয়া না গেলেও উত্তর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। গৃহিণী গৃহকর্তার নিকট তাহার তৈল খরচ করিবার হিসাব দাখিল করিতেছে—

২২

আন্ছিলে ত এক কড়ার তেল,
শোন্ না কিয়ৎ কিয়ৎ গেল।
মাইয়ার মাথায় ছেইলার গাও,
তোর মোছে আমার পাও।
তিনের হাট খাইলাম ডাইল,
দুইজন অতিথ আইছিল কাইল।
চাহিয়া নিল অই পাড়ার পিসি,
আমি নাকি তেল লাগাই বেশি।—মৈমনসিং

তিনের হাট শব্দ দুইটির একটি বিশেষ অর্থ আছে ; সপ্তাহে যেখানে দুইবার হাট হয়, সেখানে তিন দিনের পর যে হাট হয়, তাহাকে তিনের হাট ও পাঁচ দিনের পর যে হাট হয়, তাহাকে পাঁচের হাট বলে। এই প্রকার বাংলার নিজস্ব ভাষার সঙ্গে বাংলার ছড়ায় পরিচয় লাভ করা যায়। উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়া অহেতুক আনন্দরসের পরিবর্তে যে কঠিন বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইল, তাহাতেও সংসারাভিজ্ঞতার স্পর্শ রহিয়াছে। খেলার ভিতর দিয়াই শিশুরা জীবনের শিক্ষা পাইয়া থাকে।

২৩

এই ঘরে বাতি হৈহ ঘরে বাতি,
আরও রান্ধ্‌ছি ছালুন পাতি।
পুলার মাথায় পুরীর গায়,
তোর দাড়িতে মোর পায়।
কিঞ্চিৎ খাইছি গরম ভাতে,
কিঞ্চিৎ খাইছি ভাজা মাছে।
পাড়ার সর্বনাশীরারে,
কিছু কিছু দিছি ধারে।
বাকি কিছু আছিল তা'ত,
উল্টা লাগ্যা পড়্যা গেছে গা
উন্দুরের গাত'।—ঐ

পুলা শব্দের অর্থ পুত্র এবং পুরী শব্দের অর্থ কন্যা। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিও একটি করুণ রসাশ্রিত বাস্তব কাহিনী ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়াই এই করুণ কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে; ইহার মধ্য দিয়া বিশেষ কোন যুগের সামাজিক জীবনের অনিশ্চয়তার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা বাংলার ঐতিহাসিকের পক্ষে লক্ষণীয়—

২৪

দূত। রাজার খবর আইলো।
সব মেয়ে। কি খবর আইলো?
দূত। একটি বালিকা চাইলো।
সব মেয়ে। কোন্‌ বালিকা চাইলো?
দূত। চাঁপা বালিকা চাইলো।
সব মেয়ে। (একজনকে দেখাইয়া) নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।
দূত। বড় আনন্দিত হইলাম।
সব মেয়ে। বড় দুঃখিত হইলাম।

সমাজের একদিনের একটি সকরুণ ঘটনা কালক্রমে যে কি ভাবে খেলায় পরিণত হইয়াছে, তাহা এখানে দেখা যাইতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি রবীন্দ্র-সংগ্রহের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পর্কে নিজেই বিস্তৃত আলোচনাও করিয়াছেন। ছড়াটি এক দিক দিয়া যেমন সৌন্দর্যবোধ তেমনই আর এক দিক দিয়া বাস্তব জীবনবোধে সমুজ্জ্বল। ইহাকেও প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়ারই অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা যায়—

২৫

'জাদু, এ তো বড় রঙ্গ, জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥'
'কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥'

'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥'
'বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তা হ'তে অধিক ধলো কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥'

'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥'
'জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥'

'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥'
'নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর॥'

'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥'
'হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥'

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

মনে হয়, এই ছড়াটি একটি বিস্মৃত রূপকথার অংশ: কারণ, ইহার মধ্যে রূপকথায় আমেজ আছে। অনেক সময় কাহিনীটি বিস্মৃত হইয়া গেলেও কবিত্ব গুণে ইহার বিশিষ্ট গীতিভাবাপন্ন অংশগুলি সমাজ-মানসে স্থায়িত্ব লাভ করে। মার্কিন দেশের লোক-সাহিত্য সংগ্রহে অনুরূপ একটি ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেখানেও ইহা একটি সুপরিচিত রূপকথার অংশ মাত্র। মার্কিন দেশীয় ছড়াটি এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

'What is whiter,
What is whiter,
Than any sheep's down
In General Cling town ?'

'Snow is whiter,
Snow is whiter,
Than any sheep's down
In General Cling town.'

'What is greener,
What is greener,
Than any wheat growed
In General Cling town ?'

'Grass is greener,
Grass is greener,
Than any wheat growed
In General Cling town.'

'What is bluer
What is bluer
Than anything down
In General Cling town ?'

'The sky is bluer,
The sky is bluer,
Than anything down
In General Cling town.'

'What is louder,
What is louder,
Than any horns down
In General Cling town ?'

'Thunder is louder,
Thunder is louder,
Than any horns down
In General Cling town.'

উপরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত যে বাংলা ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে চারি কালো, ধলো, রাঙা, তিতো এবং হিম দেখাইবার কথা থাকিলেও চারি মিষ্টি দেখাইবার কথা নাই। স্বতন্ত্র একটি ছড়ায় চারি মিঠারও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—

২৬

দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী।
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী ॥—রংপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিও একটি প্রশ্নোত্তরবাচক খেলা। কয়েকটি ছেলে গাছে চড়ে, নীচে দাঁড়াইয়া একটি ছেলে প্রশ্ন করে ও উত্তর পায়—

২৭

গাছছুয়া রে গাছছুয়া,
গাছ ক্যারে ?—বাঘের ডরে।
বাঘ কই ?—মাটির তলে।
মাটি কই ?—এই ত।
তোরা কয় ভাই ?—সাত ভাই।
এক ভাই দিবে ?—ছুঁইতে পারলে নিবে।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়াটি ঘোড়া ঘোড়া খেলার ছড়া—

২৮

গাঙ্গুরে গাঙ্গুরে,—কিরে গাঙ্গু ?
দাও দে।—দা কি কততি ?
বাঁশ কাটতাম।—বাঁশ কিত্তি ?
ঘর উড়াইতাম।—ঘর কিত্তি ?
বুড়ী থাকৃত।—বুড়ী কিয়ত্ত ?
ফুতা কাটত।—ফুতা কিয়ত্ত ?
খইলতা খিলাইত।—খইলতা কিয়ত্ত ?
টেহা রাখ্‌ত।—টেহা কিয়ত্ত ?
ঘোড়া কিনত।—ঘোড়া কিয়ত্ত ?
মামুর বাড়ীত যাইত।
ছেঁইও বদর—চেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ॥—নোয়াখালী

ইহারই একটি পাঠান্তরে শুনিতে পাওয়া যায়—

২৯

ঘুঙ্গি লো ঘুঙ্গি, কি লো ঘুঙ্গি ?
দাও দে। দাও ক্যারে ?
বাঁশ কাটতাম।—বাঁশ ক্যারে ?
ঘর তুলতাম।—ঘর ক্যারে ?
বুড়ী থাকৃত।—থাকৃত ক্যারে ?
স্থতা কাটৃত।—স্থতা ক্যারে ?
কাপড় বুন্‌ত।—কাপড় ক্যারে ?
পিন্‌ত।—পিন্‌ত ক্যারে ?
কলাপাতা পিন্‌ধ্যা থাকৃব কদ্দিন ?—ঢাকা

ধারাপাতের নামতাও যে কখনও কখনও খেলার ছড়ার মধ্য দিয়া কি ভাবে কবিতা হইয়া উঠে, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

৩০

চাক্কুলাটা—পানের বাটা,
চাক্কু দুই—তুলে থুই,
চাক্কু তিন—ঘোড়ার ডিম,
চাক্কু চার—পগার পার,
চাক্কু পাঁচ—ধিন্‌তা নাচ,
চাক্কু ছয়—খুকুর জয়,
চাক্কু সাত—কুপোকাৎ,
চাক্কু আট—গড়ের মাঠ,
চাক্কু নয়—বাঘের ভয়,
চাক্কু দশ—খেজুর রস,
চাক্কু এগার—ফক্কা গেরো,
চাক্কু বারো—কিস্তি মারো ॥—ঢাকা

ইহাকে যথার্থ প্রশ্নোত্তরবাচক খেলার ছড়া বলা যায় না, তবে ইহাতে তাহার কিছু কিছু লক্ষণ আছে এই মাত্র।

বুড়াবুড়ী

কতকগুলি খেলার ছড়ায় সাধারণতঃ বুড়াবুড়ী, বিশেষতঃ বুড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেক দেশেরই লোক-কথায় বুড়ীর গল্প শুনিতে পাওয়া যায় ; বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর লোক-কথার (folk-tale) অভাব নাই। ইংরেজিতে ইহাকেই old lady motif বলে। বাংলাদেশেও চাঁদের বুড়ী, পান্তা বুড়ী, উকুনে বুড়ী ইত্যাদির গল্প প্রচলিত আছে। বয়সের আধিক্য বশতঃ বুড়ীর কর্মশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদির যে অভাব দেখা যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহার সম্পর্কে আনন্দোদ্দীপক কাহিনী রচিত হইয়া থাকে। বুড়াবুড়ীর আচরণ শিশু-দিগের নিকট কৌতুককর বিবেচিত হয় বলিয়া খেলার ছড়াতেও এই শ্রেণীর রচনা আসিয়া সহজেই প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে কতকগুলি নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল।

মনে হইতেছে, অবোধ একটি শিশুকে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে এই বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইতেছে—

১

গাঙ্গে দিয়া ভাস্যা যায় রে আট্যা কলার ছড়ি,
আমার ভাইয়েরে বিয়া করাইবাম ঝন্‌ঝনান্যা বুড়ী।
বুড়ীর দাঁতে মিশি,
ভাই দেখ্যা খুসি।
বুড়ীর মাথায় পাক্‌না চুল,
লট্‌কিয়া রইছে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে,
ভাই নাচে আনন্দে।—ঢাকা

চাঁপা ফুলের গন্ধটি আসিয়া এখানে 'ঝন্‌ঝনান্যা বুড়ী'র চিত্রটি অস্পষ্ট করিয়া দিল, তাহাতেই ভাইটি জীবনের এক চরম সঙ্কটের মধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গেল। বর্ণনার গুণে বুড়ীটি এখানে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—

এক যে ছিল বুড়ী,
দিত হামাগুড়ি।
তামাক খাইত গুড়গুড়ি,
চিড়া খাইত চুরচুরি।

নাকে দিত সুড়সুড়ি;
পান খাইত চাপুর চুপুর
নাতিন জামাইর বাড়ী।—ঐ

বয়সের আধিক্যের জন্য যে বুড়ী হামাগুড়ি দিয়া চলে, সে তামাক খাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিলেও যে চিড়া খাইতে পারে, তাহা কদাচ সম্ভব নহে; সুতরাং এই চিত্রও অতিরঞ্জিত এবং অতিরঞ্জিত বলিয়াই কৌতুককর।

এক বৃদ্ধের দাম্পত্য জীবনের একদিনের অশান্তির কথা ছড়ার মধ্যে এইভাবে গাথা হইয়া গিয়াছে। বুড়ী প্রচার করিতেছে—

৩

বুড়া আমায় মারিছে,
আঙ্গুল আমার ভাঙ্গিছে।
ভাঙ্গা আঙ্গুলে আমার আংটি পরাইছে॥
তোমরা হাস্য না গ বাপুরা,
বুড়া আমায় মারিছে।
হাত আমার ভাঙ্গিছে।
দেখ আমার ভাঙ্গা হাতে চুরি পরাইছে॥
তোমরা হাস্য না গ বাপুরা,
বুড়া আমায় মারিছে॥

প্রহারের ফলে যেখানে হাতের আঙ্গুল এবং হাত দুই-ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেখানে হাসির বিষয় কিছুই নাই; না বলিয়া দিলেও কেহ এই বিষয়ে দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতে যাইত না; কিন্তু বুড়া প্রহারান্তে অনুশোচনা করিয়া বুড়ীর ভাঙ্গা আঙ্গুলে যে আংটি এবং ভাঙ্গা হাতে যে চুড়ি পরাইয়াছে তাহার ফলেই হাস্য অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, শত অনুনয় বিনয়েও এই হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব।

বুড়ীর সঙ্গে চরকা দিয়া সূতা কাটিবারও একটি সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। যে দিন এদেশে চরকার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ পল্লীর আকাশ মুখরিত করিয়া রাখিত, সেইদিন পরিবারের বৃদ্ধাদিগের ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অথচ সহজ কর্তব্য

ছিল। সেই জন্যই চরকার সঙ্গে বুড়ীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আমরা জানি, চাঁদের বুড়ী চাঁদের মধ্যে বসিয়া চরকা দিয়া সুতা কাটে।

৪

ও বুড়ী সুতা কাট,
কাইল হইব গঞ্জের হাট।
গঞ্জের হাটে যাইব না,
চরকি মরকি আন্‌ব না।
চরকি আমার ঘুরে,
নাতিন জামাই লড়ে॥—ঢাকা

বৃদ্ধাদিগকে প্রতারণা করিয়া গ্রাম্য বালকেরা তাহার গাছের ফল খাইয়া পলাইয়া যায়, বাংলার গ্রাম্য জীবনে বালকদিগের ইহা নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয়; তাহা লইয়াও খেলার ছড়া রচিত হইয়াছে—

৫

ঝিঁও ঝিঁও ঝিঁওলা.
বুড়ীর বাড়ীর পিয়ালা।
পিয়ালা খাইতে গেলাম,
কাঁটা ফুটি আইলাম।
কাঁটায় কাঁটায় শূলানি,
বুড়ী দিল দৌড়ানি।—ত্রিপুরা

উপরে যে পিয়ালা শব্দটি পাইলাম, তাহার অর্থ পেয়ারা, এ'বার কুল বা বরই'র কথা শুনিতে পাইব—

৬

মাগো মা বরই খাইতে গেছিলাম,
কাঁটার মধ্যে পড়ছিলাম।
কাঁটায় লইল শূলানি,
বুড়ইয়ায় লইল দৌড়ানি।

ও বুড়ইয়া দৌড়াইছ কা,
বুড়াইয়া গেছে হাটে,
গাই বিয়াইছে মাঠে।
নোলা দীঘির ঘাটে,
ঘোড়ায় ঘাস কাটে।
সুন্দরীরে দেখ্যা,
হাপুর হুপুর নাচে।—ঢাকা

এক বুড়াবুড়ীর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এই চিত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়—

৭

শাকে ভাতে রান্ধে,
কলা গাছে টাঙ্গে।
কলা হইল বাত্তি,
বুড়ীর মাথাত ছাতি।
কলা হইল লাল,
বুড়ী ফুলায় গাল।
ছাতি নিল উড়াইয়া,
বুড়ী কান্দে দৌড়াইয়া।
কলা খায় বান্দরে,
বুড়ী মারে বুড়ারে।
ও বুড়ী কান্দ্য না,
বুড়ীরে আর মাইর না।
ঘরে আছে জামাই,
তারে দিয়া আনাই।
ঘরের পিছে হাঁইট্যা ধান,
কেচর কেচর কাট্যা আন।—ঐ

শিশু রচিত খেলার ছড়া বলিয়া ইহাদের মধ্যে সুনিবিড় জীবন-চিত্র ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না, কেবলমাত্র ব্যঙ্গের ভাবই সর্বত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বালকেরা অনেক সময় নিজেরাই বুড়াবুড়ীর অভিনয় করিয়া থাকে। অভিনয়ের মধ্য দিয়া একজন বুড়া বলিয়া পরিচিত হয়, আর একজন বুড়ী বলিয়া পরিচয় লাভ করে। কোন সাজ সজ্জা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ ভাবেই তাহারা একজন বুড়া ও একজন বুড়ীর সংলাপগুলি অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া যায়—

৮

বুড়া। ভাত রান্ধ্যা দেও তুমি,
হাল বাইতাম যাইবাম আমি।
বুড়ী। ভাত রান্ধতাম পারতাম না,
বাপের বাড়ীত যাইবাম গা।
বুড়া। বাপের বাড়ীত যাইবা তুমি,
চুল ধইরা আনবাম আমি।
(কেশাকর্ষণ)
বুড়ী। চুল ধইরা আন্‌বা তুমি,
লেছুড় দিয়া থাকবাম আমি।
বুড়া। লেছুড় দিয়া থাকবা তুমি,
কান্ধে কইরা আন্‌বাম আমি।
বুড়ী। কান্ধে কইরা আন্‌বা তুমি,
ছেপ্‌ (থুথ্‌) দিয়া পলাইবাম আমি।
বুড়া। ছেপ্‌ দিয়া পলাইবা তুমি,
বানার নদীত ধুইবাম আমি।
বুড়ী। বানার নদীত ধুইবা তুমি,
পানির তলাত পলাইবাম আমি।
বুড়া। পানির তলে পলাইবা তুমি,
জাল দিয়া ছাঁকবাম আমি।
বুড়ী। জাল দিয়া ছাঁক্‌বা তুমি,
কাঁকড়ার গাত' পলাইবাম আমি।
বুড়া। কাঁকড়ার গাতাত্‌ পলাইবা তুমি,
কোদাল দিয়া তুলবাম আমি।

বুড়ী। কোদাল দিয়া তুলবা তুমি,
ছন ক্ষেত' পলাইবাম আমি
বুড়া। ছন ক্ষেত পলাইবা তুমি,
আগুন দিয়া পুড়বাম আমি।
বুড়ী। আগুন দিয়া পুড়বা তুমি,
তোমারে থইয়া মরবাম আমি।
বুড়া। আমারে থইয়া মরবা তুমি,
তোমার সাথে যাইবাম আমি।—মৈমনসিং

বৃদ্ধার এই চরম ভীতি প্রদর্শন যে, সে বৃদ্ধকে রাখিয়া মরিবে, তাহাই বৃদ্ধকে শেষ পর্যন্ত বিচলিত করিয়া দিল। এই শ্রেণীর মৌখিক ছড়ার মধ্য দিয়াই একদিন লিখিত নাটকের রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, লোক-নাট্যের ইহা একটি আদিরূপ।

কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের আকাশের নীচে বসিয়া রৌদ্রের আশায় ছেলেরা এই ছড়া বলিয়া শীত হইতে পরিত্রাণ পাইবার দৈব উপায়ের আশ্রয় নেয়—

চান্দের মাগো বুড়ী,
ঘেঁচু কুড়িতে গেলি।
সাতখান কাপড় পা'লি,
সাত বউয়েরে দিলি,
নিজে মর্‌লে জারে,
কলা গাছের আড়ে॥
গাঙ্গের পারে চাম্পা ফুল,
চন্‌চনাইয়া রৈদ তুল॥—ঢাকা

মনে হয়, শেষ দুইটি পদ স্বতন্ত্র ছড়ার একটি অংশ; কেবল মাত্র রোদ তুলিবার প্রার্থনার প্রয়োজনে বুড়ীর জীবনবিষয়ক এই ছড়ার সঙ্গে আসিয়া তাহা যুক্ত হইয়াছে।

বিবিধ

ছেলেমেয়েদের খেলার যেমন অন্ত নাই, তেমনই খেলার ছড়ারও অন্ত নাই। তবে গুরুত্বপূর্ণ একই বিষয় লইয়া যেমন বহু ছড়া রচিত হইয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে এক একটি খেলা অবলম্বন করিয়া একই প্রকৃতির কয়েকটি ছড়া রচিত হয়, সেইজন্য ইহাদের বৈচিত্র্য যত বেশি, গভীরতা তত নাই। বিভিন্ন খেলার সঙ্গে সংযুক্ত আরও কয়েকটি ছড়া এখানে উদ্ধৃত করা হইল; ইহাদের অনেক ক্ষেত্রেই খেলাগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ছড়াগুলি কোন প্রকারে এখনও আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে; তথাপি বাংলার লৌকিক ছন্দ ও ছড়ার বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার জন্য ইহাদের অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

রথযাত্রা বাংলাদেশের একটি বিশেষ উৎসব। রথ দেখা বিষয়ে কয়েকটি ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীতে, নগরের উপকণ্ঠে রথযাত্রা যখন আসন্ন হইয়া আসে, তখন ছেলেরা এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাদের সঙ্গে বিশেষ কোন খেলার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না—

১

ও পাড়ার ময়রা বুড়ো,
রথ করেছে তের' চুড়ো,
তোদের হলুদ মাখা গা,
তোরা রথ দেখতে যা।
আমরা পয়সা কোথায় পাব,
আমরা উল্টো রথে যাব।—২৪ পরগণা

গায়ে হলুদের মত দেশীয় প্রসাধন বস্তু মাখিতে পারিলেই যে রথ দেখার অধিকার হয়, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না; দেখা যাইতেছে, গায়ে হলুদ মাখা সত্ত্বেও যদি হাতে পয়সা না থাকে, তবে খেলার জগতেও কোন অধিকার সৃষ্টি হইতে পারে না। এই কথাটিই নানাভাবে এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

২

তোদের হল্‌দি মাখা গা,
তোরা রথ দেখ্‌তে যা।

আমরা ফেরতি রথে যাব,
আমরা ঠাকুর দেখ্‌তে পাব।—২৪ পরগণা

ঠাকুর সব রথেই সমান দেখা যায়, তথাপি ফিরৃতি রথের উপর কেন যে এত জোর দেওয়া হইতেছে. তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না—

৩

মাগো রথ দেখ্‌তে যাবো,
এ' রথেতে যাব না মা,
ফেরতি রথে যাবো।
দু'জনে যুক্তি করে কাঁঠাল কিনে খাব।—ঐ

কাঁঠাল সকল রথেই সমান আমদানি হইবারই কথা, তথাপি শেষ রথ বলিয়া ফিরতি রথে দামের দিক দিয়া যদি কিছু সুবিধা হয়, শিশুমনে তাহার চিন্তা উদয় হইয়াছে বলিয়া যদি কেহ এখানে মনে করেন, তবে তিনি নিজে কোনদিন শিশু ছিলেন না, বরং পরাশর মুনির মত মাতৃগর্ভ হইতেই দাড়িগোঁপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। ইহা অকারণ আনন্দের অর্থহীন উল্লসিত অভিব্যক্তি মাত্র। এই প্রকার আরও শুনা যায়—

৪

তোদের হলুদ মাখা গা,
তোরা রথ দেখ্‌তে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাব,
আমরা উল্টো রথে যাব।—ঐ

অথচ উল্টো রথেই যে হলুদ কোথা হইতে আসিবে, তাহার কোনও আভাসও ইহাতে নাই। ইহাই খেলার ছড়ার ধর্ম।

কতকগুলি খেলার ছড়ার মধ্যে কোন এক স্থানে যাওয়া কিংবা অভিযানের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। ছড়াগুলি বিশেষত্বহীন হইলেও শিশুমানসের বিচিত্র পরিচয় ইহাদের ভিতর দিয়াও ব্যক্ত হইয়া থাকে—

৫

আমি যাব নদীয়া
গাই বাছুর বাঁধিয়া,
আমি যাব রঙ্গে,
বেলগাছটি সঙ্গে।—২৪ পরগণা

বেলগাছটি সঙ্গে করিয়া লইয়া কি ভাবে যে নদীয়া যাত্রা করা যায়, তাহা সহজে বোধগম্য না হইলেও ইহার মধ্যে খেলার আনন্দের ভাবটি সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। এই ছড়াটি ছেলেদের খেলার ছড়া হইলেও নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি যে মেয়েদের কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না—

৬

শানের ঘাটে নাইতে গেলাম
ওহে বকুল ফুল,
না হ'ল মোর সাবান কাচা,
না হ'ল মোর কাপড় কাচা
ওগো বকুল ফুল।

উপরে বকুল ফুল সইর নাম শুনিলাম. এ'বার ডুমুরের ফুলের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ডুমুরের ফুল ও বকুল ফুল কথাগুলির অর্থে পার্থক্য আছে। বকুল ফুল সইর নাম, ডুমুর ফুল ক্বচিৎ যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এমন ব্যক্তি, সুতরাং ছড়া দুইটির অর্থ এবং রসে পার্থক্য থাকিবার কথা। কিন্তু মনে হয়, এখানে সই অর্থেই ডুমুরের ফুল কথা দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে—

৭

হোটিটি বাবুর বিটি কানচি কাটা চুল,
ও বেলাতে নায়তে যাব ও ডুমুরের ফুল।—মুর্শিদাবাদ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে খেলা করিবার কথা শুনা যাইতেছে—

৮

গোলাপী তাল তলাপী
যাস্না বাগানে,

আস্‌দ পাতার খিলি করে
খেলব দুজনে।—২৪ পরগণা

খেলার মধ্যে কর্তব্য অবহেলিত হয়, মধ্যে মধ্যে মন সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠে—

৯

হেলায় বাড়ে বেলা, জলে শুকাইল ধান,
উঠ্‌ কলসী জল্‌কে যাই, ঢেকুচ কুটে ধান।—ঐ

কোন কোন খেলার ছড়ায় রহস্যলোকের এক পক্ষীর নাম শুনা যায়,

১০

হাট্টিমা টিম্‌ টিম্‌,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম ;
তাদের খাড়া দু'টো শিং,
তারা হাট্টিমা টিম্‌ টিম্‌।—ঐ

অনুরূপ একটি ছড়ায় এমনি একটি জীবের নাম পাওয়া যাইতেছে, তবে ইহা পক্ষী জাতীয় নহে—

ওপারে যেও না ভাই,
কটি টিং টিং-এর ভয় ;
তিনটে মানুষের মাথা কাটা,
পায়ে কথা কয়।—ঐ

ভোজনবিলাসী বলিয়া বাঙ্গালীর চিরদিনই একটু খ্যাতি আছে, শিশুকাল হইতেই এই জাতির মধ্যে তাহার সংস্কার গড়িয়া উঠে ; সেইজন্য এক শ্রেণীর খেলার ছড়াতেও কেবল খাদ্যের কথাই শুনিতে পাওয়া যায়—

১২

হাওড়া লেকা পতর কেটা
বাগবাজারের দই,
সকল লেকা খেয়ে গেল
হাওড়া লেকা কই।—২৪ পরগণা

নিমন্ত্রণের পাতে বসিয়া দধির আস্বাদ লাভ করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র; এ' বিষয়ে পরিবেশনকারীদিগের পক্ষপাতিত্ব সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে—

১৩

ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে :
দে দই দে দই পাতে।
ওরে দু'বার দিলি,
মোরে কি ভুলে গেলি ?
ওরা তোর বাবা খুড়ো ?
ওরা তোর মাসি পিসি
নাইক মোদের কেউ ?
গাঙ্গে ভাঙ্গছে ঢেউ,
দেখতে যাবি কেউ।—ঐ

নিমন্ত্রণের পাতে বসিয়াও যদি 'মামার জোর' না থাকে, তবে তৃপ্তির সঙ্গে আহারও হইয়া উঠে না, এই বেদনা ভোজনবিলাসীর পক্ষে পরম বেদনা, সেই বেদনার কাতরতার ভাব ছড়াটির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর আরও শুনা যায়—

১৪

আলু ভাতে পোক্
পাকাল মাছের টক্।
আজকে খাব ঘি রুটি
কালকে দাঁত ছিরুকুটি।

তারপর তামাক খাওয়ার কথা নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শুনিতে পাইয়া যদি কেহ এ' কথা মনে করেন যে, শিশুদিগের মধ্যে এই অভ্যাস প্রবেশ করিয়াছিল, তবে তিনি ইহার পরবর্তী পদটি হইতে একথাও মনে করিতে পারেন যে, শিশুদের দাড়িও গজাইত। সুতরাং খেলার ছড়ায় তথ্যের কোন মূল্য নাই। পূর্বোদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে দইয়ের উল্লেখ থাকিলেও যেমন তাহাতে প্রকৃত পক্ষে

দইয়ের কোন অস্তিত্ব নাই, এখানেও তাহা কিছু নাই, শুধু ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া অন্তরের অর্থহীন উল্লাস অভিব্যক্তি লাভ করে মাত্র—

১৫

কবিরাজের ভাই
আলা তামাক খাই।
দাড়িতে মোচড় দিয়া
কল গাড়ীতে যাই।—ঐ

১৬

শুষ্‌নি শাক উঠছে যতনে,
সে বলে চলি যতনে।
সকাল বেলায় ভোরের বেলায়
তুলতে গেলাম ফুল,
আমায় কামড়াল ভীমরুল।
সয়দাপুরের ময়দা এনে
বাগবাজারের ঘি
নন্দপুরের কলাই এনে লুচি ভেজেছি।
ও শ্যাম খাবে না ত' কি?
কাককে দেব বককে দেব, তোমায় দেব কি?

সয়দাবাদের ময়দার কথা বহু পূর্বে একবার শুনিয়াছি, এইবার যে সয়দাপুরের নাম শুনা গেল, ইহা যে সয়দাবাদেরই একটি পরিবর্তিত রূপ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু ভীমরুলের কামড়টি এখানে অসহ্য বোধ হইতেছে। এমন খাদ্যের আয়োজনের মাঝখানটিতে যেন এক দুঃসহ জ্বালা ধরাইয়া দিয়া গেল।

১৭

শশাবনে মশা খায়
আয় ক্ষুদিরাম ঘর আয়,
জল খাব না দই খাব
হাত ছেড়ে দাও ঘর যাব॥—ঐ

শশা বনে মশা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, জল পান করিবার পরিবর্তে দধি আহার করিবার ইচ্ছা আরও সম্ভব।

১৮

নিমাই নিমাই নিম পাতা,
নিমাই গেছে ক'লকাতা।
একলা মাগী তুই চাল কুটেছিস্,
কে খাবে তোর গুড় পিঠা।

কলিকাতা আধুনিক সহর, সেইজন্য ইহার নাম ছড়ায় বড় একটা পাওয়া যায় না; বরং শাঁখা শাড়ীর সূত্রে ঢাকার নাম বার বারই শুনা যায়। সুতরাং উদ্ধৃত ছড়াটি আধুনিক কালে রচিত বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি চাল কুটিয়া গুড়পিঠা তৈরী করিবার বিষয়ে ইহার গ্রাম্যতা অক্ষুণ্ণ আছে

শাঁখা সিঁদুর ছাড়াও ঢাকার 'বৃন্তহীন' একজাতীয় ফলের জন্য খ্যাতি ছিল বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে জানা যায়,—

১৯

হরম বিবি খড়ম পায়;
লাল বিবির জুতো পায়।
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই,
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, খেলার ছড়া তথ্যানুসারী রচনা নহে, সুতরাং 'বৃন্তহীন' কোন ফলই যে এখানে লক্ষ্য, তাহা নহে। বরং ইহা গ্রাম্য লোকের নিকট ঢাকা নগরীর সমৃদ্ধি সম্পর্কিত বিশ্বাসেরই পরিচয়।

আরও একটি ঢাকা সম্পর্কিত ছড়ায় কাকের বকুলবিচি খাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

২০

কাউয়া কা কা, বৈল বিচি বা খা,
সুন্দরীরে বিয়া করি ঢাকা চলি যা।—চট্টগ্রাম

সমৃদ্ধ নগরী বলিয়া মধুচন্দ্র যাপনের জন্য বোধ হয় ঢাকাই সর্বোত্তম স্থান বলিয়া মনে করা হইয়াছিল।

২১

ধহ ধহ লালার মা,
কি ভাত রান্ধে চইলও না।
হাল্যা মজুরে খাইলো না।
বাঁদীএ দাসীএ পাইলো না॥
একুলেও লাই ঐকুলেও লাই;
গুরা বাছা ঢুলের সে মনতও নাই॥—চট্টগ্রাম

রন্ধন কার্যে অপটুতা এবং কার্পণ্যের কথাই ছড়াটির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। খেলায় ধূলায় নিদ্রায় স্বপ্নে মাছের রূপই বাঙ্গালী শিশুর চোখের সম্মুখে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ায়—

২২

টেংরা মাছের ঘুর ঘুরানি
পাব্‌দা মাছের দাড়ি,
হিঁদন সেবা দেখ্‌তে যাব
চৌকিদারের বাড়ী।—২৪ পরগণা

যাত্রার পক্ষে মাছ শুভ, সুতরাং যেখানে সেবার আয়োজন হইয়াছে, সেখানে যাত্রা করিতে হইলে মাছের রূপটি স্মরণ করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বাংলার শিশু এই বিষয়ে বুদ্ধিতে প্রবীণ।

২৩

আড়া গাছে জাড়া দিলে ক্যাচলাইকা পড়ে,
তুলসী গাছে জল দিলে বতিশ টাকা পড়ে।
বতিশ টাকার ঘি কলসী সারিয়া ধানের ভাত,
সান যাইছন বিভা হিতে ষোল কোশের বাট।
বড়কি যাইছে চড়কি করতে মাঝকি যাইছে হাট,
শনকি যাইছে ঘসি কুড়েতে আইনে হবে ভাত॥—মেদিনীপুর

প্রাদেশিক ভাষার দুর্বোধ্যতার মধ্য হইতে ইহার রস ও রহস্য উদ্ধার করা কঠিন হইলেও শেষ দুইটি পদে দেখা যাইতেছে, বড় বেড়াইতে যাইতেছে, মেজো হাটে যাইতেছে, ছোট ঘসি কুড়াইতে যাইতেছে, ভাত যে কে ফুটাইবে তাহার জন্য বাড়ীতে কেহ বসিয়া নাই। পারিবারিক জীবনের একটি সমস্যার কথা এখানে আসিয়া ছড়ার সহজ আনন্দস্রোতে বাধা দিয়াছে।

কতকগুলি খেলার ছড়ার মধ্যে নৃত্যের উল্লেখ দেখা যায়, এই নৃত্য ছেলে ভুলানো ছড়ার শিশুর নৃত্য নহে ; কারণ, নৃত্যই এখানে মুখ্য নহে, অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গে এখানে নৃত্যের উল্লেখ হইয়াছে, অনেক সময় নৃত্য এখানে ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে—

২৪

লড়িয়া রে লড়িয়া,
হাতীর কান্ধায় চড়িয়া।
হাতীর কান্ধত দমা বাজে,
প্বাটেশ্বরী নাটত্ নাচে।
পাডরে জোয়ান ভাই,
বৈলছিরিদে খেলা খাই।
বৈলে ধরে থোব থোব,
চিলে মারে এক্কে ছোপ।
বাণ্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা,
পূব্ দুয়ারি মাদার কেঁটা।
মাদার কেঁটা হেট করি,
বাবু আইয়ের পাল্কীত্ চড়ি।
ছিরিপুর্গ্যা ভাঙ্গা ঘর
থাপ্ দি থাপ্ দি বকা ধর।
বকা ধাইল রোষে,
ছিরিপুর্গ্যার দোষে ॥—চট্টগ্রাম

২৫

বুড়্‌ইয়া বেড়ির পুড়ি লো,
গুয়া টুকানিত যাইবি লো ;
গুয়া টুকানিত গেছলাম,
বুড়্‌ইয়া দাদা পাইছলাম।
বুড়্‌ইয়া গেইছে ঘাইম্যা,
ছাতি ধর নাইম্যা।
ছাতির উপুর কমলা,
নাচে বিবি শ্যামলা।
নাচ নাচ শ্যামলা বুড়ি দিবাম তোমারে।
নাচ, নাচ কমলা শত দিবাম তোমারে॥—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির ছন্দের গুণে নৃত্য যেন বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে—

২৬

ঝুটকুলি লো নাইয়র স্থী কাপড় কেচে দে,
তোর বিয়াতে নাচতে যাব ঢোলক কিনা দে।
ঢোলকের ভিতর পচা পান,
তোর বর মুসলমান।—বীরভূম

এই ছড়ারই আর একটি রূপ হইতে নৃত্যের কথাটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—

২৭

বড় দিদি গো ছোড়্‌ দিদি গো গোবর ঘাটো না,
মাইতিপাড়ায় খেল্‌তে যা'ব ঝুম্‌কি কিনো না।
ঝুম্‌কির ভিতর পাকা পান,
দিদির বর মুসলমান।—মেদিনীপুর

ইহাতে নৃত্য শব্দটির উল্লেখ না থাকিলেও ছড়াটি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মন যেন পেখম ধরিয়া নাচিতে সুরু করে। ইহার ছন্দটির মধ্যেই এই গুণটি নিহিত আছে। নৃত্য বিষয়ক প্রত্যেকটি ছড়ারই এই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

কতকগুলি খেলার ছড়ার মধ্যে চরকা ও স্থতা কাটার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলার সমাজে চরকার অপ্রচলনের জন্য যদিও এই শ্রেণীর ছড়া ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে, তথাপি যে কয়টি এই বিষয়ক ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা এ' দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক বলিয়া ইহাদিগকে এখানে উল্লেখ করিতেছি—

২৮

চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
ভুয়ারে বান্ধা হাতি।
চরকা আমার আশয় বিষয়,
চরকা আমার হিয়া,
চরকার দৌলতে আমার
সাত পুতের বিয়া।
চরকা আমার ঘুরেরে
ভন্ ভন্ ভন্ ;
চরকা আমার বুকের লউ
সাত রাজার ধন।—মৈমনসিং

বাংলার সমাজ-জীবনের সমৃদ্ধিযুগের স্বপ্ন যেন এই ছড়াটির ছন্দ ও স্থরের মধ্য দিয়া ভাসিয়া আসিয়াছে।

২৯

বারই বারই স্থতা কাট,
কাইল বিহানে গোদার হাট।
গোদায় গেছে হাটে,
গোদী রইছে খাটে।
সকলে আন্ছে রুইত কাতলা
গোদায় আন্ছে ইচা,
ছুই সতীনে সল্লা কইরা
গোদারে মারে পিছা।—ঢাকা

সকলে হাটে সূতা বিক্রয় করিয়া রুই কাতলা মাছ কিনিয়া আনিল, আর গোদা কুঁচো চিংড়ি কিনিয়া লইয়া ঘরে আসিয়া উঠিল, সুতরাং দুই সতীনে তাহার জন্য যে সমবেত ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা তাহার পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে বলিয়া কেহই মনে করিতে পারিবে না।

৩০

শিল কাটুনি বিল কাটুনি তেঁতই তলে বাসা,
সাত দিন ধইরা কাটলাম সূতা জামাইর গলায় খাসা।—ঢাকা

জামাইকে একদিন নিজে হাতে সূতা কাটিয়া চাদর তৈয়ারী করিয়া উপহার দেওয়া হইত, তাহার প্রতিটি সূত্রে মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ীর আশীর্বাদ গাঁথা হইয়া থাকিত, সেই উপহার দিবার এবং পাইবার যে আনন্দ তাহা আজ আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

৩১

ফকিরর মা ফুতা কাটে,
ফুতা বড় সরু।
বিলর মাঝে মৈর্গ্যো হকুন,
উপর দি উড়ে গরু। —চট্টগ্রাম

ইহার পর মামীরও সরু সূতা কাটিবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কন্যা

এমন কতকগুলি বাংলা ছড়া আছে, ইহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন বিশেষ খেলার কোন সম্পর্ক নাই। অথচ অবসর সময়ে ছেলেমেয়েরাই তাহা আবৃত্তি করিয়া থাকে; তবে খেলাচ্ছলে যে আবৃত্তি করে, তাহা নহে—অর্থাৎ ইহাদের সঙ্গে শারীর ক্রিয়া কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার কোন সম্পর্ক নাই—ইহাদের মধ্য দিয়া অলস অবসর যাপনের আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহাদের রচয়িত্রী শিশুধাত্রী কিংবা জননী নহেন, ইহাদের রচয়িতা সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা স্বয়ং; কিন্তু তথাপি জননী কিংবা শিশুধাত্রী কর্তৃক রচিত ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির রূপ এবং ভাবের প্রভাবও অনেক সময় ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ খেলার ছড়াগুলির সঙ্গে ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, শারীর ক্রিয়া (physical action) কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার সঙ্গে খেলার ছড়ার সম্পর্ক বলিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া ভাব কিংবা রস কিছুই নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না; কিন্তু ইহাদের তাহা নহে—ইহাদের সঙ্গে শারীর ক্রিয়ার কোন যোগ নাই বলিয়া ইহারা ভাব এবং রসের দিক দিয়া নিবিড়তা লাভ করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এই শ্রেণীর ছড়াই শিশু-রচিত প্রথম সাহিত্য। ছেলে ভুলানো ছড়ার প্রভাব ইহাদের উপর কোন কোন বিষয়ে অনিবার্য হইলেও এই প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াও এখান হইতেই শিশুর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহা অবসর যাপনের অবলম্বন, অলস মনের অনায়াস সৃষ্টি, সুতরাং সাহিত্য সৃষ্টির যাহা ধর্ম, তাহা ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবার যথার্থ সুযোগও রহিয়াছে।

এই সকল ছড়া আবৃত্তি করিবার কোন সুনির্দিষ্ট সময় কিংবা উদ্দেশ্য নাই। অর্থাৎ জননী শিশুসন্তানকে ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে যেমন ঘুমপাড়ানি ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন, ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেমন কোন কোন ছেলে ভুলানো ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিংবা কতকগুলি ক্রীড়ার অনুষ্ঠানের সময় যেমন সুনির্দিষ্ট কতকগুলি খেলার ছড়া আবৃত্তি করা হইয়া

থাকে, ইহাদিগকে তেমন কোন উদ্দেশ্যে কিংবা কোন কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া আবৃত্তি করা হয় না। অবসর সময়ে আমরা যেমন চিত্তবিনোদনের জন্য সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকি, শিশুরাও তাহাদের অবসরকালীন চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে যদি কোন যোগসূত্র কাহারও থাকে, তবে প্রকৃতিলোকের সঙ্গেই তাহা আছে. অন্য কাহারও সঙ্গে তাহা নাই। যেমন, বাদলার দিনে চারিদিক যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, তখন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া ছেলেমেয়েরা যে নিষ্ক্রিয় মুহূর্তগুলি যাপন করে, সেই সময়ে তাহারা সেই পরিবেশ অনুযায়ী এক একটি বাদলার ছড়া আবৃত্তি করে। তাহাদেরই একটি ছড়া শিশু রবীন্দ্রনাথকে যে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা আমরা সকলেই জানি ; তাহাই 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।' টাপুর টুপুর করিয়া আকাশ হইতে গাছের পাতায়, গাছের পাতা হইতে মাটির উপর যখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন অনন্ত শিশুরাজ্যের হৃদয়-কন্দরে এই ছড়াটি আপনা হইতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে কোন খেলা যুক্ত হয় নাই, কিংবা নৃত্যেরও অনুষ্ঠান হয় না। কেবল পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিলোকে শ্রাবণের যে ধারা বর্ষণ হইতে থাকে, তাহারই তালে তালে শিশুহৃদয় দুলিতে থাকে। এমনই ভাবে যদি কখনও দেখা যায় যে. বৃষ্টিপাতের সময় সহসা এক ঝলক রোদ উঠিয়াছে, তৎক্ষণাৎ শিশুচিত্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া ছড়া বলিয়া উঠিবে. 'রৌদ্র উঠে বৃষ্টি পড়ে, শেয়াল মামা বিয়ে করে, টোকা মাথায় দিয়ে।' অন্যথায় এই ছড়া কেহ স্মরণও করিবে না। এমনই ভাবে 'বৌ কথা কও' পাখী যখন মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া যাইবে. তখন তাহার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া শিশুরা একটি ছড়া বলিতে থাকিবে। তারপর সেই পাখীর ডাক যখন বহু দূর দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে, তাহার আর শেষ রেশটুকুও শুনিতে পাওয়া যাইবে না, তখন তাহারা ছড়াটি আবৃত্তি করা শেষ করিবে। সুতরাং শিশুর অলস অবসর যাপনের সুনির্মল আনন্দ ইহাদের মধ্য দিয়া অতি সহজেই অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে।

এই প্রকার অলস অবসর যাপনের মধ্য হইতেই প্রত্যেক সমাজের সাহিত্য সৃষ্টিরও প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। শিশুসমাজের পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিশুর এই অলস অবসরের মধ্যেই তাহার মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টির

প্রথম প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিয়াছিল ; কারণ, অবসরকালীন অলস চিন্তার মধ্য দিয়াই একদিন অলক্ষিতে জীবনের কথাও ইহাদের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কারণ, জীবনকে বাদ দিয়া কোন চিন্তাও যে কখনও রূপ লাভ করিতে পারে না। অলস চিন্তায় অবচেতন কিংবা অচেতন মনেরই বিকাশ হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর ছড়াগুলির মধ্য দিয়াও তাহাই হইয়াছে। সেইজন্য এই ছড়াগুলি অনেক সময় বাস্তব জীবন-রসে রসায়িত হইয়া উঠিয়াছে ; অর্থাৎ ইহাদের সম্পর্কে এ'কথাও বলা যায় যে, ইহারা জীবনধর্মী। জীবনধর্মিতা সাহিত্যের অপরিহার্য গুণ, এই গুণেই ইহাদের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-মূল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক সময় ইহাদের মধ্য হইতে উপন্যাস এবং নাটকের বীজ, অঙ্কুর কিংবা ছিন্ন টুকরার সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর ছড়ার বিষয় প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ পারিবারিক জীবন, কোনও অপ্রত্যক্ষ রোমান্টিক চেতনা নহে। পারিবারিক জীবনের প্রধানতঃ নারীচরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহারা রচিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সাধারণভাবে ইহাদিগকে নারীজীবনাশ্রিত ছড়া বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। নারীজীবনের মধ্যেও প্রধানতঃ নারীর কন্যারূপ বিবাহবিষয়টি অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীর ছড়া এবং পারিবারিক জীবন অবলম্বন করিয়া আর এক শ্রেণীর ছড়া রচিত হয়।

পূর্বোদ্ধৃত ছেলে ভুলানো বিবাহ-বিষয়ক ছড়াগুলির সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য এই যে, ছেলে ভুলানো বিবাহের ছড়াগুলি স্বপ্নধর্মী, কিন্তু ইহারা বাস্তবধর্মী ; সেইজন্য সাহিত্যের বিচারে ইহাদের মূল্য অধিক।

কৃষিজীবী সমাজের পারিবারিক জীবনের মধ্যে নারীর স্থানই প্রধানতম ; সেই সূত্রে পারিবারিক বিষয়ক বাংলার ছড়াগুলির মধ্যে নারী-চরিত্র সম্পর্কে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

পারিবারিক নারীজীবনের দুইটি প্রধান ভাগ—একটি বাস্তব বা গার্হস্থ্য জীবন, আর একটি আচার (ritual) জীবন। বাস্তব জীবনের মধ্যে নারী কোথাও কন্যা, কোথাও বধূ, কোথাও জননী ইত্যাদি সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ ; আচার জীবনের মধ্যে তাহার এই প্রকার ব্যক্তিগত পরিচয় কিছু নাই, সেখানে নারী ব্রতিনী বা ব্রত কিংবা আচারের অনুষ্ঠানকারিণী। নারীর এই দুইটি বিভিন্নমুখী জীবন আশ্রয় করিয়াই লোক-সাহিত্যে অগণিত ছড়া রচিত হইয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়া সমাজের ব্যক্তি-চরিত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয়

একদিক দিয়া যেমন ফুটিয়া উঠে, আবার অন্যদিক দিয়া তেমনই নারীর আচার জীবনের পরিচয়ও প্রকাশ পায়।

ছড়ায় পারিবারিক চরিত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানই অধিকার করিয়া আছেন জননী; কেবলমাত্র নারী-চরিত্রের মধ্যেই নহে, পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যেই জননীর স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত হইয়াছে—

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
আজ হতে জানিলাম মা বড় ধন॥

এই প্রকার অকপট মাতৃ-বন্দনায় বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি মুখর হইয়া আছে—

মাসি বল পিসি বল মায়ের সমান নাই।
চিড়ে বল মুড়ি বল ভাতের সমান নাই॥

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, কৃষিজীবী সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবনে জননীর যে স্থান, সে স্থান আর কাহারও নাই। বাংলার সংস্কৃতি কৃষি-জীবনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সেইজন্যই বাংলার নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য-ধারায়ও জননীর এই স্থানটি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পশুচারণশীল যাযাবর জাতির পারিবারিক জীবনে জননীর কোন স্থান নাই; এমন কি, তাহার উল্লেখ পর্যন্ত বিশেষ দেখা যায় না। কৃষিজীবী সমাজে পিতারও সেই স্থান, তাহারও বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কচিৎ যে উল্লেখ কোন কোন স্থানে দেখা যায়, তাহাও অভিমানাহত সন্তানের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথায় পূর্ণ হইয়া থাকে; যেমন, কন্যা শ্বশুর বাড়ী যাইবার কালে পিতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছে—

আল্‌তা নুড়ি গাছের গুড়ি জোড়া পুতুলের বিয়ে।
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে॥

পিতা অর্থপিশাচ, অতিরিক্ত অর্থের লোভে কন্যাকে বহুদূরাঞ্চলে বিবাহ দিয়া পাঠাইয়া দিতেছেন, এখানে কোন কোন সমাজের কন্যা-বিক্রয় প্রথা (marriage by purchase)র উল্লেখ করা হইতেছে।

কিংবা শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় কন্যা সকলের সঙ্গেই স্নেহ-সম্পর্কের কথা স্মরণ করিতেছে, যেমন—

ঠাকুর মা কেন কাঁদ সিঁদুরের চুপ্‌ড়ি ধ'রে।
কাল যে ঠাকুর মা সিন্দুর দিলে কপাল পতা করে॥
মা কেন কাঁদ গো দুধের হাঁড়ি ধ'রে।
কাল যে মা দুধ দিলে বাটি পতা ক'রে॥
বৌদি কেন কাঁদ গো ভাতের হাড়ি ধ'রে।
কাল যে বৌদি ভাত দিলে থালা পতা ক'রে॥

ঠাকুর মা, মা, বৌদির সম্পর্কে এই পরম স্নেহনিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়াও কন্যাটি পিতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—

বাবা কেন কাঁদ গো চালের বাতা ধ'রে।
কাল যে বাবা মেরেছিলে চালের বাতা দিয়ে॥

পিতার সম্পর্কে কোন স্নেহস্মৃতির অবশেষ মাত্র নাই, কেবল মাত্র স্নেহহীনতার অভিযোগটুকু লইয়া অভিমানিনী কন্যা তাহার এতদিনের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এক জায়গায় অর্থলোভের অভিযোগ, অন্যত্র নিষ্ঠুরতার অভিযোগ কন্যার নিকট হইতে পিতার ভাগ্যে জুটিল; কিন্তু জননীর অকৃপণ স্নেহের দাক্ষিণ্যের কথা কোন দিন সে বিস্মৃত হইল না।

এই জননীরই আর একটি পরিচয় আছে, সেখানে তিনি শাশুড়ী; সেখানে কন্যার সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তে অন্যের গৃহ হইতে আনীত পরের কন্যার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক; এখানে সেই জননীরই আর একটি রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাশুড়ী বধূর নিকট ভয়ের পাত্রী, তাঁহার যে স্নেহ অকৃপণ দাক্ষিণ্যে কন্যার দিকে প্রসারিত হইয়া যায়, তাহারই ধারা এখানে পরের কন্যার জন্য শুষ্ক হইয়া যায়। শাশুড়ীর অভাবে বধূর মনে স্বাধীনতার আহ্লাদ জাগিয়া উঠে—

শাউড় নাই ননদ নাই কারে করমু ডর।
আগে বাড়মু ভিজ্যা ভাত পাছে মুছমু ঘর॥

শাশুড়ীর সঙ্গে বধূর ভয়ের সম্পর্ক বলিয়াই ভক্তির কিছুমাত্র অস্তিত্ব তাহার অন্তরে নাই, তাহার মৃত্যু তাহার পরম স্বস্তির কারণ। বাংলার নানা প্রবাদ ও ছড়ার ভিতর দিয়া এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়া থাকে—

শাশুড়ী মল সকালে।
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে
তবে কাঁদব আমি বিকালে॥

কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার সময়ই কন্যার জননী কি ভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিতে পারা যাইবে, তাহার ব্যবস্থা করিতে ভুলেন না। তাঁহার প্রসন্নতার উপরই তাঁহার কন্যার পারিবারিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে, সেই জন্য কন্যার জননী

উড়কি ধানের মুড়কি দিল শাশুড়ী ভুলাতে।

আগেকার দিনের শাশুড়ীকে ভুলাইবার জন্য বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন হইত না, উড়কি ধানের মুড়কির মত নিতান্ত সামান্য উপকরণেই তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু ক্ষুধার ধর্মই হইতেছে, ইহা কেবল বাড়িয়াই চলে, কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হয় না, সেইজন্য উড়কি ধানের মুড়কি ভেট্ পাইয়াও তাঁহাদের লালসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই।

বাংলার ছড়া বাঙ্গালী জননীর এই দ্বিধাবিভক্তি চরিত্রের বাস্তব পরিচয়ে সার্থক হইয়াছে। কন্যা চরিত্রেরও দুইটি রূপ, এক পরিবারে যেমন সে কন্যা, অপর পরিবারে সে তেমনি বধূ। এই দুইটি চরিত্রের পরিচয় স্বতন্ত্র। পিতৃগৃহে সে স্নেহাশীলা কন্যা, পরের সংসারে বধূ হইয়া যাইবার ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় পরিবারের সকলের অকুণ্ঠ স্নেহ সে প্রাণ ভরিয়া লাভ করে। পিতৃগৃহে তাহার জীবন বিকাশ লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্পর্কিত একটি আশঙ্কা ছায়ার মত তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কা তাহার আসন্ন পরগৃহে যাইবার আশঙ্কা। অথচ এই আশঙ্কাই তাহার সঙ্গে স্নেহ সম্পর্কটিকে নিবিড় ও মধুর করিয়া তোলে—

তনয়া পরের ধন
বুঝিয়া না বুঝে মন
হায় হায়, একি বিড়ম্বন বিধাতার।

কন্যার সঙ্গে বিচ্ছেদ যখন অনিবার্য হইয়া উঠে, তখন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠে, তাহা এক দিক্ দিয়া যেমন করুণ, আর এক দিক্ দিয়া তেমনই পবিত্র—

বাপ যায়রে নায়ে নায়ে খুড়ো যায়রে তড়ে।
শিশুকালে হৈল বিয়া সদাই আগুন জ্বলে॥
খুড়ী কান্দে জেঠী কান্দে সকল কান্দে পর।
মা জননী কান্দে যে গো বেলা আড়াই পর॥
খুড়ীলো জেঠীলো মা'কে না যা ঘরে।
মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে॥

বাস্তব কন্যা-স্নেহের এমন করুণ চিত্র উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 'মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে'—ইহার মধ্যে করুণতম বেদনার অভিব্যক্তি দেখা যায়। সকল দুঃখই বালিকা সহ্য করিতে পারে, সহ্য করিতে হয়; কিন্তু পরম স্নেহশীলা জননী যে তাঁহার স্নেহপুত্তলীটিকে নিজের স্নেহ-বন্ধনে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাহার সম্মুখ দিয়াই যে সে তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অনিশ্চিত জীবনের স্নেহ-করুণাহীন রাজ্যে পা বাড়াইতে চলিয়াছে, তাহা তিনি কিছুতেই স্থির হইয়া সহ্য করিতে পারিতেছেন না। পল্লীকবির এই বেদনা প্রকাশের ভাষা নাই, যতটুকু ভাষা তাহার অধিকারে আছে, তাহা সর্বস্ব করিয়াই তিনি এই অননুকরণীয় পদটি রচনা করিয়াছেন—'মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে'।

কিন্তু এই অশ্রুমুখী জননীকে ধূল্যবলুণ্ঠিত রাখিয়া গেলে বালিকার পথযাত্রা যে দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে; সেইজন্য বুদ্ধিমতী বালিকা জননীকে প্রবোধ দিয়া স্থির করিয়া রাখিয়া যাওয়াই সঙ্গত মনে করিল—

ও পারের কুল গাছটি রাম ছাগলে খায়,
তার তলা দিয়া দ্রবময়ী শ্বশুর বাড়ী যায়।
আগে যায় গো ভার বাউটি পিছু যায় গো ডুলি,
দাঁড়ারে কেবলা মায়ে বোধ করি।
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর,
আপনি ভাবিয়া দেখ, মা, কার ঘর কর।

মা কি এ কথা মুহূর্তের জন্য ভাবিয়া দেখেন না যে, তিনিও একদিন তাঁহারই জননীর এই প্রকার স্নেহসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এই পরের সংসারে আসিয়া আজ নিজে জননী হইয়া নিজের কন্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এমনই সহ্য করিতেছেন? ইহা যে পারিবারিক জীবনেরই ধর্ম, এই ধর্ম পালনের ভিতর দিয়াই পারিবারিক জীবনের সকল মাধুর্য রক্ষা পায়। স্নেহান্ধ জননী এই কথা যেন কিছুতেই বুঝিতে পারেন না; মা যে ঘরে বসিয়া তাঁহার কন্যার জন্য এমন করিয়া কাঁদিতেছেন, সেই ঘরই কি তাঁহার নিজের? না তিনিও পরের ঘর হইতে এখানে আসিয়াছেন! সাংসারিক এই কর্তব্যবোধের মধ্যেই এই অন্ধ স্নেহবোধের পরমা সান্ত্বনা। বিদায়কালীন কন্যাই যেন নিজে জননী হইয়া জননীকে এই শিক্ষা দিয়া গেল।

তারপর শ্বশুরগৃহে কন্যার স্নেহহীন বধূজীবনের সূত্রপাত হয়। বিগত জীবনের বিস্মৃত সুখস্বপ্নের শেষ রেশটুকু কখনও কখনও চোখের পাতায় জাগিয়া উঠে। সেই বিস্মৃত লোক হইতে যখন কোন দূত স্নেহের সংবাদ লইয়া আসে, তখন মনে অধীরতা আর কোন বাঁধ মানিতে চাহে না—

‘ও’ পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌॥
ও’ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙ্গা টুক্‌টুক করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥’
‘এ’ মাসটা থাক্‌ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যা’ব পাল্‌কী সাজিয়ে॥’
‘হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হ’লো দড়ি।
সাধ যায় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি॥’

বধূজীবনের এমন বাস্তব বেদনার ছবি বাংলার সাহিত্যে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহার মধ্যে নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা নাই, আন্তরিকতাহীন কোন অভিনয় নাই, কেবলমাত্র যাহা সত্য, তাহাই সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু এই বেদনার মধ্যেও বাংলার বধূ বাঁচিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি যে কোথায়, তাহার সন্ধান সে নিজেই পায়। কেবলমাত্র শৈশব জীবনের স্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকিলে সে বাঁচিবার শক্তি পায় না, সুতরাং স্বামিগৃহে

শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদের স্নেহহীন সম্পর্কের মধ্য হইতে নিজের আত্মরক্ষার শক্তিটিকে সন্ধান করিয়া বেড়ায়। বাতাসকে আহ্বান করিয়া যে ছড়াটি সে আবৃত্তি করে, তাহার মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের সম্পর্কিত তাহার মনোভাব প্রকাশ পায়, সেখানে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র স্নেহহীনা নারী—কন্যা কিংবা ভগিনীর পরিচয় কিছুমাত্র তাহাতে অবশিষ্ট নাই—

আয় পবন বাতাস আয় জাউ জুড়ায়ে যাউ।
কর্তা গেছে মাটি কাট্‌তে কোমরে লেগে যাউ॥
আয় পবন বাতাস আয় জাউ জুড়ায়ে যাউ॥
দেওর গেছে নৌকায় দাঁড় ছিঁড়ে পড়ে যাউ॥
ননদ গেছে মাছ ধরতে কুমীরে খেয়ে যাউ॥
শাশুড়ী গেছে পড়শীর পাড়া ঝগ্‌ড়া লেগে যাউ॥
আয়রে পবন বাতাস আয় যাউ জুড়ায়ে যাউ॥

যে কন্যা পিতৃ-সংসারের স্নেহস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে অধীর হইয়া উঠে, সে-ই এক স্নেহহীন সংসারে বধূ হইয়া প্রবেশ করিয়া তাহার স্বামীর সংসারের প্রত্যেকটি নিষ্ঠুর আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে এই অশুভ কামনা করিতেছে। এই সংসারের স্নেহের অভাবই তাহার স্নেহময় পিতৃসংসারের দিকে তাহাকে বার বার আকর্ষণ করে। এক পরিবারে স্নেহময়ী জননী ও ভগিনী এবং স্নেহময় পিতা ও গুণবতী ভাই-এর স্মৃতি, আর এক পরিবারে নিষ্ঠুর শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, শাশুড়ী, ননদের দুঃসহ সাহচর্য এই উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কন্যা ও বধূরূপী নারীর চরিত্র বিচিত্র হইয়া উঠে। কেবলমাত্র স্নেহের উপাদানে গঠিত হইয়াও যেমন সে মেরুদণ্ডহীন পুত্তলিকাবৎ হইয়া উঠে না, তেমনই নিষ্ঠুর শাসনের মধ্য-বর্তিনী হইয়া প্রাণহীনা দানবীও হইয়া উঠে না—উভয়ের মিশ্র উপাদানেই তাহার চরিত্র গঠিত হয়।

বালিকা শৈশবে তাহার পুতুল খেলার ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎ জীবনের সাংসারিক শিক্ষার অভ্যাস গড়িয়া তুলে। আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে ব্রতের ছড়া লইয়া যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে বিবিধ ব্রত উদ্‌যাপনের ভিতর দিয়া বালিকারা জীবনের নানা ব্যবহারিক বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। পুতুল খেলা ব্রতেরই আর একটি প্রাথমিক রূপ,

খেলার নাম করিয়া ইহার মধ্যে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বালিকার নিকট খেলায় আর ব্রতে কোনও পার্থক্য নাই; সে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিছুই বুঝে না, সুতরাং ব্রতও তাহার নিকট খেলা। শৈশবের পুতুল খেলার মধ্য দিয়াই তাহার প্রাথমিক রূপটি ধরা দেয়; পুতুল খেলা বিষয়ক কতকগুলি ছড়াও প্রকৃত পক্ষে নারীর ব্যবহারিক জীবনেরই অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। পুতুল খেলার নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

আল্‌তামুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে,
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কান্‌ছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে॥
আগে কাঁদে মা বাপ পাছে কাঁদে পর,
পাড়াপড়শি নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর।
শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনি,
তাতে ব'সে পান খান দুগ্‌গা ভবানী।
হেঁই দুগ্‌গা হেঁই দুগ্‌গা তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা গোঁদের ডালা কোন সোহাগীর বউ,
হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বউ।
এক বাড়ীতে দই দিব এক বাড়ীতে চিঁড়ে,
এমন করে ভোজন ক'রো গোক্ষ্ণনাথের কিরে।

ইহার মধ্যে জীবনের কথা ও খেলার কথায় মিশিয়া গিয়াছে; খেলার কথা দিয়াই এখানে জীবনের আসন্ন দুঃখের কথা বালিকা ভুলিয়া থাকিতে চাহিয়াছে। সুতরাং খেলার মধ্য দিয়া এখানে জীবনেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই প্রকার বাংলার ছড়ার মধ্য দিয়া কত ভাবে যে কন্যাজীবনের বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অন্ত নাই।

অধিবাস

পারিবারিক জীবনের প্রধানতম বিষয়ই বিবাহ, বিবাহের ভিত্তিতেই পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নিরূপিত হইয়া থাকে; সেইজন্য এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে বিবাহ বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নানা প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ বাস্তব এবং রূপক চিত্রের সহায়তায় বিবাহ বিষয়টি নানাভাবে এই শ্রেণীর ছড়ায় বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহ বিষয়ক ছড়াগুলিকেও যদি কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়, তবে ইহাদের প্রথম বিভাগটির নামকরণ করা যায়, 'অধিবাস'। কারণ, রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটির আরও কতকগুলি বিভিন্ন পাঠ আরও কয়েকজন সংগ্রাহক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, এই সবগুলি পাঠই একটি শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইহাদের একত্র এই নামকরণ করিতে পারা যায়; কারণ, প্রত্যেকটি ছড়াতেই আজ অধিবাস এবং আগামী কল্য বিবাহের দিন ধার্য আছে শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত ছড়া দুইটিই যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা নহে, তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন পাঠ পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, ইহার প্রাচীনতম পাঠটি বর্ধমান জিলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ সেই ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রাচীনত্বের লক্ষণ নির্দেশ করি,—

১

ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো চাল পিটুলি খেয়ে।
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে।
ঘুঘুকে নিয়ে গেলুম বকুলতলা দিয়ে॥
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা।
রাম ধনুকের বাদ্যি বাজে সীতেনাথের খেলা॥
সীতেনাথ নাচেরে কাঁকাল বাঁকাইয়ে।
আলোচাল ভেজে দেব টোপর ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হলো কাট।
কতক্ষণে যাবোরে ত্রিবেণীর ঘাট॥

ত্রিবেণীর ঘাটেরে ঝুর্ ঝুর্ বালি।
সোনামুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি॥
ত্রিবেণীর ঘাটেতে হাতী নেবেছে।
হাতীর গলায় জোর ঘণ্টা বাজ্‌তে লেগেছে॥ —বর্ধমান

সকল দেশেরই ছড়ার ক্রম পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মূলতঃ ছড়াগুলি প্রথম রচিত হইত, তারপর ক্রমে নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর চরিত্রই পশুপক্ষীর চরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই সূত্রেই এই ছড়াটির মধ্যে ঘুঘুর বিবাহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহাই প্রাচীনতার দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত এই শ্রেণীর ছড়াগুলির দুইটির পাঠে তাহার পরিবর্তে একটিতে যে যমুনা ও আর একটিতে যে দুর্গা নামক বালিকার নাম পাওয়া যাইতেছে, (পরে দ্রষ্টব্য) তাহা পরবর্তী যোজনা মাত্র। 'তিন কন্যা' শ্রেণীর ছড়াগুলির মধ্যেও এই কথাই প্রমাণিত হইবে। কারণ, পশুপক্ষীর আচরণই শিশুমনে কৌতূহল এবং কৌতুকবোধের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ বিবাহের ব্যাপারটি কন্যার পরিবারের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার নহে; শিশুমনে স্বভাবতঃই তাহাতে বেদনার সঞ্চার হইয়া থাকে; কারণ, ইহার ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের একজনকে পরের ঘরে চলিয়া যাইতে হয়; ছড়া আবৃত্তিকারিণী বালিকা সেই মুহূর্তে নিজে শ্বশুরগৃহে যাত্রা না করিলেও একদিন সে নিজেও যাত্রা করিবে, এই অপ্রিয় সম্ভাবনা সে ভুলিয়া থাকিতে চাহে। সেইজন্য নিজেদের একজনের নাম করিয়া তাহারা স্বভাবতঃই এই ছড়া বলিতে পারে না। তাহার পরিবর্তে একটি পাখীর নাম তাহাতে জুড়িয়া দেয়, এই মনোভাবকে ইংরাজীতে euphemism বলা হয়; সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহাই সমর্থিত। সেইজন্য যমুনা কিংবা দুর্গার পরিবর্তে এই ছড়ার নায়িকা ঘুঘু হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই বিষয়ক যে ছড়াগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই নায়িকা ঘুঘু। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি তাহার প্রমাণ—

২

ঘুঘু মলরে ঘুঘু মলরে ঝাল পিঠালু খেয়ে,
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে।

ঘুঘুর নাচন দেখতে যাবো মায়ের শাড়ী পরে।
মায়ে দিল তেল আমলা বাপে দিল বিয়ে।
কোন শালা নিয়ে গেল ঢাকে বাড়ি দিয়ে।
ঢাক গেলরে ঢাক গেলরে কদম তলা দিয়ে।
কদম তলার পথ ঘিরব হিরে কাঁটা দিয়ে,
হিরে কাঁটার শাক খাব ঘি মধু দিয়ে।—মুর্শিদাবাদ

৩

ঘুঘু ম'লো ঘুঘু ম'লো আলো চা'ল খেয়ে,
ঘুঘুর বিয়েয় যাবো আমি পাটের শাড়ী নিয়ে।
মায়ে দিল তেল পানি বাপে দিল বিয়া,
রাজার বেটা নিতে এলো মাগেশ্বরী দিয়া।
আয়রে ভাই চিড়া কুট খাই—
একটা চিড়া কম পড়লো দাদার কাছে যাই।
দাদার আছে ভাইয়া বলদ আমার আছে গাই।
দুই বোনে যুক্তি করে লক্ষ্মীপুর যাই।
লক্ষ্মী দিল ধান দূর্বা মালি দিল ফুল।
এমন খোঁপা বেধে দেবো হাজার টাকা মূল॥—রাজসাহী

বিভিন্ন ছড়ার বিচ্ছিন্ন অংশ আসিয়া ইহাতে যুক্ত হইয়া ইহার রসগত নিবিড়তা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তথাপি ঘুঘুর কথা দিয়া ইহা আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব বাংলা প্রধানতঃ ঢাকা, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে ঘুঘুকে ঢুপী বলিয়া উল্লেখ করা হয়; সেখানে ঘুঘু শব্দটি অপরিচিত। মৈমনসিং হইতে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে সেইজন্যই ঘুঘুর পরিবর্তে ঢুপী শব্দটি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বুঝিতে পারা যাইবে যে, নামটি এখানে পক্ষীর হইলেও আচরণটি একটি সদ্য বিবাহিতা বালিকার—

৪

কাউয়াডা কলকলায় গাছের আগে বইয়া।
ঢুপীটা মাথা কুটে চিনা ক্ষেতে বইয়া॥

আইজ ঢুপীর লেডাপেডা কাইল ঢুপীর বিয়া ॥
ঢুপীরে যে লইয়া যাইবে ভেরণ তলা দিয়া ॥
ভেরণের ফুল ফুট্যাছে ডাহা ডাহা অইয়া।
ঢুপী ছেঁড়ী চাইয়া কান্দে সোয়ারীর মধ্যে বইয়া ॥—মৈমনসিং

ঢাকা হইতে সংগৃহীত ছড়াটির মধ্যেও ঘুঘুর নাম শুনা যাইতেছে—

৫

আইজ ঢুপীর অধিবাস কাইল ঢুপীর বিয়া,
ঢুপীরে যে নিত আইছে সোনার পালকি দিয়া।
সোনার পালকি ভাইঙ্গ্যা পড়ল খেওয়া ঘাটে গিয়া।
পালকির তলে ডোরা সাপ,
ফাল দিয়া উঠে বউয়ের বাপ।
বউয়ের বাপে তামুক খায়,
নাক বরাবর ধোঁয়া যায়।
সেই ধোঁয়া কালা,
বউয়ের বাপ শালা।—ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ঘুঘুর অধিবাসের কথা শুনিতে না পাওয়া গেলেও ঘুঘুর অধিবাস সম্পর্কিত ছড়াটির সুরের অস্তিত্ব অংশতঃ অনুভব করা যায়—

৬

এ পারেতে বেনা, ও পারেতে বেনা,
মাছ ধরেছি চুনোচানা।
হাঁড়ীর ভিতর ধনে,
গৌরী বেটি কনে,
নোকে বেটা বর।
টাকশালাতে চাকরি করে ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর।
ঘুঘুডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে,
ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়োশাঁখা পরে।
শাখাটি ভাঙ্গল,
ঘুঘুটি ম'ল।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সংগ্রহে ঘুঘুর নামটি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থলে প্রত্যক্ষভাবেই একটি বালিকার নাম গৃহীত হইয়াছে। ছড়ার পরিবর্তনের ধারা যে কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এখানে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৭

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজি ফুল কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম সীতারামের খেলা॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাট।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড় ফুল দিয়ে॥
ওড়ফুল কুড়তে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্ষুর বেলা॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে জীবন-ধর্মিতা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে; মনে হয়, ইহা যেন ছড়ার রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া উপন্যাসের রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাঠি দিয়েছেন গলা সাজায়ে
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধুক সাজায়ে

মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজায়ে॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজায়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে॥
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন 'স্বামীখাকি' বলে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ইহাতে যে সুর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বেদনার সুর; ইচ্ছানন্দময় শিশুর অর্থহীন আনন্দের সুর নহে। সুতরাং গঠনের দিক দিয়া ইহা ছড়া হইলেও বক্তব্য বিষয়টি ইহার স্বতন্ত্র—পারিবারিক জীবনের একটি নিতান্ত বেদনার্ত চিত্র বাস্তব রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বেদনার্ত হইলেও ইহা জীবন-রসে সঞ্জীবিত। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ছড়াটির একান্ত বাস্তব-ধর্মিতাই ইহার ভিতর হইতে অপ্রত্যক্ষ সকল চিত্রকেই দূর করিয়া দিয়াছে; সেই সূত্রেই ঘুঘু ইহা হইতে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে একটি অশ্রুমুখী বালিকা আসিয়া ইহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, পারিবারিক জীবনাশ্রিত ছড়াগুলি ছড়া হইয়াও আরও বেশি কিছু। এই ছড়াগুলিই আগমনী বিজয়াগানের জননী।

৯

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনাকে আন্‌তে যাব বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে একটি পেলাম মালা,
কার গলায় দিব মা সীতারামের গলায়।
সীতারাম বলে আমি চাল কলাই খা'ব,
চাল কলাই খেতে খেতে হেথা হোথা যাব।
হেথা হোথা জল নাইক চিকুনির ঘাটে,
বালি চকচক করে,
শৈলমুখে রোদ লেগেছে রক্ত পড়ে ফেটে।—২৪ পরগণা

তারপর আরও আছে—

১০

ময়নামতী সরস্বতী কাইল ময়নার বিয়া,
ময়না রে লইয়া যাইব দিগ্‌নগর দিয়া।
দিগ্‌নগরের মাইয়াগুলা নাইতে লাগিছে,
চিকন্ চিকন্ চুলগুলা ঝাড়তে লাগিছে,
গলায় তাগো শঙ্খমালা রক্ত ফুটিছে,
হাতে তাগো দ্যাব (দেব) শাঁখা ম্যাগ (মেঘ) করিছে।
পরণে তাগো ডুইরা শাড়ী উড়তে লাগিছে,
কে দেখিছে, কে দেখিছে, দাদা দেখিছে,
দাদার হাতের বাজু বন্দুক ছুইড়া মারিছে,
উহু দাদা, উহু দাদা, বড্ড লাগিছে।—ফরিদপুর

১১

আজ ময়নার খেলা ধূলা কাল ময়নার বিয়া,
ময়নারে যে লইয়া যাইব ঢোলক বাজাইয়া।
ময়না যাইব শ্বশুর্ বাড়ী সঙ্গে যাইবে কে?
ঘরে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে।—ঢাকা

যমুনাই এখানে ময়না হইয়াছেন। আজ ময়নার অধিবাসের দিনটির উপর আগামী কল্য তাহার বিবাহের দিনের বেদনার ছায়াটি আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, এ'কথা ত দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ময়না তাহাদিগকে সঙ্গিনীহীন করিয়া দিঙ্‌নগরের পথ দিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যাইবে। এমন কি, সে যে চলিয়া যাইবে, তাহাও নহে—তাহাকে 'লইয়া যাইবে।' এখানেই বালিকার অসহায়তার ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়া চিত্রটিকে আরও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই কথাটির বেদনা ভুলিবার জন্যই হোক কিংবা উদ্গত অশ্রুধারা রোধ করিবার জন্যই হোক, পরবর্তী পদ কয়টির পরস্পর অসংলগ্ন চিত্রগুলি ইহার সঙ্গে আনিয়া যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অসহায়ের সান্ত্বনা, অবাঞ্ছিত ঘটনাকে ভুলিয়া থাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। ঢাকের বাদ্যে সানাইয়ের সুর ঢাকা পড়ে না; বার বার বুক ফাটা ক্রন্দন হাহাকার করিয়া উঠে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটিতে ঘুঘুও নাই, দুর্গাও নাই ; সাধারণভাবে বালিকা অর্থ বাচক দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহাতে বিষয়টির গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

১২

আজ ছেম্‌রীর এদিক ওদিক কাল ছেম্‌রীর বিয়া,
ছেমরীকে নিয়ে যাবে ঢাকের বাড়ি দিয়া।
মা কান্দবেন, মা কান্দবেন ধূলায় লুটিয়ে,
বাপ কান্দবেন, বাপ কান্দবেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়াছে পেটরাটি ভবিয়ে।
ভাই কান্দবেন, ভাই কান্দবেন আঁচল ধরিয়ে,
সেই যে ভাই কাপড় দিয়াছেন আলনাটি সাজিয়ে ॥—ঢাকা

১৩

কুটি কালে খেলাইছিলাম খুটি মুছি নিয়ে,
ভাই বউতে গালাইছিল থুবড়ি থুবড়ি বলে।
আজ থুবড়ির নাচন কোচন কাল থুবড়ির বিয়ে,
থুবড়িকে নিয়ে যাবে ঢাকাই শাড়ী দিয়ে।—রাজসাহী

ইহার মধ্যে বেদনাকে গোপন করিবার কোন প্রয়াস নাই, রূঢ় সত্যটি যেন ঢাকের বাদ্যের মত কানে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি রবীন্দ্র-সংগৃহীত পাঠেরই একটি সামান্য পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপ মাত্র—

১৪

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবে শ্বশুরবাড়ী সংসার কাঁদায়ে।
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে,
সেই যে মা দুধ দিয়াছেন গলা ভিজায়ে।
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবার বসিয়ে,
সেই যে বাপ টাকা দেছেন সিন্দুক ভরিয়ে।
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে,
সেই যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।

পিসি কাঁদেন, পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে,
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি ভরিয়ে।
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন চোখে হাত দিয়ে,
সেই যে ভাই কাপড় দেছেন আল্‌না সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে,
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন কালামুখী বলে।—ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্কোচের সহিত দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়া এই ছড়া হইতে যে শব্দটি একটু ইতর ভাবাপন্ন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে ঢাকা হইতে সংগৃহীত এই পাঠে তাহা আদৌ নাই, বরং তাহার পরিবর্তে কালামুখী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শব্দটিকে 'স্বামীখাকী' বলিয়া পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন, তাহাই প্রকৃত রূঢ় গালির ভাষা ছিল এবং কেবল মাত্র তাহার জন্যই ভগিনীটির বিদায়ের মুহূর্তে তীব্রতম অনুতাপ সম্ভব এবং স্বাভাবিক, 'কালামুখী' কথার জন্য তাহা আদৌ স্বাভাবিক নহে। সেইজন্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে 'কালামুখী' শব্দটি এখানেও সংগ্রাহকের সংশোধন মাত্র। যাঁহার একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে, তিনি অতি সহজেই ছড়ার 'সংশোধন'গুলি ধরিতে পারেন। এখানেও তাহা গোপন থাকিতে পারে নাই।

ক্রমে মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছড়াগুলি পরিবর্তিত হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত যে কি ভাবে লুপ্ত হইয়া যায়, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলি তাহার প্রমাণ—

১৫

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ী বকুল তলা দিয়ে।
বকুল তলা কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা,
রাম রাবণের বাদ্যি বাজে সীতারামের খেলা।
নাচরে ভাই সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে,
আলোচাল খেতে দেব টোপর পুরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে পেট হলো কাঠ,
হেথা হোথা জল পাবি পিঁপড়ির মাঠ।—বাঁকুড়া

১৬

আজ ময়নার খেলাধূলা কাল ময়নার বিয়ে,
ময়নাকে তুলে দেবে ঢোলক বাজিয়ে।
ঘর ভরা ধান চাউল পুকুর ভরা পানি,
ময়নারে বিয়া দিয়া ঘরে আন্‌বো টানি।—রাজসাহী

উপরি-উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মেয়েকে বিবাহ দিবার কথা শুনিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে ছেলেকে বিবাহ দিবার কথা শুনা যাইতেছে—

১৭

দাদা দাদা হাঁক পড়েছে দাদা নাই ঘরে,
আজ দাদার অধিবাস কাল দাদার বিয়ে।
দাদাকে নিয়ে যাব দিঙনগর দিয়ে।
দিঙনগরের মাঠেরে রে ভাই হাতি নেবেছে,
হাতির গলায় গজঘণ্টা বেজে উঠেছে।
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌না বুড়ো মালা পেতেছে। —হুগলি

কিন্তু দাদার বিবাহে বেদনার চিত্র নাই, তাহাতে আনন্দ মাত্রই আছে। সুতরাং এই ছড়াটি সেই সুরেই বাঁধা। অথচ কন্যার বিবাহের বেদনার চিত্র দিয়াই ছড়াটির প্রথম রচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

১৮

আজকে খোকার খাওন দাওন কালকে খোকার বিয়ে.
খোকার মাকে আন্‌তে যাব চড়কডাঙ্গা দিয়ে।
চড়কডাঙ্গার পাখীগুলি কিচিরমিচির করে,
সাবধানে চলরে ভাই হড়কে পড়ে যাবে।—২৪ পরগণা

তিন কন্যা

ঘুঘুর বিবাহ বিষয়ক ছড়াগুলিকে যেমন প্রচলনের দিক হইতে বিচার করিয়া 'অধিবাস' এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়, তেমনই আর এক শ্রেণীর বিবাহ বিষয়ক ছড়া আছে, তাহার নায়ক ঘুঘুর পরিবর্তে বাংলার শিশুর নিতান্ত পরিচিত জীব শৃগাল, ইহারাও শৃগালের বিবাহ বিষয়ক ছড়া; কিন্তু ক্রমে যেমন ঘুঘুর নামটি পরিবর্তিত হইয়া যমুনা এবং দুর্গা হইয়াছিল, তেমনই শৃগালের নামটি পরিবর্তিত হইয়াও এখানে তাহার স্থলে শিবঠাকুর নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে তিন কন্যা দানের কথা সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য সাধারণভাবে ইহাদিগকে 'তিন কন্যা' এই সাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। কিন্তু ঘুঘু যে ভাবে যমুনা, ময়না কিংবা দুর্গায় পরিবর্তিত হইয়াছে, শিয়াল সম্পূর্ণ সেইভাবেই শিব ঠাকুরে পরিবর্তিত হয় নাই, কারণ, দেখা যায় যে, বাংলার কোন কোন অঞ্চলে শিয়ালকেই শিবরাম পণ্ডিত বা শিবঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে শিব ঠাকুর এবং শিয়াল শব্দ দুইটি একার্থবাচক। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি ('বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৭৫-৭৮); এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই বিষয়ক ছড়াগুলি এখন উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া'য় এই বিষয়ক প্রাচীনতম ছড়াটি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যেই শিয়ালের নামটির উল্লেখ রহিয়াছে, শিব ঠাকুর কিংবা শিব সদাগরের নাম নাই। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত ছড়া দুইটি ইহা অপেক্ষা পরবর্তী; সুতরাং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত পাঠটিই সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

১

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিয়ালের বিয়ে হ'চ্ছে তিন কন্যা দান॥
এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে এক শিয়ালে খায়।
আর এক শিয়ালে গোঁসা ক'রে বাপের বাড়ী যায়॥

বাপের বাড়ীর তেল সিন্দুর মালীর বাড়ীর ফুল।
শিয়ালের বিয়ে হ'লো ক্ষীর নদীর কূল ॥
বাপে দেয় ধান দূর্বা মা দেয় ফুল।
এমন খোঁপা বেঁধে দিছে হাজার টাকার মূল ॥—২৪ পরগণা

শিয়ালের বিয়েই যে এই ছড়াটির মূল বিষয়, তাহা অন্যান্য ছড়ার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ হইতেও জানিতে পারা যায়। যেমন,—

এক ছিয়ালি রান্ধে বাড়ে এক ছিয়ালি খায়,
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ি যায়।—ত্রিপুরা

এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে দুই শিয়ালে খায়,
রাজার বেটা মজুমদার ঘোড়ায় চড়ি যায়।—পাবনা

শিয়ালের বিবাহ বিষয়ক আরও বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ চিত্র বাংলার ছড়ার নানা ক্ষেত্রে এখনও ছড়াইয়া আছে। সুতরাং শিবঠাকুর কিংবা শিব সদাগর নামক কোন ব্যক্তির বিবাহ এই ছড়াটির লক্ষ্য নহে। শিয়ালের বিবাহ সম্পর্কিত নিতান্ত কৌতুককর একটি স্বপ্নচিত্রই ছড়াটির মূল প্রেরণা দান করিয়াছিল। কিন্তু পূর্বে এ কথাও বলিয়াছি, ছড়ায় পশুপক্ষীর বিবাহ চিত্রের কৌতুককর পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বাংলার পারিবারিক জীবনের বিবাহ বিষয়ের একটি বেদনার্ত চিত্রকে প্রচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস দেখা যায়; কারণ, এই শিয়াল প্রকৃত পক্ষে শিয়াল নহে; শৃগালচর্ম পরিহিত মানুষ মাত্র, সেইজন্য শিয়ালের বিবাহ-চিত্রের ভিতর দিয়াও মানুষের আনন্দ-বেদনা গোপন থাকিতে পারে নাই।

এই শ্রেণীর ছড়ার রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত দুইটি পাঠ পাওয়া যায়,—

২

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান ॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ইহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সর্বাগ্রে উদ্ধৃতি-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি

প্রথমেই মনে হয়, শিবু ঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল, যখন এতাদৃশ চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘন মেঘান্ধকার বাদলার দিন এক উত্তাল তরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম, সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটি দুয়েক পান্‌সী নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবুঠাকুরের নব বিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড় সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন কি, তৃতীয় বধূঠাকুরাণী মর্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুত চরণে বাপের বাড়ি অভিমুখে চলিয়াছেন, সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে নাই। এই নির্বোধ তখনও বুঝিতে পারিত না, ওই একটি মাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবুঠাকুরের জীবনে কী এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, চরিত্র বিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি, হতবুদ্ধি শিবুঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠ জায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহে প্রয়াণ দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।' ('রবীন্দ্র রচনাবলী,' ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৪৭, পৃঃ ৫৮৪)।

বাংলার ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই প্রশস্তি, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠককে এই বিষয়ের প্রতি একদিন আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার মধ্যে একটি কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য এই যে, তিনি এই ছড়াটি তাঁহার 'বাল্যকালের মেঘদূত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছড়াটি সম্পর্কে ইহা একটি লৌকিক প্রশংসা মাত্র নহে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় ইহা গভীরভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনায় যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে একদিক দিয়া যেমন পরিদৃশ্যমান বাংলার বর্ষাপ্রকৃতির রূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, আর এক দিয়া তাঁহার বাল্যকালের মেঘদূত স্বরূপ বাংলার বর্ষা প্রকৃতি বিষয়ক ছড়াগুলিও তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। পরিণত বয়সে কালিদাসের মূল মেঘদূত কাব্যের প্রেরণার মধ্যেও তিনি তাঁহার শৈশবের মেঘদূতের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাল্যকালের সংস্কার যে সর্বদাই সক্রিয় হইয়া ছিল, তাহা অন্যত্রও আমরা অনুভব করিতে পারি।

এই ছড়াটির আরও যে কয়েকটি স্বতন্ত্র পাঠ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও এখানে উল্লেখ করা যায়—

৩

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যা গোঁসা ক'রে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল সিঁদুর মালিদের ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল ॥—২৪ পরগণা

৪

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী আইল বান,
শিবঠাকুরের বিয়া হইল তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, আর এক কন্যা খান,
আর এক কন্যা রাগ কইরা বাপের বাড়ী যান।—ফরিদপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে আরও কতকগুলি নূতন পদ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ষার সুনিবিড় চিত্রটি এবং শিবঠাকুরের পারিবারিক জীবনের সংহত পরিচয়টি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—

৫

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়া হৈল তিনটি কন্যা দান ॥
একটি কন্যা রাঁধেন বাড়েন একটি কন্যা খান।
একটি কন্যা না খেয়ে বাপের বাড়ী যান!
বাপেদের তেল আমলা মালীদের ফুল।
এমন করে চুল বাঁধব হাজার টাকার মূল।
হাজার টাকার মুলিরে কুড়িয়ে পালাম খাড়া,
কচ্ করে কেটে দিলাম কাল কচুর দাঁড়া।
কাল কচুর দাঁড়া ওলো কচ্ কচ্ করে।
তাই দেখে সর্দারের মেয়েগুলো হেসে হেসে মরে।—ঢাকা

ক্রমে এই ছড়াটির ভিতর হইতে শিবঠাকুরের বিবাহের চিত্রটি সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে—

৬

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর বাহিরে বসে কে,
আমি তোদের ঠাকুর দাদা তামাক সেজে দে।—২৪ পরগণা

পূর্বোক্ত এক শ্রেণীর ছড়ার সংস্কার অনুসরণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে পুনরায় ঘুঘু উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে—

৭

এট্টা ঘুঘু রান্ধে বাড়ে আর এট্টা ঘুঘু খায়,
আর এক ঘুঘু রাগ করে মামার বাড়ী যায়।
মামার বাড়ীর ত্যাল সিন্দূর মালী বাড়ীর ফুল,
কাঞ্চনরে বিয়ে দিলাম শ্রীনদীর কূল।—খুলনা

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই শ্রেণীর ছড়ার আর একটি পাঠ এই, ইহার মধ্যে শিবঠাকুর শিব সদাগর হইয়াছেন—

৮

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশুর বাড়ি বসতে দিল পিঁড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সবরি কলা, কাগমারে দই॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এই ছড়াটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্যই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—'ভাবে গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে, শিবুঠাকুর এবং শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্য সম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ সখ আছে এবং বোধ করি আহার সম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে-স্থানটুকু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাও নব পরিণীতের প্রথম প্রণয়-যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান। এই স্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবু সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া

বলা হইয়াছে, "শালিধানের চিঁড়ে নয়রে বিন্নিধানের খই।" যেন ঘটনার সত্য সম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের যে খুব একটা ইতর বিশেষ হইয়াছে, জামাই আদর সম্পর্কে শ্বশুর বাড়ীর গৌরব খুব উজ্জ্বলতর রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বশুর বাড়ীর মর্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্যাদা রক্ষার প্রতি কবির অধিক লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মতো। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতে বিন্নি ধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবঠাকুরও কখন এমনি করিয়া শিবু সদাগরে পরিণত হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।' ('রবীন্দ্র-রচনাবলী' ঐ, পৃঃ ৫৮৫)

শিব ঠাকুর যে এই ছড়ায় শিব সদাগর হইয়াছেন, এ কথা সত্য। কারণ, বাংলার প্রাচীন যুগের বাণিজ্য-কেন্দ্রিক সমাজের উপরই লোক-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল; সেইজন্য ক্ষত্রিয় রাজা এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপেক্ষা বৈশ্য সদাগরই বাংলার লোক-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির নায়ক। এখানেও সেই সূত্রেই শিবঠাকুর অতি সহজেই শিব সদাগর হইয়াছেন। তারপর ছড়ার মধ্যে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিবার উপর কবির লক্ষ্য আদৌ থাকে না, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ যে অনুমান করিয়াছেন, অর্থাৎ শালিধানের চিঁড়ার বিন্নি ধানের খইতে রূপান্তর তাহা 'স্বপ্নের মতো', ইহা যথার্থ। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এখানে শালিধানও নাই, বিন্নি ধানও নাই, এমন কি, শিব সদাগর নামক কোনও ব্যক্তিও নাই। যাহা আছে, তাহা স্বপ্ন ও ছায়ামাত্র। সেইজন্য অতি সহজেই ইহাদের রূপান্তর সম্ভব হইয়া থাকে। এই ছড়াটির আরও কয়েকটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—

৯

এ পার গঙ্গা ও পার গঙ্গা তার মাইদ্দে চর,
সেইখানেতে বস্যা আছেন শিব সদাগর।
শিব গ্যালেন শ্বশুর বাড়ী বইস্‌তে দিলো পিড়া,
জলপান করিতে দিলো শালিধানের চিড়া।
শালিধানের চিড়া নালো বিন্নিধানের খই,
হবিগঞ্জের সবরি কলা গামছা বান্ধা দই।—ফরিদপুর

এই শ্রেণীর কতকগুলি ছড়ার মধ্য হইতে ক্রমে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কথাগুলির পরিবর্তে কয়েকটি নূতন কথা দেখা দিল, তাহা 'স্থর স্থরনি, গুড় গুড়ুনি' কিংবা 'মেঘ হড় হড়, মেঘ দুড়্ দুড়্' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুরে'র মধ্যে যেমন ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িবার শব্দটি শুনা যাইতেছিল, তাহার পরিবর্তে ইহাতে মেঘ গর্জনের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল ; অতএব বর্ষার রূপটি ইহাতে অক্ষতই রহিয়া গেল—

১০

স্থরস্থড়ুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান,
শিবঠাকুর বিয়ে কল্লেন তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।
বাপেদের তেল আমলা মালীদের ফুল,
এমন ক'রে চুল বাঁধব হাজার টাকা মূল।
হাজারে বাজারে পড়ে পেলাম খাঁড়া,
সেই খাঁড়া দিয়ে কাটলাম নাল কচুর দাঁড়া ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

উদ্ধৃত ছড়ার শেষাংশে স্বতন্ত্র ছড়া হইতে আগত নূতন পদ-যুক্ত হইয়া ইহার মেঘ গর্জনের ধ্বনির গুরুগম্ভীরতাকে আঘাত করিয়াছে ; এমন কি, শেষের কয়টি পদের মধ্য হইতে বর্ষার চিত্রটি সম্পূর্ণ মুছিয়া গিয়াছে—

১১

মেঘ হড় হড় মেঘ দুড় দুড় নদীয়ে আইলা বান,
শিব ঠাকুর কহি পাঠাইছেন তিনটি কন্যা দান।
গুটিয়ে কন্যা রাঁধেন বাড়েন গুটিয়ে কন্যা খান।
সুঁকুড় ধুবার বেল হিনে বাপের বাড়ী যান।
বাপ দিলান চুয়া চন্দন মালী দিলান ফুল,
এমন জুড়া বাঁধব নি গো হাজার টাকা মূল।—মেদিনীপুর

এই ছড়াটিও মেঘগর্জনের ধ্বনি দিয়া সূত্রপাত হইয়া খোপা বাঁধার মূল্য নিরূপণের মধ্য দিয়া শেষ হইয়াছে।

১২

তালপাতার ঘরখানি ঝিকিমিকি করে,
তাই দেখে বাবাঠাকুর কন্তে দান করে।
এক কন্তে রাঁধে বাড়ে এক কন্তে খায়,
এক কন্তে না খেয়ে বাপের বাড়ী যায়।
বাপেদের তেল সিঁদুর মালীদের ফুল,
এমন খোঁপা বেঁধে দেব হাজার টাকার মূল।—২৪ পরগণা

নিম্নে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এ যাবৎ বর্ষার ছড়ার নায়ক যে শিব ঠাকুর বা শিব সদাগরের কথা শুনিয়াছি, এখানে সেই শিব ঠাকুর নাই, শুধু তাহার নামটিই আছে। এই শিব ঠাকুর গাজনের শিব ঠাকুর, নব পরিণীতা তিন কন্যার বর শিব ঠাকুর নহেন। কে বলিবে এই শিব ঠাকুরই পরবর্তী কালে তিন কন্যার বর শিবঠাকুরের নামের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছেন, ইহারই প্রভাববশতঃ মূল শিয়ালের নামটি পরিবর্তিত হইয়া শিব ঠাকুর হইয়াছে ?—

১৩

আদা কাটি কুচুর কুচুর রক্ত পড়ে ধারে।
শিবঠাকুরের কোটনা কাটি, মহাদেবের ঘরে।
মহাদেব, মহাদেব, এবার বড় খরা,
আর বচ্ছর নীল বুনাবো শ্যাওড়া গাছতলা।
শ্যাওড়া গাছতলা নালো, বটগাছ তলা,
দুইপাশে দুই ঢাকের বাড়ি, মইদ্দে নাচে বালা।
বালার ব্যাটা বালারে তোর হাতে লোহার তাড়,
ভ্যান্না গাছে উইঠ্যা বালার ভাঙলো মাজার হাড়।
হাড় ভাঙিলো, গোড় ভাঙিলো, ভাঙলো মাথার খুলি,
শিবঠাকুরের আইজ্ঞা লইয়া ঢাকে দাও বাড়ি।—ফরিদপুর

ইহার মধ্যে গাজনের ঢাকের বাদ্য শুনিতেছি ; ইহাতে বর্ষার মেঘ গর্জনই হোক, কিংবা শ্রাবণের ধারাবর্ষণই হোক, ইহাদের কাহারও সুর লাগিতেছে না।

কন্যা আন

ব্যক্তি বিশেষের বিবাহ ব্যতীতও সাধারণভাবে বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, এমন ছড়ার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই বাস্তব জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর ছড়াকে 'কন্যা আন' বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহাতে কন্যার সন্ধান এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহের জন্য যাত্রা বিষয়টি প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

১

উটকন আন বাট্যা দেই,
কন্যা আন বিয়া দেই।

এই ভাবটি এই শ্রেণীর সকল ছড়াতেই কম বেশি প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন কোন ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র ভগিনীটি দাদাকে তাহার খেলার একটি সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছে—

২

দাদা গো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও ॥
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকলা ॥
হেই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এই ছড়াটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যাহা স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃতি-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'দাদার বেতন অধিক নহে—কিন্তু বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের স্বচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন,

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি ॥

চতুরা বালিকা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে, "বউ বরণে চন্দ্রকলা।" যদিও ভগ্নীর খেলেনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য, তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশত নহে।'

তারপর বউ প্রকৃতই আনিতে যাইবার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—

৩

বড়দিদি গো ছোড়দিদি গো দাদা কোথা গেছে ?
হালের গরু পালে দিয়ে বৌ আনতে গেছে।
বৌয়ের মুখটা দেখি না খোকা হয়েছে,
খোকা খোকা কাঁদিস না হনু এসেছে।
হনুর লেজে কাটারি বাঁধা কাটতে এসেছে।
ও খোকা, এটা কি ফুলের গাছ ?
পাখী আমার পাকী ফুলের গাছ।—২৪ পরগণা

ইহার শেষাংশে খেলার একটি ছড়ার বিচ্ছিন্ন অংশ আসিয়া যুক্ত হইয়া ইহার রস বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। তারপর খোকনমণি বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়া কি লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, তাহারও কৌতুকাবহ চিত্র দেখা যায়—

৪

আদুরের কলা ছড়া বাদুড়ে খায়,
তালতলা দে' খোকনমণি বিয়ে করতে যায়।
খোকনমণি বিয়ে করে যৌতুক পেলে কি ?
থালা পেলুম গাড়ু পেলুম বড় মানুষের ঝি !
বড় মানুষের ঝিকে নিয়ে উঠে দিলুম লড়্,
তালতলাতে পড়ে গিয়ে হাটুর গেল ছড় ।—ঢাকা

থালা এবং গাড়ু যৌতুক এবং বড় মানুষের ঝিকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া খোকনমণি কেন যে সহসা উঠিয়া দৌড় দিলেন, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না; কিন্তু তালতলাতে পড়িয়া গিয়া তাহার হাটু যে ছড়িয়া গেল,

সে জন্য সকলেই তাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। তবে সর্বত্রই যে খোকনমণি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে,—ইহার ব্যতিক্রমও আছে—

৫

ও পারেতে কুল গাছটি নই ছাগলে খায়।
তার তলা দিয়ে খোকনবাবু শ্বশুর বাড়ী যায়॥
আগে যায় ইংরেজী বাজনা চার ঘোড়ার গাড়ী।
তার পিছনে কাকাবাবু যান তাড়াতাড়ি॥
তার পিছনে দাদামশায় হাতে সোনার ছড়ি।
তার পিছনে দাসীর মাথায় রকম রকম হাঁড়ি॥
আতর গোলাপ ফুট পাথরে হচ্ছে ছড়াছড়ি॥
দুধে আলতায় পাথরেতে বরকনে দাঁড়াল।
সবাই বরণ করে বল্ল, খোকন বাবুর বউটি কেন কালো॥
হোক গো আমার কালো,
আমার আঁধার ঘরে আলো।
জন্ম ইস্ত্রী হ'য়ে আমার ঘর করবে আলো॥
কে বলে রে কালো।
চুন কালি দিয়ে পাঠিয়ে দোব চুলো, চুলো, চুলো॥—হুগলি

খোকনবাবুর বউটি যে একটু কালো হইয়াছে, সে জন্য যে যাহাই বলুক, তিনি মনে মনে বলেন,

'কালো তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

উদ্ধৃত ছড়াটির একটি পাঠান্তর এই—

৬

ও পারেতে কুল গাছটি নৈ ছাগলে খায়,
তার তলা দে আমার খোকন বিয়ে কর্তে যায়।
বিয়ে কর্তে গিয়ে খোকন কি পায় যৌতুক?
হাতে পায়ে হীরের বালা মাথায় মটুক।

শাশুড়ী এসে বলে জামাই কেমন নাকালো।
শ্বশুর এসে বলে জামাই ঘর করেছে আলো।—২৪ পরগণা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে দেখা যাইতেছে, বিবাহান্তে স্বামিসহ খুকুরাণী শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিয়াছেন—

৭

ওপারে ধনচে গাছ রাম ছাগলে খায়,
তার তলায় দিয়ে খুকুরাণী বিয়ে হয়ে যায়।
আসে যায় বর মহাশয় চার ঘোড়ার গাড়ি,
তার পিছনে খুকুরাণী চৌদোলাতে চড়ি।
তার পিছনে কাকাবাবু যান দৌড়োদৌড়ি,
তার পিছনে মামাবাবু হাতে সোনার ছড়ি।
তার পিছনে ঝিয়েদের মাথায় রকম রকম হাঁড়ি।
তার পরেতে সব শেষেতে শ্বশুর ঘর গেল,
সাইত শুভক্ষণ করে দুধে আলতা হলো।
সবাই দেখে বললো, ওগো বৌ হয়েছে কালো,
শাউড়ি ননদ বললে, আমার ঘর করেছে আলো।
নুড়ো নুড়ো খড়ের আগুন শত্রু মুখে জ্বালো।—পাবনা

কিন্তু যে যাহাই বলুক, খোকনমণির বিবাহের মধ্যে যে বিজয়ের গৌরব প্রকাশ পায়, খুকুমণির বিবাহে তাহা পায় না; খুকুমণিকে বিবাহ করিয়া পাল্কী সাজাইয়া গ্রামান্তরে লইয়া যায়, তাহার ও তাহার আত্মীয় পরিজনের মনের মধ্যে পরাজয়ের বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে—

৮

পুঁটুমণি গো মেয়ে।
বর দিব চেয়ে॥
কোন্ গাঁয়ের বর।
নিমাই সরকারের বেটা পালকি বের কর॥
বের করেছি বের করছি ফুলের ঝারা দিয়ে।
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব বকুলতলা দিয়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কিন্তু খুকুমণির শ্বশুরবাড়ীর জীবন সম্পর্কেও কত আশঙ্কা, কত সন্দেহ, কত দুশ্চিন্তা সকলের অন্তর অধিকার করে—

৯

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে॥
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিনসে কাহার দেব পালকি বহাতে॥
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে॥
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ী ভুলাতে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ী কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। উক্ত উড়কি ধানের মুড়কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত, এ'কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহে এখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে (রবীন্দ্রনাথ আজ হইতে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বেকার কথা বলিতেছেন) কন্যার শাশুড়ীকে যে কী উপায়ে ভুলাইতে হয়, কন্যার পিতা তাহা ইহ জন্মেও ভুলিতে পারিবেন না।'

এই ছড়াটির আরও একটি পাঠ পাওয়া যায়—

১০

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেবো ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
শান বাঁধানো ঘাট দেবো পথে জল খেতে।
ঝাড়-লুণ্ঠন জেলে দেবো আলোয় আলোয় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দেবো শাশুড়ী ভুলাতে।
শাশুড়ী ননদ বলবে দেখে, বউ হয়েছে কালো,
শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে, ঘর করেছে আলো।—ঢাকা

শাশুড়ী ননদের সর্বদাই খুঁত ধরিবারই অভ্যাস, সুতরাং বধূ সুন্দরী হইলেও তাহারা সেই সৌন্দর্যের মধ্যেও ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইবে। ইহা কেবল মাত্র শিশুজগতের খেলার কথা নহে, বাস্তব জগতের সত্য কথা। পারিবারিক জীবন-ভিত্তিক বিবাহের ছড়াগুলির মধ্যে লঘু পরিবেশের মধ্যেও এমনই বাস্তব জীবনের সুগভীর ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

খুকুমণির বিবাহের আশা আশঙ্কা আলোছায়ার মত জননীর মনের আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—

১১

খুকি খুকি তালের আঁশ।
খুকির বিয়া ভাদ্র মাস॥
খুকির সাথে যাইব কে।
বিড়াল দুইটা সাজাইয়া দে॥
বিড়াল দুইটা যাইব না।
খুকির বিয়া আইব না॥—মৈমনসিং

সহসা গৃহপালিত মার্জার দুইটি খুকুমণির শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গী হইতে আপত্তি করার ফলে যে তাহার বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। ইহাতে জননী হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা সহসা মুখের ভাষায় বিদ্রোহ প্রকাশ করে মাত্র। খুকুমণির বিবাহের যত সব অসম্ভব চিত্র কল্পনা করিয়া তাহার জীবনের এই রূঢ় সত্যকে ভুলিয়া থাকিবার অক্ষম প্রয়াস ছড়ার মধ্য দিয়া দেখা যায়—

কন্যাদান

বিবাহ উপলক্ষে বরের আগমন এবং কন্যাদান বিষয়ক কতকগুলি ছড়া আছে, তাহাদিগকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, আশালতা নাম্নী একটি কন্যার বিবাহ বিষয়ক কয়েকটি মাত্র ছড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, হাওড়ায় এক অযোগ্য বরের সঙ্গে আশালতার বিবাহ ভাষাতেই হইয়াছিল, তাহার বিবাহটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হইয়া আছে। ছড়ায় তাহা শুনি—

১

আশালতা পালং পাতা আজকে আশার বিয়ে।
হাওড়া থেকে বর আসবে টোপর মাথায় দিয়ে॥
মুখপোড়া বর আবার তেড়ি কেটেছে।
ধুমসো ধুমসো মেয়েরা কাঁদ্‌তে লেগেছে॥
কেঁদনি নি গো কেঁদনি রান্না ঘরে ঝুল।
কনক কনক চাঁপাফুল॥—হুগলি

বর দেখিয়াই মেয়েরা কেন যে কাঁদিতে বসিয়াছে, তাহার কারণটি নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

২

আশালতা পালংপাতা তোমার নাকি বিয়ে,
হাওড়া থেকে বর এসেছে টোপর মাথায় দিয়ে।
বর দেখে যাও; বর দেখে যাও, রান্না ঘরের ঝুল।
কনে দেখে যাও কনে দেখে যাও কনক চাঁপার ফুল।
—২৪ পরগণা

কনক চাঁপা ফুলের মত সুন্দরী আশালতার রান্নাঘরের ঝুলের মত বরটি দেখিয়া প্রতিবেশিনীরাও অশ্রুবিসর্জন না করিয়া পারিল না। কেবল প্রজাপতিই অলক্ষ্যে থাকিয়া বোধ হয় মৃদু হাস্য করিলেন—

৩

আশালতা পালংপাতা আজকে আশার বিয়ে,
হাওড়া থেকে বর এসেছে গামলা মাথায় দিয়ে।
বর দেখ না, বর দেখ না রান্নি শালের ঝুল
কন্যা দেখ না, কন্যা দেখ না কনক চাঁপার ফুল।—২৪ পরগণা

বরের যে দোষত্রুটিই থাকুক না কেন, সে গামলা মাথায় দিয়া বিবাহ করিতে আসিবে, তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না; এ শুধু 'যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা।' এমন কি, তাহার টেরি কাটার উপরও যুবতীদিগের বিদ্রূপ বাণের বৃষ্টি হইতেছে—

৪

আশালতা পালং পাতা আজকে আশার বিয়ে।
হাওড়া থেকে বর এসেছে টোপর মাথায় দিয়ে।
মুখপোড়া বর তেড়ি কেটেছে—
হাতীমুখো মেয়ে আমার কাঁদতে বসেছে।
বর দেখ না বর দেখ না রান্নাঘরের ঝুল
কনে দেখ না কনে দেখ না কনক চাঁপা ফুল।—মেদিনীপুর

উদ্ধৃত ছড়াটিকে আঞ্চলিক ছড়া বলা যায়; কারণ, দেখা যাইতেছে হাওড়ার উল্লেখ থাকার জন্য ইহা হাওড়ার চতুষ্পার্শবর্তী স্থান ব্যতীত আর কোথাও প্রচারলাভ করিতে পারে নাই।

কতকগুলি ছড়া নারীকণ্ঠে উচ্চারিত উলুধ্বনির ভিতর দিয়া সূত্রপাত হইয়াছে। উলুধ্বনি দিয়া তাহারা বরশোভাযাত্রাটিকে এখানে যেন বরণ করিয়া লইতেছে—

৫

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আসছে কত দূর॥
বর আসছে বাঘনাপাড়া।
বড়ো বউ গো রান্না চড়া॥

ছোটো বউ লো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
ফুলের বরণ করি।
নটে শাকের বড়ি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এই ছড়াটি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটিই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'জামাতৃ সমাগম প্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের উৎসুক্য এবং আনন্দ উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষ্যে শেওড়াগাছের বেড়া দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথঘাট বন পুষ্করিণী এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।'

৬

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আস্‌চে কত দূর॥
বর আস্‌চে বাগনাপাড়া।
বড় বউ গো রান্না চড়া॥
মেজ বউ গো কুট্‌নো কোট্‌।
ন বউ নত্তা।
সকল ঘরের কর্ত্তা॥
ছোট বউ গো জলকে যা।
জলের ভেতর লেখা যোখা।
ফুল ফুটেচে চাকা চাকা॥
ফুলে বড় কুঁড়ি।
নটে শাগে বড়ি॥
আহ্লাদিনী গো আহ্লাদ করিস না।
তোদের আহ্লাদ সাজে না॥
ধন ধন ধন ধনিয়া।
কাপড় দেব বনিয়া॥
গরবিনী তোদের গরব সাজে না।
তোরা গরব করিস না॥—বাঁকুড়া

একটি সমগ্র পরিবারকে আশ্রয় করিয়া একটি ব্যস্ততার চিত্র যেন এখানে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে উলুধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেলেও চিত্রটি স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হইবে—

৭

উলু উলু উলু মাদারের খুলু।
কন্যা গেল কতদূর ?
ওগো কন্যা বামনপাড়া।
ছোট বৌ ভাত চড়া।
বড় বৌ বাগুন কুটা।
বাগুন কুটতে ফুটলো কাঁটা।
সেই হ'লো ননদের খোঁটা।
চল ননদ জলকে যাই।
জল আনতে লেখা চোখা।
ফুল ফুটেছে থোকা থোকা।
কামানের শিষ।
বড় বেটাকে বিয়া দিয়া ঘর করিছে বিষ।—ঢাকা

কন্যা বামনপাড়া ছাড়াইয়া গিয়াছে, এইবার গৃহকর্ম করিবার অবকাশ হইয়াছে। কিন্তু মনের চাঞ্চল্য তখনও দূর হয় নাই, সেইজন্য বেগুন কাটিতে গিয়া হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। তাহাই আবার ননদের খোঁটা হইয়া রহিল। তারপর বড় ছেলেকে বিবাহ দিয়া যে ঘর কি ভাবে বিষ হইয়া উঠিল, সেই কথাও বিবাহের চিত্রটির মধ্যে আসিয়া পড়িল। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে কন্যা বিদায়ের ছায়া পড়িয়াছে—

৮

'উলু উলু শিমুলের ফুল মুকুট মাথায় দিয়া
শিমুল ফুল তুলতে গেলাম তাইতে হল বিয়া।'
'আয়লো খেলার সই খেলার সাজ নিয়া,
আর ত খেলব না খেলা পরের দেশে গিয়া।'

ঢোল বাজে ঘুমুর ঘুমুর শানাই বাজে রয়া
পরের ছেলে নিতে এল ঢোলে টোকর দিয়া।
আম কাঁটালের পিঁড়িখানি ঘি মউ মউ করে
তারির উপর বাপ ভাই কন্যে দান করে"।—ফরিদপুর

উলুধ্বনি মুখর বিবাহের আনন্দচিত্রটি কি ভাবে পরগৃহে যাইবার আশঙ্কায় ম্লান হইয়া উঠে, উপরি-উদ্ধৃত ছড়াটিতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে কেবল খেলার কথা কিংবা অকারণ আনন্দের অর্থহীন উচ্ছ্বাস নাই, বরং তাহার পরিবর্তে জীবনের সুগভীর বেদনার কথা আছে। সেই গুণেই ইহারা শিশুর রসসামগ্রী হইয়াও সাহিত্য। বরাগমনের কথা কতভাবে ছড়ার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে—

৯

আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়ে।
ঐ আসতিছে পাচির বর গামছা মাথায় দিয়ে॥
ও গামছা নেব না,
মাইয়া বিয়া দেব না।
কাচা মাইয়ে দুধির সর,
কেমনে কর্বে পরের ঘর ?
পরে এট্টা কবে,
ফুলে ফুলে কান্‌বে।
ছইয়ে নাও দেখ্‌বে।
বাবা ব'লে ডাক্‌বে।—খুলনা

ছইওয়ালা নৌকা দেখিয়াই পরগৃহবাসিনী কন্যাটি পিতা তাহাকে লইতে আসিয়াছেন ভাবিয়া কাঁদিতে থাকিবে। সুতরাং এই মেয়েটির বয়স আর কতই হইবে ?

১০

আমতলা ডামুর ডুমুর কলা তলা বিয়া,
আইল রে নাতিন জামাই হোলার মুকুট দিয়া।—ঢাকা

জামাই বরণ করিবার অনন্ত কৌতূহলের কথা ছড়ার মধ্য দিয়াও নানাভাবে প্রকাশ পায়—

১১

ওপার দিয়া বাদ্য বাজে কিসের রে ?
ছোট ঠাকুরের বিয়া,
হল্‌দি কুটি গা।
মরিচ কুটি গা,
থাকের উপর থাক থুইয়া জামাই বরি গা।

বাংলার ছড়ায় মোরগের উল্লেখ পাওয়া যায় না বলিলেই চলে ; ইহার কারণ মুসলমান সমাজে বাংলার ছড়ার স্বকীয় কোন রূপ নাই ; বাংলার সর্বত্র যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, মুসলমান সমাজে তাহাই শুনা যায়। ইহারও একটি কারণ হয়ত এই যে, বাংলায় মুসলমান ধর্ম বিস্তারের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ক্বচিৎ দুই একটি ছড়ায় মুসলমান সমাজের পরিচয় স্পষ্ট হইয়া আছে—

১২

লাল মাডি তোল গো ফতুরার বিয়া।
সাতদিন ধর্‌ইয়া জামাই আইছে মডুক মাথাত দিয়া ॥
মোরগা নাচে, মুরগী নাচে চালে ঠেং দিয়া।
আমার বইন মাড যায় ইরার কলসী লইয়া।
সরকার বেডা চাইয়া রইছে কলম কানে দিয়া ॥
নারে বেডা আইজ দিতাম না
কাইল দিয়াম সাজাইয়া,
সতরঞ্চিডা বিছাইয়া।
বাপে লইছে একশ টেকা মায়ে লইছে শাড়ি।
বইনে লইছে জুতাজোর যাইত জামাইর বাড়ী ॥—মৈমনসিং

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে, মুকুট মাথায় দিয়া জামাই আসিবার কথায়, হিন্দু সমাজেরই প্রভাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। বিশেষতঃ 'বাপে লইছে একশ টেকা মায়ে লইছে শাড়ী' এই সামাজিক প্রথাটির মধ্য দিয়াও এক

প্রাচীনতর সামাজিক প্রথার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ছড়ার কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক পরিচয় নাই, সামগ্রিক ভাবে বিভিন্ন সমাজের উপাদানেই ছড়া রচিত হইয়া থাকে।

বাংলা দেশে রাজকন্যার পরিবর্তে সদাগরের কন্যাই যে বিবাহের জন্য সর্বাধিক অভিপ্রেত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার কারণ, পূর্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, এ'দেশে রাজতন্ত্র অপেক্ষা বাণিজ্যতন্ত্রই ছিল সমৃদ্ধির মূল—

১৩

এক নৌকা সরু চাল, এক নৌকা ঘি,
দাদা গেছে বিয়ে কত্তে সদাগরের ঝি।
নাড়া বনে কাড়া বাজে, লোকে বলবে কি,
মরা-চাটা বে করেছে, মালসা চাটার ঝি।—২৪ পরগণা

বিবাহের অনুষ্ঠান কত জটিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছড়ায় ও গানে তাহার ভার আপনা হইতে যেন লঘু হইয়া আসে—

১৪

নাপিত বাড়ি গেলাম আমি
নাপিত বলে বোসো।
বসব না বসব না,
বসন বুড়ির বিয়ে।
তোমরা নরুণ নিয়ে যেয়ো।
মালাকার বাড়ি গেলাম আমি
মালাকার বলে বোসো,
বসব না বসব না।
বসন বুড়ির বিয়ে।
তোমরা টোপরমালা নিয়ে যেয়ো।
বামুন বাড়ি গেলাম আমি
বামুন বলে বোসো।

বসব না বসব না,
বসন বুড়ির বিয়ে,
তোমরা বামুন নিয়ে যেয়ো।
কুমোর বাড়ি গেলাম আমি
কুমোর বলে বোসো,
বসব না বসব না
বসন বুড়ির বিয়ে।
তোমরা চালন কুলো নিয়ে যেয়ো।
ধোবা বাড়ি গেলাম আমি,
ধোবা বলে বোসো,
বসব না বসব না,
বসন বুড়ির বিয়ে,
তোমরা বার তাল নিয়ে যেয়ো ॥—রাজসাহী-পাবনা

ছড়াটির ভিতর দিয়া যেন কতকগুলি চলমান দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল। নাপিত বাড়ি হইতে ধোবি বাড়ী পর্যন্ত নিমন্ত্রণ হইল, কিন্তু একটি নীরস কর্তব্য ছন্দিত হইয়া যেন ইহার মধ্যে প্রাণবান্ হইয়া উঠিল। ইহা কেবল ছড়া নহে, ইহা কবিতা—ইহার মধ্যে কেবল নিষ্প্রাণ চিত্রই নাই, জীবনের স্পন্দনও আছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা বাস্তবধর্মী বিবাহের ছড়া নহে, সাধারণতঃ পুতুলের বিবাহেই এই শ্রেণীর ছড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে—

১৫

টিয়া লো টিয়া।
তরার বাড়ীতে বিয়া।
পান নাই সুবারি নাই
আমলী পাতা দিয়া।
আমলী পাতা খাইতাম না
তরার বিয়াত যাইতাম না ॥—মৈমনসিং

কতকগুলি ছড়ার একটি সাধারণ লক্ষণ এই দেখা যায় যে, ইহার শেষ চরণটি পূর্ববর্তী একটি চরণের প্রতিবাদ স্বরূপ রচিত হইয়া থাকে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি—

নার্গিসকে বিয়া দিমু না,
এত টাকা নিমু না।

এখানেও তাহারই প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে।

কন্যার বিবাহে পিতারই সকল দায়িত্ব, বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখের জন্য নিজের ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া কন্যা পিতাকেই দায়ী করিয়া থাকে—

১৬

ও বাবা, বাবা গো,
কই তুললা্যা দিলা গো॥
দুই বেডা কাঁহারো।
সোয়ারী তুলল্যা ঝাঁহারো॥
মা মরছিল ছোডু থইয়া বাপে করছিল বিয়া।
কি পোড়া পুড়ল গো, কাডের আগুন দিয়া॥

—মৈমনসিং

মা শিশুকালেই পরলোক গমন করিলেন, তারপর পিতা পুনরায় বিবাহ করিলেন। সমস্ত জীবন ধরিয়া কাঠের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। কোন অভাগিনী বালিকার দীর্ঘনিঃশ্বাসে এই ছড়াটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

১৭

বড় পোঅরির চাক্কা ইঁচা, ডাউর ভরণ তেল।
সোনাবাবু বিহা করি, চাকরীতে গেল॥
আইস আইস সোনাবাবু, রৌদে পুড়ে গা।
কাপড় চোপড় ছাড়ি দেও, চাকরে বিচৌক গা॥—চট্টগ্রাম

দেখা যাইতেছে, ছড়ার যুগেও বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্তে বাড়ী বসিয়া আরাম করিবার উপায় ছিল না; কারণ, সোনাবাবু এখানে বিবাহ করিয়া চাকুরিতে চলিয়া গেলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

একদিকে বিবাহিত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা যেমন আছে, আবার অন্য দিকে দূরে বিবাহ দিবার আশঙ্কাও কন্যার হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলে—

১৮

উচ্ছে ভাজা চিড়িং চিড়িং বাবা বিয়ে দিবি তো দে,
কত দূরে দিবি বাবা তত্ত্ব নেবে কে ?
সরু ধানের খই দিলাম শ্বশুর বিলোতে,
মোটা ধানের খই দিলাম রাস্তায় জল খেতে।—২৪ পরগণা

পরগৃহে যাইবার আশঙ্কার মধ্যেও বিবাহে পিতৃগৃহ হইতে কি সামগ্রী লাভ করিল কন্যাকে তাহার হিসাব করিতেও বিরত থাকিতে দেখা যায় না; কারণ, কন্যা হইয়াও সে জানে, ইহাই তাহার পিতৃগৃহ হইতে শেষ পাওয়া এবং ইহার উপরই তাহার শ্বশুর গৃহের লাঞ্ছনা কিংবা সম্বর্ধনা নির্ভর করিবে—

১৯

বাপ সোহাগী ঝি,
দানে পেলে কি ?
ভাঙ্গা একখান কুলো,
ফুলো একটা মূলো।—রাজসাহী

২০

আঁকো কুল ঝাঁকো কুল বৈঁচ ফুলের পিঁড়ি।
কন্যা যাবে পরের ঘর মাকে মাগে শাড়ি॥
বাপ দিল তারে যাইতে ডুলি মা দিল তার শাড়ী।
এই শাড়ী খান পর্যা কন্যা যাবে শ্বশুর বাড়ী॥—মেদিনীপুর

মায়ের প্রদত্ত একখানি শাড়ী পরিয়া কন্যা শ্বশুর গৃহে যাত্রা করিল। ইহার মধ্যে বাংলার পল্লীজীবনের যে রূপ ছায়াপাত করিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এখানে তবু পরিয়া যাইবার মত একখানি শাড়ীর কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শাড়ী তৈরী করিয়া পরিবার জন্য চরকা যৌতুক দেওয়া হইল। কিন্তু মেয়ের মন তথাপি অসন্তোষে পরিপূর্ণ—

২১

চরকা দিলাম চরকি দিলাম নাটাই দিলাম দানে,
তবু মেয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে চক্কোবর্ত্তীর কানে—
বাবা, বাঁক দিলে না ক্যানে?—ফরিদপুর

জনক-জননীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবার মুহূর্তেও যে কন্যাটি পিতার কানের কাছে ঘুন ঘুন করিতেছে যে তাহাকে কেন বাঁক নামক একটি অলঙ্কার দেওয়া হইল না, তাহা যেন পিতাপুত্রীর স্নেহ নিবিড় সম্পর্কটির ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশে ম্লান করিয়া দিয়াছে। জীবন যে শুধু মাত্র কবিতা নয়, নিষ্ঠুর গদ্যও বটে, এখানে তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কন্যা কি নিজের একান্ত স্বার্থের বশবর্তী হইয়াই এই আচরণ করে? তাহা কদাচ নহে—লোকে যে তাহার পিতাকে নিন্দা করিবে, ইহা তাহার দুঃসহ—

২২

জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।
তারি তলে বাবা আমার থাল দান করে
সেও থাল কানা বাবা লোকে নিন্দা করে।
জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।
তারি তলে কাকা আমার গেলাস দান করে।
জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।
তারি তলে মামা আমার কলসী দান করে।
সেও কলসী কানা মামা লোকে নিন্দা করে।—ঢাকা

কন্যাবিদায়

বিবাহের প্রায় সকল অনুষ্ঠান সম্পর্কেই ছড়া শুনিতে পাওয়া গেলেও পতিগৃহ যাত্রা বা কন্যা বিদায়ের ছড়াগুলিই বিষয়গুণে সর্বাপেক্ষা করুণ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের নিত্তনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা অনুতাপ অশ্রুপাত জামাতৃ পরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমন কি, নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই—কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। আমাদের মিলন-ধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্বদাই সেই বেদনায় হাত পড়ে।' এই বিষয় লইয়া সেইজন্যই অগণিত পল্লীসঙ্গীত রচিত হইয়াছে। কিন্তু ছড়াগুলির এই বিষয়ক প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে আগমনী বিজয়া গানের মত হরগৌরীর নাম প্রবেশ করে নাই। কন্যা বিদায়ের ছড়াগুলিই এই বিষয়ক পল্লীসঙ্গীতের জননী, মেয়েলী বিবাহ-গীতি কিংবা আগমনী বিজয়ার গীতিতে কন্যাবিদায়ের যে করুণ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, ছড়াগুলির মধ্যে তাহারই পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। ইহাদের বাস্তব-ধর্মিতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ—

১

ঢোল বাজে গামুর গুমুর শানাই বাজে রইয়া,
পরার পুত নিতে আইছে ঢোল' বাড়ি দিয়া।
আয় লো খেলার সই খেলার সাজু লইয়া
আর তো খেলুম না পরার ঘরে গিয়া।—চট্টগ্রাম

যে যুগে আট বৎসরের কন্যাকে গৌরীদান করা হইত, সেই যুগে ইহার বেদনা যে কী গভীর ছিল, আজিকার দিনের সমাজের দিকে চাহিয়া তাহা অনুমানও করিতে পারা যাইবে না। অপরিণত বালিকা-বয়সে জনক-জননী, ভাই-ভগিনী, খেলার সঙ্গিনীদিগের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া এক অনিশ্চিত জীবনের

নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের মধ্যে যখন পা বাড়াইতে হইত, তখন আশঙ্কায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি দুলিতে থাকিত। কিন্তু বেদনা ত শুধু নিজেরই নহে। অশ্রুমুখী জনক-জননী ভাই-ভগিনী পাড়াপ্রতিবেশী যে তাহার বিদায়ের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহাদের প্রতি অভিমানে বালিকার হৃদয় আজ যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল—

২

এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদলা তলায় বসে,
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে,
পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে;
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি, একদিন সমাজে যে কন্যাবিক্রয় প্রথা (marriage by purchase) প্রচলিত ছিল এবং এখনও নিম্ন শ্রেণীর অনেক সমাজেই যে তাহা প্রচলিত আছে, এখানেও তাহারই কথা বলা হই- -ছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক হইতে জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজও একদিন এই প্রথা দ্বারা ব্যাপক ভাবে দূষিত হইয়াছিল তাহাতে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের পত্নী ধর্মাচার্য নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বলিতেছে, 'আমার বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা ক'রেছেন, আরো এখনো দু'টো আছে। আমার চারিটিই ছেলে, মেয়ে হয় নি, তাই আমাদের সেই মিন্সে আমারে সর্বদা তাড়না করে বলে, "এমন হতভাগিনী তুই, একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।"' (৪র্থ-অঙ্ক, ১২৫৯ সং পৃঃ ৬৩)। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী এবং নিম্ন শ্রেণীর সমাজে এই প্রথা আজিও প্রচলিত আছে; এই প্রথা আদিম সমাজেরই (primitive society) একটি বৈশিষ্ট্য।

৩

ইটা কমলের মালো ভিটা ছেড়ে দে,
তোর ছাওয়ালের বিয়া বাদ্য এনে দে।
ছোটো বেলায় খেলাইছিলাম মুটি মুছি দিয়া,
মা গালাইছিলেন থুবরি বলিয়া।

এখন কেন কাঁদো মাগো ডুলির খুরা ধরে,
পরের পুতে নিয়ে যাবে ডুমডুমি বাজিয়ে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কত অল্প বয়সে যে পরের ঘর করিতে চলিয়া যাইতে হইত, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক সময় নিতান্ত আকস্মিক সংবাদে বিবাহ হইয়া যাইত বলিয়া ক্ষুদ্র বালিকাটি তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিত না—

৪

আয়রে পুলা পুড়ি ফুল টুকনিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়া মামার বাড়ী যাই।
যেম্‌নি গেলাম ফুল টুকনিতে অম্‌নি আইল বিয়া।
পরের পুতে নিতে আইছে ঢোল বাড়ি দিয়া।
ঢোল বাজে টেনর টেনর শানাই বাজে রইয়া।
চাচি কান্দে মাসি কান্দে একই খাটে বইয়া ॥—মৈমনসিং

একদিন সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে ফুল তুলিতে গিয়া শুনিতে পাইল, তাহার বিবাহ; পরদিনই যে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল। সমস্ত বিষয়টির কারুণ্যের উপর ইহার আকস্মিকতাও তাহাকে আঘাত করিল।

একদিন কণ্বমুনির আশ্রমে তরুলতা পশুপক্ষী শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার মুহূর্তে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল, এখানেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—

৫

তারামণি বারা ভানে ঢেঁকি উঠে না,
দুঃখ্যার মা চাইয়া রইছে জামাই আইয়ে না।
আইব জামাই নিব ঝি,
মার পরাণে কইব কি।
মায় কান্দে ভইনে কান্দে,
জলে কান্দে পানকউড়ী শুক্‌নায় কান্দে টিয়া॥

—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

ছড়াটির শেষ দুইটি পদে পরিবারের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে প্রকৃতলোকের পশুপক্ষী একাকার হইয়া উঠিয়া অন্তর্বেদনাটিকে শতগুণ করুণ করিয়া তুলিয়াছে।

৬

আজকে টুনুর বিয়ে হ'ল কাল যাবে ঘরে ;
কাঁদতে বসেছে সবে।
ঠাকুর মা কেন কাঁদো গো সিঁদুরের চুপড়ি ধ'রে ?
কাল যে ঠাকুমা সিঁদুর দিস্‌ল কপাল পতা ক'রে ?
বৌদি কেন কাঁদ গো ভাতের হাঁড়ি ধ'রে ?
কাল যে বৌদি ভাত দিস্‌ল থালা পতা ক'রে ?
বাবা কেন কাঁদো গো চালের বাতা ধ'রে ?
কাল যে বাবা মেরেছিল চালের বাতা দিয়ে।
দাদা কেন কাঁদো গো, গোয়ালের দড়ি ধ'রে ?
কাল যে দাদা গরু বেঁধেছিল গোয়াল ভর্তি ক'রে।
বোন কেন কাঁদো গো, কড়ে' আঙুল ধ'রে
কাল যে বোন গালি দিস্‌ল কড়ে' নাড়ী বলে।—২৪ পরগণা

আজ বিদায়ের মুহূর্তে প্রত্যেকের সম্পর্কেই যে তাহার স্নেহস্মৃতির কথাটিই মনে উদিত হইতেছে, তাহা নহে,—যাহারা তাহার প্রতি একদিন নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল, তাহাদের কথাও সে বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না। পিঠাপিঠি ছোট বোনটিই তাহার প্রতি মাত্র কাল যে নিষ্ঠুরতম গালি বর্ষণ করিয়াছিল, তাহা যেন তাহার অন্তরে বিঁধিয়া রহিয়াছে। অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে তাহার কথাই এখানে সে স্মরণ করিল। তারপর অশ্রুমুখী জননীকে প্রবোধ দিয়া যাইতে না পারিলে তাহার নিজের বেদনা যে গভীরতর হইয়া উঠিবে—

৭

আগু যায় বাজনদার পিছু যায় ডুলি,
দাঁড়াও হে বাজনদার মায়ে বোধ করি।
বাবা আমায় চাবি দিয়ে রাখবে কতক্ষণ
জানলা কেটে পালিয়ে যাব জনমের মতন।—২৪ পরগণা

৮

আগে যায় রে বারো বেহারা, পিছে যায় রে ডুলি,
দাঁড়াও কাহার ভাই মাকে কিছু বলি।

মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর ?
আপনি ভাবিয়ে দেখ কার ঘর কর।—২৪ পরগণা

এ'বার নিজেই যেন মা হইয়া নির্বোধ শিশুতুল্য-জননীকে সে সান্ত্বনা দিতে চাহিল,—'মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর।' নিজে একবার চিন্তা করিয়া দেখ ত তুমি কোথা হইতে আসিয়া কাহার ঘর আপনার করিয়া লইয়াছ। এই চিন্তার মধ্যেই জননীর ব্যথা যদি কিছু সান্ত্বনা লাভ করে।

৯

ওপারের কুল গাছটি রামছাগলে খায়,
তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুর বাড়ী যায়।
আগে যায় গো ভার বাউটি পিছু যায় গো ডুলি,
দাঁড়ারে কেবলা মায়ে বোধ করি,
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর,
আপনি ভাবিয়ে দেখ মা, কার ঘর কর।—হুগলি

বিবাহের যৌতুক সামগ্রী এবং শ্বশুর শাশুড়ী ননদের উপহার সামগ্রী লইয়া অগ্রে অগ্রে 'ভার বাউটি' যাইতেছে, পিছনে ডুলিতে আরোহণ করিয়া দ্রবময়ী শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিয়াছে। সমাজের রূপটি এই চিত্রটির মধ্য দিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; ইহা খেলার কথা নহে, ইহা জীবনের কথা; সেইজন্য ইহা কাব্যের রসে সমুজ্জ্বল।

১০

আঁকড় ফুলে ঝাঁক ঝাঁক, বেঁচ ফুলের পেঁড়ি,
দুর্গা যাচ্চেন শ্বশুর বাড়ী।
আজ থাক মা দুধ পান্ত খেয়ে,
কাল যাবে মা সহর কাঁদিয়ে।
পাছে যাচ্ছে ভার বাউটি,
আগে যাচ্ছে ডুলি।
দাঁড়ারে বাজ বাজন্দার,
মায়ে বোধ করি।
নির্বুদ্ধি, মাগো, কেঁদে কেন মর ?
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর।—মেদিনীপুর

তারপর সকলকেই একে একে আশ্বাস দিয়া যাইতেছে—

বাবাকে কি দিব নীলগিরি হাতী।
দাদাকে কি দেব দুধ খেতে বাটি॥
মাকে কি দেব হেঁসেল ঘরা ঘটি।
বৌকে কি দেব ছড়া ভর্তি কাঁঠি॥—মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে খোকন অর্থেও খুকুমণি। বিদায় কালে তাহাকে নানা আশ্বাস দিয়া জননী নিজের বেদনা ভুলিতে চাহিতেছেন—

১১

যাওরে খোকন যাও হস্ত নাইড়া যাও।
তোমার লাইগা সাজাইছে বত্রিশ দাঁড়ের নাও॥
বত্রিশ দাঁড়ের নাওখানি ঝলকে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে যাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি॥
মাসি কান্দেন পিসি কান্দেন সকলি কান্দার পর।
পেট পুড়নী মায়ে কান্দেন বেলা আড়াই পোহর॥
বড় বৌ কান্দনা করেন আমার দোসর ননদ কে নিল হরিয়া॥
ছোট বৌ কান্দনা করেন চক্ষে তেল দিয়া।
আমার দোসর ননদ কে নিল হরিয়া॥—ঢাকা

ছোট ননদের কপট আচরণটিও ছড়া রচয়িত্রী এখানে লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই। ননদ শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেলেই ভ্রাতৃবধূর শান্তি; সেইজন্য তাহার বিদায় দৃশ্যে তাহার চোখে জল আসিতেছে না। তথাপি সে 'চক্ষে তেল দিয়া' লোক দেখানো কান্না কাঁদিতেছে।

১২

আইলো ছবি খেলা করি বাবুর বাগানে,
তুলি ফুল গাঁথি মালা বসি দু'জনে।
মা দিল চুল বেঁধে বাবা দিল বিয়ে,
পর পুরুষে নিয়ে গেল আলতা সিঁদুর দিয়ে।—মুর্শিদাবাদ

১৩

বাপ যায়রে নায়ে নায়ে খুড়ো যায়রে তড়ে,
শিশু কালে হৈল বিয়া সদাই আগুন জলে।
খুড়ী কান্দে জেঠী কান্দে সকল কান্দে প'র,
মা জননী কান্দে বেলার আড়াই প'র।
খুড়ীলো জেঠীলো মাকে নে' যা ঘরে,
মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে।—ফরিদপুর

নিজের কান্না ভুলিয়া বালিকা মায়ের কান্না রোধ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ জানায়।

১৪

দোলাত উঠম্ দোলাত উঠম্ দোলা কেয়া লড়ে।
চান্দ্ কপাল্যা মা বাপ্ রে কান্দি কেয়া মরে ॥
ন কান্দিও ন কাটিও সঙ্গে যাইবো ভাই।
পরের্ পুতে বান্ধি নিবো কোন দাবী নাই ॥
খাট দিয়ম্ পালঙ দিয়ম্ দিয়ম্ ধেয়ন গাই।
সেই গাভী চরাইতাম্ দিয়ম্ কন্যার ছোট ভাই ॥—চট্টগ্রাম

নিজের গভীর বেদনার মধ্যেও বালিকা মাতাপিতার বেদনার কথা ভুলিতে পারিতেছে না ; সেইজন্য তাহাদিগকে সে প্রবোধ দিয়া যাইতেছে—

১৫

পোইরর্ পারত্ বাগ্যা ভুয়া ধুঁয়াই ধুঁয়াই জলে।
বাপর বাড়ীথুন্ কন্যা যাইতে ফোঁকাই ফোঁকাই কান্দে ॥
ন কান্দরে মা বাপ ন ভাঙ্গ হিয়া।
তোঙার ঘরত্ জন্মিয়াছি পরবাসী হৈয়া ॥
মারে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত ধাই।
পালিয়া পুষিয়া লইত তাহারার জামাই ॥
বাপরে কৈওরে ভাই দি পাঠাইত গাই।
ক্ষীর নবনী খাই যৌবন হৈত তাহারার জামাই ॥—চট্টগ্রাম

'তোমার ঘরত জন্মিয়াছি পরবাসী হইয়া।' বালিকার মুখে কী গভীর সত্য ভাষণ! শিশু নিমাই জননীকে তত্ত্ব কথা শুনাইয়াছিলেন, তাহা আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার বিষয়; কিন্তু এখানে ঘরের বালিকার মুখে জীবনের যে সুগভীর তত্ত্ব কথা প্রকাশ পাইল, তাহার যেন তুলনা নাই।

কতদূর যে তাহাকে যাইতে হইবে—কতদূর যে তাহার শ্বশুরবাড়ী তাহা বালিকা নিজেই জানে না! সে আশঙ্কা করিতেছে, বহুদূর তাহার শ্বশুরবাড়ী—তাহা হইলে মাতাপিতা তাহার সংবাদ লইতে পারিবেন না; সেইজন্য বহুদূর সে যাইতে চাহে না, তাই বলিয়া একান্ত নিকটেও থাকিতে চাহে না; কারণ, নিকটে থাকিলেও ঝগড়াঝাটির সম্ভাবনা। সুতরাং বেশি দূরেও নয়, বেশি নিকটেও নয়, এমন স্থানে শ্বশুরবাড়ী হওয়াই তাহার কাম্য—

১৬

সানাই বাজে জোড়া জোড়া কর্তাল বাজে রৈয়া,
মা বাপর কি ধন পাইলাম দূরে ন অ বিয়া।
দূরে ন অ দূরে ন অ গাইলর ভাগী হৈবা,
কাছে ন অ কাছে ন অ চুলাচুলি হৈবা,
মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনের সম্বাদ লৈবা।
ছিক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল,
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল।
খুড়ী জেঠী কান্দন করে পাক ঘরেতে বসি,
এ ভায়ারি ঝিঅরে নিল পাক ঘর শূন্য করি।
মায়েত কান্দন করে হাতিনাতে বসি,
এ ঝিঅরে নিল মোর হাতিনা শূন্য করি।
খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর ঘরে বসি,
এ ভাই ঝিয়রে নিল মোর গোঞাইর ঘর শূন্য করি।
বাপেত কান্দন করে উঠানেত বসি,
এ ঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য করি।
ভইনেত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি,
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ করি।

ভাইএত কান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি,
এ ভইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি।
ন কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইবো ভাই,
পরর পুতরে বান্ধি দিয় কোন দাবি নাই।
থাল দিয় লোটা দিয় আরো দিয় গাই,
সেই গাভীর চরানি দিও কন্যার ছোট ভাই।—চট্টগ্রাম

কন্যার ছোট ভাইটিকে কন্যার শ্বশুরগৃহে গরু চরাইবার রাখাল করিয়া পাঠাইয়া দিও, ভাইটিকে দেখিয়া ভগিনী পরগৃহবাসের দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারিবে। সমগ্র পরিবারের চিত্রটি যেন এই ছড়াটির মধ্য দিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মা কেবল একদিন আঘাত পাইবার জন্যই যেন কন্যাসন্তানকে শৈশব হইতে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না যে, একদিন এই কন্যার বিচ্ছেদ বেদনাই তাহার বুকে শেল হইয়া বিঁধিয়া থাকিবে—

১৭

অবলার মা কান্দে গো অবলারে লইয়া,
এত সাধের অবলারে কেমনে দিবাম বিয়া।
আগে যদি জান্‌তাম আমি যাইবে শেল দিয়া,
তবে ত না পালিতাম আমি বুকের দুধ দিয়া।
—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

১৮

হাজেরার মা কান্দে গো হাজেরারে লইয়া,
পালন ছোবার হাজেরারে কেমনে দিবাম বিয়া।
দিছি বিয়া শুকুর বারে জুলা টেহা লইয়া॥
ছুডু মুডু নাও খান,
ঝলকিয়া উঠে পানি খান;
আস্তে ধীরে যাওরে মাঝি শুনি মায়ের কান্দন।—ঢাকা

কিন্তু এই সর্বব্যাপী বেদনার চিত্রটির মধ্যেও সংস্কার আচরণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; তাহার লোক-দেখানো কান্নার অন্তরালে তাহার নিষ্ঠুর হাসি চাপা পড়িতে পারে নাই—

১৯

মাওই গো মাওই নিতাম আইছি,
কারে নিতা আইছ ?—বুরে নিতাম আইছি।
কিদ্‌দিয়া নিতা আইছ ?—নয়া মাফা দিয়া।
মায় কান্দে দুধ ভাত লইয়া
বাপে কান্দে মরিচ ক্ষেত' বইয়া,
ভাইএ কান্দে মাফার কুড়াত ধইর্যা।
চাচী কান্দে মাসী কান্দে অক্কই জাগাত বইয়া,
ভইনে কান্দে খেইলের হাজু লইয়া॥
হতাই-এ কান্দে ভস্‌ভসি,
চউখেই পানি নিয়ে ভাসে,
কল্‌কলি হাসে।—মৈমনসিং

কন্যাকে বিদায় দিয়া দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্যের মাঝখানেও মাতাপিতা দিদিমা সেই বেদনার কথা ভুলিতে পারেন না—

২০

আয় গো ছেলে মেয়েরা মেন্দি তুল্‌তে যাই,
মেন্দি ডালার ভাব লাগ্যা নাকফুল ছিঁড়্যা যায়।
নাকফুলের উছিলায় বিয়া হইয়া যায়।
মায়ে কান্দে গো হল্‌দি ক্ষেতে বইয়া,
বাবায় কান্দে গো লাঙ্গলের খুঁটি ধইরা।
দাদী কান্দে গো গামছা মাথায় দিয়া॥—ঢাকা

পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র ভ্রাতৃবধূর ব্যবহারটি সর্বত্র সমান নহে ; কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বজনীন বেদনার চিত্রটির মধ্যে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই, সেও সকলের সঙ্গেই আন্তরিক বেদনা অনুভব করিয়াছে ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার ঈর্ষা বোধটি সজাগ রহিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

২১

আম গাছে ডাকে কোকিল চন্দন গাছে বাসা,
জানকীরে নিবা কৈরা মনে করছ আশা।
আগে যদি জান্তামরে জানকী তরে নিব পরে,
শঙ্খ সিন্দুর দিয়া রে জানকী বরিতাম তরে।
আড়শি কান্দে পড়শি কান্দে রইয়া রইয়া।
জানকীর মায় কান্দে শানে আছাড় খাইয়া॥
আড়শি কান্দে পড়শি কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া,
জানকীর বাপে কান্দে গামছা কান্ধে লইয়া।
আড়্শি কান্দে পড়্শি কান্দে রইয়া রইয়া,
জানকীর ভইনে কান্দে লেবু পাস্তা লইয়া॥
আড়শি কান্দে পড়শি কান্দে রইয়া রইয়া,
জানকীর ভাই বৌ কান্দে চক্ষেতে মরিচ দিয়া॥
আড়শি কান্দে পড়শি কান্দে রইয়া রইয়া,
জানকীর ভাইয়ে কান্দে চুলের ফিতা লইয়া॥—ঢাকা

ক্ষুদ্র স্নেহপুত্তলিকাটিকে লইয়া নৌকাটি নদীর বুকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, অশ্রুমুখী মা ও মাসি ঘাটে বসিয়া তখনও কাঁদিতেছেন—

২২

মায় কান্দে মাসি কান্দে অক্কই ঘাটে বইয়া,
মায়ের পেটের ভইনে কান্দে পালই গড়' পইড়া—মৈমনসিং

মাতৃস্নেহের আস্বাদ পরিপূর্ণ লাভ করিবার পুর্বেই পরের ঘরে চলিয়া যাইতে হইত বলিয়া মাতৃস্নেহের পিপাসা বালিকার অতৃপ্ত হইয়া থাকিত—

২৩

কাঁটালের পিড়িখানি ঘি মিউ মিউ করে,
তারি উপর বাপ খুড়া কন্যা দান করে।
বাপে যায় রে নায়ে খুড়া যায় তড়ে,
শিশুকালে বিয়া দিয়া সদায় আগুন জলে।—ঢাকা

বাপের বাড়ীর দালান কোঠা পিছনে পড়িয়া রহিল, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে ফিরিয়া একদিন এখানে আসিবে, এই আশা লইয়া কন্যাটি অনিশ্চিত জীবনের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়—

২৪

বেতের বান্ধন বেতের ছান্দন,
তার মাধ্যে বন্যা বিবি জুড়িল কান্দন।
আর কাইন্দ না বেলা উদয় শেষ,
গাও তোল ডুলিত চড় চলি আপন দেশ।
কন্দুর ঘাটা যায়া বিবি ফিরিয়া চায়,
বাপে ভাইয়ের দালন কোঠার ঝিলিক দেখা যায়।
থাক থাক দালান কোঠা মায়ের আত্ম জুইড়া,
যদি বিবি বাইচা থাকে আবার আইসব ফিরা্যা।—পাবনা

পতিগৃহগামিনী অশ্রুমুখী কন্যাটিকে মাতাপিতা নানা ভাবে আশ্বাস দিয়া থাকেন—

২৫

বাবা কেন কান্দিবে শ্বশুর বাড়ী যাইব,
লোক দিমু লস্কর দিমু সাথে সাথে যাইব।
হাতী দিমু ঘোড়া দিমু তাত চইড়া যাইব,
ফুলের বাগিচা দিমু ছায়ায় ছায়ায় যাইব।
বড় বড় কড়ি দিমু খাবার কিনা খাইব।
ছোট ছোট কড়ি দিমু খ্যাওয়াত পার হইব।—পাবনা

কন্যা ঘরের শোভা, তাহাকে পরের ঘর শোভা করিবার জন্য বধূ করিয়া পাঠাইয়া দিলে নিজের ঘর যে শোভাহীন হইয়া যায়, এই বেদনা কিছুতেই জননী ভুলিতে পারেন না—

২৬

মণির মায় কান্দে গো মণিরে বিয়া দিয়া,
ঘর শোভা মণি গো কেমনে থাকবে গিয়া।
মণির মা মণিরে ছাইড়া চাউল ভাজা খায়,
ঘর শোভা পক্ষীটা মণিরে লইয়া যায়।—ঢাকা

শিশু কন্যাকে বিবাহ দিয়া ঘর শূন্য হইয়া গেল, এই বেদনা জননীর হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠে—

২৭

শাক তুল্লাম মুখে মুখে বাঙ্গন তুল্লাম জালি,
শিশু মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর কল্লাম খালি।—খুলনা

বাল্যবিবাহ-পীড়িত বাংলার সমাজের একদিন মাতৃহৃদয়ে যে হাহাকার উঠিয়াছিল, বাংলার ছড়াগুলি তাহার স্বর কতটুকু ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে?

২৮

পোইরর্ চারিপারে লাগাইয়াছম্ তারা,
আজ লাগতি এড়ি যামর্ মা বাপর পাড়া।
কলাগাছে গুয়া গাছে মেলি দিছে পোল,
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর কোল।
কলাগাছে গুয়া গাছে মেলি দি এ ডাগ্ উআ,
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর বুক্উআ।—চট্টগ্রাম

জোড় পুতুলের বিয়ে

কতকগুলি ছড়ার বিষয় 'জোড় পুতুলের বিয়া'; ইহারা পুতুল বিয়ের ছড়া; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের জীবনধর্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে এবং ইহাদের মধ্য দিয়াও পরগৃহবাসের আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও খেলার ছড়ার যাহা ধর্ম, তাহাও ইহাদের মধ্য দিয়া মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইয়া ইহাদের ভাব কোন কোন স্থানে সামান্য তরলায়িত করিয়া দিয়াছে। তথাপি ইহাদিগকে এই বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আলতাঝুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে।
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে॥
এখন কেন কানছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।
আগে কাঁদে মা বাপ পাছে কাঁদে পর,
পাড়াপড়শি নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর॥
শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনি,
তাতে বসে পান খান দুর্গা ভবানী।
হেঁই দুর্গা, হেঁই দুর্গা, তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা গোঁদের ডালা কোন্ সোহাগির বউ।
হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বউ।
এক বাড়িতে দই দিবা এক বাড়িতে চিঁড়ে।
এমন করে ভোজন ক'রো গোক্নাথের কিরে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

মাতাপিতার প্রতি অভিমান নিমোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। বহু অর্থের বিনিময়ে পিতা যে কন্যাটিকে বহু দূর দেশে 'বিক্রয়' করিয়া দিয়াছেন, এই অপমান সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। এই আচরণের জন্যই মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কোন কোন সময় অশ্রদ্ধা এবং অভক্তির রূপে বিদ্রোহ প্রকাশ করে।

২

আলতা মুড়ি গাছের গুঁড়ি হয় পুতুলের বিয়ে।
সকলকে দিল আশে পাশে,
আমাকে দিল বনবাসে।
এ দেশে কি বর ছিল না,
এই কি বাবার বিবেচনা।
বাবার জন্য কি এনেছ পক্ষীরাজ ঘোড়া,
মায়ের জন্য কি এনেছ—মাথা বাঁধা দড়া;
ভাইএর জন্য কি এনেছে,—দুধ খাওয়ার বাটি;
বোনের জন্য কি এনেছ—জল দেওয়া ঘটি।—২৪ পরগণা

মনে হইতেছে, উপরি-উদ্ধৃত ছড়ার শেষাংশ স্বতন্ত্র কোন ছড়ার বিচ্ছিন্ন অংশ; সেইজন্য ভাবের দিক দিয়া প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের সঙ্গতি নাই। এই ছড়ার শেষাংশটি এই বিষয়ক ছড়ার 'ভাব-সম্মিলন'; ইহার বিষয় এই অধ্যায়ের সর্বশেষ ছড়াটির সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

টাকা লইয়া যে পিতা ক্ষুদ্র কন্যাটি বহু দূরে বিসর্জন দিয়াছেন, বিদায়ের মুহূর্তে কন্যার সেই কথাই বার বার মনে হইতেছে—

৩

আলতা মুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে,
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মাথায় দিয়ে?
আগে কাঁদে বাপ মা পিছে কাঁদে পর।
পর পত্তেশ লিখে দিলাম শ্বশুর বাড়ীর ঘর।
শ্বশুরদের ঘরখানি খড়েরই ছাউনি,
বাপেদের ঘরখানি বেতেরই ছাউনি।
তার মধ্যে বসে আছে মা দুগ্গা ভবানী।

—পাবনা-রাজসাহী

এমন কি, জোড় পুতুলের বিবাহের সংবাদ সুদূর পূর্ব বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে গিয়াও পৌছিয়াছে—

৪

মা গো মা, জোড় পুতুলের বিয়া।
লাই জাংলার তলে গো মা জোড় পুতুলের বিয়া॥
আরশি কান্দে, পড়শি কান্দে, চালের বাতা ধরুইয়া।
মা বাপ কাইন্দা মরে হলদি ক্ষেতে যাইয়া॥
ভাই-বইন কান্দে জোরে চইক্ষে মরিচ দিয়া।
সোনা ভাই পাগল অইছে কৈতরীরে লইয়া॥
কৈতরী লো কৈতরী, উছা ধান বান।
গোদা গেছে মাছ মারিতে কাপড় ধরুইয়া টান॥
গোদা গেল মাছ মারিতে গাঙ্গে আঁড়ু পানি।
গোদারে ধরল জোকে লাগল টানাটানি॥—মৈমনসিং

পুতুলের বিবাহ বলিয়াই শেষাংশে ইহার জীবন-ধর্মিতা তরলায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

৫

শাইল মাটির তলে গো জোড় পুতুলের বিয়া।
মামি কান্দে, পিসি কান্দে চালের বাতা ধরুইয়া॥
বাপ কান্দে, মায় কান্দে হলদি ক্ষেতে বইয়া।
ভাই-বইন কাইন্দ্যা মরে চইক্ষে মরিচ দিয়া॥—মৈমনসিং

ভাই ভগিনীর আচরণটি এখানে লক্ষ্য করিবার মত; তাহাদের চোখে জল নাই, এতটুকুন বয়সে তাহারা ভগ্নী বিচ্ছেদের গুরুত্বটি এখনও অন্তর দিয়া অনুভব করিতে পারিতেছে না; সেইজন্য সহজে তাহাদের চোখে জল আসিতেছে না, অথচ পরিবারের সকলেই যখন কাঁদিতেছে, তখন কাঁদা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহারা চোখে লঙ্কা দিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। ভগ্নী তাহাদিগকে বয়সের দাবী লইয়া হয়ত সময়ে অসময়ে শাসন করিত, আজ তাহার বিদায় হইবার দিনে সেইজন্য তাহার বেদনায় তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না।

৬

লাউ মাচার তলে লো জোড়া পুতুলের বিয়া।
বাজনা বাজায় ঝুমুর ঝুমুর দেখে আসি গিয়া।
আম কাঠালের পিড়িখানি ঝিমিক ঝিমিক করে,
তারি মধ্যে বাপে খুড়ায় কন্যা দান করে।—ঢাকা

খেলা সব সময়ই শুধু মাত্র খেলা নয়, জীবনের গভীর বেদনা গোপন করিবার উপায় মাত্র। পুতুল বিয়ের খেলাও তাহাই; সেইজন্য তাহার মধ্য দিয়াও জীবনের সুগভীর ক্রন্দনের কথাই শুনা যায়—

৭

শাইল মাডির তলে গো জোড়া পুতুলের বিয়া,
মাসি কান্দে পিসি কান্দে চালের বাতা ধইরা।
বাপে কান্দে মায় কান্দে হল্‌দি ক্ষেত বইয়া,
ভাই ভইন কান্দ্যা মরে চক্ষে মরিচ দিয়া।—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

আজ পুতুলের জন্য কাঁদিতেছে, কাল নিজের জন্য কাঁদিবে। সেই কথাই নানা ভাবে শুনা যায়—

৮

উলুবন তুল তুলু পুতুলার বিয়া,
পুতুলারে নিতে আইছে লাল শাড়ী দিয়া।
পুতুলার মাথায় টাক পড়্‌ছে,
পান্তা ভাতে পোক পড়্‌ছে।
জামাই যায় ঘুরইয়া,
পোক গেল জুড়াইয়া॥—ঢাকা

পুতুলের মধ্য দিয়া এখানে জীবনটিকে অনুভব করা হয় বলিয়া অনুভূতি এখানে প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব গুণ লাভ করিতে পারে না, সেইজন্যই ক্ষণে ক্ষণে তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। উপরের ছড়াটিতেও তাহাই হইয়াছে—

৯

লাল মাটির তলে গো তাল পুতুলের বিয়া,
আমার ভাই চইল্যা যাইব সোনার মুকুট দিয়া।—ঢাকা

পরের ঘর

পুতুল খেলার ঘর-সংসারের ভিতর দিয়াই বালিকা একদিন জীবনের খেলা-ঘরে প্রবেশ করে, পুতুল বিয়ের ছড়াগুলির মধ্যেও সেইজন্য জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়।

পিতৃগৃহের পরিপূর্ণ আনন্দ উল্লাস ও অফুরন্ত স্নেহ দাক্ষিণ্যের মধ্যে একদিন আকস্মিক পরগৃহ বাসের অভিশাপ আসিয়া পড়িল। যে শিশুকন্যা জনক-জননীর নিকট হইতে কেবল মাত্র স্নেহই লাভ করিয়া আসিয়াছে, সহসা সে কী নিষ্ঠুর আচরণের সম্মুখীন হইতে চলিল—

১

আয়লো পুলাপুড়ি ফুল টুকানিত যাই,
যেম্‌নি গেলাম ফুল টুকানিত অম্‌নি অইল বিয়া।
আর ত খেইল খেলতাম না গো পরের ঘরে গিয়া,
পরের পুতে লইয়া যাইবে ঢোল বাড়ি দিয়া।
পরের পুতে মার্‌ব,
চুল ধইরা টান্‌ব।

শেষ দুইটি পদ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিশুকন্যাটির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল। সেইজন্য তাহার কথাগুলি যেন স্খলিত হইয়া গেল। পূর্বোদ্ধৃত একটি ছড়া স্থানান্তরে গিয়া সামান্য এক আধটু পরিবর্তিত হইলেও ইহার মূল স্বরটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—

২

সারাদিন চিড়া কুটলাম চিড়া পাইলাম না,
একখান চিড়া মুখে দিলাম শান্তি পাইলাম না।
একখান চিড়া মুখে দিলাম শাশুড়ী মাইল ঠোক্কা,
ঘরের পাছে কান্‌তে গেলাম ভাউরে মাইল চাক্কা।
গোয়াইলে গেলাম গোবর ফালতাম যাঁড়ে মাইল গুঁতা,
গাঙে গেলাম হাত ধইতাম কুমীরে মাইল জাতা।
জাতা মাইরা নিদয় কুমীর ঠেঙ্গে দিল টান,
পরের ঘরে অভাগিনীর উইড়িয়া গেল জান।—ঢাকা

ভাগ্যকেই জীবনে মানিয়া লইয়া এই বিড়ম্বিত জীবনে শান্তি পাওয়া ছাড়া উপায় কি? ইহাতে জীবনের উপরি স্তরের ফেনিল আবর্তটুকুই শুধু রূপ লাভ করে নাই, ইহার গভীরতম স্তরের বেদনার কথাও স্তম্ভিত হইয়া আছে। শৈশব খেলার বহির্মুখী উল্লাসের ভিতর দিয়া অন্তর্মুখী এই বেদনাকে গোপন করিবার প্রয়োজন হয়—

৩

নন্দে গেছে গাঙের কূল,
ফুইট্যা রইছে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইছে আনন্দে।
মা গো মা কাইন্দ্য না,
শামার গলা ভাইঙ্গ্য না।
কেচকি মাছের দুধের সর,
কেমনে করবে পরের ঘর।
পরের মায় দূর দূর,
চইক্ষের পানি ভুরভুর।—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

কন্যা সন্তানটি যখন নিতান্ত শিশু, তখন হইতেই জননী তাহাকে পরগৃহ বাসের বিভীষিকা দেখাইয়া সাংসারিক কর্তব্যে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিতে চাহেন—

৪

ছোট মেয়ে দুধের সর,
কেমনে করবি পরের ঘর।
পরের বেটায় মারবে চড়,
ঘুরুইয়া ঘুরুইয়া কাম কর।—ঐ

একে স্বামীর অদর্শন, তাহার উপর পরিবারের শাসন, ইহাদের বেদনায় বালিকা-বধূর জীবনটি কি ভাবে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার নিজের ভাষাতেই শুনি—

৫

আড়া বনে বাড়া ভানি ঢেঁকি উঠে না,
লাল শাড়ি পর্‌য়া থাকি জামাই আইয়ে না।

শিক্কায় থুইলাম পিঠাখানি তাও পাইলাম না,
কাঁচা কঞ্চির বাড়ি আমার পিঠে কুলায় না।—ঐ

এতটুকুন মেয়ের নরম পিঠখানি কাঁচা কঞ্চির আঘাতে কাটিয়া বসিয়া গিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, কী নিষ্ঠুরতার মধ্যে বাংলার বধূকে যে জীবন ধারণ করিতে হইত, ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট ভাষায় তাহা আর কোথা হইতে জানিতে পারা যাইবে? 'কাঁচা কঞ্চির বাড়ি আমার পিঠে কুলায় না।' এই কঞ্চির দাগ বাংলার ছড়াগুলি ধরিয়া রাখিয়াছে।

যে শিশুকন্যা শৈশবেই মাতৃহারা হইয়াছে, যাহার ঘরে সৎমা আসিয়াছে, তাহার দুঃখ সীমাহীন, পিতৃগৃহও তাহার পরগৃহ, জ্বালা জুড়াইবার তাহার কোন স্থান নাই—

৬

টুকুনি লো সই,
পিঁড়ি দেলো বই।
ছোটবেলা মা মরছে দুঃখের কথা কই॥
মা মরল দুধের বাচ্চা থুইয়া, বাপে করল বিয়া,
এমন পোড়ানি পোড়ে লো তুষের আগুন দিয়া।

—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

শিশুকন্যার শৈশবের খেলাধূলার মধ্যে পরের ঘরের আশঙ্কা মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্নের মত দেখা দেয়—

৭

আয় গো খেলুনিরা খেলতাম যাই।
খেলতাম না খেলতাম না,
পরের ঘরে যাইতাম না,
পরের মায় দূর দূর,
চক্ষের পানি ভুর ভুর,
মিয়া ভাইর বউ গো,
বিলাই আইন্যা সাজাও গো,
বিলাই ত সাজে না,
ঝিঙা ফুল ফুটে।—ঢাকা

বিবাহ হইয়া গেলে পিতৃগৃহে আর থাকিবার উপায় নাই, অথচ কি করিয়া পরের ঘর করিবে সেই ভাবনারও অন্ত নাই—

৮

অন্নপূন্না ত্নধের সর, ক্যামনে করবো পরের ঘর।
পরের বেটা মারিবে, কানাচ বইস্যা কাঁদিবে।
ছিনাজোঁকে ধরিবে, লাফাইয়া মরিবে।
বাপ কইবো যাইট্ যাইট্, মায় কইবো থাউক,
বউ কইবো দূর কইর্যা দাও, শ্বশুর বাড়ী যাউক।—ফরিদপুর

মাতাপিতা সন্তানকে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার তাহা ত অসহ্য হইয়া উঠিবে! এই চিরন্তন গার্হস্থ্য নীতির কথা অনিবার্যভাবে ছড়ার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

৯

সারাদিন চিড়া কুটলাম চিড়া পাইলাম না।
একখান চিড়া মুখে দিয়া তুঃখে বাঁচি না॥
বাঘুনী শাশুড়ী আইয়া গালে মাইল ঠোক্কা।
ঘরের পাছে কানতে গেলাম ভাউরে মাইল চাক্কা॥
গোয়াইলে গেলাম গোবর ফালতাম হাঁড়ে মাইল গুঁতা।
গাঙ্গে গেলাম হাত ধইতাম কুমুরে মাইল জাতা॥
জাতা মারইয়া নিদয় কুমুর ঠেঙ্গে মাইল টান।
পরের ঘরে অভাগিনীর উড়ইয়া গেল জ্ঞান॥ --মৈমনসিং

পরগৃহবাসের বেদনা উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়া যেন শতমুখে ভাষা পাইয়াছে। সকল শ্রেণীর ছড়াই যে অকারণ আনন্দের অর্থহীন অভিব্যক্তি নহে, এই ছড়াটির মত এত স্পষ্ট করিয়া তাহা আর কাহারও ভিতর দিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

১০

আমলী পাতা ত্নধের সর।
কেমনে করবে পরের ঘর॥
পরের ঘর না যমের ঘর।
রাইত না পোয়াইতে কামে ধর॥

চউখের পানি দরদর।
কামে বোলে কর কর ॥
পরের পুত রইস্যা।
বেত মারে কইস্যা ॥—মৈমনসিং

'পরের ঘর না যমের ঘর' বাস্তব জীবনের এই কঠোর অভিজ্ঞতা বালিকা বয়সেই যে কন্যাটি সঞ্চয় করিল, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই; কারণ, প্রাত্যহিক জীবনে এই ঘটনার অভিনয় তাহার নিজের গৃহেও সে দেখিতেছে; সুতরাং তাহারই অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী একটি ছড়ার অন্নপূর্ণা যে কি ভাবে এখানে আমলী পাতা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অন্নপূর্ণা সম্পর্কে পল্লীবাসীর সুস্পষ্ট ধারণা নাই, কিন্তু আমলী (সংস্কৃত আমলকী কিন্তু এখানে তেঁতুল অর্থ) পাতা সম্পর্কে তাহাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সেইজন্য এই কথাটি অতি সহজেই আসিয়া গিয়াছে।

পরের ঘর সম্পকিত ছড়ার সংখ্যা যে এত অল্প তাহা নহে। কন্যা বিদায়ের ছড়ার মধ্যে পরগৃহবাসের আশঙ্কা নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত পাশুড়ী ও বধূ সম্পর্কিত ছড়াগুলির মধ্যেও এই ভাবটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। এমন কি, নিম্নে যে পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহার মধ্যেও পিতৃগৃহে প্রবর্তনের জন্য কন্যার যে কাতরতা দেখা যায়, তাহাতেও তাহার পরগৃহবাসের দুঃখের কথা যেন শতমুখে ভাষা পাইয়াছে।

'গুণবতী' ভাই

বহু দিনের অদর্শনের পর যখন 'গুণবতী' ভাইটি স্নেহময়ী ভগ্নীর সংবাদ লইতে তাহার শ্বশুর-গৃহে আসিল, তখন তাহার পুঞ্জীভূত বেদনা অন্তরের সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল,—

১

'ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
ও পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে—
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'
'এ মাসটা যাক দিদি কেঁদে কঁকিয়ে,
ও মাসটা নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে।'
'হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হ'লো দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 'এই অন্তর্ব্যথা; এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রু জলোচ্ছ্বাস কোন্‌কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে কোন অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোন চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।...ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনা-পরম্পরা কে বলিয়া দিবে! দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে কত সহ্য করতে হইয়াছিল—এমন সময় সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে,—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে? সেই ঘর সেই খেলা সেই বাপ মা সেই সুখ শৈশব সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি একদণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়! বিশেষত সে দিন নদীর ও'পার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম ঝম করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারা মুখরিত

মেঘচ্ছায়া শ্যামল, কূলে কূলে পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনই হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি।' (রবীন্দ্র রচনাবলী ৬, 'লোক-সাহিত্য', পৃঃ ৫৯৮)।

এখানে ভাইকে যে 'গুণবতী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাঠকদিগকে ব্যাকরণ অনভিজ্ঞা মূঢ়া ভগিনীটিকে মার্জনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। লোক-সাহিত্যে কতকগুলি বিশেষার্থক শব্দ আছে, তাহাদের মধ্য দিয়া অর্থ এবং ভাব প্রকাশের বিশেষ শক্তি প্রকাশ পায়। এখানে 'গুণবতী' শব্দটিও সেই বিশেষার্থক শব্দ, এখানে গুণবান্ ভ্রাতা ব্যবহার করিলে শব্দের এই অর্থ প্রকাশ পাইত না। 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও শুনিতে পাওয়া যায়,—'মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতী।' এখানে সৎ বলিলে মাণিকচন্দ্র রাজা সম্পর্কে উদ্দিষ্ট বিশেষ গুণগুলি প্রকাশ পাইত না। লোক-সাহিত্যের ভাষা লোক-মানস গঠিত ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা শাসিত হয়।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটির মধ্যে মুখ্যতঃ পিতৃগৃহাগত ভাইয়ের উল্লেখ না থাকিলেও উপরি-উদ্ধৃত বেদনার সুরটি কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে—

২

ওপারে জাম্বি গাছটি জাম্বি বড়ো ফলে।
গো জাম্বির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে আইঢাই গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিনলাম, চুণ কিনলাম, ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দেলাম॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি॥
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটাসোটা চুলগুলি গো-পেতে বসেছে।

চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে ॥
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে ॥
পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে।
নাল গামছা দিয়ে ॥
অশথের পাতা ধনে।
গৌরী বেটী কনে ॥
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্দি বাজে চড়কডাঙার ঘর ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

৩

ও পারে ধন্‌চে গাছে ধন্‌চে ফল ধরে,
ও ধন্‌চের মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই গলা করে কাঠ,
এদ্দূরে এলাম রে মা হরগৌরীর মাঠ।
হরগৌরীর মাঠে রে মা পাকা পাকা পান,
পান কিন্‌লাম চূন কিন্‌লাম ননদে ভাই-বৌ খেলাম।

—পাবনা।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে পুনরায় পরগৃহবাসের দুঃখের মধ্যে পিতৃগৃহের সংবাদ লইয়া ভাইয়ের আগমনের জন্য প্রতীক্ষমানা ভগিনীর বেদনার কথা শুনিতে পাই—

৪

বোন—এদেশ বাপেরি দেশ ফিরে ফিরে চাই,
গড় ক'রে যাই
ফিরে ফিরে চাই,
যদি আনে ভাই,
আউশ ধান পাকিলে ভাই

হেমন্ত ধানের গোড়া
এখনও না এল ভাই, অভাগিনী পাড়া।
ভাই—এ'মাসটা থাক বোন কাঁদিয়ে কাটিয়ে,
মাঘ মাসকে নিয়ে যাব দোলায় চড়িয়ে—২৪ পরগণা

৫

আমার একটা বইন আছে হীরা চান্দের মালা,
রাইতে দিনে খবর দেয় যাইতে বড় জ্বালা।
মোহনগঞ্জের বাজারে কোটা কোটা ঘর,
জলে ভাসা সাবান দিলে করুব পরের ঘর।—মৈমনসিং

ভাইয়ের কাছে ভগিনীর দাবী বিশেষ একটা কিছু নহে, ন্যূনতম মূল্যের একখানি সৌখিন সামগ্রী জলে ভাসা সাবান মাত্র। কিন্তু ভগিনীটি রূপে 'হীরা চান্দের মালা।'

পরগৃহবাসিনী কন্যা দীর্ঘকাল অদর্শনের পর গুণবতী ভাইয়ের নিকট হইতে খুঁটিনাটি করিয়া তাহার পিতৃগৃহের সংবাদ লইতেছে—

৬

'কুলায় কইরা কামরাঙ্গা সিন্দুর ট্যাকো নিরে ভাই?'
'অলো বোন চম্পাই।'
'শুইয়া চন্দ্র খ্যাখো নিরে ভাই?'
'অলো বোন চম্পাই।'
'দীঘির পাড়ের কচুর শাক খাওনিরে ভাই?'
'অলো বোন চম্পাই।'—ঐ

ফেলে আসা পিতৃগৃহের কত খুঁটিনাটি সংবাদ জানিবার জন্য তাহার কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা! এমনি করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সে ভাইয়ের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিবার প্রয়াস পায়।

পরগৃহবাসিনী কন্যা কখনও কখনও নদীতীরে দাঁড়াইয়া দেশ বিদেশের নৌকার মাঝিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলে—

৭

'কুবালির বেডাইন যাও গো গাঙ্গে বৈঠা বাইয়া,
ঠাকু ভাইরে কইও নাইওর নিতে আইয়া।'
'থাক থাক ভইনি গো কিল মুড়া খাইয়া,
আষাঢ় মাসে নিতাম আইয়াম বড্‌ডা পান্‌সি লইয়া ॥—ঐ

কুবালির বেডাইন শব্দের অর্থ কোথাকার লোক। ক্ষুদ্র বালিকাটি মনে করে, বিদেশ হইতে নৌকা বাহিয়া যাহারা আসে, নৌকা বাহিয়া যাহারা বিদেশে যায়; তাহারা সবাই তাহার 'ঠাকু ভাই'কে চিনে। বিদেশী মাঝিরা তাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিতে পারে; তাহাদেরও ভগিনীরা এই প্রকার পরগৃহ-বাসের দুঃখ সহ্য করিতেছে, তাই তাহাকে আশ্বাস দিয়া যায়।

এই প্রকার আরও শুনা যায়—

তোমরা কে যাও গো রঙিন নাও বাইয়া,
বাপ মায়েরে কইও খবর নাইয়র নিত আইয়া।
চাচাত ভাই জেঠাত ভাই·নাও বাইয়া যায়,
মার পেটের নাল্যা আলি ফিরা্যা ফিরা্যা চায়।—ঢাকা

পরগৃহের অপরিসীম দৈন্যের মধ্যে পিতৃগৃহের ঐশ্বর্যের কথা বার বারই স্মরণ হয় এবং সেখানকার প্রতি আকর্ষণ দুনিবার করিয়া তোলে। বধূর নিকট পিতৃ-গৃহের ঐশ্বর্যের তুলনা নাই, স্বামিগৃহের সকল ঐশ্বর্যও যেন তাহার চিন্তায় ম্লান হইয়া যায়—

৯

বাপের বাড়ী বন্দার পীর পুব দুয়াইরা ঘর,
আইস্‌তে যাইতে দিও খবর মোরে লইয়া যাইত নাইয়র।
মনে কয়রে ধাইয়েরে যাইতাম কলঙ্কেরি লাগে ডর,
বাপের বাড়ী বাদার পীর পুব দুয়াইরা ঘর।—ঢাকা

তারপর একদিন যখন সত্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাই ভগিনীকে লইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন ভগিনীর আনন্দ যেন মনের সকল আগল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসে—

১০

আয় তই, তই তই,
বিন্নি ধানের খই।
ভাই আইছে ভইনের লাগ্যা
চলতি ঘোড়া লই।—নোয়াখালী

ঢাক ঢোল শানাই বাজাইয়া মহা সমারোহে ভাইয়েরা ভগিনীকে পিতৃগৃহে 'নাইয়র' লইয়া যাইবার আয়োজন করিল।

১১

খাঁর ঝি রান্‌ছ কি?
ইচা মাছের ঝোল।
খায়রা আইছে নাইয়র নিত
তিনটা আন্‌ছে ঢোল।
একটা আন্‌ছে শানাইয়া,
দুইটা আন্‌ছে বানাইয়া।—ঢাকা

পরগৃহবাসের বন্ধনের মধ্য হইতে মুক্ত পাইবার আনন্দের মত বধূর আর কোন আনন্দ নাই, ঢাক ঢোল শানাই সেই মুক্তির আনন্দেরই প্রতীক্। এই বন্ধনের দৃঢ়তা হইতেই পরগৃহবাস যে কি কঠিন ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে গুণবতী ভাইয়ের পরিবর্তে মামার নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এখানে মাতুলের মধ্যেই স্নেহময় ভ্রাতার গুণটি বিকাশ লাভ করিয়াছে—

১২

কেডা যাওগো লাল চৈর বাইয়া,
সোনার মামারে কইও নাইয়র নিত আইয়া।
থাক থাক ভাইগ্নি গো পথের দিকে চাইয়া,
আট্যা ধান দাওয়া হৈলে নাইয়র নিমু আইয়া।
আইট্যা ধানের কড়মড় কুমড়ি ধানের চিড়া,
হায় পরাণ পুড়রে জাইত মরিচের গুড়া।

কেডা যাওরে ধলি গাঙ বাইয়া,
কেডা যাওরে লাল চইর বাইয়া।
সোনার মামারে কইও নাইয়র নিত আইয়া।—ঢাকা

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন ভাব-সম্মিলন আছে, মঙ্গলকাব্যে যেমন স্বর্গভ্রষ্ট দেব-শিশুর স্বর্গারোহণ আছে, তেমনই ছড়াতেও ভাব-সম্মিলন আছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহাই। দীর্ঘদিনের পরবাসের অদর্শনের পর রসবতী পিতৃগৃহে ফিরিয়াছেন, মাতাপিতা ভাই ভগিনীদিগের জন্য যেন রাশি রাশি সম্পদ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। বাস্তবের জগতে ইহা মিথ্যা, কেবল কল্পনার জগতেই ইহা সত্য। আশাবাদী সমাজের ইহা আশার সান্ত্বনা মাত্র—যেন পরিপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া বেহুলার প্রত্যাবর্তন

১৩

মাঝখানে তালগাছ কাক ঝুল খায়।
তার পরদিন রসবতী বাপের বাড়ী যায়।
বাবার জন্য কি এনেছো?
লক্ষ টাকার ঘোড়া।
মায়ের জন্য কি এনেছো?
মাথা বাঁধার ধড়া।
ভাইয়ের জন্য কি এনেছো?
চন্দন কাঠের লাঠি।
বোনের জন্য কি এনেছো?
দুধ খাবার বাটি।
ভাজের জন্য কি এনেছো?
হেঁসেলের ঘটি।
সাত বন্ধুর সতীন-ঝি সে মায়ের:
তার জন্য কি এনেছো?
পুঁটি মাছের পটা।—২৪ পরগণা

স্বপ্নবিলাসিতার মধ্যেও মায়ের সতীন-ঝির প্রতি অনুদার দৃষ্টিটি সজাগ হইয়া আছে। এমনি ভাবেই ছড়ার স্বপ্ন রাজ্যে সত্য আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারে।

প্রেম

নারীজীবন সংক্রান্ত ছড়াগুলি পরিণত জীবন অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই ইহাতে নারীমনের সর্বোত্তম অনুভূতি যে প্রেম, তাহারও অভিব্যক্তি তাহাতে দেখা যায়। বিষয় এবং রচনার গুণে অনেক ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর ছড়াগুলি ছড়ার সীমানা অতিক্রম করিয়া কবিতা বা প্রেম-সঙ্গীতের সীমানায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যেই বাংলার রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রণয়-লীলার প্রথম আস্বাদ লাভ করা যায়। রচনার দিক দিয়া যে গ্রাম্যতাই থাকুক না কেন, অনুভূতির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রেম-সঙ্গীতের গভীরতার সন্ধান পাওয়া যায়, বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনায়ও ইহাদের একটি বিশেষ স্থান আছে।

বর্ষণমুখর শ্রাবণ-নিশীথে স্বামিগৃহের প্রাঙ্গণে বধূ একটি পরিচিত পদধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠে—

১

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
পুরাণ কালের দোস্ত আইস্তে দুয়ার খুলি দি॥
ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি।
বাড়ীর পিছে মানকচুপাত কাট্যা মাথাত্ দি॥
ঝড় করে লোচা লোচা চালত্ নাইরে ছন।
এমন বিপত্তি-কালে নাইয়র্ যাইবার মন॥—চট্টগ্রাম

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহেও অনুরূপ পদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—

আসমানেতে কালমেঘ ডাকে ঘন ঘন,
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ,
ঘরের পাছে মানের পাতা কাট্যা মাথাত ধর।
ভিজিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশা কালে,
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে।

চণ্ডীদাসের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।

২

দৈয়ারে দৈয়া কি কর বৈয়া,
ঢেউয়ে শিং লড়ে।
আমি ত মরি বাদ বিবাদে,
পক্ষিণী কি হালে তরে॥
ফল খাইলাম্ ফুল খাইলাম্
ভাচ্ছিয়া ভরাইলাম্ কায়া।
সুজনর সঙ্গে পিরীত করি,
মরণে ন ছাড়ে দিয়া॥—চট্টগ্রাম

ইহার মধ্যেও যেন চণ্ডীদাসেরই অনুশোচনার বেদনা অনুরণিত হইয়া উঠিল। এই সম্পর্কে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'এই সকল পদ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ পদগুলির ভিত্তি কোথায়। এ' সকল চণ্ডীদাসের পরবর্তী কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশে যে-সকল কবিতা কোন পূর্বযুগে ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতায় যোগদান দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।' কোন কোন প্রেমমূলক ছড়া বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের উৎস স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

৩

গুড়ুম গুড়ুম দেওয়া ডাকে
ডাকে দেওয়া আস্‌মানে।
ঝর ঝরাইয়া পানি পড়ে
ভাইছাব আইলেন কেম্‌নে?

বলেন বলেন বলেন ভাইছাব
বলেন শীঘ্র কইর‍্যা ?
জৈষ্ঠি মাসে ল্যাখলাম চিঠি
কইলকাতারই বাড়ী।
আমার লাইগ্যা আনবেন কিন্তু
ঢাকাই তাঁতের শাড়ী।
শাড়ী যদি না পাই
কইব না আর কথা,
রাগ কইর‍্যা শুইয়া থাকব
গায়ে দিয়া কাঁথা।—নদীয়া

ছড়াটি মুসলমান পরিবার হইতে সংগৃহীত, মুসলমান সমাজে খুড়তুত ভাই জ্যেঠতুত ভাইর সঙ্গে বিবাহে বাধা নাই, সুতরাং প্রণয়েও কোন অন্তরায় নাই ; এখানে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

৪

আমরা দুটি ভাবের মেয়ে পানের ব্যবসা করি,
মোদের এক কানেতে দুল, চলছি বকুল ফুল ;
সানের ঘাটে নাইতে যাব হেলিয়ে দিব চুল।—২৪ পরগণা

ভাবের মেয়ে দুইটির মনোভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা না গেলেও, এক কানে দুল পরিয়া মাথার চুল হেলাইয়া দিয়া যে তাহারা সান বাঁধানো ঘাটে স্নান করিতে যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে একটু নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সময় অনেক লজ্জাশীলাকেও যে প্রেমের খোঁটা সহ্য করিতে হয়, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

৫

হাটত্ও ন গেলাম্ ঘাটত্ও ন গেলাম্
জলত্ও ন গেলাম্ লাজে।
কন্ কুণ্ডারে দিয়ে কোঁটা
কালা ঝাঁটার মাঝে ॥—চট্টগ্রাম

৬

নদীর ঘাটে নূপুর শোনা যায়রে সন্ধ্যাবেলা,
ওরে নাগর ছাইড়া দেরে, নসি আমার যায়রে বেলা,
ভাল তোমার মাতাপিতা, ভাল তোমার হিয়া,
একেলা পাঠাইলা ঘাটে কাঁখে কলস দিয়া,
ভাল তোমার মাতাপিতা ভাল তোমার হিয়া,
এত বড় হইলাম নাগর না দিল মোর বিয়া,
তোমার মতন মণি পাইলে আমি করতাম বিয়া।
পরের অমন মণি দেখে কেন অমন কর,
গলায় দড়ি দিয়ে জলে ডুবে মর।
কোথা পাব কলসীর কানা, কোথা পাব দড়ি,
তুমি হও গো প্রাণ যমুনা, আমি তাতে ডুবে মরি॥

—২৪ পরগণা, সুন্দরবন

৭

দাদা গো মন কেমন করে মিয়ার খবর জান না,
দিনে দিনে দিন ফুরায় গো বিয়ার গান আর গাইলে না।—ঐ

দাম্পত্য প্রণয়ের একটি সুখচ্ছবি নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

ধান খাঁট খাঁট সুন্দরীরে পিঠত্ পড়ে লেম,
আমি ত কুডাব্ হাটত্ যাইব্
কি কি হারা (সারা) দেম্॥
পানির আনিবা চটক্ মটক্ হাতীর আনিবা দাঁত।
রূপার আনিবা পঞ্চ কলিকা,
সোনার আনিবা পাত্॥—চট্টগ্রাম

যদিও সাধারণ হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই বাল্য বিবাহই সাধারণ রীতি ছিল, এবং কন্যাবিদায় বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি, তথাপি নানা কারণে কোন কোন সময় কন্যার বয়স হইয়া যাইত,

অথচ বিবাহ হইত না; কিন্তু বয়স হইয়া গেলেই যে কন্যা লজ্জাশীলা এবং অসূর্যম্পশ্যা হইয়া দিন যাপন করিত, তাহার কোন কথা নাই—

৯

কঞ্চি কাটুম কঞ্চি কাটুম গাঙ্গে দিলাম বানা,
বয়সের কালে পীরিত করবাম কে করিবে মানা।—মৈমনসিং

ইহার মধ্যে সাহসিকা নায়িকার পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। সন্তানবতী নারী, সেও পরদেশী বন্ধুকে 'বেজার' করিতে চাহে না; সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে—

১০

ঘুমারে ঘুমারে পুলা চাদর দেই তোর গায়,
পরদেশী বন্ধু আমার বেজার হইয়া যায়।
ফুডি ফুডি মেঘ পড়ে বাইরে কেন ভিজ,
ঘরের পাছে মানের পাতা মাথায় তুল্যা ধর।—মৈমনসিং

রূপমুগ্ধ প্রণয়ী প্রণয়িনীর পায়ে তাহার রূপ-বন্দনার অঞ্জলি দেয়—

১১

ও সুন্দর কন্যারে কি সুন্দর তোর রূপের মাধুরী,
মানুষ যদি হওরে কন্যা কিবা হুর পরী।
বল বল বল কন্যা কি নাম তোমারি,
করব তোমার রূপের সাধন এই জনম ভরি।—ঐ

লোক-নিন্দার ভয়ে প্রবাসী পথিককে বধূ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পিপাসার জল দিতে পারে না, পথিক তাহার উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ জানায়—

১২

'ধান কাটলে ওগো কন্যা আউলা মাথার কেশ,
জল চাইলে যায় না পাওয়া কেমন তোমার দেশ।
হাঁড়িতে জল বাড়িতে জল কিসের নিন্দার দেশ,
তোমার থাক্যা সুন্দর স্বামী আছে মোর বিদেশ।'

—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

১৩

'জল তুল ওলো কন্যা পিন্ধ্যা পাটের ডোর,
চিত্ত করে খলর খলর আরও খাইওয়্যা তুল।'
'ওরে ওরে রাখাইলা, তর গরু গেছে দূর,
নইলে তরে দেখাইতাম সইরষা রাঙা ফুল।'—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া গেলেও এই রাধাকৃষ্ণ বাংলার পল্লীজীবনচারী প্রণয়-প্রণয়িনীযুগল, সেই সূত্রেই ইহারা ছড়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে—

১৪

রাধা যায় গো জল ভরিতে হীরার কলসী লইয়া,
কাল সাপে মারছে ঠোকর কদমতলায় বইয়া।
ওঝা বৈদ্যি নাই গো দ্যাশে জীবনের নাই আশা,
কৃষ্ণ শান্তিরস আন্যা দেও গো অঙ্গে ঘসা।—ঢাকা

ইহার মধ্যে কোন তত্ত্বের কথা নাই; যাহা আছে, তাহা সহজ প্রেমরসের অনুভূতি মাত্র।

কতকগুলি ছড়ায় নারীর রূপসজ্জার বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগের সম্পর্কে এখানেই উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, নারীর রূপ-সজ্জা তাহার প্রেমের পথেরই সহায়ক। ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে, তথাপি ইহারা নানাদিক হইতে বিশেষত্বপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি 'গোপীচন্দ্রের গানে' বর্ণিত হীরা নর্তকীর রূপসজ্জার অনেকটা অনুরূপ, তাহাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অতি সহজেই স্বাধীনভাবেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে—

১৫

পরথমে পৈরাল শাড়ী নামে গঙ্গাজল,
নউখের উপর তুল্লে শাড়ী করে টলমল।
সেই শাড়ী পৈরাইয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়,
অইল না তার মনের মত দাসীরে পৈরায়।

তারপরে পৈরাইল শাড়ী নামে মুক্তামণি,
সাত রাজার ধন লাগ্ গ্যাছে শাড়ীর গাঁথুনি ;
সেই শাড়ী পৈরাইয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়,
দিল-মন না খুসি অইল থোয়াইয়া ফেলায়।
তারপরে পৈরাইল শাড়ী নাম তার কেও,
শাড়ীর মধ্যে আঁক্যা থইছে বিয়াল্লিশ গণ্ডা দেও।
চাটগাঁও, সোনার গাঁও, হরিপুর, লেখছে থরে থরে,
কত পক্ষীর নাম লেখ্যাছে শাড়ীর কিনারে।
দইয়ল খঞ্জন লেখ্যা থইছে যার বুক কালা,
কুসুম পক্ষী লেখ্যা থইছে রাও শুনিতে ভালা।
কুড়া পক্ষী লেখ্যা থইছে টুল্লুর টুল্লুর করে,
কানি বগা লেখ্যা থইছে গাল ফুলাইয়া মরে।
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থইছে ভালা ভালা গাঁও,
শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থইছে সাউধে ভরা নাও।
আর এক শাড়ী তুল্যা রাখ্ছে আসমান তারা নাম,
লতাপাতা আঁক্ছে কত নবিসিন্দা কাম।
সাজিয়া পরিয়া কইন্যা রূপের পানে চায়।
চান সুরুজ লজ্জা পাইয়া আবের নীচে যায়।
এর পরে আন্যা বাটা মুখে দিল পান,
ঘর তনে বাইর অইল পুন্নমাসীর চান।
কন্যার রূপে তুন্যাই আলো আন্ধাইর গেল দূরে,
ফুল ফুট্যাছে লাখে লাখে মন ভমরা উড়ে।—মৈমনসিং

এই বর্ণনাটির মধ্যে যেমন মহাকাব্যোচিত বিস্তার দেখা যায়, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে তেমনই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও এই প্রকার নারীরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

১৬

বড় বাড়ীর বড় ছেড়ি লাম্বা মাথার চুল,
আচ্ছা কইরা বান্ধছে খোঁপা কানে দিছে ফুল।—ঐ

মুসলমান সমাজের নারীর প্রসাধনে মেহ্‌দি ব্যবহার অতীব প্রাচীন, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে তাহার উল্লেখ আছে—

১৭

ঢাকাতে না আন্‌লাম পাটা আর জুতা,
দিল্লীতে না আন্‌লাম চিরল মেন্দির পাতা,
সেই না মেন্দি বাটব বালি আশে আর পাশে,
সেই না মেন্দি বাটব গো দামান্দের ভাউজে।
সেই না মেন্দি পিন্দাইব দামান্দের ভাউজে,
হাতের মেন্দি গোটা,
পায়ের মেন্দি নব লক্ষের ফোঁটা।—ঢাকা

বঙ্গগৃহের কন্যা মাত্রই গৌরী। ব্রতের ছড়া আলোচনা কালে দেখা যাইবে, সূর্যঠাকুর যে মল খাড়ুয়া পরা ব্রাহ্মণ কন্যাটি বিবাহ করিতেছেন, তাহার নাম গৌরী। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে সংস্কৃত ভাষায় গৌরী বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যেমন, 'অষ্টবর্ষে ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষে তু রোহিণী'; ইত্যাদি। অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিলে গৌরীদানের পুণ্য হইত বলিয়া বিবাহযোগ্যা কন্যা মাত্রকেই সাধারণভাবে গৌরী বলিয়া উল্লেখ করা হইত। এখানে এই গৌরীরই একটি রূপ বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

১৮

আন গৌরীরে ডাক দিয়া,
বড় ঘরের তল দিয়া।
বড় ঘর কড়মড় করে,
তাতে গৌরীর মাথা ধরে।
আন গৌরীরে ডাক দিয়া,
ছোট ঘরের তল দিয়া।
ছোট ঘর লড়ে চড়ে,
গৌরীর কানের দোল লড়ে॥
আন গৌরীরে ডাক দিয়া,
মূলা ফুলের তল দিয়া।

মূলা ফুল থোপা থোপা,
গৌরীর মাথায় বান্ধছে খোঁপা ॥
আন গৌরীরে ডাক দিয়া,
নাগেশ্বরের তল দিয়া।
নাগেশ্বরের ফুল রেণু রেণু,
গৌরীর মাথায় বান্ধছে বেনু।
আন গৌরীরে ডাক দিয়া,
সইরষা ফুলের তল দিয়া।
সইরষা গাছে নাই ফুল,
গৌরীর মাথায় দীঘল চুল।—ঢাকা

সহজ সরল বাংলা ভাষায় এমন রূপ-বর্ণনার পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। নিতান্ত সহজ গ্রাম্য ভাষায় এই যে বর্ণনাটি শুনিতে পাওয়া গেল, তাহা নিরলঙ্কারতার গুণে একটি মুগ্ধ হৃদয়কে সহজেই অধিকার করিয়া লইল।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি যদিও বর্তমানে পূর্ব বাংলার কুমারী মেয়েদিগের মাঘমণ্ডল ব্রতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে যে প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহার সহজ মানবিক আবেদন কিছুতেই গোপন হইতে পারে নাই—

১৭

ও'পার দুইটি বাওনের কন্যা মেল্যা দিছে কেশ,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
ও'পার দুইটি বাওনের কন্যা মেল্যা দিছে শাড়ী,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী।
ও'পার দুইটি বাওনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়।
'ওগো সূর্যাইর মা,
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে, বিয়া করাও না।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিবার

কতকগুলি ছড়ার মধ্যে পারিবারিক জীবনের কয়েকটি নিকট আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে শিশু এবং পরিবারের অন্যান্য কাহারও কাহারও অকপট মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। বাংলার পারিবারিক জীবনের রস ও রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য ইহাদের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। ছড়াগুলি বাংলার যৌথ পরিবার ভিত্তিক রচনা। সুতরাং যৌথ পরিবারের জীবনে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে পারিবারিক স্বার্থের কি ভাবে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইত, বহির্মুখী লৌকিক আচরণের অন্তরালেও কি ভাবে যে কোন সময় এক একটি বৈরীভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, ছড়াগুলি অনুসরণ করিলে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে পরিবারের মধ্যে আমরা সন্নিকট আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দূর আত্মীয়কে লইয়া একত্র বাস করি, তাহার মধ্যে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের মনোভাব (attitude) এক হইতে পারে না, অথচ পারিবারিক জীবনের বহির্মুখী একটি সমতা রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি লৌকিক আচার আমরা সমান ভাবেই সকলে পালন করিয়া থাকি। বিশেষতঃ একটি যৌথ পরিবার প্রধানতঃ তিন পুরুষের সমবায়ে সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে একদিকে দাদাশ্বশুর, শ্বশুর, স্বামী এবং আর একদিকে দিদিশাশুড়ী, শাশুড়ী এবং বধূ; এমন কি, কোন কোন সময় অধস্তন চতুর্থ পুরুষের সন্তান পর্যন্ত একত্র বাস করিয়া থাকে।[১] পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইহাদের প্রত্যেকের স্বার্থ এক নহে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সম্পর্কে বিভিন্নমুখী মনোভাব গড়িয়া উঠে। অথচ প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে ইহার মধ্যেও একটি শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিয়া চলিবার আবশ্যক হয়, বাহিরের আচার এবং আচরণে কোনও প্রকারেই বিদ্রোহ প্রকাশ করিবার উপায় থাকে না। অনেক সময় ছড়ার মধ্য দিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া দেয়।

১ Jyotirmoyee Sarma, 'Formal and Informal Relations in the Hindu Joint Household of Bengal', *Man in India*, Vol- XXXI., (1951), pp- 51-71.

সেইজন্য ছড়াগুলি অনুসরণ করিলেই পরিবারস্থ ব্যক্তিদের একজনের সম্পর্কে আর একজন যে কি মনোভাব পোষণ করে, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়।

ছড়াগুলি অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ শিশুদিগের নিকট নিজের পরিবারের মধ্যে জননীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী। যদিও যৌথ পরিবারে জননী সর্বদাই পরিবারের কর্ত্রী নহেন, ঠাকুরমা জীবিত এবং কর্মক্ষম থাকিলে তিনিই কর্ত্রী কিংবা যদি জ্যেঠীমা থাকেন, তবে তিনিই কর্ত্রী, তথাপি শিশুর নিকট নিজ পরিবারের মধ্যে মা ব্যতীত আর কেহই কোন মর্যাদার অধিকারী হইতে পারেন নাই। নিজস্ব পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শাশুড়ী এবং বধূর সম্পর্ক সর্বদাই অত্যন্ত তিক্ত। অবশ্য এ'কথা বলা যাইতে পারে যে, বধূ অন্যের পরিবারের কন্যা, তিক্ততার কারণ প্রধানতঃ ইহাই। নিজ পরিবারের বাহিরে যে সকল আত্মীয়স্বজন আছে, যেমন—মামা, মাসি, ভগ্নীপতি ইত্যাদি, তাহাদের সঙ্গেই শিশুদিগের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা মধুর। নিজের পরিবারের সকলেই অভিভাবক, তাহাদের শাসনই সর্বদা নানাভাবে সক্রিয় হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের সঙ্গে কনিষ্ঠদিগের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না; বরং তাহার পরিবর্তে ভয়ের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কিন্তু জননীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়া একদিক দিয়া যেমন স্নেহও আছে, অন্যদিক দিয়া শাসনও আছে। মামা, মাসি, জামাই ইহাদের সঙ্গে তাহা নাই। এমন কি, কাকীমা, বৌদি ইহারা অন্যের পরিবার হইতে আনীতা হইলেও তাহাদের সঙ্গে নিজের পরিবারে মধ্যে একটা শ্রদ্ধা এবং ভয়ের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সঙ্গেও শিশুদিগের প্রাণখোলা আনন্দ প্রকাশের কোন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য ছড়ার মধ্যে এই সকল চরিত্রের প্রায় উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না।

নিজের পরিবারের মধ্যে আচরণে সংযমের প্রয়োজন বলিয়াই এই বিষয়ক ছড়াগুলি নিরঙ্কুশ আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্য পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় চরিত্রগুলিই এই শ্রেণীর ছড়ার প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। নিজের পরিবারের মধ্যে একমাত্র জননী ব্যতীত ছড়ায় আর কাহারও তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঠাকুর্দা, জ্যেঠা, কাকা, দাদা, ঠাকুরমা, জ্যেঠিমা, কাকীমা, পিসিমা, দিদি ইত্যাদি ছড়ায় প্রায় অনুপস্থিত বলিলেই চলে; তাহার পরিবর্তে মাসি, মামা, মামী, জামাই ইত্যাদি চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু জামাই চরিত্রের সমকক্ষ প্রাধান্য আর কোন চরিত্রই লাভ করিতে পারে নাই। ইহার সুগভীর সমাজতত্ত্বমূলক যে কারণ আছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানেও যথাস্থানে তাহার অন্যান্য কারণগুলি উল্লেখ করা যাইবে। জননী সম্পর্কিত ছড়াগুলি যেমন স্বভাবতঃই জননীর প্রশস্তি বাচক, শাশুড়ী সম্পর্কিত বধূর ছড়াগুলিই তাহা নহে। বাহিরের শাসন এবং ভীতি প্রদর্শন দ্বারা কখনও অন্তর জয় করা যায় না। জননীর সঙ্গে কন্যার যে সম্পর্ক, শাশুড়ীর সঙ্গে বধূর সেই সম্পর্ক কোনদিনই গড়িয়া উঠিতে পারে না, ইহাতে জৈব এবং মনস্তত্ত্বমূলক দুই প্রকার বাধাই আছে। সুতরাং শাশুড়ী সম্পর্কিত বধূর ছড়াগুলি বিদ্বেষমূলক। এই শ্রেণীর ছড়ার ভিতর দিয়া সুগভীর জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাদের মধ্যেও উপন্যাসের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মানব-চরিত্রের যে সুগভীর উপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সূক্ষ্মতম জীবনদর্শনেরই ফল বলিয়া গণ্য করা যায়। তবে এই জীবনদৃষ্টি জীবন সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফল, বিদ্যা কিংবা জ্ঞানের ফল নহে। সেইজন্য এই জীবনদৃষ্টিতে যে ভ্রান্তি-হীনতা দেখা যায়, লিখিত সাহিত্যে সর্বদা তাহা দেখা যায় না। সুতরাং এই শ্রেণীর ছড়াগুলি ছড়ার উদ্দেশ্য অতিক্রম করিয়া গিয়া বৃহত্তর জীবনের সীমানায় আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্য দিয়া পরিবার এবং সমাজের যে এক একটি বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহা সচরাচর অন্য কোথাও বড় দেখা যায় না।

পরিবারের বহির্ভূত চরিত্র মামা মামী এবং জামাই বা ভগ্নীপতি সম্পর্কিত যে ছড়াগুলি শুনিতে পাওয়া যায়, তা সমাজতত্ত্বের দিক হইতে অত্যন্ত জটিল; কারণ, সমাজতত্ত্বের বিচারে ইহাদের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাহা পিতৃপরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনের মত একমুখীন নহে, বরং বহুমুখীন। সেইজন্য ইহাদের সম্পর্কেই ছড়া সর্বাধিক শুনিতে পাওয়া যায়।

মা বড় ধন

মায়ের সম্পর্কিত ছড়া যে সংখ্যার দিক দিয়া অধিক শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, তবে মর্যাদার দিক দিয়া জননী সম্পর্কিত ছড়াগুলিই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কন্যাবিদায়ের ছড়াগুলির মধ্যে জননীর একটি পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঘুমপাড়ানি এবং ছেলে ভুলানো ছড়াতেও আমরা নানাভাবে মায়েরই গুণগান শুনিয়াছি। ছড়া শিশুর সাহিত্য বলিয়া এবং শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্কই নিবিড়তম বলিয়া ছড়ায় জননীর কথাই সর্বাধিক থাকিবে, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তথাপি পারিবারিক জীবনের মধ্যে জননীর যে একটি বিশেষ স্থান আছে, সেই স্থানটি সম্পর্কে সন্তানের মনোভাব (attitude) ব্যক্ত, করিয়া এক শ্রেণীর ছড়া রচিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদিগেরই পরিচয় দেওয়া যাইবে। জননী সম্পর্কিত কতকগুলি ছড়া সন্তানের জননীস্তব মাত্র—

১

দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আর মিঠা ননী,
তার চাইতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী।—রংপুর

২

কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন,
মরা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।—বীরভূম

৩

চিঁড়া বল মুড়ি বল ভাতের সমান নাই,
মাসি বল পিসি বল মায়ের সমান নাই।—ঢাকা

মাসিকে নিরুদ্বেগে বৃন্দাবনে বিদায় করিয়া দিয়া বোনঝি মাতৃস্তব করিতেছে—

৪

মাসি পিসি বনকাপাসি বনের ধারে টিয়ে,
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন,
আজ হতে জানিলাম মা বড়ো ধন।

মাকে দিলাম শাঁখা শাড়ী বাপকে দিলেম নীলে ঘোড়া,
ভাইএর দিলাম বিয়ে,
কলসীতে তেল নেইকো কিবা সাধের বিয়ে।
কলসীতে তেল নেইকো নাচব থিয়ে থিয়ে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এমন কি, মাসির হৃদয়হীনতাকে এখানে প্রত্যক্ষভাব আক্রমণ করিয়া জননীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে—

৫

মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর্ ॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম মা বড়ো ধন ॥
মাকে দিলুম আমন দোলা।
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া ॥
আপনি যাব গৌড়।
আনব সোনার মউর ॥
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে।
আপনি নাচব ধেয়ে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত পূর্ববর্তী ছড়াটিরই সামান্য একটু পরিবর্তিত রূপ বর্ধমান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—

৬

মাসি পিসি বনকাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে।
মাসি গেছে বৃন্দাবনে দেখে আসি গিয়ে ॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
আজ হতে জানিলাম মা বড় ধন ॥
মাকে দেব শাঁখা শাড়ী, ভাইকে টাকার তোড়া।
বাপকে দেব জামা জোড়া আর নীলে ঘোড়া ॥
খাবতো ধোবতো নাচ্‌বো থেয়ে থেয়ে।
অলঙ্গেতে চাল নাই তবে কিসের বিয়ে ॥—বর্ধমান

ইহারই আর একটি সামান্য পরিবর্তিত রূপ সুদূর পূর্ববঙ্গ হইতেও পাওয়া যাইতেছে—

৭

মাসি পিসি বনবিলাসী বনের আগে টিয়া,
মাসি গেছে বৃন্দাবন দেখ্যা আসি গিয়া।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন,
মরা গাছে ফুল ফুটিছে মা বড় ধন।
মায় দিল ভাতগুণ চাপিয়া চুপিয়া,
খুড়ি দিল বেন্নুন টুক ঝিন্নুক কাটিয়া।
বাপে দিল গাভীটি লাফ্‌শি লুফ্‌শি চাইয়া,
খুড়ায় দিল কাপড় জোড়া কেনি কাটিয়া।
ভাই দিল ঝাঁটার বাড়ি,
যা ছেম্‌ড়ি তোর শ্বশুর বাড়ী;
আমার ভাত খাইতে আইছ ক্যা?—ঢাকা

কন্যা সন্তানের উপর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির কি মনোভাব, তাহা সাধারণভাবে এই ছড়াটির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সমস্ত পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে মা-ই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, বা 'মা বড় ধন', তাহা বিভিন্ন চরিত্রের আচরণের সঙ্গে তুলনা করিয়া এখানে যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল। সহোদর ভ্রাতার ব্যবহারটিই এখানে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক, সে শুধু ঝাঁটার বাড়ি দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তদুপরি তাহার অন্ন ধ্বংস করিবার খোঁটা দিয়া তাহাকে পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুর বাড়ীতে দূর হইয়া যাইতে বলিল। সেইজন্য বহু আত্মীয় পরিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের মধ্যেও কেবল মাত্র জননীর দাক্ষিণ্যের কথাই মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মত অবিচল রহিয়া গেল।

মাতৃস্নেহের প্রতি সন্তানের অপরিসীম বিশ্বাস। শ্বশুর গৃহে চলিয়া যাইবার সময় পিতৃগৃহের তালগাছটির দিকে তাকাইয়া কন্যাটি মনে করে—

৮

'ঐ যে একটা তাল গাছ,
ঐ তালটা পাকিব।

আমার মায় কান্দিব,
বুজিগো বুজি কইয়েন গো,
আমরা আইলাম পরের ঝি,
আমাগ বুঝি লইব নি'।'—ঢাকা

মায়ের নিকট সকল আব্দারই যে রক্ষা পায়, সন্তান তাহা জানে—

৯

তাল তলা দিয়া জল যায় মা ডুবে মরি গো,
পাটের শাড়ী বের কর মা দক্ষিণে যাব গো।—২৪ পরগণা

সন্তান ও জননীর স্নেহনিবিড় সম্পর্কটি নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় যেন নিবিড়তম হইয়া উঠিয়াছে—

১০

এক আঙ্গুল জল তুলসী,
মা, আঙ্গুল শুদ্ধ হ'লো।
ওরে খেলা খেল ওরে বাছা যাদু
থাকো মায়ের কোলে।
এক হাঁটু জল তুলসী
মা হাঁটু শুদ্ধ হলো।
ওরে খেলা খেল ওরে বাছা যাদু
থাকো মায়ের কোলে।
এক কোমর জল তুলসী
মা কোমর শুদ্ধ হলো।
ওরে খেলা খেল বাছা যাদু
থাকো মায়ের কোলে।—ঢাকা

সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসিনী পল্লীবালিকার কণ্ঠে গ্রাম্য ভাষায় উচ্চারিত মাতৃবন্দনার ছড়াটি যেমন সরল, তেমনই মধুর—

১১

বন্ধের বাড়ি বন কাছারি,
নয়লি পিন্ধে শাড়ী।

আস্‌তে যাইতে মা তাই যাইও ;
তেতৈ তল্যা বাড়ী ॥
আম পাতা কাঁঠাল পাতা তারা সোদর ভাই।
লেয়র পুতর কথা শুনি মাথাত উঠিল বাই।—চট্টগ্রাম

জননী শৈশব হইতেই নিজের সন্তানকে বীর ও সাহসী রূপে দেখিতে অভিলাস করিয়া থাকেন—

১২

আমার যাদু বীরের বেটা বন-ভালুকের ছাও,
ঢাল তলোয়ার লইয়া বাছা বাঘ মারিতে যাও।
কিসের ডর কিসের ভয় কিসের আতাপাতা,
বাঘ মারিয়া আইলে মাথায় ধরবাম সোনার ছাতা।
ছাওয়াল যায়রে বাঘ মারিতে ঢাল তলোয়ার লইয়া,
মা মাসি চাইয়া হাসে মুখে কাপড় দিয়া।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ার ভাবটি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না, পারিবারিক জীবনাশ্রিত সুগভীর ভাব ও তত্ত্বমূলক রচনার পরিবর্তে ইহার মধ্যে কতকটা খেলার ছড়ার ধর্ম প্রবেশ করিয়া ইহার অন্তর্মুখী ভাব অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে—

১৩

ঝি লো ঝি মুজি লো আমার বাড়ীত্‌ আয়,
তোর মা তোরে এড়ি কড়াই ভাজা খায়।
চাল্‌তা তলে হাঁটু পানি,
ঝি ঝি মার কান ছেদানি।
ঝি ঝি লো মুজি লো আমার বাড়ীত হয়।—চট্টগ্রাম

ছড়া বলিয়া সংগৃহীত হইলেও নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি প্রবাদ-ধর্মী, যথার্থ ছড়া বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের মধ্যে সামাজিক কর্তব্যের ত্রুটিবিচ্যুতি-গুলিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহারা প্রবাদ, ছড়ার অহেতুক আনন্দ-রসোপলব্ধির ইহাদের মধ্যে অন্তরায় আছে—

১৪

মা মানা কৈরগ্যে শতক্ষণ,
বাপে মানা কৈরগ্যে শতক্ষণ ;
পাওর পায়ৈস কুঙুরে লৈ যায়,
ন মাতি থাক্যম্ কতক্ষণ।—চট্টগ্রাম

ইহা কাহিনীমূলক প্রবাদ অর্থাৎ ইহার সঙ্গে একটি কাহিনী যুক্ত হইয়া আছে। এক মুখরা এবং অসংযতবাক্ কন্যার বিবাহের প্রাক্কালে মাতাপিতা তাহাকে বলিয়া দিলেন, বিবাহ-সভায় আসনে বসিয়া যেন সে কোন কথা না বলে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় মাতাপিতার নির্দেশ মত নীরব হইয়া রহিল ; এমন সময় দেখিতে পাইল, একটি কুকুর আসিয়া বরের জুতা জোড়া মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উপরোক্ত ছড়াটি আবৃত্তি করিল। ইহার মধ্যে যে শিক্ষার কথা আছে, তাহা ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় না, প্রবাদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

ইহার আর একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়, যেমন

১৫

মায় দিল শ',
বাপে দিল পঞ্চাশ,
আভাগ্যা মুখে ব'লে,
জুতা নিল হিঙ্গলে।—মৈমনসিং

এখানে পিতা অপেক্ষা মাতার দায়িত্ববোধ যে বেশি, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

মামা বাড়ী যাই

মাতুল নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয় নহে ; সুতরাং পারিবারিক জীবনে বাস করিয়া প্রাত্যহিক আচরণে শিশুকে যে শাসন এবং সংযমের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, মাতুলের সঙ্গে সম্পর্কে তাহা সাধারণতঃ স্বীকার করিতে হয় না। সেইজন্য মাতুল এবং মাতুল পরিবারের অন্যান্যের সঙ্গে আচরণের মধ্য দিয়া শিশু কতকটা স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকে। তাহার স্বাধীনতার আনন্দ ছড়ার ভিতর দিয়া যেন সহস্র ধারায় বিকাশ লাভ করে। সেইজন্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শিশুর মাতুল সম্পর্কিত ছড়াই সর্বাধিক পাওয়া যায়।

একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মাতুলের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে একটু জটিলতাও আছে। শৈশবে পিতৃহীন বালক-বালিকা অনেক সময় মাতুল-গৃহে লালিত পালিত হয়, অনেক কুলীন পরিবারের সন্তানও মাতুল গৃহেই আজন্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে মাতুল-ভাগিনেয়ের স্বাভাবিক এবং সহজ সম্পর্কটি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে একটু অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এখানে মাতুল পিতৃস্থানীয় অভিভাবক স্বরূপ, সুতরাং যৌথ পরিবারের পিতা ও পিতৃস্থানীয় আত্মীয়ের সঙ্গে শিশুর যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, এখানে মাতুলের সঙ্গেও তাহাই গড়িয়া উঠে। এই সকল ভাগ্যাহত শিশুর পক্ষে মাতুল গৃহের স্বাধীন আনন্দ উপভোগ করিবার উপায় থাকে না, সেই সূত্রেই মাতুল সম্পর্কিত ছড়ারও তাহাদের মধ্যে যথার্থ বিকাশ ও প্রচার লাভ করিতে পারে না।

কেহ কেহ এ'কথা মনে করিতে পারেন যে, আমাদের কৃষিভিত্তিক যে সমাজ একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা মূলতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সূত্রে শিশুর ছড়ায় আত্মীয়ের মধ্যে মাতুলের স্থান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ'কথা যথার্থ সত্য বলিয়া মনে হয় না ; এ' দেশের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে মাতৃতান্ত্রিক কোন উপকরণ ছিল, এ' কথা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার ফলেই যে ছড়ায় মাতুলের প্রাধান্য দেখা যায়, তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাতুলই অভিভাবক এবং পিতৃস্থানীয়। সুতরাং পিতার সম্পর্কে যে কারণে ছড়ার অল্পতা দেখা যায়, সেইজন্যই এই ক্ষেত্রেও মাতুলের সম্পর্কেও

অন্নতাই দেখা যাইত ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা দেখা যায় না। সুতরাং মাতুলের পরিবারের মধ্যে আসিয়া শিশু একটু স্বাধীনতার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় বলিয়া এখানকার সঙ্গে তাহার একটি অন্তরের যোগ স্থাপিত হইয়া থাকে। এখানে আসিলে ছুটির আরাম, বাঁধাধরা বিধিনিয়ম হইতে সাময়িক পরিত্রাণ ইহাই বুঝায়। তাহারই উল্লাস মামাবাড়ী সম্পর্কিত ছড়াগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে ; এমন কি, শিশু তাহা কদাচ গোপনও করিতে পারে না। এখানে যে কোন শাসন নাই, তাহা স্পষ্ট ভাষাতেই যে প্রচার করিয়া অন্তরের উল্লাস ব্যক্ত করে—

তাই তাই তাই,
মামাবাড়ী যাই।
মামাবাড়ী ভারি মজা,
কিল চাপড় নাই।

মামাবাড়ী সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই শিশুর কোন শাসনের সম্পর্ক নাই ; তবে মামীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি অন্যের পরিবার হইতে মাতুলের পরিবারে আসিয়াছেন, সুতরাং মাসি মামা এবং দিদিমার সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায়, তাহার সঙ্গে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে স্বভাবতই একটু জটিলতার সৃষ্টি হয়। সে কথা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। এখন ছড়াগুলির বিস্তার ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া মাতুলের সঙ্গে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যটি অনুসরণ করি।

প্রথমতঃ এ' কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ছড়া ব্যতীতও মাতুল সম্পর্কিত এমন কতকগুলি লোক-বিশ্বাস প্রচলিত আছে, যাহাদের মধ্য দিয়া সমাজে মাতুলের স্থান সম্পর্কে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। মামার সম্পর্কে যে সকল প্রবাদ আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে, ইহাদের মধ্য দিয়া আত্মীয় হিসাবে মামার গুরুত্বের কথা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

প্রথমতঃ 'মামার সমান কুটুম নাই'—এই প্রবাদটির ভিতর দিয়া মাতুল যে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, সমাজের এই স্বীকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর আরও আছে, 'ধানের মধ্যে খামা, কুটুমের মধ্যে মামা।' এমন কি, এক চক্ষু কানা মামাও নিন্দনীয় নহে,—'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' তার পর

আরও শোনা যায়, 'মামা ভাগ্‌নে যেখানে, আপদ নাই সেখানে', 'মামার জয়েই জয়', ইত্যাদি। তথাপি একথাও শুনিতে পাওয়া যায়, 'জন, জামাই, ভাগ্‌না ; তিন নয় আপনা।' ইহার অর্থ মাতুল এবং তাহার পরিবারের অন্যান্য কাহারও বিষয়ে ভাগিনেয়ের কোন দায়িত্ব নাই। নিজের পিতৃপরিবার সম্পর্কে তাহার যে দায়িত্ববোধ আছে, মাতুল পরিবারের সঙ্গে তাহার সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ জন্মলাভ করিতে পারে না। সেইজন্য ছড়াতেই শুনিতে পাওয়া যায়,

বাপের বোন পিসি,
ভাত কাপড়ে পুষি।
মার বোন মাসি,
কাদায় ফেলে আসি।

মামা শিশুর শ্রেষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাহার সম্পর্কে ভাগিনেয়ের কোন দায়িত্ব বোধ নাই বলিয়াই ছড়ার মধ্যে মাতুলের সম্পর্কে কেবল সহজ আনন্দ রসের অভিব্যক্তি দেখা যায়, কঠিন কর্তব্যবোধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এ' কথাও সত্য, যেখানে কঠিন কর্তব্যবোধ, সেখানে ছড়াও জন্মলাভ করিতে পারে না। কারণ, অকারণ আনন্দানুভূতির মধ্যেই শিশুর ছড়ার জন্ম, জীবনের কঠিন দায়িত্ববোধের মধ্যে তাহা কদাচ জন্মলাভ করিতে পারে না। সেই জন্য পিতার সম্পর্কে ছড়া নাই, মামার সম্পর্কেই ছড়া আছে।

মামার সঙ্গে বাংলার সমাজের ভাগিনেয়ের যে সম্পর্ক, তাহার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু সমাজের মামা ভাগিনেয় সম্পর্কে পার্থক্য আছে। একজন সমাজতত্ত্ববিদ্‌ লিখিয়াছেন,……'in South India, I have been informed that a Bhanej (ভাগিনেয়) generally jokes with his *mama*. In the people in whom cross-cousin marriage is common and customary a *mama* is a father-in-law and the relationship involves respect and sometimes avoidance. Outside of India we have many examples of people where a Bhanej and his *mama* joke with each other.'[১] বাংলা দেশে

১। T. B. Naik, 'Joking Relationships' *Man in India*, Vol XXVII (1947), p. 262

মামা-ভাগিনেয়ের যে সম্পর্ক, তাহা প্রকৃত হাস্ত-পরিহাসের সম্পর্ক (joking relationship) বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নহে, অথচ পিতার পরিবারের পিতৃস্তরের আত্মীয়দিগের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, প্রকৃত সেই সম্পর্কও নহে। একজন মার্কিণ দেশীয় পণ্ডিত বিভিন্ন দেশের মাতুল-ভাগিনেয় সম্পর্ক বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন—'The avunculate, despite its more serious aspect, demands consideration from this angle also. In Fiji the sister's son not only merely treats his uncle's property as if it were his father's, but recklessly and wantonly kills his pigs and destroys his plantations for the fun of it. Among the Winnebags Indians, too, the nephew may appropriate the belongings of his maternal uncle with the Shonga, the sister's son takes his uncle's food and among the Hokentot, the uncle may seize his nephew's property if damaged, while his nephew freely imdemnifies himself with his uncle's uninjured possessions.'[২] ইহা হইতেই মাতুল-ভাগিনেয় সম্পর্কের জটিলতা বিষয়ে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। বাংলাদেশের মাতুল-ভাগিনেয় সম্পর্কের মধ্যেও যে এই শ্রেণীর জটিলতা কতকটা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মাতুলের পদমর্যাদার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, তাহার সঙ্গে ভাগিনেয়ের যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তাহা সমর্থন করা যায় না।

তাই তাই তাই
মামাবাড়ী যাই,
মামাবাড়ী ভারি মজা,
কিল চাপড় নাই।—২৪ পরগণা

ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত দেহ ও মন নৃত্যের তালে তালে দুলিতে থাকে, শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভাষা ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে। 'তাই তাই তাই' এই আনন্দেরই ভাষা।

২। R. H. Lowie. Primitive Society (London,1921) p. 95

তাই তাই তাই,
মামাবাড়ী যাই।
মামাঘরে মনসা পূজা,
পূজার কলা খাই।—২৪ পরগণা

একে মামাবাড়ী, তাহার উপর সেখানে যদি কোন উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তবে ত আর কথাই নাই।

৩

তাই তাই তাই,
মামাবাড়ী যাই।
মামাঘরে ভাত দিল না
সরায় খেয়ে যাই॥—ঐ

মামাঘরে যে কেন ভাত দিল না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তবে ইহার মধ্যে মামীর হস্তক্ষেপেরও কোন কারণ থাকিতে পারে। কারণ, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতেও মামীর অনুরূপ আচরণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—

তাই তাই তাই,
মামার বাড়ী যাই।
মামা দু'টো কলা দিল,
পথে বসে খাই।
আর মামীমা ত ভাত দিল না,
বাড়ী ফিরে যাই।—মুর্শিদাবাদ

মাতুলানীর এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের মধ্য দিয়াই মামার আদর যেন আরও মধুর বলিয়া মনে হয়।

৫

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই।

আমরা দুই ভাই,
বেজ বাগানে যাই,
বেজের ফল খাই।
মা গিয়াছে গয়া কাশী
ডুগ্ ডুগি বাজাই।—মুর্শিদাবাদ

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ক্ষুদ্র ছড়াটি বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। পূর্বে বলিয়াছি, খেলার ছড়া এত সহজে বিস্তার লাভ করিতে পারে না, ইহার সঙ্গে কোন খেলা যুক্ত হইয়া নাই এবং কেবল মাত্র সহজ আনন্দের ভাবটিই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া ইহার একটি সর্বজনীন আবেদনও অতি সহজেই সৃষ্টি হইতে পারে।

৬

তাই তাই তাই,
মামার বাড়ীত্ যাই॥
মামার বাড়ী বড় ভালা।
কিল চূড়া নাই॥—চট্টগ্রাম

নিম্নলিখিত ছড়াটিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পিতৃ পরিবারের দুধ মামাবাড়ীতে আসিয়া দুধু হইয়াছে, এই ভাষার ভিতর দিয়া গাভীর দুগ্ধ যেন আপনা হইতেই বিগলিত হইয়া পড়িতেছে—

৭

তাই তাই তাই
মামুর বাড়ীত যাই।
হাম্বার দুধু খাই,
হাম্বার দুধু না দিলে,
হাতুয়া ভাঙ্গি ধাই।—চট্টগ্রাম

আমাদের বিশ্বাস, মামা ভাগ্‌নের গায়ে হাত তুলিতে পারে না, তুলিলে মামার হাত কাঁপে। ভাগ্‌নে মামার এই দুর্বলতাটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া মাতুল পরিবারে আসিয়া জিনিসপত্র ভাঙচুর করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। এই

দৌরাত্ম্য সে পিতৃপরিবারে করিতে পারে না, করিলে শাসিত হয়; এখানে শাসন নাই বলিয়াই এই সকল ছড়ায় সর্বদাই স্বাধীনতার উদ্দাম উল্লাস প্রকাশ পায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মামাবাড়ী কথাটিই সাধু এবং শুদ্ধ প্রয়োগ, 'মামার বাড়ী' নহে। তবে ছড়ায় ছন্দের অনুরোধে অনেক সময় 'মামার বাড়ী' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই শুদ্ধ প্রয়োগ 'মামাবাড়ী'ই ব্যবহৃত হয়, পূর্ববঙ্গের ছড়াতেই অশুদ্ধ প্রয়োগটির অধিক প্রচলন।

৮

তাই তাই তাই,
মামার বাড়ীত যাই।
মামারত আছে টুন্যা ভাই,
সঙ্গে খেলা খাই।
চল মামার বাড়ীত যাই।—চট্টগ্রাম

এমন কি, মামাত ভাইটির সঙ্গে যে স্নেহমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, খুড়তুতো জেঠতুত ভাইদিগের সঙ্গে বুঝি সেই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য পিতৃপরিবারের ভাইদিগের কথা বিস্মৃত হইয়া মামাবাড়ীর 'টুন্যা ভাইটি'র জন্য মন কেমন করে।

৯

তা—তাঁ—তা,
মামা বাড়ী যা।
মামা দিল খই,
মামী দিল দই।
দুয়ারে বইসা খা,
হা—হা—হা।—ত্রিপুরা

মামীর এই বদান্যতার কথা আর বেশি দূর পর্যন্ত শোনা যাইবে না। নিজের এবং মাতুল পরিবারের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে শিশুর মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত ছড়ার ভিতর দিয়াও সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে—

১০

মার ভাই মামা,
গায় দিই জামা।
বাবার ভাই কাকা,
আমরা যাব ঢাকা।
মার বোন মাসী,
আমরা বাজাই বাঁশী।
বাবার বোন পিসি,
আমরা যাব কাশী।—ঢাকা

মামাবাড়ীর সব কিছুই ভাল, মামার নিকট সকল আব্দারই সম্ভব; এমন কি, একটি বউ আনিয়া দিবার আব্দারও গুরুজনদিগের মধ্যে কেবলমাত্র মামার নিকটই প্রকাশযোগ্য।—

১১

মামাঘরে পাকা বাড়ী,
তায় বসেছে কলের গাড়ী।
মামা তোমার পায়ে ধরি,
বৌ এনে দাও খেলা করি।
বৌ এর মাথায় লট্‌কা চুল,
কোথায় পাব গাঁদা ফুল।
গাঁদা ফুলের ছড়াছড়ি
আয় গাঁদাফুল মোদের বাড়ী।
বস্‌তে দিব নীল মাদুরী
খেতে দিব সাঁচি পান।
সাঁচি পানের কাঁচি কাটা
নাত জামাইয়ের নাক কাটা।
ধ'রে মার তিন ঝাঁটা॥—২৪ পরগণা

দেখা যাইতেছে; মামার সঙ্গে ভাগ্‌নের সম্পর্কটির মধ্য দিয়া এক পুরুষের ব্যবধানও রক্ষা পাইতেছে না; কারণ, তাহার বয়সের মর্যাদা রক্ষা করিয়া

ভাগিনের কোন কথা বলিতেছে না। তবে এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, অনেক সময় মাতুল এবং ভাগিনেয়ের বয়সের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই পার্থক্য অনেক সময় কাকার সঙ্গেও ভাইপোর থাকে না, তথাপি কাকা পিতৃস্থানীয় এবং পিতৃপরিবারের অধিবাসী বলিয়া তাহার সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। মুর্শিদাবাদ হইতে ইহার সামান্য একটু পরিবর্তিত পাঠ পাওয়া যাইতেছে—

১২

মামা ঘরে তেতালা বাড়ী,
তায় বসেছে কলের গাড়ি।
মামা তোমার পায়ে পড়ি
বৌ এনে দাও খেলা করি।
বৌ-এর মাথায় লটকা চুল,
কোথা পাব গাঁদা ফুল।
গাঁদা ফুলের ছড়াছড়ি
আয়রে গাঁদা মোদের বাড়ি।
বসতে দেব লাল মাদুরী :
খেতে দেব সাচি পান।
সাচি কাঁচি কাটা,
মসলা দেব শিল নড়াতে বাটা।—মুর্শিদাবাদ

১৩

মামা তুমি ধামা বাজাইও না,
কাঠের পুতুল কিনে দিব
শাউড়ি নাচাইও না।—২৪ পরগণা

মামার শাশুড়ী সম্পর্কে ভাগিনেয়ের দিদিমা স্থানীয়া। তথাপি এখানেও তাহার বয়সের মর্যাদা রক্ষা করা হইতেছে না। মামার শাশুড়ীর নৃত্যের চিত্রটি কল্পনা করিয়া ভাগিনেয় আহ্লাদে আত্মহারা হইতেছে।

মাতুল গৃহে একবার একটি বাগ্‌দি জাতির লোকের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মাতুল সম্পর্কে ইহাতে দ্বিতীয় কথা শুনিতে

পাওয়া যায় না। বরং পিতৃপরিবারের অন্যান্য আত্মীয় এবং আত্মীয়া আসিয়া ইহাতে জুড়িয়া বসিয়াছে।

১৪

মামা ঘরে পাটবাড়ীতে বাগ্‌দি মরেছে,
নোকা কাকা খবর দিয়েছে।
বড় বৌ কাঁদতে বসেছে,
মেজ বৌ এর খোকা হয়েছে।
ওরে খোকা কাঁদিস না,
হনু এসেছে।
বড়্‌ ঠাকুর পো বড়্‌ ঠাকুর পো,
গুড়ের দোকান যাও না,
মেজ ঠাকুর পো মেজ ঠাকুর পো
নারিকেল ভাঙ্গ না।—২৪ পরগণা

বাগদির মৃত্যুতে এখানে বিন্দুমাত্রও শোকের ভাব প্রকাশ পাইতেছে না, কেবল মাত্র বড় বৌ যে কেন এখানে কাঁদিতে বসিল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা গেল না।

১৫

ড্যাং ড্যাং শালুক ডাঁটা
মামাকে আন্‌তে পাঠা;
মামাদের কচুবনে,
কচুশাক খায় না কেনে,
বেলাঙ্গিতে বাঘ্য মরেছে,
তোমাকে যেতে বলেছে,
তুমি নাও ঘি কলসী,
আমি যাই বাউটি হাতে,
চল যাই রাজপথে,
মণ্ডি মনোহরা,
জিলিপি রসকরা।—হুগলি

এখানেও বাঘ্ব বা বাগ্‌দির মৃত্যু সংবাদ শিশুচিত্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। পরবর্তী ছড়াটিতে মাতুলগৃহে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া শিশুচিত্তের উল্লাস প্রকাশ পাইতেছে—

১৬

মামাদের হোত্তা গাছে কোকিল বসেছে,
পায়ে ঝুমঝুম নর্তকীরা নূপুর বেঁধেছে।
পান্তাভাতে চবচবানি—গরম ভাতে মৌ,
দাদা গেছে গান শুনতে বাবার কোলে বৌ।—মেদিনীপুর

মাতুল বাড়ীর পুকুরেও মাছের অভাব নাই, তাহারও একটি আকর্ষণ শিশু-চিত্তকে সর্বদা প্রলুব্ধ করিতেছে—

১৭

মামাদের পুকুরে টোকা পানা।
পান ভেঙেছি এলাচদানা॥
কাককে দেবো, বককে দেবো
তোমায় দেবো না।
কোলে বসবো টাকা নেবো
মুখ দেখাবো না॥—মেদিনীপুর

কিন্তু ভাগিনেয়ের যে উদারতার অভাব এখানে দেখা যাইতেছে, তাহা তাহার কোন উচ্চ চরিত্রগুণের পরিচায়ক নহে। কারণ, যেখানে কাক এবং বক বঞ্চিত হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল, সেখানে মানুষের পক্ষে বঞ্চনা বেদনাদায়ক। এইবার মামাবাড়ীতে একটি উৎসবের কথা প্রচারিত হইতেছে—

১৮

আশথ গাছে পুতলা নাচে,
তাই ঝুমঝুম নেপুর বাজে,
কাল মামুঘরে মালসা পুজা,
বাবু খাবে মোর উখ্‌ড়া ভুজা॥—মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে মামাবাড়ীতে খেলিতে যাইবার জন্য একজোড়া ঝুম্‌কা কিনিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে—

১৯

আলুক মালুক শালুক রে
বন শালুকের পাতা,
হরির নামে কেটে দেব
ছোট ঠাকুরের মাথা,
ছোট ঠাকুরের জামা জোড়া
রঘুনাথকে সাজে,
রঘুনাথের মরণ হল দেব-তলার ঘাটে ॥
দেব বুড়ি, দেব বুড়ি কাপড় কেচে দে না।
মামা ঘরে খেলতে যাব ঝুমকো এনে দে না।
ঝুমকোর ভেতর পাকা ধান,
মামার ভারী অভিমান।—মুর্শিদাবাদ

ছড়ার শেষ দুইটি পদ স্বতন্ত্র এক ছড়ার একটু পরিবর্তিত রূপ বলিয়া তাহা ইহার মধ্যে সহজে সংযোগ লাভ করিতে পারিতেছে না। মামাবাড়ীর বাঁশগুলিও অত্যন্ত শক্ত—

২০

মামাগো বাড়ী বউরা বাঁশ।
কাট্‌তে লাগে ছয় মাস ॥
মামা তুমি সাক্ষী।
পানির তলে পক্ষী।
উট্‌কন আনো বাইট্যা দেই।
কন্যা আনো বিয়া দেই ॥
আলু পাতায় থালুথুলু ভ্যাম্না পাতার কস ;
এমন কইরা লেইখা দিমু সাত রাজায় বশ ॥—রাজসাহী

পরবর্তী ছড়াটির মধ্যে মামার যেমন গুণকীর্তন শুনা যায়, তেমনই মামাকে মরিবার জন্য উপদেশ দিতেও শুনা যাইতেছে। মামাবাড়ীর আব্দার শেষ

পর্যন্ত কোথায় গিয়া যে পৌঁছিয়াছে, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

২১

মামার বাড়ীর বৈড়া বাঁশ,
কাটতে লাগে আড়াই মাস।
মামা তুমি সাক্ষী,
জলের তলে পক্ষী।
ধইর‍্যা আন দেখি,
গামছা আন তামাসা করি।
লাঠি আন ভর করি।
কন্যা আন বিয়া করি।—টাঙ্গাইল, মৈমনসিং

২২

ঠেন ঠেমকী কেঁয়াইল বেঁকী,
মাউর পিছে যা,
গোর সুন্দর জিজ্ঞাস্ করে,
শীতল শীতল গা॥
আমা চাইতুম্ মালা মালা,
ঝাপ দি পড়ে গুয়া।
ফুল ফুল মাদারি ফুল,
মামা চাতন গুয়া॥
মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।
আজিয়া মররে মামা ঘরর বিষ খাই॥
হলে দর গাঁড়া গাঁড়া শিগুরির পাড়া।
কোন্ সতীনে দেখাই দিয়ে মুই সতীনর খাঁড়া॥—চট্টগ্রাম

মাতুল কর্মস্থান হইতে ঘর্মাক্ত হইয়া গৃহে ফিরিবার পথে ভাগিনেয় তাহার মাথার উপর ছাতা ধারণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে—

ও বুড়ী ও বুড়ী স্থতা কাট্।
কাইল বেহানে গজর হাট ॥
গজর হাটত্ যাতুম্ চাম্;
চর্কা চর্কী আনতুম চাম্।
মামা আইএর্ ঘামিয়া,
ছাতি ধরি লামাইয়া।
ছাতির উপর কদম্ ফুল,
ভেরুআ নাচন নাদান ফুল।
হাত কাটিলুম্ ভোঁয়া ভোঁয়া:
চালত্ ফেলাইলুম্ দা।
বড় ভৈনরে বিয়া দিয়ে
দু পুতের মা ॥
স্থন্দরী গেইয়ে পানীর লাই,—
বাহু লাড়া লাড়া।
হাতত্ দিয়ে বাজু বন,
মাতুলী ছাড়া ছাড়া ॥—চট্টগ্রাম

মাতুল বাড়ীতে দিবারাত্র দুধ খাইবার কোন বাধা নাই, কারণ মামার গোয়ালে কপিলা গাই বাঁধা রহিয়াছে—

২৩

মামার কপিলি গাই;
দিনে রাতে দুধ খাই।
সাত বউএতে সাত ছিবা,
আমাস্তে এক ছিবা।
এক ছিবা কাটিলুম্,
যমের ঝাক বাশিমুম্।
কালা গরু ধলা দুধ,
বেচে যে পুতানির পুত।

হাটে ঘাটে দোষ নাই,
গোরখ পোয়ার দোষ নাই।
বাড়ীর পিছে কোত্তি,
গরুর পেট ভর্তি ॥—চট্টগ্রাম

ঘুমপাড়ানি মাসির আগমনী গানের স্নেহ এবং আব্দারযুক্ত সুরে এখানে মাতুলকেও আহ্বান জানান হইতেছে—

২৪

উদোর মামা উদোর মামা আমার বাড়ীত্ আইও,
ডালা ভরি চূড়া দিয়ম্ গাল ভরাইয়া খাইও ॥
একটি চূড়া উনা হৈলে মালীর বাড়ীত্ যাইও ॥
মালীর বউএর দাঁতত্ ছাতা।
ধোপার বউএর হাতালি মাথা ॥—চট্টগ্রাম

মামাবাড়ীর পিছনে যে আতা গাছটি আছে, তাহারও গুণের অন্ত নাই।

২৫

আমার মণির মামার বাড়ীর্ পিছে দু সরিয়া আতা।
আতা কাটি পেলাইল কুঁইলা নিয়ে মাথা ॥
শাম পুকুরগ্যার্ তের দিন,
বাঘ গেইয়ে পানী খাইত,
হরিণ গেইয়ে চাইত।
ঘুঙ্গ্যা উন্দূর খাপ্ দি বৈসে
বাঘর চোখ খাইত ॥—চট্টগ্রাম

বড় মামা ও ছোট মামা উভয়ের বাড়ীর পিছনেই নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে—

২৬

বড়্ মামার বাড়ীর পিছে বড়, কবালির ঝুঁয়া।
ছোট মামার বাড়ীর পিছে জাত্ মরিচর আগা ॥
নন্দ ভইজে কান্দন করে ঘহর কেন গেলা।
শ্রীচরণে বাঁশী বাজাতন্ রথের কমলা ॥
ঢুলো ঢুলো চন্দ্রকলা।

কৈল্‌কাতার্‌ তুন্‌ গর্বা আইস্তে কল্কী হাতত লই।
খেছুয়া বোলে তুরুৎ তারুৎ ডেয়াএ বোলে হাম্বা।
মুসলমানর সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লম্বা॥—চট্টগ্রাম

মামাবাড়ীতে হাতিঘোড়ারও অভাব নাই—

২৭

ঘুঙ্গি লো ঘুঙ্গি কই যাস্‌?
মামার বাড়ী।—ক্যারে যাস্‌?
আনব আত্তি, মারব লাত্তি।
আর কি?—আনব ঘোড়া!
দিব দৌড় চিঁ ছিঁ ছিঁ ছিঁ।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি মায়ের মামাকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত—

২৮

মাগো মা, তোর মামা গেছে কামাইত,
ছত্রী ধইরা নামাইত।
ছত্রীর মধ্যে কাউয়ার ঠেং,
লাফ দিয়া উঠ্‌ল 'ঘাউয়া' বেঙ।
ফকীরা দোয়ায় তিন বারাতে,
মাইছ রাঙ্গায় মাছ মারে,
ঢোঁড়া সাপে লেজ লাড়ে।
এল ভাই দেল ভাই,
রাজা বলে হাত ছুরত কাট।—ত্রিপুরা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়, মাতুল প্রদত্ত একটি খলিসা মাছ চিলে ছোঁ দিয়া লইয়া গেল—

২৯

টাই লো টুয়ানি,
খইলসা মাছের বোয়ানি।
মামা দিলে খইল্‌সা মাছ, তারে নিল চিলে,
চিলের লাগাল যদি পাই,
ঘাড় ভাইঙ্গা রক্ত খাই।—মৈমনসিং

সামান্য একটি খলিসা মাছ হরণ করিবার অপরাধে চিলের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খলিসা মাছটি নিতান্ত সামান্য ছিল না, ইহা মাতুলের দান ছিল; সেইজন্য ইহার অপহারকের বিরুদ্ধে আক্রোশ এত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার আকাশে বাদুড় উড়িতে দেখিয়া শিশুরা যে ছড়া আবৃত্তি করে, তাহার মধ্যেও মামার কথা স্মরণ করে,

৩১

বাদুড় বাদুড় চৈতা,
মামু কইছে যাইতা।
তিলের সিন্নি খাইতা,
তিল লাগে তিতা,
তুমি আঁর মিতা।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগুলির ভিতর দিয়াও মাতুল সম্পর্কিত সমাজের পরিণত অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রবাদই ছড়ার ধর্মী। মামার সঙ্গে সম্পর্কের যে আরও একটি দিক রহিয়াছে, এই প্রবাদগুলি তাহার প্রমাণ,—

মামা শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারেখারে।
মামা, বাবার জবানীতে শালা।
মামা ভাগ্‌নে জামাই শালা আর পোষ্যপুত।
ঘরে ঘরে বিরাজ করে এই পাঁচটি ভূত।

মামাবাড়ী হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন মামা পিতৃপরিবারে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন, তখন শিশুর সঙ্গে মামার যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহারই পরিচয় উপরি উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায়।

তারপর আরও শোনা যায়—

মামার ক্ষেতে বিয়ল গাই,
সে সম্পর্কে মামাত ভাই।

এমন কি মামার জয়কেই নিজের জয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। 'মামার জয়ই জয়।' 'মামা রাতকানা, তাই আমি চোখে দেখি না।' মামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভাবটি ইহাদের অপেক্ষা আর কোথাও স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে পারে নাই। তারপর আরও আছে—

মামার নামে ধামা ধামা,
আমার নামে আধ ধামা।
মামা মামী ঝগ্‌ড়া করে,
নেকা পান্তা খেয়ে মরে।

সকল মাতুল চরিত্রই যে সর্বত্র সমান, তাহা কখনও হইতে পারে না, তথাপি মামার ব্যবহারে যদি কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে তাহা ভাগিনেয়ের নিকট বড়ই মর্মান্তিক হইয়া থাকে—

কংস মামার আদর।
মামার বড় ভালবাসা,
কলা খেয়ে দেয় খোসা।
মামার ভাতে বেগুন পোড়া।

সকলকেই মাতুল বলিয়া গণ্য করা যায়, কিন্তু খুড়া জেঠা বলিয়া গণ্য করা যায় না—

গাঁ সুবাদে মুচি মিন্‌সে মামা।

তারপর মামার সম্বন্ধে আরও শুনা যায়—

হাটে মামা হারানো।
মামা বাড়ী আব্দার।
চালের দর কত, না মামার ভাতে আছি।

মামার ভাত হইলেই বুঝিতে হইবে, সেখানে নিরঙ্কুশ অধিকার এবং চূড়ান্ত অপব্যবহার। মামার সঙ্গে সম্পর্কের পরিচয় ইহা হইতে আর কোথাও স্পষ্টতর হইতে পারে নাই।

মামী কাটে সরু সুতো

মাতুল সম্পর্কিত উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীরা মাতুলের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে এবং সেইজন্য ছড়ার মধ্য দিয়া তাহারা নানাভাবে তাহার গুণ কীর্তন করে। মামার সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কটি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি এবং ভয়ের সম্পর্ক নহে, বরং তাহার পরিবর্তে আদর এবং আব্দারের সম্পর্ক। কিন্তু মামীর সঙ্গে সম্পর্কটির মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। পদমর্যাদার দিক দিয়া মামী মাতৃস্থানীয়া, কিন্তু ছড়ার মধ্য দিয়া মাতুলানি ভাগিনেয়ের যে সম্পর্কটির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সর্বদা মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের অনুরূপ নহে। বরং ইংরেজিতে যাহাকে joking relationship অর্থাৎ হাস্য পরিহাসের সম্পর্ক বলে, মামীর সঙ্গে ভাগিনেয়ের অনেক সময় তাহারই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, যেমন,

খোকাখোকি দোলে,
অগ্রদীপের কোলে।
মামী কাটে সরু সুতা,
মামা কাটে পাড়।
হে মামী তুমি কাঁদছ কেন ?
মামা তোমার বাপ।

এই উক্তি যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। সুতরাং কি ভাবে যে মামী ভাগিনেয়ের মধ্যে এই প্রকার একটি সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে উচ্চতর হিন্দুসমাজে মাতুলানি ভাগিনেয়ের মধ্যে হাস্য পরিহাসের সম্পর্ক বর্তমান আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। এই বিষয়ে গুজরাটের সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্পর্কে জানা যায়—'In Gujrat, a *mami* of a Brahmin caste would joke with her *Bhanej* (ভাগিনেয়) ; would generally ask him, if he is unmarried, when he would take her in his *dan* (দান) ; or would tell him that

she has found out a bride for him or that he does not care for her. The Bhanej replies in the same vein and tells her that he can do anything for her it she wants or that it must be unbearable for a beautiful lady like her to stay with his rustic *mama*, her husband.'[১]

বাংলা দেশ হইতেও নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির সন্ধান পাইয়া মনে হইতেছে, এই বিষয়ে গুজরাটের সঙ্গে এ'দেশের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, তবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার দ্বারা এই ভাব অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে—

ভাগ্নে রে তোর মাগ্না কথা সয় না আমার গায়,
তোর মামা গেছে পরবাসে,
আমার নবযৌবন অমনি যায়।

রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কটির মধ্যেও লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মামী ভাগিনেয়ের একটি সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। ইহা কালক্রমে স্বর্গীয়তা লাভ করিলেও ইহার যে একটি লৌকিক ভিত্তি ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

নানা কারণে হাস্যপরিহাসের সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পূর্বে জামাই সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তাহার কিছু উল্লেখ করিয়াছি। মাতুলানি ও ভাগিনেয়ের হাস্যপরিহাস রসিকতার কারণ সম্পর্কে অনুমান করা হইয়াছে,...... it may be that formerly a marriage was allowed between the two, and now joking survives as an indication of that. Even to-day a *Bhanej* (ভাগিনেয়) can marry the sister of his *mami*."[২] এই অনুমান কতকটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

অনেক সময় প্রচ্ছন্ন বৈরীভাব হইতেও বহির্মুখী হাস্যপরিহাসের সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। জামাই সম্পর্কিত আলোচনায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাহা আলোচনা করিয়াছি। মামার সঙ্গে ভাগিনেয়ের যে স্নেহ মধুর সম্পর্কই থাকুক না কেন, মামীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কটি বৈরীর। সেই ভাবটিও এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

১ I bid p. 262

২ I bid p. 263

১

দোল দোল দোলে,
খোকন মণি কোলে,
কলাগাছটির তলে।
মামী কাটে সরু স্থতো,
মামা কাটে পাত,
সত্যি করে বলগো মামী
মামা কি তোর বাপ ?—২৪ পরগণা

উপরি-উদ্ধৃত ছড়ারই আর একটি পাঠেও প্রায় অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়, সুতরাং একটি মাত্র ছড়ার কোন স্বেচ্ছাচারমূলক (arbitrary) উক্তি নহে—

২

খোকাখোকি দোলে,
অগ্‌গদীপের কোলে।
মামী কাটে সরু স্থতো,
মামা কাটে পাড়,
হে মামী, তুমি কাঁদছ কেন ?
মামা তোমার বাপ্‌॥—মুর্শিদাবাদ

পরবর্তী ছড়াটি নীতির দিক্ হইতে আরও আপত্তিজনক বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূলে যে সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না—

৩

ভাগ্নে রে তোর মাগ্না কথা
সয় না আমার গায় ;
তোর মামা গেছে পরবাসে,
আমার নবযৌবন অমনি যায়।—২৪ পরগণা

বৈরীর ভাবটি কখনও কখনও হাস্যরসিকতা, কখনও বা চাটুকারিতা দ্বারা প্রচ্ছন্ন করা হইয়া থাকে। নিম্নে চাটুকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল—

৪

তেতই পাতা তুলসী,
আমার মামী উর্বশী
উর্বশী ঝির লাম্বা চুল।
বান্‌তে বান্‌তে চাম্পা ফুল॥—ঢাকা

মামীর পরিবারে ভাগিনেয়ী অনভিপ্রেত, বিশেষতঃ সে যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে, তবে ত আর কথাই নাই; মামী সর্বদাই স্বপ্ন দেখেন যেন, ভাগিনেয়ীকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছে, এখনই আপদ বিদায় হইতেছে—

৫

জোনাক পাখী ডাকে লো!
গাছের আগায় বইয়া লো!
মামী বলে ভাগ্নী লো!
তোরে নিতে আইছে লো!
আগে যদি জানতাম,
ভাইগো বাড়ী যাইতাম।
ভাইগো বাড়ী কত দূর?
গাছের আগায় চম্পা ফুল।
চম্পা ফুলের গন্ধে
চুল বান্ধে নন্দে।
চুলের উপর কালাই সাপ,
লাফ দিয়া পড়ে বেয়াইর বাপ।
বেয়াইর বাপে তামাক খায়,
নাকে মুখে ধোয়া বয়।
ছোট ছোট পাল্কী,
তার মধ্যে কল্‌কী।
সেই কলকীর নাচনা,
ঝুমুর ঝুমুর বাজনা।—বরিশাল

৬

কুটুম পক্ষী ডাকে লো,
মামী কয় ভাগ্নে লো।
তোরে নিতে আইছে লো।—ঢাকা

৭

বড় মামী বড়্ মামী,
বড়্ ডালম্ তলে।
ছোট মামী তেতই তলে।
তেতই পাতা তুলসী,
আমার মামী উর্বশী।
উর্বশী ঝিএর লাম্বা চুল,
বান্তে বান্তে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের উপরে
তুয়া বিরিক্ষি জ্বলে।
বিরিক্ষি চাইতুম্ গেলুম্ রে
সাপে চক্কর ধরে।
সাপ পেলাইলাম্ পাকাইয়া,
লাঠি আন্‌লাম্ ঢাকাইয়া।
খাটর তলে বাঘর ছা,
হাড়ুম হুড়ুম করে রা।
যে ন মাতে তারে খা॥—চট্টগ্রাম

আলুর ছাড়া কচুর ছাড়া।
মামার্ বিয়া তুপুর ধারা॥
মামীরে নিতে আইস্থে হাড়ে তিনটা মরদ্।
ভাক্ক আ ছিড়ি পৈড়্গে মামী জোট্ পুকুর গ্যার্ পারত্
মামারে পার করাতে লাগে আনা আনা।
মামীরে পার করাতে লাগে কাণের সোনা॥

মামা কাটে চিকণ সুতা,
মামী কাটে পাট।
অ মামী ন কান্দিয়,
মামা তোমার বাপ ॥—চট্টগ্রাম

মামীকে এইবার বাপ তুলিয়া খোঁটা দিবার হীন মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়—

৯

কাঁচা কলা খাইতে গো মা কষ্টি কষ্টি লাগে,
পাকা কলা খাইতে গো মা মিষ্টি মিষ্টি লাগে।
বড় গাঙ্গে যাইতে গো মা ডর ডর লাগে,
ছোট গাঙ্গে যাইতে গো মা ফুল ছিট্যা পড়ে।
ফুলের উপর সাপটা,
বড় মামীর বাপটা।—ঢাকা

সাপের সঙ্গে বড় মামীর বাপের তুলনা দিবার মধ্যে মামীর প্রতি যে বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হাস্যরসিকতার অন্তরালে চাপা পড়িতে পারে নাই।

১০

ছোড্ড মামার বউ,
বড় মামার বউ;
আইও গো বাইঙ্গন তুলতে যাই;
বাইঙ্গনের কাঁডা,
নছিবের বাঁডা।
যদি মাইয়া থাকতাইন,
গজ্জ বইয়া কান্‌তাইন।
গজ্জ গেল পুড়ইয়া,
মাইয়া গেলাইন মরইয়া।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটির মধ্যে মামী সম্পর্কিত ভাগিনেয়ের পরিহাস-রসিকতা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—

১১

ইছন বিছন দাইড়ক্যা বিছন।
মৈষ পড়ে সোহাগ ভরে,
গাবের বেটি বিয়া করে।
চাউঁল কুটুনির মাও লো,
মামার ছাতি ধরই লো,
ছাতির উপরে গাম্‌ছা,
দেখ মামীর তাম্‌সা।
এক মামীর গলই পেট,
গলই পেটে মারলাম বাড়ি,
ভাত বাড়াইল ডালি চারি।
ভাত অইল কড়্‌কড়া,
লাঠি দিয়া গড়্‌ গড়া,
লাঠি গেল ভাইঙ্গ্যা,
জামাই আইল তিন ঠেঙ্গ্যা।—মৈমনসিং

১২

আয় লো মেয়েরা মামার বাড়ী যাই,
মামার বাড়ী গিয়া ছিটি ফল খাই।
ছিটি ফল খাইতে ফুটিলাম কাঁটা,
সেইতে আইল সতীনের খোঁটা।
সতীন সতীন বহুত দূর,
ভাইয়ের বাড়ী চাম্পাপুর।
ভাই আইল ঘামাইয়া,
ছাতি ধর টানাইয়া,
ছাতির উপরে গাম্‌ছা,
দেখ মামীর তাম্‌সা।
এক মামী রান্ধে বাড়ে আর এক মামী খায়,
আর এক মামী গাল ফুলাইয়া নাইওর যাবার চায়॥—ঐ

তবু জামাই ভাত খেল না

বাংলার জামাই সম্পর্কিত ছড়াগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, জামাইর সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারেরই যে সম্পর্ক তাহা খুব আন্তরিক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ নহে। বরং তাহার পরিবর্তে মান অভিমান এবং তাহার প্রতি পরিবারের একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে পূর্বে একবার আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু বিষয়টি গভীর-ভাবে লক্ষ্য করিবার মত। ইহার মধ্য দিয়া বাংলার সমাজ-জীবনের যে একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অনুরূপ পরিচয় আর কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই পাওয়া যায় না। 'জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা' এই প্রবাদ বাক্যটির ভিতর দিয়া জামাই সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ছড়াগুলির মধ্য দিয়াও তাহারই সমর্থন পাওয়া যায়। শত করিয়াও জামাইর মন পাওয়া যায় না, এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই জামাই সম্পর্কে একটা বিদ্বেষের আগুন পরিবারের মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে, কিন্তু স্নেহপুত্তলী কন্যাটিকে তাহার হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে, তাহার কোন দিক দিয়া দুঃখ হয়, এই ভয়ে সেই ভাব সর্বদা তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ পায় না,

> কাপড় দিলাম জোড়ে জোড়ে কন্যা দিলাম দানে
> তবু জামাই ভাত খেল না কিসের অভিমানে।
> গুড়া মাছের পাতগুড়া মাছ ইলিস মাছের মুড়া,
> জামাইবাবু ভাত খেল না নে আয় ঝাঁটা মুড়া।

বাংলার সমাজের জামাই সম্পর্কিত মনোভাব এই ছড়াটির মধ্য দিয়া সর্বাধিক সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সাধ্য মত জামাইকে পরিতুষ্ট করিয়াও যখন কোন ফল হইল না,—তাহার অভিমান দূর হইল না, অথচ কিসের জন্য যে তাহার অভিমান তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল না, তখন সমাজ তাহার জন্য মুড়া ঝাঁটারই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছে। অবশ্য কন্যার দিকে চাহিয়া মুড়া ঝাঁটার প্রয়োগ করা সম্ভব না হইলেও মনে মনে প্রত্যেক পরিবারই জামাই সম্পর্কে এই মনোভাবই পোষণ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং জামাই সম্পর্কিত ছড়াগুলির মধ্যে কেবল মাত্র অর্থহীন মান অভিমানের কথা, অযোগ্যতার কথা, অপদার্থতার পরিচয়।

মেজ জামাইর অভিমানের কথা লইয়া একটি ছড়া বাংলার প্রায় সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে—

১

আলুপাতা থালুপাতা, ভেরেণ্ডা পাতার ঝোল,
সকল জামাই ভাত খেলে মা, মেজ জামাই কই।
কাপড় দিয়েছি থানে থানে, ঘটি দিয়েছি দানে,
মেজ জামাই ভাত খায় নাই কিসের অভিমানে।—হুগলি

থান থান কাপড় দেওয়া হইয়াছে, ঘটি বাটি সবই দান করা হইয়াছে, তথাপি যে তাহার কিসের অভিমান, তাহা পরিবারস্থ কেহই বুঝিতে পারিতেছে না, ইহাও ত কম অশান্তির কথা নহে!

২

আলু পাতা থালু থালু মনসা পাতার দই,
সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই?
মেজ জামাই জলাতে,
ফুলের মালা গলাতে।—২৪ পরগণা

শ্বশুর গৃহের প্রতি যদি তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তিনি জলাতে ফুলের মালা গলায় দিয়া বসিয়া থাকিয়াই বা কি করিতেছেন? সুতরাং ইহা তাহার উপর ব্যঙ্গোক্তি, তাহার কোন প্রশংসার কথা নহে।

৩

আলু পাতা থালুক থালুক বেগুন পাতা দই,
সব জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই?—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে দেখা যাইতেছে যে, মেজ জামাই ছোলা খেতের আল পথ ধরিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আসিয়া পিঁড়িতে বসিয়াও খাওয়া শেষ করিতে পারিলেন না; এমন কি, তাহার এই দুর্ভোগ পরিবারের সকলেরই কৌতুকের কারণ হইল, সহানুভূতির বিষয় হইল না। যাহার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেই মূলত বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে কোন সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি হইতে পারে না।

৪

আলুর পাতায় থালু থালু ভেণ্ডার পাতায় দৈ,
সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কৈ ?
ওই আসছে ওই আসছে ছোলা খেতের আল দিয়ে,
ছোলা শাক রেঁধেছি আমি খেও মধু দিয়ে।
একটু একটু খেয়ে যাও না পিঁড়েয় আসন দিয়ে,
পিঁড়ে গেল হড়্‌কে জামাই গেল ফর্‌কে॥—ঐ

এমন কি, সুদূর পূর্ববাংলা পর্যন্ত মেজ জামাইর এই অভিমানের কথা গিয়া পৌঁছিয়াছে—

৫

আলুর পাতা থালু থালু ভেন্না পাতার দৈ
সকল জামাই খায়্যা গেল মাইজান জামাই কই ?
আইস্‌তাছে আইস্‌তাছে ছোলার বন দিয়া,
ছোলার শাক ভাইজা দিমু ঘিরৃত মধু দিয়া।—ঢাকা

সহসা দেখা গেল, ছোলার বন দিয়া মেজ জামাইবাবুর আবির্ভাব ঘটিতেছে, সুতরাং আসিয়া পৌঁছিলে ছোলার শাক দিয়াই তাহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হইল।

৬

আলু ভাজা থালা থালা সজনে পাতায় দই
সব জামাই এলোরে আমার ছোট জামাই কই।
ঐ আসছে ঐ আসছে লাল গামছা কাঁধে,
ও গামছা লিব না
বিটির বিয়ে দিব না
বিটি দিব সাজিয়ে
টাকা লিব বাজিয়ে॥—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে মেজ এবং ছোট জামাইর পরিবর্তে কুদা জামাইর কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কুদা শব্দটির ভিতর দিয়া সম্ভবতঃ কোন অঙ্গগত (physical) ত্রুটির কথা প্রকাশ পাইয়াছে—

৭

আলু পাতা থালু থালু ব্যান্নার পাতার দই,
সকল জামাই আইছে আমার কুদা জামাই কই।
কুদা গেছে মাছ মারতি পাইছে একটা শৈল ;
শইল্লারে দিলাম পোছ,
বারোল তুই মোছ।
মোছে দিলাম আগুন,
বারোল তুই বাগুন।
বৌরে দিলাম ভাজতি,
বৌ বস্‌ল কান্‌তি।
বৌরে দিলাম খাবা,
বৌ বল্লে, ওরে বাবা।—খুলনা

জামাতার প্রতি প্রত্যেক পরিবারেরই যে প্রচ্ছন্ন বিরূপ মনোভাব রহিয়াছে, তাহাই কখনও কখনও জামাতার অসঙ্গত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া যে ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। যদি জামাতা যথার্থ সহানুভূতির পাত্র হইত, কিংবা নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কেহ হইত, তবে তাহার অঙ্গগত ত্রুটি প্রচার করিয়া কোন ছড়া রচিত হইত না। ইহার পর আমরা খোঁড়া জামাইর কথাও শুনিতেছি, ইহাও জামাইর প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র—

৮

আলুর পাতায় ছালুরে ভাই তেল্লা পাতায় দই,
সকল জামাই এল রে আমার খোঁড়া জামাই কই।
ওই আসছে খোঁড়া জামাই টুংটুঙ্গি বাজিয়ে,
ভাঙা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান।
কেঁদো না কেঁদো না জামাই গোরু দিব দান,
সেই গরুটার নাম থুইয়ো পুণ্যবতীর চাঁদ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিজের জামাইটির পায়ে যদি কোন ত্রুটি থাকিয়াই থাকে, তবে তাহাকে শ্বশুর পরিবারের লোকই খোঁড়া জামাই বলিয়া প্রচার করিবার মধ্যে কি মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। নিজের পুত্র

যদি খোঁড়াই হয়, তবে তাহাকে নিজের পরিবারের লোক খোঁড়া খোকা বলিয়া কদাচ ডাকিবে না, যদি তাহাই হইত, তবে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হইতে পারিত না। কিন্তু নিজের জামাতার বেলায় যে এই নিয়মটি খাটিল না, তাহার অর্থই হইতেছে যে, পরিবারের পুত্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক জামাতার সঙ্গে কিছুতেই সেই সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না, সেইজন্য তাহার সামান্য একটি অঙ্গগত ত্রুটি ছড়ার মধ্যে এমন প্রকাশ্য প্রচারের কারণ হইয়াছে।

খোঁড়া জামাইর সংবাদ বাংলার পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে—

৯

আলুর পাতা ঠালুর ঠালুর বিন্না পাতা সই,
সকল জামাই খাইত বইছে আমার লেংড়া জামাই কই ?

—মৈমনসিং

১০

চড়ইটারে মরুইটা দুয়ারে বসোসে।
রামচন্দ্রের কান বিঁধাব নাড়ু বিলাও সে॥
বড় বড় নাড়ুগুলি সিকেয় তুলোসে।
ছোট ছোট নাড়ুগুলি গালে ভরসে॥
এস এস জামাই-এর পাল ভোজন করসে।
সকল জামাই এলো আমার খোঁড়া জামাই কই।
ঐ আসছে খোঁড়া জামাই ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে।
ভাঁড়ার ঘরে শুতে দিলুম ইঁদুরে নিল কান।
কেঁদ না কেঁদ না জামাই গরু দেব দান।
ও গরুটির নাম কি—পূর্ণিমার চাঁদ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

দীনবন্ধু মিত্র 'জামাই-বারিক' নাটক রচনা করিয়া শ্বশুর গৃহাশ্রিত কুলীন জামাতার এক ব্যারাক (Barrack)-এর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, এখানেও 'জামাইয়ের পাল' কথাটির মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতি সেই অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইতেছে। খোঁড়া জামাই ডুগ্‌ডুগি বাজাইয়া আসিবার চিত্রটি আরও ব্যঙ্গাত্মক। জামাইর প্রতি অসন্তোষের ভাব কত ভাবে যে ছড়ায় প্রকাশ পায়,

তাহার অন্ত নাই। এখানে খোঁড়া জামাইর সম্বর্ধনার বর্ণনাটির মধ্য দিয়া তাহা আর এক অভিনব পরিচয় লাভ করিয়াছে।

১১

ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে,
ক্ষীরের হাঁড়িতে দই প'ল ছাই খাক্ সে।
হাঁড়ায় আছে কাতলা মাছ ধরে আন্ গে,
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলে টিয়ে,
টিয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
লাল গামছায় হল নাকো তসর এনে দে,
তসর করে মসর মসর শাড়ি এনে দে;
শাড়ির ভারে উঠতে নারি শালারা কাঁদে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

কাতলা মাছের কথা উঠিবা মাত্রই খেলার ছড়া হইতে কাত্লা মাছের পরিচিত একটি চিত্র এখানে আসিয়া যুক্ত হইয়া গিয়াছে। মাছের চিত্রটি বাঙ্গালীকে সর্বত্রই লক্ষ্যচ্যুত করে, শিশুর রাজ্যে এই লক্ষ্যচ্যুতি নিরন্তরই ঘটিয়া থাকে।

জামাইর অভিমানের রহস্য কেহই উদ্ধার করিতে পারে না—

১২

কাপড় দিলাম জোড়ে জোড়ে
কন্যা দিলাম দানে;
তবু জামাই ভাত খেল না
কিসের অভিমানে॥
গুড়া মাছের পাতগুড়া মাছ ইলিশ মাছের মুড়া,
জামাইবাবু ভাত খেল না নিয়ায় ঝাঁটা মুড়া।—২৪ পরগণা

অকারণ অভিমানের একমাত্র শাসন মুড়া ঝাঁটার ব্যবস্থা। জামাই যে পরের ছেলে ইহা অপেক্ষা আর কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাহা স্পষ্ট হইতে পারে না। তবে অভিমানের একটি কারণ পূর্ববাংলা হইতে সংগৃহীত একটি ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, প্রকৃত ইহার জন্যই যদি জামাইর অভিমান হইয়া থাকে, তবে এই অভিমানের কোনও প্রতিকার নাই—

১৩

শালটি শোভা দুইটা পাখী ময়দান গাঙে উড়ে,
কন্যার মারে সুন্দর দেখ্যা জামাই গোস্বা করে।
বুদ্ধি নাইরে জামাই বেটার বুদ্ধি নাইরে ধড়ে,
ঘর শোভা কন্যা দিলাম তবু জামাই গোস্বা করে।—ঢাকা

কন্যার মা কন্যা অপেক্ষা সুন্দরী—ইহাই যদি হতভাগার অভিমানের কারণ হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে আশার বিষয় কিছুই নাই।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে জামাই অভ্যর্থনার একটি অভাবনীয় ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়—

১৪

এসো জামাই বসো খাটে,
পা ধোও গে গড়ের মাঠে।
পিঠ ভাঙ্গব চেলা কাঠে,
কেঁদে বেড়াবে মাঠে ঘাটে।—২৪ পরগণা

চেলা কাঠের আঘাত সহ্য করিবার মত পিঠ যাহার শক্ত এবং মজবুত, সেই কেবল জামাতা হইবার যোগ্য।

১৫

আলতা পরা পা গো,
জামাই আনতে যাগো,
জামাই আনা এমনি নয়,
তিনটি টাকা খরচ হয়।
ঘটি দিলাম, বাটি দিলাম কন্যা দিলাম দানে,
মেজ জামাই ভাত খেল না কিসের অভিমানে।—ঐ

জামাই আনিবার ব্যয় সেদিন বেশি ছিল না, মাত্র তিন টাকা। তখন তিন টাকাই হয়ত সাধারণ পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কারণ, বলা হইয়াছে, 'জামাই আনা এমনি নয়, তিনটি টাকা খরচ হয়।' তিন টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা সত্ত্বেও সেই জামাই যদি খাইবার বেলায় অভিমান করিয়া বসে, তবে এই দুঃখ রাখিবার আর স্থান কোথায়?

১৬

ইংগলানি পাইত পাইত,
জামাই আইছে নিশি রাইত।
আগুার ছালুন খাইন না,
বিদায় দিলে যাইল না।
কই গেলে গো ধাইড়া বান্দী,
দড়ি আন জামাই বান্ধি।—মৈমনসিং

নিতান্ত অসময়ে নিশীথ রাত্রে জামাই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি তাহার সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু তিনি ডিমের ডাল্‌না স্পর্শ করিলেন না, বিদায় দিলেও তিনি যাইতে চাহেন না, সুতরাং দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহার সম্বর্ধনার প্রয়োজন হইয়াছে। পুর্বে যে মুড়া ঝাঁটার কথা শুনিয়াছি, এখানে তাহারই পরিবর্তে দড়ি দিয়া বাঁধিবার কথা শুনা গেল।

১৭

আশি টাকার খাসি দিলাম নব্বই টেকার ভঁইষ,
তেও ত জামাই খায় না
বিদায় দিলে যায় না।—ঐ

জামাইকে প্রসন্ন করিতে পারে, এমন সাধ্য কোন গৃহস্থের নাই; আশি টাকার খাসিতেও যিনি খুসি হইতে পারিলেন না, তাহাকে বিদায় দেওয়াই কর্তব্য, কিন্তু বিদায় দিলেও যে সে যায় না! সুতরাং 'প্রহারেণ'ই উপায়।

১৮

বুবুর জামাই আইছে,
আইলের গোড়াত বইছে।
দেখ তো জামাই আন্‌ছে কি,
এক পোয়া এক পোয়া জিলাপি।
তার জিলাপি তারে দে,
আরও কদ্দুর বাড়াইয়া।—মৈমনসিং

শ্বশুর বাড়ীতে কিছু ভেট লইয়া জামাই আসিয়া ক্ষেতের আলের নিকট বসিয়া আছেন, আগ্‌ বাড়াইয়া সম্বর্ধনা করিয়া না আনিলে তিনি গৃহে আসিবেন

না। এখানেও সেই অভিমানেরই কথা। জামাইর অযোগ্যতা ও দারিদ্র্যকে এখানে তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে।

জামাই অপদার্থ অযোগ্য, বুদ্ধিহীন এবং বয়ঃক্লান্ত। নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় এই ভাবটি কন্যার মুখে অপূর্ব ভাষা পাইয়াছে—

১৯

মাগো মা! জামাই এসেছে!
ইলিশ মাছের ঠোঙ্গায় ক'রে গয়না এনেছে,
দাওয়ায় বসতে পিঁড়ি দিলাম শুয়ে পড়েছে
পা ধুতে জল দিলাম খেয়ে ফেলেছে।
আম কাটতে ছুরি দিলাম আঙ্গুল কেটেছে,
তেল মাখতে তেল দিলাম কাণে ঢেলেছে,
গা মুছতে গামছা দিলাম, কোমরে বেঁধেছে।
বড় পুকুরে নাইতে দিলাম, ডুবে মরেছে।—২৪ পরগণা

অন্যত্রও এই বিষয়ে শুনা যায়—

২০

মা গো মা তোর জামাই আসিছে,
আম গাছ আর জাম গাছের মধ্যে বসিছে।
পায়ে দিতে খড়ম দিলাম কাণে ঝুলাইছে,
পাও মুছিতে গামছা দিলাম মাজায় বাঁধিছে।—ঢাকা

২১

মা গো মা তোর দামান্দ আইছে,
আলকু পাতা মুড় দিয়া বিল বইছে।
এক কাখি বিরুইন ধান মায় কবে শুকাইছে,
বিরুইন ধানের খই ভাইজ্যা শিকায় শুকাইছে।—শ্রীহট্ট

গৃহে উপঢৌকনের বস্তু মজুত থাকিলে জামাই আসার কোন 'ভয়' নাই, সুতরাং দেখা যায়, গৃহস্থের বাড়ীতে জামাই আসা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আসিবার মত আনন্দের ব্যাপার নহে, বরং ভয়ের কারণ—

২২

কি কর গো কন্যার চাচি, খাটের উপর বৈয়া,
তোমার ভাসুর-ঝির জামাই আইছে লাল ঘোড়া দৌড়াইয়া।
আইউক (আসুক) আইউক ঝিয়ের জামাই কিবা ভয় রাখি,
খাটের উপর বিছাইয়া রাখ্‌ছি সিতি পাইড়ের ধুতি।—ঢাকা

এইবার জামাইকে লইয়া একটু তামাসার আয়োজন হইতেছে, পুর্বেই বলিয়াছি, ইহাও প্রচ্ছন্ন বৈরীভাবের অভিব্যক্তি মাত্র—

২৩

বড় ভাই একটি গান বল।
না যদি গান বল্‌তে পার,
আমার ভগ্নীর পায়ে ধর।
না যদি পায় ধরতে পার,
কান মলাটি স্বীকার কর।
আমার ভগ্নী তরঙ্গিণী,
তার যোগ্যের নয়ক তুমি।
আহা মরি বেশ
গায়ে মারি ঢেস
অবিকল যেন নারিকেল সন্দেশ।—২৪ পরগণা

'তার যোগ্যের নয়ক তুমি' এই কথাটিই জামাই সম্পর্কিত সকল ছড়ার একমাত্র কথা!

২৪

দাদাবাবু কমলা লেবু
একলা খেও না;
আমার দিদি কচি ছেলে
কিছুই জানে না॥—২৪ পরগণা

২৫

পদী পদ্মলোচনী,
পদ্মীর ভাঙ্গা ধুচিনী।

পদীর বর পটল ব্যাপারী,
একটি পটল ফিকে দিলে
নানা রকম তরকারী ;
তরকারী হলো ভালো,
মস্‌লা দিতে ফস্‌কে গেল।
হায় লো পদী কি হলো ॥—২৪ পরগণা

শ্বশুর গৃহে এমন রান্নারই ব্যবস্থা হইল, যাহার ত্রাসে জামাই পলাইয়া গেল—

২৬

কে যায়রে, কে যায়রে,
ছোল্লা বাড়ি দিয়ে?
ছোল্লার শাক রেঁধেছি রে
হিং মৌরী দিয়ে।
হিং মৌরীর বাসে,
জামাই পালায় ত্রাসে,
কাল জামাই আনবো গো,
ঢাক ঢোল বাজিয়ে।—২৪ পরগণা

পলায়িত জামাইর পরবর্তী দিবসে পুনরায় সম্বর্ধনায় যে ব্যবস্থার আশ্বাস পাওয়া গেল, তাহাতে জামাতৃ-হৃদয় কতখানি উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই।

২৭

জামাই ভাত খেয়ে নাও নূতন তরকারী,
পোড়া ভাতে কাস্তে পোড়া কোদাল চচ্চড়ি।
সাবলের ঝোল কুড়াল ভাজা, খেলে জামাই হবে তাজা।
নিত্য আসা শ্বশুর বাড়ী ভুলতে পারবে না।—মেদিনীপুর

ভাঙ্গা কুলা এবং ছেঁড়া কাঁথা জামাইর অভ্যর্থনার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে—

২৮

'আয়রে খোকা আয়, ডাকছে রে তোর মায়।
মার জামাই আসছে রে, ঐ ভাউয়া ডিঙ্গি নায় ॥'

'আসুক জামাই দেব পিঁড়ি, তোরে নিয়ে যাবে বাড়ী,
একলা একলা খাব মুড়ি, আয়রে জামাই আয়।'
'জোড়া শাড়ী সোনার চুড়ি মল খারুয়া পায়,
দে না মাগো পরিয়ে মোরে কেমন দেখা যায়।'
'এল জাঁমাই বাড়ীতে, তেল নাই খারিতে,
বসতে দেব কি?
ভাঙ্গা কুলো ছেড়া কাঁথা জোগাড় করেছি।
এস জামাই বস না, মনের কথা কও না,
কেঁদো কাঁদা জামাই গাঁদা, ছি ছি ছি॥
'দেখে যাগো, অগো মাগো শিগ্‌গির করে আয়,
কালকে যাব সোয়ামীর ঘর থাক না হেথায়;
তোর খোকা দুষ্ট ছেলে, কথা বার্তা যা তা বলে,
তোর জামাই আদরের মোর হায় মরি আয়॥'
'এল জামাই নেবে ঝি মার পরণে বলবে কি,
পান্ত ভাতে পুরান ঘি, যাগো যা ছোট দি।'—নদীয়া

২৯

ইটে কুমুড়ির মা লো ভিটে বেঁধে দে,
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবে বাজন্যে এনে দে।
বাজন্যে আনতে গেলো বুড়ি পথে পড়লো খেয়া,
সেও খ্যাওয়া তুলে এনে শ্রীরামপুরের দেওয়া।
শ্রীরামপুরের জামাই বেটা কি কি এনেছো?
আর তো কিছু আনিনি, নথ এনেছি।
সেও তো নথ ভালো না ভাঙ্গা এনেছি।
মেয়ের নাকে তুলে দিলাম বেশ তো সেজেছে।
মেয়ে বড় দজ্জাল টান্ দ্যে ফেলেছে।
জামাই বেটা রসিকদার খুঁটে তুলেছে।
সকল জামাই এলো রে ছোট জামাই কৈ।
আসছে ছোট জামাই ছোলার শাক নিয়ে।

ছোলার শাক রাঁধছি আমি ঘেত্য মধু দিয়ে।
সেই গন্ধ যাবে রে আমার চাকার গলি দিয়ে।
চাকার গলির পথ মারব হীরের কাঁটা দিয়ে ॥—পাবনা

শ্রীরামপুরের জামাই একখানি মাত্র নথ লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া কন্যার হাতে কি রকম নাকাল হইল, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৩০

পড়ঙ্গা চরঙ্গা শোলঙ্গ পাতা,
মধুর বউঅরে কৈয়ম্ যে কথা।
মধুরো বউঅর চিকনা ধুতি,
বলদে নিল শিঙ্গত্ করি।
আন্ধা গরু বান্ধা দিলুম্ ভুঁই গেল্ খিল,
যমুনারে বিহা দিলুম্ গঙ্গার কূল।
উঠ উঠ যমুনা একটি বাইঅন কুটনা,
জামাইর পাত্ত ঝোল নাই।—চট্টগ্রাম

৩১

অছিরদ্দি বাপর চিকন ধুতি,
বল্দে নিল শিঙ্গত তুলি,
অ যমুনা যমুনা উঠ উঠ,
তিনটা বাইঅন কুট,
জামাইর পাত্ত সুকা নাই,
মাইলর তোতা মরর্ কেম্মা,
চল্‌রে তোতা পোইরত্ যাই,
ভুট্যাই ভুট্যাই হালুক খাই,
একগুআ হালুক মথুরা,
জামাইর দেশ খান চতুরা ॥—চট্টগ্রাম

৩২

মণির বাড়ী দূরথুন দূর;
সম্বাদে আনাইয়ম্ কেতকী ফুল।

কেতকী ফুলের শতেক পাথর ;
মণির জামাই রসিক নাগর।
নাগর চান্দে সাগর বান্ধে ;
বটবৃক্ষর তলে।—চট্টগ্রাম

৩৩

ঝিঁয়া ফুল মুট্টে বেল নাই।
জামাই আস্তে তেল নাই ॥
জামাইয়ে দিয়ে ভাতর্ হাড়া।
শাশুড়ী দিয়ে ঢেঁকীত্ বাড়া ॥—চট্টগ্রাম

ঘরে জামাতা আসিয়াছেন, কিন্তু শ্বশুর-গৃহে তৈলের অভাব, শূন্য ভাতের থালা সম্মুখে দিয়া শাশুড়ী ঢেঁকিতে চাল কুটিতে গেলেন !

৩৪

অরঙ্গ ডরঙ্গ শোলকর পাতা।
বন্ধর বউঅরে ন কৈঅ কথা ॥
আন্ধা গরুআ বান্ধা দিম্।
যবুনারে বিভা দিম্ ॥
উঠ উঠ যবুনা।
ছ কুড়ি বাইঅন কুট না ॥
জামাইএ ন খায় ফলৈ মাছ,
কন্যার মারে কহ গৈ,
কাটৌক্ কৈতর বাছা ॥—চট্টগ্রাম

৩৫

টেন্ টেয়ালি কচুর লতি,
বড়্দিদি মোরে কোলত্ লতি, (লইতি)
বড়্ পোইরর্ বড়্ ভাডইয়া,
জামাই আইএর টুন টুনাইয়া,
ও জামাই ফিরি চা,
খুং মিলাবি মিলাই যা।—চট্টগ্রাম

জামাইকে অভ্যর্থনা করিবার বিদ্রূপাত্মক বর্ণনাটি এখানে লক্ষ্য করিবার মত—

৩৬

বাঁধার দুয়ারত আঁই (আমি) জামাই আগকুলা পাইল।
বাহার ডেহরিত্ আই জামাই ফুলর্ ছাতি লৈল॥
উঠানেতে আই জামাই পঞ্চ জোয়ার পাইল।
গোঞাইর ঘরত্ গিয়া জামাই গোঞাইর নজর দিল॥
খীলর ভিতর আই জামাই বেদীর লাগত্ পাইল।
লাত্যাইত্ উঠি জামাই লাখ টাকা পাইল॥
হাতিনাত্ যাইয়া জামাই হাতীর লাথি খাইল।
পাক ঘরত্ যাইয়া জামাই পঞ্চ বেজন পাইল॥
উপুর তলে যাইয়া জামাই বিলাইর লাথি খাইল।
বাড়ীর পিছে গিয়া জামাই গুড়ের ভাণ্ড পাইল॥—চট্টগ্রাম

৩৭

ও বুড়ী বুড়ী কুটনী।
গরু চরাতি যাবিনি॥
যাইম্ যাইম্ বিয়ালে।
কুড়া নিল হিয়ালে।
জামাই আইলে কি বুলিম্।
ধুতি পিন্ধি নিকলিম্॥
আশে আঁশে কৈঁটা।
খাস্তা পাতা ভরি দিম্।
এক্কে টানে উড়াই দিম্॥—চট্টগ্রাম

খুড়ো দিল বুড়ো বর

বর এবং কন্যার মধ্যে কোন কোন সময় বয়সের অস্বাভাবিক অসমতা আমাদের সমাজের চিরকালীন কলঙ্কস্বরূপ ছিল। বাংলার আগমনী বিজয়া গানের মধ্য দিয়া ইহার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ছড়া আগমনী-বিজয়া গানের জননী, সেই সূত্রে ছড়ার মধ্যেও ইহার অভিব্যক্তি দেখা যায়। এ'দেশে কুলীনের গৃহে কন্যাদান করা যে সামাজিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত, তাঁহারই সূত্র ধরিয়া বর এবং কন্যার মধ্যে দুই বিষয়ে অসমতা অপরিহার্য হইয়া উঠিত, প্রথমত বয়সের দিক দিয়া অসমতা; ইহার ফলে বালিকা কন্যাকে বৃদ্ধ বরের নিকট সমর্পণ করিতে হইত, দ্বিতীয়ত আর্থিক অসমতা; ইহারই ফলে ধনীর কন্যাকেও দরিদ্র স্বামীর নিকট সমর্পণ করা হইত। আগমনী বিজয়া গানে এই দুইটি বিষয়েরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ছড়ার মধ্যেও নানাভাবে এই দুইটি বিষয়েরই উল্লেখ আছে। তবে আর্থিক অসমতা অপেক্ষা বয়সের অসমতাই দাম্পত্য জীবনের অধিকতর অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ছড়ার মধ্যে তাহার প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করা যায়।

বাংলায় এই সম্পর্কে যে কয়েকটি ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, প্রথমতঃ 'ডালিম গাছে পরভু নাচে', দ্বিতীয়তঃ 'অন্নপূর্ণা দুধের সর', তারপর 'উলু উলু মাদারের ফুল ' এবং সর্বশেষে 'গৌরী হেন ঝি।' ইহাদের দুইটি শ্রেণীর মধ্যেই খুড়াই যে বুড়ো বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, তাহার উল্লেখ আছে; খুড়ার হৃদয়হীনতার কথা ক্ষুদ্র বালিকাটি ইহাদের মধ্যে মর্মান্তিক বেদনার ভিতর দিয়া স্মরণ করিয়াছে। তাহার বেদনাই ছড়াগুলিকে জীবনরসে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অবশিষ্ট ছড়াগুলির মধ্য দিয়া অদৃষ্টকেই ইহার জন্য দায়ী করা হইয়াছে,—'তোর কপালে বুড়া বর, আমি কর্‌ব কি?' নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য মানুষ কখনও মানুষকেই দায়ী করে, আবার কখনও অদৃষ্টকেই দোষী করে—এই ছড়াগুলির মধ্যেও দেখা যায়, কখনও শুনা যাইতেছে, 'খুড়া দিল বুড়া বর,' আবার কখনও শুনা যাইতেছে, 'তোর কপালে বুড়া বর!' কিন্তু শান্তি ও সান্ত্বনা ইহাদের কেহই দিতে পারে না।

১

ডালিম গাছে পরভু নাচে।
তাকধুমাধুম বাদ্দি বাজে॥
আই গো চিনতে পার।
গোটাদুই অন্ন বাড়ো॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর!
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মারলে চড়।
কানতে কানতে খুড়োর ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি॥
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি।
মায়ে দিল সরু শাঁখা বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়্কো ঠেঙা চল শ্বশুরবাড়ি॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 'তখন ইংরেজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, ঘরের বধূ-শাসনের জন্য পুলিসের আইনের চেয়ে সেই গার্হস্থ্য আইন, কনস্টেবলের সেই হ্রস্ব যষ্টি অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার হুড়কো ঠেঙা ছিল ভালো। আজ আমরা স্ত্রীকে বাপের বাড়ী হইতে ফিরাইবার জন্য আদালত করিতে শিখিয়াছি, কাল হয়তো মান ভাঙ্গাইবার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু হাল নিয়মেই হউক, আর সাবেক নিয়মেই হউক, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা—এতবড়ো অস্বাভাবিক বর্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।'

২

ডালিম গাছে পিরভু নাচে,
তা ধেই ধেই বাদ্দি বাজে,

আই গো চিন্‌তে পার,
গোটা দুই অন্ন বাড়,
অন্নপুর্ণা দুধের সর,
কাল যাবো মা পরের ঘর,
পরের বেটা মারবে চড়,
কাস্তে কাস্তে খুড়োর ঘর,
খুড়ো দিলে বুড়ো বর,
হে খুড়ো তোর পায়ে পড়ি,
রেখে আয় মায়ের বাড়ী,
মা দিলে সরু শাখা, বাপ দিলে শাড়ি,
ভাই দিলে হুড়কো ঠ্যাঙ্গা চল শ্বশুরের বাড়ী।—হুগলি

৩

অন্নপুর্ণা দুধের সর,
কাল যাব লো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়,
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেঁই খুড়ো তোর পায়ে ধরি,
রেখে আয় গে মায়ের বাড়ি।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা,
বাপে দিলে শাড়ি।
ঝপ ক'রে মা বিদেয় কর্ রথ আসছে বাড়ি।
আগে যায় রে চৌপল, পিছে যায় রে ডুলি।
দাঁড়া রে কাহার মিনসে, মাকে স্থির করি।
মা বড়ো নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর,
আপুনি ভাবিয়ে দেখো কার ঘর কর!—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নবনীত-কোমলা ক্ষুদ্র বালিকাটিকে খুড়া বুড়া বরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা নৃশংসতার কথা কল্পনাও করা যায় না, খুড়ার উপর অভিমান সেই জন্য দুর্জয় হইয়া উঠিল। পিতৃগৃহ হইতে বুড়া বরের সংসারে বিদায় হইয়া

যাইবার মুহূর্তে বালিকার কোনদিকে আর কোন অবলম্বন দেখা যাইতেছে না-

৪

অন্নপূর্ণা দুদের সর,
কাল যাব মা পরের ঘর।
পরের বেটা মারল চড়,
কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর,
হেঁই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি।
দিয়ে আয়গে বাপের বাড়ী।
মা দিলে সরু শাঁখা, বাপ দিলে শাড়ি।
ভাই মেলে হুড়্কো ঠেঙ্গা চল শ্বশুর বাড়ী।—বর্ধমান

৫

অন্য মন্য দুধের সর,
কাল যাবো পরের ঘর।
পরের বেটা মারল্ চড়,
কাঁদতে কাঁদতে খুড়ার ঘর।
খুড়া দিলে বুড়া বর,
যা খুড়া তুই পড়ে মর্॥—২৪ পরগণা

খুড়ার উপর এমন কঠিন অভিশাপ উচ্চারণ করিয়াও বুঝি বালিকার মনের অস্বস্তি দূর হইল না।

৬

অনুপমা দুধের সর,
চায়না যেতে পরের ঘর!
বাপ বল্ছে, 'আয়, আয়, মা বল্ছে, থাক।'
বৌ বল্ছে 'দূর করে দাও, শ্বশুর বাড়ী যাক'।—যোগীন্দ্র-সংগ্রহ

৭

কাঞ্চন কাঞ্চন দুধের সর।
কাঞ্চন যাবে পরের ঘর॥

হইত যদি বাপের ঘর।
তুল্যা খাইত দুধের সর॥
এ ত হইল পরের ঘর।
কোই পাবেরে দুধের সর॥
খুড়া দিল বুড়া বর।
ও খুড়া তুই জলে ডুব্যা মর॥—মেদিনীপুর

ইহাতে বঞ্চিতা বালিকা খুড়াকে জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য সোজাসুজি আদেশ করিতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে বরের কেবল গোঁফ জোড়াটি পাকা বলিয়া উল্লেখ আছে। এই পক্বগুম্ফ বরের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য এখানে অদৃষ্ট কিংবা মানুষ কাহাকেও অভিশাপ দিবার কথা নাই; ইহাদের মধ্যে বিষাদ এত ঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই—

৮

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আস্‌চে কতদূর।
বরের মাথায় চাঁপার ফুল;
কনের মাথায় টাকা।
এমন বরকে বিয়ে দেব,
তার গোঁপ জোড়াটি পাকা।
ভালতো বেণী বিনিয়েচে রাণী,
বেণীর আগায় সোনার ঝাঁপা।
মাঝে মাঝে তার কনক চাঁপা।—বাঁকুড়া

কিন্তু পরবর্তী ছড়াটি একই সুরে সূচনা হইলেও শেষ পর্যন্ত গিয়া অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে মাতা, পিতা এবং খুড়া কেহই বালিকার অভিশাপ হইতে রক্ষা পায় নাই। কারণ, বরের কেবলমাত্র গোঁফ জোড়াটাই পাকা নহে, সে তামাকখেকো এবং লোভী প্রকৃতির—

৯

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আস্‌চে কতদূর?

বর আসচে বাথ্‌নাপাড়া।
বরের মাথায় চাঁপা ফুল ;
কনের মাথায় টাকা।
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
গোঁপ দাড়িটা পাকা ॥
চোক খাক তার মা বাপ,
চোক খাক তার খুড়ো,
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
তামাক-খেকো বুড়ো।
তামাক-খেকো বুড়োটা কলা-আড়িকে যায়,
যে কলাটা মর্তমান সেই কলাটা খায়।—বর্ধমান

বৃদ্ধ বরটির আহারে বিলক্ষণ রুচি আছে ; কারণ, 'যে কলাটা মর্তমান' বাছিয়া বাছিয়া 'সেই কলাটাই খায়।'

১০

তালগাছ কাটম্‌ বোসের বাটম্‌ গৌরী এল ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী।
টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদন-কড়ি,
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়োর চাপদাড়ি।
চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খুড়ো,
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো।
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে,
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'বাপ মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে, কিন্তু বুড়া বরটা তাহার চক্ষুঃশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।'

১১

তাল গাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী গো ঝি,
তোমার কপালে বুড়ো বর আমি কর্বো কি ?

চোক খাক তোর মা বাপ,
চোক খাক তোর খুড়ো,
এমন বরকে বে দিয়েছে ;
তামাক-খেকো বুড়ো।
বুড়োর নল গেল ভেসে।
বুড়ো তামাক খাবে কিসে ?—বর্ধমান

১২

তাল গাছ কাটম্ বেসের বাটম্ গৌরী লো ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি ?
য়্যানকা ভেঙ্গে স্যান্‌কা দিব, কানে মদন কড়ি,
তোর বিয়ের বেলায় দেখতে যাব বুড়োর চাঁপ দাড়ি ;
বুড়ো চাঁপ দাঁড়ি নেড়ে কলা বাগানে যায়,
যে কলাটা মর্তমান, টপরে গিলে খায়।—হুগলি

বুড়া চাঁপ দাড়ি নাড়িয়া কলা বাগানে গিয়া প্রবেশ করিয়া কদলী নির্বাচন এবং তাহার সদ্ব্যবহারে যে দক্ষতা দেখায়, তাহাতে মনে হয়, তাহার বয়স হইলেও সে রসিক এবং ভোজন ব্যাপারেই তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩

তাল গাছ কাটি বেসর গড়ি গৌরী হল ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর তো বল, আমি করব কি ?
অঙ্ক ভেঙ্গে শঙ্খ দিলাম পানের বেলায় কড়ি,
বিয়ের বেলা দেখতে পেলাম বুড়োর চাঁপ দাড়ি।
বুড়ো হোক থুড়ো হোক রসের সাগর—
সে বরকে কিনে দেব তসর কাপড়।—মেদিনীপুর

যখন সে রসের সাগর, তখন বরের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিবার আর কিছুই নাই ; সুতরাং এক জোড়া তসরের কাপড় সে যৌতুক স্বরূপ লাভ করিবারও যোগ্য।

পূর্ব বাংলা হইতে সংগৃহীত ছড়া দুইটির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। ইহাদের প্রথমটিতে খুকুকে বুড়া বরে বিবাহ দিবার ভয় দেখান হইতেছে—

১৪

পটল চেরা চক্ষু খুকুর বাঁশীর মতন নাক ;
খুকুর বর হবে বুড়ো, ফোক্‌লা মাথায় টাক্‌ ।—ঢাকা

দ্বিতীয় ছড়াটিতে প্রকাশ্য ভাবে বুড়া বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, লবণ দিয়া মাখিয়া বুড়া জামাইর মাংস আহার করিবার কথা ঘোষণা করিতে শুনা যাইতেছে। এই ভয়াবহ সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বর মাত্রেরই আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কথা—

১৫

বুড়ইয়া জামাই পুড়ইয়া খাইয়াম লবণ মাখাইয়া,
জোয়ান জামাই ঘরে আনবাম তেল সিন্দুর দিয়া।
কন্যারে ডাক্য না আর আম গাছের ডালে,
বুড়ইয়া জামাই দেখলে আমার ইন্দ্রের আগুন জ্বলে।—মৈমনসিং

প্রকৃতপক্ষে এই কথাই বৃদ্ধ বরের সম্পর্কে সকল বালিকা বধূর মনের কথা, 'বুড়াইয়া জামাই দেখ্‌লে আমার ইন্দ্রের আগুন জ্বলে।' কারণ, 'Where sex-attraction is utterly and definitely lacking in one partner to a union, no amount of pity or reason or duty or what not can overcome a repulsion implicit in nature.' (John Gelsworthy Introduction to *Forsyte Saga*).

বৌ ভেঙ্গেছে কাঁসা

যৌথ পারিবারিক জীবনে বধূর স্থানটি অত্যন্ত জটিল। গৃহের যিনি কর্ত্রী, সর্বতোভাবে বধূ তাহারই অধীন, তাহার সুখ দুঃখ ভালমন্দ সকল কিছুরই তিনি নিয়ন্ত্রী। বধূর উপর তাহার মনোভাবের মধ্যেই বধূজীবনের সকল কিছুই নির্ভর করে। কর্ত্রী কখনও শাশুড়ী হইতে পারেন, কখনও বড় জা-ও হইতে পারেন ; কিন্তু তাহার সঙ্গে ব্যবহারে উভয়ই অনেক সময় অভিন্ন প্রকৃতিরই হইয়া থাকেন। বধূর প্রতি পরিবারের একটা ব্যঙ্গ এবং অপ্রসন্নতার ভাবই ছড়াগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

বড় বৌ বড় মানুষের ঝি,
তাকে বলতে পারি কি ?
মেজ বৌটি বেগুন কুটি,
কথা বল্লে ঠিক্‌রে উঠি।
সেজ বৌটি হল্‌দি বাটে,
কথা বল্লে ঝুন্‌কে উঠে।
ছোট বৌটি মুখের পান,
সকাল বেলা পান্ত খান।

পরিবারের মধ্যে বধূদিগের উপর এই মনোভাবটিই সর্বদা বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। পরিবারের ছোট বড় সকলের নিকটই বধূ অপরাধিনীই, তাহার এতটুকু ত্রুটি এত বড় হইয়া প্রচার লাভ করে। বাসন মাজিতে গিয়া দৈবাৎ একটা কাঁসা ভাঙ্গিয়া যাওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু ইহা বধূর অপরাধ বলিয়া মুহূর্তেই গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া যায় ; এমন কি, তাহা ছড়ার বিষয় হইয়া উঠে, নিন্দা এবং অত্যাচারের ভয়ে হতভাগিনীকে পলাইয়া বাঁচিতে হয়—

তেঁতুল তলে বাসা,
বৌ ভেঙ্গেছে কাঁসা।
সে বৌ কোথা ? ইত্যাদি

পরিবারের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই কত জিনিসের অপচয় হইতেছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে না; কিন্তু বধূর হাত দিয়া যদি সূঁচ খানিও ভাঙ্গিয়া যায়, তবেই তাহা গ্রাম্য-জীবনের মৌখিক সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার লাভ করে। এই অবস্থার মধ্যে বধূকে ক্ষুরের ধারের উপর জীবন যাপন করিতে হয়। তথাপি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লাঞ্ছনার হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পায় না। কখনও কখনও সদ্য পিতৃগৃহাগত ক্ষুদ্র বালিকা শাশুড়ীর নিকট করুণ মিনতি জানায়,

রাগ করো না শাশুড়ী গো,
আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও তবে
দাঁড়াই কোথা যেয়ে?

কিন্তু শাশুড়ী তাহার আজন্ম সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না, অসহায় বধূর এই করুণ অনুরোধ সর্বদাই ব্যর্থ হয়। ইহার মধ্যে যে মনস্তত্ত্ব সক্রিয় হইয়া থাকে, তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যক দেখি না, তবে বৈজ্ঞানিক-গণ বলিবেন, ইহা প্রৌঢ়া নারীর এক জৈব সংস্কার, সহজে ইহার মধ্য হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পায় না। এমন কি, যে নারী নিজের কন্যাকে শ্বশুর গৃহে বধূ করিয়া পাঠাইয়া দিয়া তাহার নিরাপত্তার জন্য সর্বদা দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তিনিও পরের কন্যাকে বধূরূপে নিজের মুঠির মধ্যে পাইয়া নিজের কন্যার বধূজীবনের কথা ভুলিয়া যান। ইহাই পারিবারিক জীবনের মৌল ধর্ম।

পারিবারিক জীবনে বধূদিগের উপর সর্বদাই একটা ব্যঙ্গ এবং অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে; তাহারা সুন্দরী হইলেও যথার্থ সুন্দরী বলা যায় না, কর্মদক্ষ হইলেও যথার্থ তাহা নহে। সত্য এবং কল্পিত দোষত্রুটির সমবায়েই যেন তাহারা গঠিত। এই ভাবটি বধূ সম্পর্কিত ছড়ার মধ্য দিয়া প্রায় সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে ছড়াগুলি একে একে উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বধূ বিষয়ক এক শ্রেণীর ছড়া আছে, বড় বৌকে উল্লেখ করিয়াই তাহাদের সূচনা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল মাত্র বড় বউয়ের চরিত্রেরই ব্যাখ্যা আছে, তাহাদিগকেই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যাক্।

বড় বউয়ের খোকা হইবার সংবাদের আকস্মিকতা এখানে আনন্দ এবং বিস্ময় রসের সৃষ্টি করিয়াছে—

১

ও পাড়াতে যেয়ো না বধূ এসেছে,
বধূর পাতের ভাত খেও না ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে।
ঢাকন খুলে দেখো বড়ো বউর খোকা হয়েছে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ঐ পাড়ায় বঁধু (বধূ নহে) আসিবার সঙ্গে এবং বঁধুর পাতের ভাত না খাইবার সঙ্গে কদম ফুল ফুটিবার কোন সম্ভাবনা থাকিলেও বড় বৌর খোকা হইবারও কোন সম্পর্ক নাই। ছড়ার অন্যান্য ধর্ম ইহাতে অক্ষুণ্ন রাখিয়া মূল লক্ষ্য বড় বৌতে আসিয়া এখানে পৌছান হইয়াছে এই মাত্র।

পরবর্তী ছড়ার বিষয়টি আরও জটিল—

২

বড়ো বউ গো ছোট বউ গো জলকে যাবি গো,
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো।
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে তাঁত নিবি গো,
তারি জন্যে মার খেয়েছি পিঠ দেখো গো।
বড় বউ গো ছোট বউ গো আরেক কথা শুন্‌সে!
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা মিনসে।
ঘটি নেয় না বাটি নেয় না নেয় না সোনার ঝারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, পূর্ববর্তী ছড়ায় যে বঁধুর কথা শুনিয়াছি, তিনি এই চুড়োবাঁধা মিন্‌সে ছাড়া আর কেহই নহেন। এখানে তিনি ঘটি বাটি পরিত্যাগ করিয়া রাঙা বৌয়ের ঘরে চুরি করিবার কার্যে নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত এই ছড়া দুইটির মধ্যে যে একটু রোমান্সের স্পর্শ অনুভব করা যায়, এই শ্রেণীর অন্যান্য ছড়ায় তাহা পাওয়া যায় না। তবে বধূর ঘরে চোর ঢুকিবার কথা আরও একটি ছড়া হইতে শুনিতে পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিটি রহিয়াছে, তাহার জ্বালা বড় দুঃসহ—

৩

গেঁড়ি বৌ নাচনা।
ঢামুক খোলের বাজনা;
তোর ঘরেতে চোর ঢুকেছে,
আলো জেলে দেখ না।—২৪ পরগণা

কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির জীবন-ধর্মিতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ—

৪

বড় বৌ বড় মানুষের ঝি,
তাকে বলতে পারি কি,
মেজ বৌটি বেগুন কুটি,
কথা বল্লে ঠিকরে উঠি।
সেজ বৌটি হলদি বাটে,
কথা বল্লে ঝুনকে উঠে।
ছোট বৌটি মুখের পান,
সকাল বেলা পান্ত ভাত খান।—ঐ

বধূদিগের গুণপনার বিচার নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে আরও সূক্ষ্ম—

৫

বড় বৌ বড়ালের ঝি,
রান্নাঘরে বসে কর কি?
পটল ভেজে পলায় ঝি।
মেঝ বৌ মেঝের মাটি,
সব কথাতেই ঝন্‌কে উঠি।
মেজ বৌ ভাল বাখরা,
কথায় কথায় লাগায় ঝগড়া।
ছোট বৌ মুখের রাজা,
মুখের পরে মুখটি দিয়ে
আচ্ছা করে ঢোলক বাজা।—মেদিনীপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ার উক্তিটি যে বড় বৌয়ের তাহা নহে, বরং বড় বৌয়ের নাম করিয়া পরিবারের কোন পরছিদ্রান্বেষী চরিত্রের—

৬

আমি বড় বৌ বড় মানুষের ঝি,
আমায় বলতে পারে কে কি ?
একলা বাপের ঝি,
গরব করব না ত কি।
গরবের পাৎনা ফেলেছে।—২৪ পরগণা

স্বামীর সংসারে বিশেষতঃ যৌথপরিবারের সংসারে বধূর কোন গর্বই খাটে না, বাপের ঘরে দুলালী হইলেও সে স্বামিগৃহে সেবিকা মাত্র, সুতরাং এই গর্ব তাহাকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৭

বড়্ বউ বড়ুয়ার ঝি।
তান্ কথা কৈয়ম্ কি ॥
মধ্যম বউঅর্ হাতত্ হরা ;
সকল গুষ্টি ভাতে মরা।
ছোট বউঅর্ হাতত্ পান,
সকল গুষ্টির পরাণ খান ॥—চট্টগ্রাম

রূপকথা ও উপকথায় ছোটর একটি বিশেষ স্থান আছে, ছোট রাণী ; সদাগরের ছোট বৌ ইত্যাদির সেখানে বিশেষ মর্যাদা দেখা যায়। ছড়ায় বড় বৌ সেই মর্যাদার অধিকারিণী হইলেও কদাচিৎ ছোট বউয়েরও নাম শুনা যায়। বয়সের ধর্মেই ছোট বউ আদরণীয়, সেইজন্য সে-ই সর্বাপেক্ষা ঈর্ষার পাত্রী।

৮

বড় বউ গো রান্না চড়া।
ছোট বউ গো জলকে যা ॥
জলের ভিতর লেখা জোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা ॥
ফুলে বড় কুঁড়ি।
নটের শাকে বড়ি ॥—বর্ধমান

ইহার মধ্যে একটু রূপকথার আমেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জলের মধ্যে আঁকা বাঁকা চাঁদের রেখা পড়িয়াছে, তাহার উপর চারিদিকে ফুটন্ত ফুলের রাশি, সেই ফুলের অগণিত কুঁড়ি দেখা দিয়াছে, সুতরাং আজি দিনের ঝরা ফুল কাল আবার পূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব চিত্রটি কল্পনাধর্মী, কিন্তু সর্বশেষে নটে শাকের বড়ির আবির্ভাবের ফলে চিত্রটিতে যেন একটু মাটির দাগ লাগিয়া গেল।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে 'ঠাকুর বউ' অর্থাৎ বড় বউয়ের যে একটু প্রশংসার কথা শুনা যাইতেছে, তাহা প্রকৃতই প্রশংসা নহে, ব্যঙ্গ মাত্র—

৯

হাড়ুরি আইএ হাড়ুরি যায়, কালা তুলসীর তলে।
ঠাকুর বৌএ নিকলি চায়, কপালে রতন জ্বলে॥—চট্টগ্রাম

১০

মেয়া ভাই গেছে পাটের নায়,
ও মেয়া ভাই বাড়ী আয়।
তোর বউ গয়না চায়।
পরের তা চাইও না, ফুল্যা ফুল্যা বাইন্দ্য না।—ঢাকা

এখানেও দুই বধূর সুতা কাটিবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতা কাটা ব্যঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই এখানে সম্ভব—

১১

ঝিঁ ঝিঁ ঝিয়লা।
বুড়ির বাড়ীত পেয়লা॥
পেয়লা খাইতাম গেলাম্ রে।
কেঁটা ফুটি মৈলাম্ রে॥
দুআ বউএ সুতা কাটে।—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যেও সম্ভবতঃ ব্যঙ্গের ভাবেই এ'কথা বলা হইয়াছে,—

১২

বাট বৌ হলদি বাট্,
বাটা হলদি মাখো গালে,
চুম খাব বৌ রাত্রি কালে।—হুগলি

ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জ্বালা অন্তরে অন্তরে সহ্য করিয়া বধূ নীরব হইয়াই থাকে, তথাপি বোবারও শত্রু হয়, অন্ততঃ বধূর জীবনে তাহাই দেখা যায়—

১৩

আতা গাছে তোতা পাখী ডালিম গাছে মৌ,
এত ডাকি তবু কথা কয় না কেন বৌ।—২৪ পরগণা

বধূ কেন যে কথা বলে না, এখানে সে কথা প্রকাশ করিয়া দিল—

১৪

'আঁতাগাছে তাঁতা বাঁসা ডালিম গাছে মউ।
কথা কইস্ না কেন বউ॥'
'কথা কইলে গা জ্বলে।
কথা কইব কুন ছলে॥'—ঢাকা

১৫

থাঁদি বিড়ায় বাঁধি চাল্‌তা গাছে মউ।
কৌড় কড়াটা টিপ্যা দিলে জমাদারের বউ।—ঢাকা

১৬

সুভাষিণী ঘুঁটেকুড়ানী চৌকিদারের বৌ,
চৌকিদার ভাত দেয় না করে ঘেউ ঘেউ।—২৪ পরগণা

অনেক সময় দাদার প্রশ্রয় পাইয়াই যে ননদেরা বধূ নির্যাতনে উৎসাহ লাভ করিয়া থাকে, তাহাও পারিবারিক জীবনে লক্ষ্য করা যায়। বধূ যদি স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হয়, তবে হতভাগিনীর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না—

১৭

গরম ভাতে তরতরানি পাখাল ভাতে মউ,
দাদা আইস্‌ কয়্যা তুব ফুটকি লাচা বউ।—মেদিনীপুর

এখানে বউয়ের সঙ্গে মিত্রাক্ষর রচনা করিবার জন্যই মৌ কথাটি আসিয়াছে, নতুবা এই শব্দটির আবির্ভাবের এখানে কোন অর্থ নাই।

যে বউ খাঁদা নাক সে যদি আবার মুখ ঝাম্‌টা দেয়, তবে তাহা কি করিয়া সহ্য করা যায়? এখানে নাক যে খাঁদা, তাহা নাও হইতে পারে, 'যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা' এখানে তাহা হওয়াই সম্ভব—

১৮

দাদা ভাই চাল ভাজা খাই, নয়না মাছের মুড়ো ;
একশ টাকার বউ কিনেছি খ্যাঁদা নাকে চুড়ো।
খাঁদা হোক্, বোঁচা হোক্ তা সইতে পারি,
মুখ ঝাপটা দিলে পরে ঐত জ্বালায় মরি।—২৪ পরগণা

বউটির গায়ের রঙ্ কালো, ভগবৎপ্রদত্ত এই গায়ের রঙটির জন্য সে কোন দিক দিয়াই দায়ী নহে। তথাপি তাহার উপর এ'জন্য যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করা হইল, তাহা জ্বালাময়। ইহা সৎ শাশুড়ীর উক্তি, সুতরাং যাহা আশা করা যায়, তাহাই এখানে হইয়াছে—

১৯

কে বল ধন সোনা তোর বউকে আমার কালো,
নাক চুল কেটে তার পাঠিয়ে দেব চুলো।
হাত কাটবো পা কাটবো, কাটবো দুটো কান,
বুকখানা তার কেটে কেটে করবো খান খান।
নই ত আমি সৎ শাশুড়ী এত কিসের ভয় ?
মাণিক সোনার বউকে আমার খাঁদা বোঁচা কয় !
কালীঘাটের শ্যামাঠাকুরুণ ছেড়ে পীঠস্থান।
আমাদের এই বাড়ীতে হয়েছেন অধিষ্ঠান ॥—২৪ পরগণা

হাঁড়ি ঢুন্ ঢুন্ পাতিলা ঢুন্ ঢুন্ ডেয়া ফেলে চোরে।
কৈলকাতার্তন্ কি বৌ আনলুম্, সদা পরাণ পুড়ে ॥—চট্টগ্রাম

কলিকাতার বধূর আচরণ যে মর্মদাহী হইবে, তাহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। নিম্নোদ্ধৃত ধাঁধাটি অনুসরণ করিয়া উক্ত ছড়াটি রচিত হইয়াছে, ইহা হইতে দেখা যাইবে, ধাঁধাও ছড়ার আঙ্গিকেই গঠিত—

থাল ঝন্ ঝন্ থাল কন্ কন্ থাল নিল চোরে,
বৃন্দাবনে আগুন লাগ্‌ল কে নিভাইতে পারে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটিতে বধূর রূপ ও গুণের উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে—

২১

শীতকালে শীত কাঁটা গ্রীষ্মকালে ঘামাচি,
কোন্.কালে ছিলে বউ তুমি রূপসী।—২৪ পরগণা

২২

পুবেতে মেঘ লেগেছে পশ্চিমেতে বান এসেছে
মাগুর মাছে ডিম পেড়েছে।
বৌ খাবে তিন তপ্ত মাগুর মাছের ঝোল।
শাশুড়ী খাবে ভিজে পান্ত তাতে টাঙ্গা দই।
বৌ শুবে খাট পালঙে তাতে পানের বাটা;
শাশুড়ী শুবে ছেঁড়া তানায়ে তাতে ছেঁড়া কাঁথা।
ঘর নিকাতে বল্‌লে বৌ করে আড়া মোড়া,
জল আনতে বললে বৌ চলে টাউন ঘোড়া;
পুঁঠি মাছ রাঁধতে বল্‌লে ঝোল করে এক খুড়া।—মুর্শিদাবাদ

বধূ মানুষই ত, তবু সে যদি কোন কারণে রাগ করে, তাহাও ব্যঙ্গের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—

২৩

কাঠের মালা চুরি চুরি চোঁচা ওঠাচ্ছে,
বউ রাগে পুষ্‌বে বিড়াল দেখি ইঁদুর কি করে?—২৪ পরগণা

বধূর প্রতি কার্যে দোষ ধরাই পরিবারের সকলের কাজ; এমন কি, শাস্তি দিতে গিয়া যদি বধূর নাকও কাটিয়া ফেলা হয়, তবে তাহা হইতে রক্ত পড়াও বধূরই অপরাধ হইবে—

২৪

মর্দিনী রে মর্দিনী।
খই ভাঙি দে খাম্॥
খইঅত কোয়া ধান্।
চুলত্ ধরি আন্॥

চুল কেয়া কালা।
নাক কাটি পেলা॥
নাকত্‌ কোয়া লৌ।
ফুলমণির বৌ॥—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি অত্যন্ত করুণ। জমি বন্ধক দিয়া ছেলের বিবাহ করাইয়া বৌ ঘরে আনা হইয়াছিল, বন্ধকের জমি বন্ধকই পড়িয়া রহিয়াছে, সংসার শূন্য করিয়া বধূটি জীবনের জ্বালা জুড়াইয়াছে। সেই বেদনায় ছড়াটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যাঙ্গাত্মক রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে, কারণ, বধূর জীবন যদিও নিতান্ত করুণ, তথাপি দেখা যায়, করুণ-রসাত্মক বধূবিষয়ক ছড়া বেশি নাই।

২৫

অতি সাধের বিয়ে,
জমি বন্দক দিয়ে।
বউ মরণকালে
কিছু বলে গেল না।
বউর হাতে ছিল চুড়ি,
ভেজে দিত মুড়ি।
মুড়ি তো আর
খাওয়াই হল না।
বউর পায়ে ছিল মল
ধুয়ে খেতাম জল।
জল বিনে তো প্রাণ বাঁচে না।
বউর জেঠি খুড়ি এসে,
বউর চারি পাশে ঘুরে বসে,
বলে, ভেব না আর সোনার জামাই
ফিরে যদি থাকত আমার মেয়ে
ঘুরিয়ে তোমায় দিতাম বিয়ে।—২৪ পরগণা

ব্যঙ্গভাবে বধূকে 'সদুপদেশ' দেওয়া হইয়াছে—

২৬

কানে দুল দুল কানে সোনা,
ও রে বউ তুই ভাত খা না!
ভাত খেয়ে তুই তামাক খা না,
তামাক খেয়ে পান্তা খা না,
পান্তা খেয়ে ডুবে মর্ না।—২৪ পরগণা

শাশুড়ীর এই ক্রুদ্ধমূর্তির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া অসহায়া বালিকা প্রার্থনা জানায়—

২৭

রাগ করো না শাশুড়ী গো আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও, তবে দাঁড়াই কোথা যেয়ে। —ঐ

কিন্তু এই করুণ আবেদন পাষাণ-হৃদয়া শাশুড়ীকে বিচলিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। পিতৃগৃহের স্নেহশালিনী কন্যা স্বামীর গৃহে আসিয়া শাশুড়ীর নিকট হইতেই ভবিষ্যতে নিজে শাশুড়ী হইবার শিক্ষা লাভ করে ; ইহাই পরিবারের নিয়ম।

স্বামীর নিকট হইতেও বধূ কখনও কখনও আঘাত পায়, এই আঘাতের জ্বালা সে সহ্য করিতে পারে না—

২৮

বাবলা কুঁড়ি সূক্ষ্ম,
আমার ভাতার মুখ্যু।
চোখের কাছে ঢেমনি রেখে
আমায় দিচ্ছে দুঃখ্যু।
মেরেছে খেজুরের ছড়ি
ফুল খেয়ে ফুল বাসনা করি।
আজ কেন প্রাণ আমার কাছে,
শিমুল ফুল গো শুকিয়ে গেছে,
বাস কর না শিমুল গাছে।
ফিরে এসো প্রাণ প্রেমের কাছে।—ঐ

বধূ সম্পর্কে যত কিছু অসঙ্গত ও অসম্ভব কল্পনা মনে স্থান দিয়া তাহাকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়া থাকে—

২৯

এক ঘরে বৌড়ি ছিল কপাটের আড়ে,
লাফ মেরে পড়ে' গেল ভাসুরের ঘাড়ে,
এক ঘরে বৌড়ি ছিল হুলো নামে কুলো,
গোল কাড়ার সময় হ'ল চোখে পড়ে ধুলো।—২৪ পরগণা

এত যন্ত্রণার মধ্যে বাস করিয়াও বধূ চিরন্তন নারী চরিত্রের যে ধর্ম, তাহা বিসর্জন দিতে পারে না, সে সুযোগ পাইলেই গহনার জন্য আব্দার করে; তাহাও ব্যঙ্গের বিষয় হইয়া থাকে—

৩০

উচ্ছা পাতা
তারে গাঁথা
ধারে শুয়ো না,
চাঁদ বদনি ঘাম লেগেছে
ধারে শুয়ো না।
বাতাস করো না।
সকল বৌয়ের হাসিখুসি
মেজ বৌয়ের মন ভারি ;
চল মেজ বৌ স্যাকরা বাড়ী
গড়িয়ে দিব কান মাকড়ি।

* * *

উঠেছে কাঁচের চুড়ি
দর কর না খুড়ি।
দরের দাম পাঁচ সিকা
কোথা পাব তোর বরের দেখা।
আর কিছু চেও না,
গড়িয়ে দেব চিক দানা—

৩১

বাব্‌লা পাতা হারে গাঁথা বিনি সুতোর হার,
আয়লো মেজ বৌ স্যাকরা বাড়ি,
গড়িয়ে দেব তোর পাশি মাকড়ি।—হুগলি

৩২

হেই বাড়ীর রাইঙ্গা ছেঁড়ি রান্ধ্‌ত বাড়্‌ত পারে,
সোয়ামীর পাত' ভাত দিয়া নথের লাগ্যা ঝুরে।
দেখ্‌খুয়াইন চাই গো বাইন্যা ভাই কেমন দুঃখ লাগে,
এক টেহার নথ দিছি তেও যে বউ কান্দে।—মৈমনসিং

বধূকে যত সোহাগ দিয়াই রাখ না কেন, সে কখনও শাশুড়ী কিংবা ননদীর তুল্য 'গুণবতী' হইতে পারিবে না, ইহাই শাশুড়ী ননদীর অভিযোগ—

৩৩

বধূ তেলাকোচার বনে
বধূ একলা রতনে
জ্বালায় কেনে;
সাধের ঢেমনী মুখে সাগরি দুঃখু পেলে রবে না;
যতই ঢেমনী রাখ তুমি আমার তুল্য হবে না।—২৪ পরগণা

বধূ-জীবনের অসহায় অবস্থার বর্ণনাটি এখানে কত করুণ—

৩৪

মশার জ্বালায় বাঁচি না লো, মশা ভন্‌ ভন্‌ করে,
মশার জ্বালায় গেলাম বনে বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে কুমীর এল ছুটে,
কুমীরের ভয়ে গেলাম বাড়ী দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে ননদে মন্দ বলে,
ননদের ভয়ে রাঁধ্‌তে গেলাম শাশুড়ী উঠে জ্ব'লে।
রাগ করো না শাশুড়ী গো আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও তবে দাঁড়াই কোথা যেয়ে।—যোগীন্দ্র

শাশুড়ী ম'লো সকালে

বধূ সম্পর্কিত ছড়ার সংখ্যার দিক দিয়া যেমন প্রাচুর্য দেখা যায়, শাশুড়ী চরিত্রের গুরুত্বের তুলনায় তাহার সম্পর্কিত ছড়ার সংখ্যা সেই পরিমাণে বিশেষ কিছুই নহে। শাশুড়ীর পরিবারে বাস করিয়া শাশুড়ীর গুণপনা বিশ্লেষণ করিয়া বধূরা স্বভাবতঃই ছড়া রচনা করিতে এবং তাহাদের আবৃত্তি করিতে কোন সুযোগ পায় না। সেইজন্য শাশুড়ী সম্পর্কিত ছড়াগুলি বধূর রচনা হইতে পারে না, বরং তাহার পরিবর্তে অন্য কর্তৃকই গতানুগতিকভাবে রচিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র এই কারণেই শাশুড়ী চরিত্রের বাস্তব দিকটিও ছড়ার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলিই তাহার প্রমাণ।

চর্যাপদের মধ্যে শাশুড়ী সম্পর্কিত কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ আছে। যদিও ইহারা 'আলো-আঁধারি' সন্ধ্যাভাষায় যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের কথাই রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তথাপি শাশুড়ী বধূর চিত্রটিই ইহাদের অবলম্বন হইয়াছে। এই পদগুলি প্রথম উল্লেখ করা যায়,—

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥

অর্থাৎ শাশুড়ী নিদ্রা গেল, বধূ জাগিয়া রহিল; নেকড়া চুরে লইয়া গেল, কোথায় গিয়া খুঁজিবে?

আরও একটি চর্যাপদে শাশুড়ী, ননদ ও শালীর একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়,

মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী,
মাঅ মারিঅ কাহ্ন ভইঅ কবালী।

অর্থাৎ শাশুড়ী, ননন্দ, শালী এবং মাকে মারিয়া কাহ্ন কপালী হইল।

কিন্তু বাংলার শাশুড়ী সম্পর্কিত ছড়াগুলির মধ্যে গুহ্য কথা ত কিছু নাই-ই, এমন কি, বাস্তব জীবন-পরিচয়ও ইহাদের মধ্য দিয়া সর্বত্র প্রকাশ পায় নাই।

তবে নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদ-ধর্মী ছড়াটির মধ্য দিয়া শাশুড়ী সম্পর্কিত বাংলার বধূর মনোভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

শাশুড়ী ম'ল সকালে,
খেয়ে দেখে যদি বেলা থাকে,
তবে কাঁদব আমি বিকালে।

১

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো'সে,
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোটো'সে।
ও বেগুন কুটো না বীচ রেখেছে,
ও ঘরেতে যেয়ো না বঁধু এয়েছে।
বঁধুর পান খেয়ো না ঝগড়া করেছে।
দাদাকে দেখে কদমপানা ফুটে উঠেছে ॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

ইহাতে কেবলমাত্র খেলার উল্লাস, শাশুড়ীর প্রকৃত পরিচয়ের ছায়াটুকু পর্যন্ত নাই।

২

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো'সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছেন আলু কোটো'সে ॥
কী করে কুটব, চাকা চাকা ক'রে।
ও দুয়োরে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে।—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

এখানে বৌটির শাশুড়ীর আদেশ পালন করিবার পরিবর্তে পলাইয়া যাইবার কথা শুনিতে পাইতেছি—

৩

পানকৌটি পানকৌটি আড়ায় উঠ না,
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কুট না,
বেগুন হ'ল থালা থালা,
বৌ পালাল দুপুরবেলা।—২৪ পরগণা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে একটু বাস্তব জীবনবোধের বিকাশ দেখা যায়—

৪

শাউড় নাই ননদ নাই কারে করমু ডর,
আগে বাড়্মু ভিজ্যা ভাত পাছে মুছ্মু ঘর।—পাবনা

শাশুড়ী ননদই সংসারে বধূর অশান্তির কারণ; সে কথা একদিন ব্যাধ কালকেতুও বুঝিত, তাই বলিয়াছিল—

শাশুড়ী ননদী নাই নাই তোর সতা,
কার সনে দ্বন্দ্ব ক'রে চক্ষু কৈলি রাতা।

৫

শাউড়ী এমন দূতের দূত,
কাঠি মেপে থোয় দুধ ;
বউ এমন দূতের দূত,
জল মিশিয়ে খায় দুধ।—২৪ পরগণা

যেমন শাশুড়ী, তাহার তেমনই বধূ; অবশ্য শাশুড়ীর অনুদারতার জন্যই বধূর চরিত্রও তাহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। শাশুড়ী কড়াতে দুধ ফুটাইয়া কাঠি দিয়া মাপিয়া যান, বধূ তাহার কিছু অংশ খাইয়া জল দিয়া তাহা পূরণ করিয়া রাখে। দুগ্ধের পরিমাণের উপরই শাশুড়ীর লক্ষ্য, গুণাগুণের উপর লক্ষ্য নাই। হৃদয়হীনা শাশুড়ীকে বধূও সেইজন্য প্রতারিত করিবার সুযোগ পায়।

আবার কোথাও তেমন বধূর হাতে পড়িলে শাশুড়ীকে এই বলিয়া বিলাপও করিতে হয়—

৬

কত পোড়া পুড়লা গো পুইড়া করলা ছাই,
কার কাছে করবাম নালিশ জাগা ত আর নাই।
সুখ কর গো পুতের বউ সুখ তোমারে দিছে,
এই সুখ আছিল আমার ডাকাইতে লইয়া গেছে।
এই কপালে আছিল আমার দুধ ভরা থাল,
এই কপালে আছিল আমার ঠোকরে ভাঙ্‌তা গাল।—মৈমনসিং

নিম্নোদ্ধৃত একটি খেলার ছড়ায় শাশুড়ীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, ইহার আর কোন বিশেষত্ব নাই।

৭

উবুর ডুবুর পান মৌরি
হিচকা লাখের ঘর শাউড়ি
শালিরে গুয়া ;
কাকার পেটে গুয়া,
বলে দেরে ডেঙ্গর কুয়া
গাছে না পেটে ?—২৪ পরগণা

সমগ্র পরিবারের বিরুদ্ধে বধূর পুঞ্জিত বিদ্বেষের ভাবটি এই ছড়ায় আছে—

৮

আয় পবন বাতাস আয় জাউ জুড়িয়ে যাউ,
কর্ত্তা গেছে মাটি কাটতে কোমরে লেগে যাউ।
আয় পবন বাতাস আয় জাউ জুড়িয়ে যাউ,
দেওর গেছে নৌকায় দাঁড় ছিঁড়ে পড়ে যাউ।
আয়রে পবন বাতাস আয় জাউ জুড়িয়ে যাউ,
ননদ গেছে মাছ ধরতে কুমীরে খেয়ে যাউ;
আয়রে পবন বাতাস আয় জাউ জুড়িয়ে যাউ।
শাশুড়ী গেছে পড়শি পাড়া ঝগড়া লেগে যাউ,
আয়রে পবন বাতাস আয় জাউ জুড়িয়ে যাউ ॥—২৪ পরগণা

কখনও কখনও শাশুড়ীকেও পলাইয়া বাঁচিতে হয়—

৯

ইন্নি ফুল বিন্নি ফুল আর ত ফুল কেশে,
বেড়া ভেঙ্গে গিন্নী পালাল বউ মরল হেসে।—রাজসাহী

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ার ভিতর দিয়া বউ আনিতে যাইবার চিত্রটি বড় মনোরম—

১০

খালে জল নাইরে—আমরা বৌ আনতে যাই !
বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ী,
তারা কাপড় চোপড় কাইর‍্যা নিল মারল জুতার বাড়ি।
খালে জল নাইরে—
বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ী,
তারা ফ্যানে ফ্যানে ভাত দিল (আর) আমসী ধোয়া পানি।
খালে জল নাইরে—
বৌ বাহির কর, বৌ বাহির কর ;
দেখি, বৌয়ের বদলে খোকনের শাশুড়ী বুড়ী,
বেসাতি বাহির কর ; বেসাতি বাহির কর,
দেখি, তিনটা ক্ষুদের হাঁড়ি।
খালে জল নাইরে— ।—বরিশাল

গুণের ভাসুর

বাংলার পারিবারিক জীবনে ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর যে সম্পর্ক, তাহাকে ইংরাজিতে বলা হয়, avoidance-এর সম্পর্ক, অর্থাৎ সর্ববিষয়ে ভাসুরকে পরিহার করিয়া যাওয়াই ভ্রাতৃবধূর সামাজিক এবং পারিবারিক কর্তব্য। Avoidance শব্দটির অর্থ বাংলায় এক কথায় প্রকাশ করা দুরূহ, তথাপি ইহার দ্বারা যে ভাবটি বুঝায়, তাহা এই যে, ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ কথা কহিবে না, তাহাকে মুখ দেখাইবে না, তাহার নাম লইবে না। এক পরিবারে বাস করা সত্ত্বেও যে ইহা কি ভাবে সম্ভব, বাংলার পারিবারিক জীবনই শুধু মাত্র যে তাহার প্রমাণ, তাহা নহে—দেশ দেশান্তরের আদিম ও বহু অনগ্রসর সমাজের মধ্যে তাহার নির্দশন পাওয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার এবং যৌথ পরিবার ধ্বংস হইবার ফলে বাংলার সমাজ হইতে এই ভাবটি ক্রমাগতই দূরীভূত হইয়া যাইতেছে, তথাপি পল্লী অঞ্চলের সমাজ জীবনে এখনও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাসুরের সঙ্গে কেন যে পরিহারের (avoidance) সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, তাহা সুগভীর সমাজতত্ত্বগত তাৎপর্যমূলক; ইহা বাংলাদেশেরই একটি স্বাধীন সামাজিক রীতি নহে। ইহার সুগভীর তাৎপর্য এখানে বিশ্লেষণের অবকাশ নাই, অনুসন্ধিৎসু পাঠক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদিতে বিষয়টি অনুসরণ করিয়া এই বিষয়ে কৌতূহল দূর করিতে পারেন।

ভাসুর বিষয়ক ছড়ার সংখ্যাও খুব বেশি নাই, ইহাদের মধ্য দিয়া ভাসুরের প্রতি যে কোন ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, বরং তাহার পরিহার (avoidance) করিবার বিষয়টি সর্বদাই ব্যাঙ্গাত্মক আক্রমণের বিষয় হইয়াছে, ইহাতে এই রীতিটির বিরুদ্ধে বধূর বিদ্রোহের ভাবই প্রচ্ছন্ন দেখা যায়—

আসুদ গাছে টিকটিকিটি লঙ্কা গাছে ছাই ;
সরে যাও না গো গুণের ভাসুর চাল ধুতে যাই
পড়ে গেলাম ভাসুর হড়কানে,
তুলে ধর ভাসুর আমায় সাবধানে।

ফুটিক বিচা ধান ভানে
কচি ছেলে কি জানে
পাক পাকাটি ঝিঝির কাঠি
লাগল বঁধুর পায়
শুয়ে শুয়ে স্বপন দেখে
পাখার বাতাস খায়।—২৪ পরগণা

২

আলুক মালুক শালুক রে বন শালুকের পাতা,
হরিণ বলে কেটে ফেল্লাম ছোট ঠাকুরের মাথা।
ছোট ঠাকুরের মাথা জোড়া রঘুনাথকে সাজে।
রঘুনাথের মরণ হল বেলতলার ঘাটে
গাই তুলে গাম্‌লার জল বাছুর তুলে ফেনা,
প্রজাপতি নাইতে যাবে ঢামুক কলের বাজনা।

ছোট ঠাকুর অর্থে ছোট ভাসুর অর্থাৎ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠকে বুঝাইতেছে। ছোট ঠাকুরের মাথা কাটিয়া ফেলিবার মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্ন কি মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতে পারিবেন।

৩

আড়ে বাড়ে লম্বে বাড়ে,
সব ঠাকুরকে গড়টি গড়টি করে।
ঘরে আছে মেটা,
সব ঠাকুরকে গড়টি লও বেঁটা।
আড়ে বাড়ে লম্বে বাড়ে
বিলে বাড়ে পুঁই
ঘরে বাড়ে শুঁই।—২৪ পরগণা

ভাসুর আসিয়া ভ্রাতৃবধূকে ঠাট্টা করিয়াছে, ইহাতে বধূর মনে অপরাধ বোধের সৃষ্টি হইয়াছে, সে আত্মঘাতিনী হইতে চাহে—

৪.

আল্‌তা পরে' গরব করে'
যাচ্ছে মাগো জলের তরে,
কলসী না ডুবাতে ;
ভাসুর এসে ঠাট্টা করে ;
কেউ কিছু বল্ল না,
নিয়ায় দড়ি বুকে মারি
এ জীবন আর রাখব না।—২৪ পরগণা

বধূ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তথাপি ভাসুর তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন না দেখিয়া বধূর অভিমান হইয়াছে, তিনি স্বামিগৃহ ত্যাগ করিবেন, –

৫

আম্বদ গাছে টিকটিকিটি লঙ্কা গাছে ছাই,
সরে যাওগো গুণের ভাসুর চাল ধুতে যাই।
পড়ে গেলাম ভাসুর হড়কানে,
তুলে ধরগো ভাসুর সাবধানে !
দেখলে ভাসুর তুললে না :
দুয়ারে বসে' সিঁদুর পরি
গোয়ালে বসে কাঁদে না,
তোমার ঘর আর করব না ॥—হুগলি

৬

শুশনী শাক তুলতে গেনু,
পা পিছলে পড়ে গেনু।
দেখলে ভাসুর তুলালে নাকো,
তোর ভেয়ের ঘর করনু নাকো।
ছ্যাক দোম্, ছ্যাক দোম্
ক্যাঁথা পেতে দে মারি ঘুম। —মুর্শিদাবাদ

এই পা পিছলানো যে ইচ্ছাকৃত পিছলান, তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় ভাসুর বধূকে সাহায্য করিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানে ভাসুরের চরিত্র-শক্তির দৃঢ়তা প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

নিম্নে যেমন ভাসুর, তাহার তেমনই একটি ভাদ্রবধূর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভাসুরের প্রশ্নের উত্তরে অবগুণ্ঠনবতী ভাদ্রবধূ তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে,—

৭

ভাসুর। ছোট ভাইয়ের বউ গো তুমি নামটি তোমার হীরা,
চৈদ্দ সিকার ঢাকাই শাড়ী কেমনে গেল চিরা।
বউ। কেচা বাঁশের বেড়া ছিল ঘন ঘন গিরা;
ভাসুর দেইখ্যা ঘোম্‌টা দিতে আঁচল গেছে চিরা।—চট্টগ্রাম

গুণের ভাসুরেরা যে ভাদ্রবধূর প্রতিও কঠোর এবং গর্হিত বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহার মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয় আছে; পরিহারের (avoidance) মধ্য দিয়াও যে কামনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহারও অভিব্যক্তি দেখা যায়—

৮

টিপির্ টিপির্ জল পড়ে ফুলবাগানে কে ?
আমি বটি ভাসুরঝি খুড়ীকে ডেকে দে।
খুড়ী খেলেন পান খিলিটি আমি মল্যাম লাজে,
কি ফুল পাতালি খুড়ী দরিয়ার মাঝে।
হাতে পান বেঁতে পান কমরে কাটারী,
ভাসুর হয়ে গাল্ দিলেক্ তেলেঙ্গা ভাতারী।—সাঁওতাল পরগণা

জ্যেষ্ঠ ভাসুরের আদেশে যে কনিষ্ঠ ভাসুরের বিবাহ হইতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে, বিবাহ বিষয়ে দেবরকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত বলিয়া অনুমান নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে করিবার বধূর যে কি কারণ, তাহা বুঝা যাইতেছে না—

৯

হলুদিয়া পক্ষী, হলুদিয়া পক্ষী বাটনা বাট কেয়া,
বট ঠাকুরে কইয়া গেছে ছোট ঠাকুরের বিয়া।
আমতলা ঝাপুর ঝুপুর কলাতলা বিয়া
সুন্দরীরে নিতে আইছে চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া,
একটা আনছে সানাইয়া কথা কয় সানাইয়া।—ঢাকা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভাসুরের এই ব্যাপারে আর কোন সক্রিয় অংশ নাই। বড় ভাসুর কেবল মাত্র ছোট ভাসুরের বিবাহের আদেশটি দিয়াই ছুটি লইয়াছেন।

ভাসুরের বিবাহের ব্যাপারে উপরে হলুদীয়া পক্ষীর কথা শুনিলাম, এইবার তাঁহার খাইবার ব্যাপারে পানকৌড়ীর কথা শুনিতেছি—

১০

পানকৌটি পানকৌটি বু গো,
খাটে ওঠ না গো।
তোমার ভাসুর ভাত খাবে,
বেগুন কোটো না গো।
বেগুন হ'ল ঝালাপালা,
বৌ গেল ঠিক দুপুর বেলা। —সুন্দরবন, ২৪ পরগণা

অন্যান্য

অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে যে সকল ছড়াগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এমন কি, পিতা যিনি একদিকে স্নেহশীল আর একদিক দিয়া কর্তব্যপরায়ণ তাহার সম্পর্কে বিশেষ কোন ছড়াই শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, পিতা শ্রদ্ধেয়, উপহাস্য নহে। ছড়ার মধ্যে লঘু ভাবটিই বেশি প্রকাশ পায় বলিয়া পিতার সম্পর্কে কোন ছড়া রচিত হইতে পারে নাই। কেবল কন্যাবিদায়ের ছড়াগুলিতে সন্তানের অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিতে পাইয়াছি। পিতার সম্পর্কে একটি ছড়া এই প্রকার—

১

বাছার বাছা পো।
নিমতলাতে শো॥
নিম পড়লো বুকে।
হাজরা এলো নিতে।
বাপ দেয় না যেতে।
বাপের হাঁসা ঘোড়া।
মায়ের ছাপন দোলা।
বোনের স্বাপন পেটারি.
ভেয়ের সোনা ধড়া॥
বাপ যাবেন গৌড়।
আনবে সোনার ময়ুর॥
দেবে সোনার বিয়ে।
আলপোনাতে চাল নাই,
নাচ্‌বো ধেয়ে ধেয়ে॥—বর্ধমান

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যেও পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের উল্লেখ আছে; কিন্তু ছড়ার বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—

বটপাতা শিরিষ পাতা যুদ্ধু গেছে,
বাপ আমার গরীব লোক পাল্কী সেজেছে।
ভাই আমার বেহালা বাজাচ্ছে।
মা আমার ঠাকুর মা কাঁদতে বসেছে
ভাজ আমার বেড়াল চোখো উঠান ঝেটোচ্ছে।

—সুন্দরবন, ২৪ পরগণা

শ্যালক সম্পর্কে এই ছড়াটি পূর্বোদ্ধৃত বধূ সম্পর্কিত একটি ছড়ারই সামান্য পরিবর্তিত রূপমাত্র—

৩

চুলো চুলো চুলো মালা,
রাম জীবনার হালা (শালা)।
চুরা ছকে বালা।
চুরাত্ কেয়া ধান ?
চুলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা ?
নাক কাটি পেলা।
নাকত্ কেয়া লৌ ?
কাকা মণির বৌ ॥—চট্টগ্রাম

ঠাকুরদাদা বা পিতামহ সম্পর্কে ছড়ার অবকাশ ছিল , কারণ, তাহার সঙ্গে নাতী নাৎনীদিগের পরিহাস রসিকতার একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু তথাপি উভয়ের বয়সের ব্যবধান এই বিষয়ক ছড়া রচনার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে একটি উল্লেখ করা যায়—

৪

দাদামহাশয় করি নিবেদন,
যেও না বৃন্দাবন।
পথে যেতে যেতে
লাঠি কেড়ে নিবে,
টাকেতে মারিবে চাটি।—২৪ পরগণা

ব্রতের ছড়ার মধ্যে সতীন বিদ্বেষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ কিংবা খেলার ছড়ার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না ; কারণ, সতীনের চিন্তা খেলার জীবন পর্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিতে পারে না।

৫

ধর্ ধর্ ধর্ পোলা নে।
ফুলমালারে কোলে নে।
দৌড়াই দেম্ সতীনর বিলাইরে॥
কালা বিলাই ধলা বিলাই কন্ সতীনে পালে,
রাত হৈলে সতীনর বিলাই দুয়ার ধরি ঠেলে।
বিলাই মারিবার আশে,
মুই গেলাম্ দুয়ারর কাছে,
মান্ দি থাকি, ঝাপ দি ধৈরলাম
ও সতীনর বিলাইরে॥—চট্টগ্রাম

স্বামী সম্পর্কিত কোন ছড়া প্রায় নাই বলিলেই চলে ; কারণ, স্বামীর সঙ্গে পত্নীর যে সম্পর্ক, তাহা যেমন প্রকাশ্য নহে, তেমনই সেই বিষয় লইয়া রসিকতা করিবারও কিছু থাকে না। তথাপি পতি-বন্দনাসূচক একটি ছড়া পাওয়া যাইতেছে—

৬

এখনকার যে অলঙ্কার।
চরণের উপর চমৎকার।
নাম পায়েতে গুজরী পাতা।
উপর পায়েতে কলস্ কাটা।
কলস্ না থাক্‌লে বল্‌তে বা কি।
এত অলঙ্কার দিয়েছেন পতি।
দানা দানা কাড়লী
মরদানা, তেখরী, পঁহুচী।
গলায় সাজ কতকগুলা।
চিক্, চৌদানী, মুড়কীমালা।

মাথার সাজ কতকগুলা।
স্বর্ণ সিঁথি, কলাটে পেড়া।
নাকের সাজ কতকগুলা।
ফুল ঝুমকো পিপলতা।
এখনকার যে মত উঠেছে।
বিবিয়ানা ঝুমকো দেওয়া
স্বর্ণ সিঁথে এত আভরণ দিয়েছেন পতি।—ঢাকা

কাকা সম্পর্কেও কোন ছড়া নাই বলিলেই চলে ; কারণ, তিনিও পিতৃস্তরের অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহার সম্পর্কে দুই একটি মাত্র ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়—

৭

একখানি কঞ্চি দুখানি কঞ্চি কঞ্চি বড় পাকা
কোকিল মণি ঘর যাবে গো রাখ্‌তে যাবে কাকা।
কাকার গলয় তুলসী মালা ব্যাঙে বাজায় বাঁশী ;
তার সাথে চলেছে গো কনের ঘরের মাসি।—২৪ পরগণা

পারিবারিক জীবনের শ্বশুর সম্পর্কেও দুই একটি মাত্র ছড়ারই সন্ধান পাওয়া যায়, তবে ছেলেভুলানো ছড়ায় খোকার শ্বশুর বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বাস্তব জগতের শ্বশুর নহে বলিয়াই তাহাতে তাহার সম্পর্কে অনেক ছড়া আছে—

৮

বঁট্টো হট্টো ধান ভানে মরিচ গুঁড়ো দিয়ে,
ঐ আসছে খোকার শ্বশুর দুখান পিঠে নিয়ে।
এখান ঘাটে এখান হাটে ঘাট মউ মউ করে।
সোনার টাকা গড়িয়ে দেব
কে গড়াতে পারে ?—বীরভূম।

ওগো খোকার বাপ
একি ফুলের গাছ ?

পাকা পাকথুড়া মেয়ে।
পাকুড় ফুলের গাছ,
চিকনী শালের হাপুরী,
কর্ত্তা গেছে কাছারী।
দুয়ারে বসে' গোমস্তা
দেখ্না ছুঁড়ির অবস্থা।—২৪ পরগণা

দাদার সম্পর্কেও ছড়ার সংখ্যা অল্পই—

১০

মান্কা বলে সান্কা দাদা!
ভেসে যায় রে তোর খড়ের গাদা।
তুই মোর বড় দাদা আমি তোর ঠাকুর দাদা,
শুনে যে হাসবে সে আস্ত গাধা।

ভাইয়ের বিষয়ে দুই একটিই ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

১১

ভাইরে কানাই গাছে বসে হনু,
মা গেছে ধান ভানতে এসে দেবে ননু।—২৪ পরগণা

বাণিজ্যের উপরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একদিন নির্ভর করিত। সেইজন্য এ দেশে রাজার ঐশ্বর্যের তুলনায় সওদাগরের ঐশ্বর্যই অধিক এবং স্থায়ী ছিল। সুতরাং মর্যাদার দিক দিয়া সওদাগরের কন্যা যে স্থান লাভ করিতেন, রাজার ঝি তাহা পাইতেন না। ছড়ায় তাহার কিছু পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। এমনি কি, রন্ধন কার্যেও তাহাদের পটুতা সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল-

১২

আমি সওদাগরের ঝি,
আমি কি অমনি রেঁধেছি।
বাড়ীর বেগুন, কাঁচকলা আর পটল ভেজেছি;
চালে আছে চাল কুমড়ো, সিকেয় আছে ঘি,
আমি সওদাগরের ঝি!
আমি কি অমনি রেঁধেছি?—বাঁকুড়া

১৩

চালে আছে চাল কুমড়া শিকেয় আছে ঘি,
ভাল ক'রে রাঁধ ওগো সওদাগরের ঝি।—২৪ পরগণা

১৪

আমি কি আর মন্দ রেঁধেছি
কথামত সর্বত করেছি।
বাড়ীর বেগুন কাঁচ কলাটি.
বেশী করে পটল ভেজেছি।
আমি সওদাগরের ঝি।—মেদিনীপুর

সওদাগরের ঝি যে কালক্রমে এখানে ময়রা ঠাকুর ঝি হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না—

১৫

এক নৌকা সরু চাল এক নৌকা ঘি,
ভাল ক'রে রান্না কর ময়রা ঠাকুর ঝি!
আমি কি ভাল রাঁধি না, মন্দ রেঁধেছি?
বাড়ীর বেগুন কাঁচ কলাটি পটল ভেজেছি।

—পাবনা-রাজসাহী

সাত ভাইয়ের বোন পরম ভাগ্যবতী বলিয়া এ'দেশের সমাজ বিবেচনা করিত; ব্রতের ছড়ায় আমরা শুনিতে পাইব, প্রত্যেক মেয়েই সাত ভাইয়ের বোন হইতে চাহে, পিতৃগৃহে ইহা অপেক্ষা সমৃদ্ধির আর কিছুই নাই। কিন্তু সাত ভাই যে যে সৌভাগ্যেরই সূচনা করুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গেই সাত ভাইয়ের সাত ভাজ আসিয়া তাহার দুর্ভাগ্য চরমে পৌছাইয়া দিতে বিলম্ব করে না, সেই বেদনা ভগিনীর মনে মর্মান্তিক হইয়া উঠে—

১৬

ঢুলো ঢুলো ডোমনার পোলা,
সাত ভাইএর বৈন চন্দ্রকলা।
বাপ মরিল তারা পাড়িতে,
মা মরিল জোন পাড়িতে।

সাত ভাই মদায় গেছে,
সাত ভাইজে বেচি খাইছে ॥—চট্টগ্রাম

১৭

ধনী ধনী ধনী, ধনীই বলা।
সাত ভাইএর বৈন্ চন্দ্রকলা ॥
গাছর আগার উপর ঢুলের্ যে
কুরগাইল্যার বলা ॥—চট্টগ্রাম

অন্যত্রও আমরা শুনিতে পাই—

১৮

সাত ভাই চম্পা জাগরে,
কেন বোন পারুল ডাকরে।

পূর্বোদ্ধৃত ছড়ায় শুনিয়াছি, সাত ভাইয়ের বোনের নাম চন্দ্রকলা, এখানে তাহার নাম পারুল।

স্বাধীনভাবে মাসি সম্পর্কে সামান্য কয়টি ছড়াই শুনিতে পাওয়া যায়, নতুবা মা এবং পিসির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহার সম্পর্কিত বহু ছড়া আছে; কিছু কিছু পূর্বেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৯

মাউসি টক টাউসি কলাবনে ঘর।
একটা কলা দেনা মাউসি জামাই ভাতার কর ॥—২৪ পরগণা

মাসিও মামারই মত বোনের ছেলেমেয়েকে নিতান্ত প্রশ্রয় দিয়া থাকেন বলিয়া, তাহার সঙ্গে তাহাদের যথার্থ মায়ের সম্পর্কটি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বরং জামাইর মত কতকটা হাস্য-পরিহাসের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, এখানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

২০

মাসিগো মাসি পায় যে হাসি,
যখন তুমি গান করো গো
পেয়ারা তলায় মেশো তখন সঙ্ সাজে গো
গলায় বেঁধে বাঁশী
মাসী গো মাসি।—২৪ পরগণা

মামাবাড়ীর মত মাসির বাড়ী সম্পর্কেও শোনা যায়—

২১

তাই তাই তাই
মাসির বাড়ী যাই,
মাসির বাড়ী ভারি মজা
কিল চড় নাই।—ঐ

মাসির নিকট বোনঝির শাসন নাই, কিন্তু আব্দারের অন্ত নাই—

২২

মাসিমা মাথা বেঁধে দে,
মাসিমা মাথা বেঁধে দে।
কাল আসবে তোমার জামাই
আমায় নে যাবে।
মাথা বেঁধে দে, মাসিমা মাথা বেঁধে দে!
ফিরিঙ্গির চুটকি
বোতল ভরা তেল থাকতে, চুল হ'ল মাটি!
কাল আসবে তোর সখের জামাই আমায় নে যাবে!
মাসিমা মাথা বেঁধে দে মাসিমা মাথা বেঁধে দে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাকৃত জগৎ

প্রাকৃত জগতের বিভিন্ন জীব-জন্তু অবলম্বন করিয়া যে সকল ছড়া রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করা যায়। যদিও এ'কথা সত্য, ছড়া অপেক্ষা লোক-কথা বিশেষতঃ উপকথার মধ্যে প্রাকৃত জগতের বিভিন্ন জীবজন্তুর সর্বাপেক্ষা ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ছড়ার মধ্যে তাহাদের যে পরিচয় আছে, তাহা লোক-কথার পরিচয় হইতে স্বতন্ত্র। ছড়ায় প্রাকৃত জগৎ সম্পর্কে বিশেষ কোন বস্তু (realistic)-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ উপকথায় তাহা পাওয়া যায়; সুতরাং ছড়ার পশুপক্ষী এবং উপকথার পশুপক্ষী অভিন্ন আচরণ করিতে দেখা যায় না। ছড়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহাতে যে প্রাকৃত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে একটু স্বপ্নধর্মিতা কিংবা রোমাণ্টিক বা কল্পনাবিলাসিতার স্পর্শ লাগিয়া থাকে. অবিকল সত্য এবং বাস্তব জীবন অনুকরণ করিয়া তাহা রচিত হয় না। সেইজন্য ছড়ার মধ্যে বুলবুলিকে ধান খাইতে শুনি, শিয়ালের তিন কন্যা বিবাহ করিবার সংবাদ ঘোষিত হয়! কিন্তু উপকথার মধ্যে প্রত্যেক জীবজন্তুর পক্ষেই যে আচরণটি বাস্তব এবং সঙ্গত তাহাই প্রধানতঃ উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কদাচিৎ কখনও যদি মানবিক গুণ তাহাদের উপর আরোপ করা হয়, তবু তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিকতা এবং পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা পায়। সেই গুণেই তাহা কাহিনী পদবাচ্য হইতে পারে। কিন্তু ছড়ার মধ্যে চিত্রগুলি সবই যেমন এলোমেলো, তেমনই জীবজন্তুর আচরণও যথেচ্ছ এবং অনেকাংশেই অসঙ্গত। শিশু প্রাকৃত জগতের নিয়ম ধর্ম কিছুই জানে না, সুতরাং তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যাহা রচিত হইয়া থাকে, তাহাদের সম্পর্কে প্রাকৃত জগতের নিয়ম (natural law) অনুসরণ করিবার কোন দায়িত্ব প্রকাশ পায় না। এই দায়িত্বহীনতা মধ্যে মধ্যে যে কতদূর পর্যন্ত পৌছিতে পারে, এই বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত জগতের মধ্যে যে সকল জীবজন্তু বাংলার শিশুর নিতান্ত পরিচিত, তাহারাই যে সর্বদা ছড়ার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; এই বিষয়ে একটি শিশুমনস্তত্ত্ব সক্রিয় হইয়া থাকে। বিড়াল এবং কুকুরের মত পরিচিত জীব বাংলার শিশুর আর কি থাকিতে পারে? অথচ দেখা যায়, ইহাদের সম্পর্কে প্রায় কোন ছড়াই রচিত হয় নাই। 'ঘরে আছে কুনো বিড়াল কোমর বেঁধেছে' ব্যতীত বাংলায় বিড়াল সম্পর্কে আর বিশেষ কোন ছড়া নাই বলিলেই চলে, কুকুর সম্পর্কে একটি ছড়ারও সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ শৃগাল সম্পর্কে ছড়ার অন্ত নাই। যে কাককে ঘুম ভাঙ্গিয়া অবধি সারাদিন ধরিয়া শিশুরা দেখিতে পায়, তাহার নানা উৎপাত সহ্য করে, তাহার সম্পর্কে কোন ছড়া শুনিতে পাওয়া যায় না, অথচ ঘুঘু—যাহা সচরাচর চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার সম্পর্কে ছড়ার অন্ত নাই। শিশু মনস্তত্ত্বের বিশেষ একটি ধারা অনুসরণ করিয়াই যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই মনস্তত্ত্বের কথা এখানে বিশ্লেষণ করিবার কোন আবশ্যক নাই, কিংবা তাহার স্থানও ইহা নহে; তথাপি এ' কথা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে যে, বাংলার শিশুর একটি জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা যথেচ্ছ (arbitrary) নহে। আমাদের দেশে শিশু মনস্তত্ত্বের অনুশীলন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার আলোচনায় এই বিষয়ক কোন নিদর্শনের উল্লেখ করা হয় না, যদি তাহা হইত, তবে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে যত সহজ হইত, কেবলমাত্র তত্ত্বকথার আলোচনায় তাহা তত সহজ হইতে পারে না।

সাধারণ ভাবে এ'কথা বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা দিবালোকে প্রত্যক্ষ হইয়া শিশুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছড়ায় তাহাদের কোন স্থান নাই; অথচ যাহা অন্ধকারের জীব, অদৃশ্য থাকিয়া যাহারা তাহাদের আচরণকে রহস্যাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই ছড়ার মধ্য দিয়া শিশুর মানসচক্ষুর সম্মুখে সহজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই সূত্রেই অন্ধকারচারী জীব এবং সুদূর আকাশচারী পক্ষী পক্ষিণী তাহাদের ছড়ার উপজীব্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিশুর নিকট প্রত্যক্ষ সত্য অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ রোমান্সের মূল্য বেশি, পরিণত বয়স্কের মন হইতেও যে এই সংস্কার সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়, তাহা নহে—সেইজন্যই রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব হইতে কেহ কোনদিন মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

এক যে ছিল শিয়াল

বাংলার ছড়ায় যে সকল পশুপক্ষীর নাম সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে শৃগাল একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে লোককথা বা folk taleএ শৃগাল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ছড়াতেও তাহার তুলনায় ইহার স্থান যে নিতান্ত নগণ্য এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে তুলনায় উপকথার ছড়ায় শৃগালের যে চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উপকথায় শৃগাল চরিত্রের দুইটি দিকই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। একটি ইহার বুদ্ধি বিচক্ষণতা ও অপরটি ইহার বিশ্বাসঘাতকতা। এই দুইটি গুণ যে ইহার মধ্যে বাংলাদেশের দুইটি স্বতন্ত্র দিক হইতে আসিয়াছে, তাহা একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত (Sten Konow) বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাংলা ছড়ায় শৃগালের এই দুইটি গুণের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথমটির অর্থাৎ বুদ্ধি-বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত একটি ছড়ায় পাওয়া যায়—

এক যে ছিল্ শেয়াল,
তার বাপ দিয়েছে দেয়াল,
সে করেছিলো পাঠশালা,
পড়তো সেথায় আড়শুলা।

যদিও আড়শুলার অপেক্ষা অধিকতর অভিজাত বংশীয় আর কোনও পশু কিংবা পক্ষী পাঠশালায় ছাত্র রূপে গণ্য হয় নাই, তথাপি এক শৃগাল যে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠাপূর্বক পশুসমাজের নিরক্ষরতা দূর করিবার উদার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতেই ইহার বুদ্ধি-বিচক্ষণতার গুণটির পরিচয় প্রকাশ পায়। কিন্তু ছড়ায় শৃগালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি তিন কন্যা বিবাহ। নিম্নলিখিত ছড়াটি তাহার প্রমাণ—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান॥
এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে, এক শিয়ালে খায়।
আর এক শিয়ালে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যায়॥

বাপের বাড়ী তেল সিন্দুর মালীর বাড়ীর ফুল।
শিয়ালের বিয়ে হল ক্ষীর নদীর কূল॥
বাপ দেয় ধান দূর্ব্বা মা দেয় ফুল
এমন খোপা বেঁধে দিছে হাজার টাকার মূল॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া' (পৃঃ ১৩) হইতে উদ্ধৃত ছড়াটি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি স্বতন্ত্র পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগৃহীত ছড়াটি হইতে কোনও কালে শিবঠাকুর নামে যে এক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল, তাহা অনুমান করিয়াছেন এবং আর একটি ছড়ায় শিব সওদাগরের উল্লেখ পাইয়া ইহারা উভয়ে যে একই ব্যক্তি এ কথা মনে করিয়াছেন। কিন্তু শিবঠাকুর অর্থ যে শিয়াল এ কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা সাহেবের একটি অভিমত উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,

'আমাদের অঞ্চলে (২৪ পরগণা জেলায়) শিয়ালকে উপহাস করিয়া শিবরাম পণ্ডিত বলা যায়।' (সভাপতি অভিভাষণ, পূর্ব-ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী, একাদশ অধিবেশন, কিশোরগঞ্জ, [১৩৪৫, পৃঃ ২০] এখানে শিয়ালের পাঠে ছন্দে ব্যাঘাত হয় বলিয়া শিবঠাকুর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ২৪ পরগণার অধিবাসী ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা সাহেবের কথা অনুসারে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিবঠাকুর ও শিয়াল শব্দ দুইটি একার্থবাচক। তবে এ কথাও সত্য, শিয়াল শব্দ দ্বারা ইহার ছন্দ পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু ছড়ায় ছন্দ সর্বদা নিখুঁতভাবে রক্ষা পায় না। 'উ'কে 'উ' উচ্চারণ করিয়া ইহাতে মাত্রার ক্ষতি পূরণ করা হয়। অতএব আধুনিক ছন্দবোধ জন্মিবার পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই যে এখানে শিবঠাকুর বা শিবুঠাকুরের পরিবর্তে শিয়ালের পাঠই ব্যবহার হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ছন্দবোধে শিয়ালের পাঠে ত্রুটি আছে বলিয়াই ইহা শিয়াল-অর্থবাচক শিবঠাকুরের পাঠে পরিবর্তিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত একটি ছড়ায় দেখা যায় শিয়ালই এই ছড়ার নায়ক। যথা—

এক ছিয়ালী রাঁধে বাড়ে আর ছিয়ালী খায়
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চড়ি যায়।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে স্থির করিয়াছেন, শিব সওদাগর নামে কোনও এক ব্যক্তি ছিল, তাহা ভুল। ইহা শিবঠাকুর বা শিব সওদাগর নামে কোনও ব্যক্তি নহে, ইহা শিয়াল।

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে আর একটি ছড়ায় শিয়ালের আর একটি নূতন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ইহার প্রসাধন-বিলাসিতা। ছড়াটি এই—

ওপারেতে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে,
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে লাল লাঠিখান ফেলে মেরেছে;
দুইদিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে
একটা নিলে কিঁয়ের মা একটা নিলে কিঁয়ে,
ঢোকুম কুম বাজনা বাজে অকার মার বিয়ে।

দুই শৃগালের চন্দন চর্চা দেখিয়া দাদা সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়া হাতের লাল লাঠিখানা কেন যে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি মনে হইতেছে, দাদা ইহাকে শৃগালের অনধিকার চর্চা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ছড়ার শেষাংশে দুই শিয়ালের উপর হইতে দৃষ্টি সরিয়া গিয়া দুই কাতলা মাছের ওপর তাহা ন্যস্ত হইল। আধুনিক একটি অনুরূপ ছড়ায় দুই কাতলার পরিবর্তে রুই কাতলা শুনিতে পাওয়া যায়। শৃগাল সাধারণতঃ ছড়ায় একক না হইয়া যুগ্ম (twin) বা ত্রয়ীরূপে দেখা দেয়। যেমন—

তিনটি শিয়াল আজি ভারী মজা পায়
ছাতিমতলায় তারা ডিগবাজি গায়।
এক ছিয়ালী রাঁধে বাড়ে দুই ছিয়ালী খায়,
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ি যায়।

শান্তিপুর হইতে সংগৃহীত একটি ছড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বোয়াল মাছের লোভ দেখাইয়া শৃগালকে আহ্বান জানান হইতেছে—

আয়রে আয় শিয়াল
তুই খাবি এক বোয়াল;
বোয়াল বোয়াল কই?
আমার বোয়াল আমার কাছে,
তুই খাবি খই।

এইখানে কেবলমাত্র শিয়াল শব্দটির সঙ্গে মিল দিবার জন্যই বোয়ালের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ছাড়া বোয়াল শব্দটির আর কোনও সার্থকতা নাই। এইভাবে কেবলমাত্র মিলের অনুরোধেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক শৃগাল-জনক দেয়াল নির্মাণ করিয়া পশু রাজ্যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। যেমন—

এক যে ছিল শিয়াল
তার দিয়েছে দেয়াল !

অনেক সময় শিয়াল কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

আখ বনের পাছে
ভুঁড় শিয়ালী নাচে।

এখানে ভুঁড় শিয়ালী অর্থে ভুঁড়িওয়ালা শিয়াল বোঝাইলেও ইহা একটি শিশুর নৃত্যের বর্ণনা। জননী শিশুকে দুই হাত দিয়া ধরিয়া দাঁড় করাইবার সময় তাহার যে রূপটি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াই এই ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া থাকেন—শৃগালের নৃত্যগুণ স্মরণ করিয়া নহে। কারণ, অন্য কোনও ছড়ায় শৃগালের আর যে গুণেরই পরিচয় থাকুক না কেন, তাহার নৃত্যশিল্প-চর্চার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ছড়ায় শিয়াল শিশুর সঙ্গে মাতুল সম্পর্কে আবদ্ধ। শিয়াল শিশুর মামা বা মাতুল, এই মাতুলের বিবাহ ব্যাপারটি খুবই কৌতুকপ্রদ। দৈবাৎ কোনও সময়ে যদি বৃষ্টিপাতের সময় রৌদ্র দেখা যায়, তখনই শৃগাল মাতুল তাঁহার পরিণয় উৎসব নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রকৃতির রাজ্যে এই বিচিত্র দৃশ্য দেখিবামাত্র শিশু আনন্দে চীৎকার করিয়া ছড়া বলিয়া ওঠে—

রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে
শিয়াল মামা বিয়ে করে।

বিবাহের বরের টোপর পরিবার যে সাধারণ বিধি আছে, শৃগাল মাতুল তাহার ব্যতিক্রম করিয়া মাথায় একটি টোকা বা পাতলা ধারণ করিয়া থাকেন; ছড়ায় তাহারও উল্লেখ থাকে। শৃগালের ধূর্ততা সম্পর্কিত দুই একটি ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপকথায় তাহার এই গুণটি অত্যন্ত প্রবল। একটি মাত্র ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

এক যে ছিল ধূর্ত শিয়াল
বুদ্ধি তাহার ভারি,
যখন তখন করত চুরি
এ বাড়ী ও বাড়ী।

নাগরিক জীবনের প্রসারের জন্যই হোক, কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক শিয়াল সম্পর্কিত প্রাচীন ছড়াগুলি ইতিমধ্যেই লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

'এক যে ছিল রাজা' দিয়া যেমন রূপকথার স্মচনা হইয়া থাকে, কতকগুলি ছড়া তেমনই 'এক যে ছিল শেয়াল' দিয়াই আরম্ভ হয়; স্মতরাং দেখা যায়, এখানে শৃগাল রাজমর্যাদায় ভূষিত হইয়া থাকেন। ছড়াটির ভূমিকা শুনিয়া মনে হইতে পারে যে, কোনো এক মহান্ কাহিনী অতঃপর শুনা যাইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা শুনা যায়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—

১

এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল;
তার বাপের নাম রতা,
আমার ফুরিয়ে গেল কথা।—২৪ পরগণা

২

এক যে শেয়াল,
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল!
তার বাপের নাম রতা,
ফুরুল আমার রাত দুপুরের কথা।—যোগীন্দ্র

শৃগালের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পিতৃপরিচয়ের মধ্য দিয়াই ছড়াটির সমাপ্তি হইয়াছে, তাহার নিজের সম্পর্কে কিছুই বিশেষ শুনিতে পাওয়া গেল না, অথচ সুদীর্ঘ রূপকথার মত ভূমিকা দ্বারা ছড়াটির সূত্রপাত হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শৃগালের সামান্য একটু ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৩

এক যে ছিল শেয়াল,
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
সে ক'রেছিল পাঠশালা
পড়্‌ত সেথা আরশুলা।—ঐ

শৃগাল বুদ্ধিমান জীব, সেই জন্য সে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। বাংলায় শৃগালের পাণ্ডিত্যের ব্যবসায় এবং বুদ্ধিমত্তার বিষয়ক বহু কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতেও শিয়াল পাঁড়ে বলিয়া পরিচিত। সেই সূত্রেই এখানে তাহার পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কথা আসিয়াছে। কিন্তু শৃগালের পাঠশালা বলিয়া আরশুলা অপেক্ষা অভিজাত জীব সেখানে ছাত্ররূপে কেহ প্রবেশ করে নাই। কিন্তু শৃগাল পাঠশালার পণ্ডিত হইলে কি হইবে, চুরি করা তাহার স্বভাব; একদিকে যেমন সে পণ্ডিত, আর এক দিকে সে ধূর্ত চোর—

৪

এক যে ছিল ধূর্ত শিয়াল
বুদ্ধি তাহার ভারি,
যখন তখন করত চুরি
এ' বাড়ি ও' বাড়ি।—সুন্দরবন, ২৪ পরগণা

এক শিয়ালের কথা শুনিয়াছি, এ'বার তিনটি শিয়াল একত্র হইয়া কি কি আচরণ করিল, তাহা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; প্রথমতঃ—

৫

তিনটি শিয়াল আজি ভারি মজা পায়,
ছাতিম তলায় তারা ডিগবাজি খায়।—ঐ

নিম্নে তিনটি শিয়ালের গৃহস্থালীর সংবাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৬

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,
শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান।
এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে, এক শিয়ালে খায়,
আর এক শিয়ালে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যায়।

বাপের বাড়ীর তেল সিন্দুর মালীর বাড়ীর ফুল।
শিয়ালের বিয়ে হল ক্ষীর নদীর কূল।
বাপ দেয় ধান দূর্বা মা দেয় ফুল।
এমন খোপা বেঁধে দিছে হাজার টাকার মূল ॥—২৪ পরগণা

বলাই বাহুল্য, এখানে শৃগাল শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, নতুবা শৃগালের হাজার টাকা মূল্যেরই হউক, কিংবা শত টাকা মূল্যেরই হউক, খোঁপা বাঁধিবার কোনই অর্থ হয় না।

৭

এক ছিয়ালি রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়ালি খায়।
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত্ চড়ি যায়॥
ঘোড়ায় বলে পাটকাপড়্গ্যা বন্ধে বলে শাড়ি।
সেই শাড়ি উড়াই দিলাম ডুম্‌রাজার বাড়ী॥
ডুম্ রাজা ডুম্ রাজা কি কর বসিয়া।
তোমার পুতে মারন্ খাইয়ে দরবারে বসিয়া॥—চট্টগ্রাম

৮

এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে দুই শিয়ালে খায়,
রাজার বেটা মজুমদার ঘোড়ায় চড়ি যায়।
যাতিরে যাতিরে পাচ কাপড়া পায়!
পাচ কাপড়া মাথায় বাঁইধে শাড়ি,
সেই শাড়ি যাইয়া পড়ে চাঁদ রায়ের বাড়ী।
চাঁদ রায় চাঁদ রায় কি কর বসিয়া,
তোমার পুত্র মার খায় সভায় বসিয়া।
বাপে কাঁদে পুত পুত মায়ে কাঁদে শুয়ে,
চোখে মুখে কামড়াল বিজাতি বোল্লা।
সেই বোল্লা কই রে?—গাছে উঠেছে,
সেই গাছ কই রে?—গঙ্গায় ডুবেছে।—পাবনা

যদিও তিন শিয়ালের খাওয়া দাওয়ার প্রসঙ্গ উপরি উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে

নিতান্ত গৌণ, তথাপি তাহা দিয়াই ছড়াটির সূত্রপাত হইয়াছে। তারপর আবার—

৯

এক ছিয়ালী রান্ধে বাড়ে আর ছিয়ালী খায়,
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়ায় চড়ি যায়।—ত্রিপুরা

কখনও কখনও দুইটি শিয়ালের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা প্রসাধন-প্রিয় এবং রোমাবৃত দেহটিও চন্দন দ্বারা চর্চিত করিয়া থাকে—

১০

ওপারেতে শিয়াল চন্দন মেখেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান ফেলে মেরেছে;
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে কিঁয়ের মা একটা নিলে কিঁয়ে,
ঢোকুম কুম বাজনা বাজে অকার মার বিয়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

শিয়ালের বিবাহ বর্ণনাও বাংলা ছড়ার একটি সাধারণ বিষয়; কারণ, বিবাহানুষ্ঠানটি নানাদিক দিয়াই বিশেষত্বপূর্ণ—

১১

শিয়াল মামার বিয়ে গো,
বেঙ্গা বাজায় শিঙা গো।
ঝিন্‌কি বাজায় করতাল,
বান্দরে দেয় উভে ফাল।
মিনি কয় শিয়াল ভাই,
ভাজামাছ পাওন চাই।
বউ আন্‌লে সুন্দর,
রঙ্গে ঢঙ্গে ঘর কর।—মৈমনসিং

সুন্দরী বধূ লইয়া শৃগালকে মনের আনন্দে ঘর সংসার করিবার পরামর্শ দিবার কথা এখানে শুনিতে পাওয়া গেল। নিজস্ব অন্তরের গোপন বিবাহ-সাধ

এখানে শৃগালের নামেই প্রচার করা হইতেছে মাত্র; কারণ, বনের শৃগাল এখানে তাহার প্রতিবাদ করিতে আসিবে না। কোন কোন ছড়ায় শৃগালের বিবাহের স্থানটিরও উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়—

১২

শিয়ালের বিয়া হল ক্ষীর নদীর কূল।—২৪ পরগণা

বিবাহের নির্ধারিত লগ্নটিরও কোন কোন ছড়ায় উল্লেখ দেখা যায়—

১৩

রৌদ্র উঠে বৃষ্টি পড়ে
শিয়াল মামা বিয়া করে
পাত্‌লা (টোকা) মাথায় দিয়া।—মৈমনসিং

কখনও কখনও শৃগালকে বোয়াল মাছের প্রলোভন দেখাইয়া আহ্বান করা হইয়া থাকে—

১৪

আয়রে আয় শয়াল,
তুই খাবি এক বোয়াল।
বোয়াল বোয়াল কই,
আমার বোয়াল আমার কাছে
তুই খোঁজ না খই।—শান্তিপুর, নদীয়া

শৃগাল মাংসখাদক হইলেও বোয়াল মাছে তাহার যে বিশেষ রুচি আছে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই; ইহা কেবল মাত্র শিয়ালের নামের সঙ্গে উচ্চারণ-সামঞ্জস্য হেতু এখানে আসিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে শৃগালের বদরি বা কুল আহার করিবার কথা আছে, কিন্তু তাহাতে কোন বিস্ময় কিংবা বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই, কুল আহার করিতে গিয়া সে যে কোথা হইতে লবণ সংগ্রহ করিল, তাহাই বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিল—

১৫

বুলবুলি লো সই,
মনের কথা কই।

শেয়ালে যে বরই খাইল,
লবণ পাইল কই?—ঢাকা

যে কুল খাইতে পারে, সে যে প্রয়োজন হইলে লবণও সংগ্রহ করিতে পারে, সে দিকে ছড়া রচয়িতার দৃষ্টি নাই; এমন কি, শৃগালের একবার তেঁতুল খাওয়া সম্পর্কেও এই চিন্তাই শিশুহৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তবে তাহাতে এই প্রশ্নের সমাধানও ছিল—

১৬

আঁায় ঘুমনি আয়,
শেয়ালে তেঁতুল খায়।
তারা নুন পাবে কোথায়?
সাগরের বালি ঝুর ঝুরানি
নুন বলে বলে খায়।—বরিশাল

এই ছড়াটি ভালুক এবং বাদর সম্পর্কেও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শৃগাল সম্পর্কে সাগরের বালি নুন বলিয়া খাওয়া যত সম্ভব, অন্য কাহারও পক্ষে তাহা তত সম্ভব নহে। কারণ, আহার সন্ধানে সমুদ্রের বালির উপর শৃগালকে প্রায়ই বিচরণ করিতে দেখা যায়।

শৃগাল যে চুরি করিয়া থাকে, তাহা পূর্বের এক ছড়াতে শুনিয়াছি, কিন্তু চুরির বস্তু তাহার খাদ্যদ্রব্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; তবে এখানে দেখা যাইতেছে, একটি চরকা চুরি করিবারও তাহার প্রয়োজন হইয়াছে—

১৭

ও বুড়ি ও বুড়ি সূতা কাট,
কাইল বেহানে অলি হাট।
অলি হাটত্ যাবি নি,
চড়কা বান্ধা দিবি নি।
চড়কা নিল হিয়ালে,
বুড়ী কান্দের্ বিয়ালে।—চট্টগ্রাম

চরকাটি চুরি যাওয়ার দুর্ঘটনায় বৃদ্ধা অশ্রুপাত করিবার জন্য একটি যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে, তাহাও শিয়ালের নামের সঙ্গে উচ্চারণ সামঞ্জস্য হেতুই

আসিয়াছে, অন্যথায় ইহার কোন বাস্তব মূল্য নাই। কারণ, শৃগালে চরকা চুরি করিয়া লইলে বৈকালে তাহার জন্য খেদ করিবার বিশেষ কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না।

শৃগাল একটি মারাত্মক জীবও বটে, তাহা হইতে সাবধান থাকিবার আবশ্যক হয়—

১৮

ও পারি, ও পারি যাস্‌নে বাগানে,
পাতি শেয়ালে ছাবড় দিলে মরবি পরাণে —হুগলি

শৃগালে টানিয়া খাইবার মত অপমান আর কিছুই হইতে পারে না—

১৯

ঠাট্টা আমায় কোর না ঠাট্টা আমি জানি।
ঠাট্টার মণ ষোল টাকা তাও মাঝারি রকম;
ক'লকাতার বেনে এক আমায় ঠাট্টা করেছিল
ওলাউঠার রোগে ম'ল শিয়ালে টেনে খেল'।—২৪ পরগণা

পূর্ববাংলার ভাষায় ফুটিকে বাঙ্গি বলে। পূর্ববাংলা হইতে সংগৃহীত এই ছড়াটি পশ্চিম বঙ্গের কথ্যভাষায় রূপান্তরিত করিয়া যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার 'খুকুমণির ছড়া'য় প্রকাশিত করিয়াছেন; মূল ছড়াটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই বলিয়া এখানে তাঁহার পরিবর্তিত পাঠটিই গ্রহণ করা হইল। ইহাতে ফুটি ও এক শিয়ালনির বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

২০

যখন বাঙ্গির ক্ষেত চষে,
তখন শেয়ালনি এ'সে বসে;
ও শেয়ালা আয়রে,
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গির পাতা,
তখন শেয়ালনির হ'ল মাথা ব্যথা।
ও শেয়ালা আয়রে—ইত্যাদি

যখন বাঙ্গির কুষি,
তখন শেয়ালনি মনে বড়ই খুসি ;
যখন বাঙ্গির জালি,
তখন শেয়ালনি বেড়ায় আলি আলি।
যখন বাঙ্গির ফুল,
তখন শেয়ালনি ঝেড়ে বাঁধে চুল।
যখন বাঙ্গির বাতি,
তখন শেয়ালনি ঘোরে দিন রাতি ;
যখন বাঙ্গি ফাটে,
তখন শেয়ালনি বসে চাটে :
ও শেয়ালা আয়রে,
গাথানি মোর কেমন কেমন করে।—যোগীন্দ্র

শেয়ালার আগমন হইলেই গাথানির কেমন কেমন করা যে কি ভাবে দূর করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

শিয়ালকে দেখিয়া বাঘও পলাইয়া যায়—

২১

এলতল দিয়া বেলতল দিয়া বোড়ল দিয়া ঘাটা,
শিয়াল দেখে বাঘ পালালো হেসে মরল পাঠা।—রাজসাহী

পাঁঠার অদৃষ্ট ভাল যে, পলাইবার পথে বাঘ তাহার উপর দৃষ্টি দিবার সুযোগ পায় নাই, তাহা হইলে তাহার হাসি মুখ কোথায় যাইত ?

বাঘে লইয়া যায়

বাঘ হিংস্র জীব ; বাংলার পল্লীগ্রামে ইহার অত্যাচার মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সুতরাং নিরীহ জীব শৃগাল সম্পর্কে ছড়ায় যে মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, বাঘ সম্পর্কেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ইহার মারাত্মক আক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার সম্পর্কে কোন কৌতুকবোধ জন্মলাভ করা সম্ভব হয় নাই, ভয়ের ভাব সর্বদাই ইহার বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়। কিন্তু লোক-কথার মধ্যে এই ভাবটির ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাঘের হিংস্রতা বোধটি সেখানে তাহার সম্পর্কিত কৌতুক বোধ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপকথায় বাঘ নির্বোধ জীব, ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জীবের নিকট সর্বদাই সে বুদ্ধিতে পরাজিত হইয়াছে। বাঙ্গালী তাহার দৈহিক বলের অভাবের মধ্যে এই সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে যে, বাঘ বলশালী হইলেও বুদ্ধিহীন, শৃগাল বলহীন হইলেও বুদ্ধিমান্। কিন্তু ছড়ায় বাঘ সম্পর্কিত এই মনোভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহাতে বাঘ ক্রূর, হিংস্র এবং নরমাংস-লোলুপ। এমন কি, নিরীহ নিরামিষাশী বৈষ্ণবও তাহার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় : 'ঘর দুয়ার ভাঙ্গ্যা বাঘা বৈরাগী লয়্যা যায়।' —ছড়ায় এই প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বাঘ সম্পর্কে এই হিংস্রতাবোধ হইতেই ইহাকে অতিপ্রাকৃত উপায়ে পরিতুষ্ট করিয়া ইহার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের পথ সন্ধান করা হইয়াছে। সেইজন্য বাঘ সম্পর্কিত অধিকাংশ ছড়াই পরবর্তী অধ্যায়ে অতিপ্রাকৃত বিষয়ক ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তথাপি অতিপ্রাকৃত ভাবনিরপেক্ষ যে সকল ছড়াও আছে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প বলিয়া মনে হইবে না, এখানে তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইবে। বাংলার প্রায় সর্বত্রই ব্যাঘ্রের আক্রমণ একদিন প্রায় সমান ছিল ; তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, পূর্ব বাংলা হইতেই এই শ্রেণীর ছড়া অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। রবীন্দ্র-সংগ্রহে এই ছড়া একটিও নাই।

নিরীহ গোজাতিই বাংলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাঘ্রের আক্রমণের প্রধানতম লক্ষ্য। ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোমর ভাঙ্গা গয়লানী বুড়ীকেও লাঠি লইয়া অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হয় না—

গোয়ালনীর মা বড় কাঁকাইল ভাঙ্গা বুড়ী,
বাঘ মারিতে লইয়া যায় তুয়ার বান্ধার লড়ী।
বাঘের পিষ্ঠে দিয়া বাড়ি বলছে হায়রে হায়,
কাল্যা গাইয়ের ধল্যা বাছুর বাঘে লইয়া যায়।
—মৈমনসিং

ব্যাঘ্র কর্তৃক গোজাতির উপর আক্রমণের বৃত্তান্তই ব্যাঘ্রবিষয়ক ছড়ার একটি প্রধান বিষয়—

২

কড় কড়া ভাতে কি কাম করে?
বুড়া বুড়ি চেতন করে।
ক্যারে বুড়া ক্যারে বুড়ি?
কয়ডা গাই কয়ডা বলদ?
বারডা গাই তেরডা বলদ।
একটা গাই নড়ে চড়ে
বাঘা আইস্যা দ্বারেতে পড়ে,
যায় বাঘা বনে
খায় আপন মনে।
খায় আর কড়মড়ায়
দুই চোখ কড়কড়ায়।
দুই কানে দুই মূলা
ধান বাই কর কুলা কুলা,
কুলা থিনি কাঠাত যাউক
গিরিলি থানেক বাঘে খাউক।
ও বাঘ তুই খাইস না
শরীর ভাত মারিস না।—বগুড়া

কোন কোন সময় বৃদ্ধাকে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হয়—

৩

ঘরত বাইর অইলো বুড়ী,
বুড়ীরে খাইলো বাঘে।
হেই বাঘ কী অইল ?—জঙ্গলায় পলাইলো ॥
হেই জঙ্গল কী অইল্ ?—রাখালে পুড়িলো ॥
হেই ছাই কী অইল্ ?—ধুবায় কাপড় ধইলো ॥
হেই কাপড় কী অইল ?—বাঁইড়া বল্‌দে খাইলো ॥
হেই বলদ্ কী অইল ?—গাঙ্গে সাঁতার দিলো ॥
হেই গাঙ্গের মাছ কী অইলো ?—কাগ্ বগায় খাইলো।
হেই কাগ কী অইলো ?—গাছের ডালে বইলো ॥
হেই ডাল্ কী অইলো ?—ঝরিয়া পড়িলো ॥—থুবো থুবো।—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে সুন্দর বনের বাঘের ব্যাপক অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তবে ইহাও বাঘের নামে মাগন সংগ্রহ করিবারই ছড়া—

৪

হাট্যা চলরে। ধ্রু ॥
হাট্যা চল পাঁচিল পাড় ॥
ঝপৎ গিরিরে।
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব ॥
সুন্দৈর বনে রে। ধ্রু ॥
সুন্দৈর বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হুম্বুর করে রাও।
ম্যাক বাঘরে। ধ্রু ॥
ম্যাক বাঘ চৈতা।
বাওন মার‍্যা নিলো পৈতা ॥
ম্যাক বাঘের গলায় দড়ি।
হারা আট লড়ালড়ি ॥
ম্যাক বাঘের কপালে সিন্দুর ॥

পুড়্যা খায় বাত্যা ইন্দুর ॥
আর য়্যাক বাঘ হৈ চৈ।
গোয়াল মার‍্যা খাইল দৈ ॥
আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে।
লাফ দিয়া পড়ে ধোপার ঘাড়ে ॥
আর য়্যাক বাঘের গলায় ব্যাত।
আর য়্যাক বাঘ বাপে-পুতে।
আর য়্যাক বাঘ হিজল গাছে।
আর য়্যাক বাঘ রাইঙ্গা।
কাড় ফ্যালাইলো ভাইঙ্গা ॥
আর য়্যাক বাঘের হাতে মিঠা।
মোরে য়্যাকখান চিতে পিঠা ॥
আর য়্যাক বাঘ কাল্যা।
গাঙ্গের মারে জাল্যা ॥
আর য়্যাক বাঘের মাথা ফাটা।
ধান দেবারে কত কাঠা ॥
বার বাঘের লেখা পড়ি।
চাউল দেও এক বুড়ি ॥

(সমবেত কণ্ঠে) —ঠাকুর কুলাই ভোঁ। —বরিশাল

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যেও বাঘের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৫

কুড়া বলে কুড়ুনী গো ইবার বড় বান,
উঁচা কইর‍্যা বাইন্ধো টঙ্গি খুইট্যা খাইতাম ধান।
কুড়া গেছে অরণে—কুড়িরে খাইলো বাঘে,
কাল দ্যা কাল দ্যা যায় কুড়া ফুল দাড়কিনার আগে
ফুল দাড়কিনায় জিজ্ঞাস করে, কই যাও রে ভাই,
রাজার ঢাল মাথায় দিয়া বাগ মারিতাম যাই।

এক বাঘ মাইর‍্যা আইছি চিতোলিয়ার পারো,
আর বাঘ মাইর‍্যা আইছি কতোলিয়ার পারো,
আর বাঘ মারতে গেলে বাঘে মাইলো কুটি।
অক্কই দফাটে গেলাম সম্বুঙ্গের মাটি;
সম্বুঙ্গের মাটি না রে চেই চেই করে···ইত্যাদি।

—মৈমনসিং

৬

বুড়া বলে বুড়ুনী ইবার বড় বান,
উচা কইরা বান্ধছি টং খুইট্যা খাইতাম ধান।
বুড়া গেছিল ধান খুঁটিতে তারে মাইল বাঘে,
সকল বুড়ায় যোগার দেয় ফুলকুমারীর আগে।
ফুলকুমারী জিজ্ঞাস ক'রে কই যাওরে ভাই,
রাজার সামনে চাল পাতা বাঘ শিকারে যাই।
এক বাঘ মারইয়া আইলাম অবইয়ার দীঘির পাড়ে,
আর এক বাঘ মারতে গেলাম সুসুঙ্গের পাহাড়ে।
অক্কই ফালে পড়ে বাঘ সুসুঙ্গের মাডি,
সুসুঙ্গের মাডি নারে পাথরের চাডি।—ঐ

৭

কুঁড়া বলে কুঁড়ুনী এইবার বড় বান,
উচা করিয়া বান্দিও ভিটি কুটিয়া খাইব ধান।
কুঁড়া গেছে ধান কুটিতে, কুঁড়িরে খাইল বাঘে,
সকল কুড়া সাজিয়া আইলো কুল মাণিকের আগে।
এক বাগ মারিয়া আইলাম চিতলিয়ার পার,
আর এক বাঘ দৌড়াইয়া নিলাম বাঘ করালা খোড়ী,
পাছাইতে পাছাইতে গেলাম মামাগর বাড়ী।
মামাগর ঘোড়াটা চোক নেকে করে,
আমার ভাই জগৎ আলী ঘোড়া দৌড়াইতে পারে।
ঘোড়া দৌড়াইতে ঘোড়া দৌড়াইতে পথে পাইল সারি,
ঘেগু সারি পিন্দিয়া বেড়ায় চান খাঁর বাড়ী।

চান খাঁ চান খাঁ কি কর বসিয়া ?
তোমার পুতে কলী যায় দরবার বসিয়া।—মৈমনসিং

৮

আইলাম রে, ভাই উড়িয়া, আত্তির কান্দ চড়িয়া,
আত্তির স্বর লড় বড় করে, গাছ থাকিয়া বরই পড়ে।
ছিক্যা লড়ে ছিক্যা লড়ে ঝড় ঝরিয়ায় টেকা পড়ে।
একটা টেকা পাইলামরে, বানিয়া বাড়ী গেলাম রে।
বানিয়া গড়ে উচা টুই, ধান বাইর কর কুলা দুই,
কুলাতত্‌ ধান কাঠাত্‌ গেল, সগল দিয়া বুড়ী ঘর গেল।
আলা বুড়ী শিতলি! কুলার পিড়া কি করিলি,
কুলার পিড়া পুলায় খাইছে, শিতলীরে বাঘে খাইছে।—ঐ

এখানে মাণিক নামক এক হতভাগ্য বালক কি ভাবে যে বাঘের শিকার হইয়াছে, তাহার কথা শুনা যায়—

মাইনকা যাবি নাকি তুই রাম ঠাকুরের নায়,
ইলের কচু, বিলের শাক রাইন্ধ্যা থুইছি ঘরে,
এমন সময় খবর আইলো মাইনকারে নিছে বাঘে।
ও মাইনকা আয়,
আয় যাবিনি রাম ঠাকুরের নায়॥—ফরিদপুর

১০

শীত করের্ বান করের্ করই ভাতি দে।
তোর করইএ মোর করইএ ভুডি বান্ধি দে॥
ভুডির ভিতর চেরাক জলের খালত্‌ পেলাই দে।
খালর মাঝে নৈল্যা ইঁচা সুকা রান্ধি দে॥
সুকা খাইয়ে বিলাইএ।
বউঅরে ধরি কিলাইএ॥
কোডে পলাইম্‌ কোডে পলাইম্‌ সিন্দুর গাছের তলে।
সিন্দুর গাছে দোহাই দিএ আইআ বাড়ির তলে॥

আইআ বাড়িত লতাপাতা বন্ধুর বাড়িত্ তেল।
তেল পড়াইতাম্ গেলুম্‌রে উন্দুর গুয়া গেল্ ॥
বাঘ মারম্ ধুম্ ধাম্ উন্দুর মারম্ গুয়া।
এই পথ দি হাঁটি যাইব মেহেতারার ছাউআ ॥
মেহেতারার ছাউআ নয় ভালুকের কেশ।
আর কতদূর গেলে দেইবি (দেখিবি) তোরার মা
বাপর দেশ ॥—চট্টগ্রাম

বাঘ মারিবার পরই বীরত্বের অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ যেখানে ইঁদুর মারিবার উল্লেখ আছে, সেখানে বাঘ যে কি বাঘ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। বাঙ্গালীর বাঘ মারিবার বিবরণ ইহাই স্বাভাবিক।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে দেখা যায়, একটি বাঘ মারিতে এক বাঙ্গালী বীরের পক্ষে দুই মাস সময় লাগিয়াছিল—

১১

ঢুপী গো ঢুপী
ধান লাড়ছ কই?
চাইলতা গাছের তলে।
সাপে নেঙ্গুর লাড়ে,
বাঘে ডুক্কার মারে।
সেই বাঘ মারে,
রাধানাথের পুতে।
রাধানাথের পুত নারে রাধানাথের নাতি,
সেই বাঘ মারুতে লাগে আশ্বিন আর কাতি।
—মৈমনসিং

বাঘের ভয়ে গরুতেও দুধ দেয় না।

১২

দুধা রে দুধা; কিরে ভাই দুধা।
দুধ কেয়া ন দেয়রু? বাঘর ডরে।
বাঘে কি করে? মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম? চোঙরা।

গাছে গাছে ভোধরা, হাত (সাত) গাছ বইট্যা।
গাছ বাহি উট্‌ঠ্যা।—চট্টগ্রাম

এমন কি, খাটের নীচ হইতেই বাঘের ছানার ডাক শুনিতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন, বাঘ ঘরের মধ্যেই আছে—

১৩

ও হলদ্যা গুয়া খা,
ছিরিপুর বেড়াই যা ॥
ছিরিপুরর কন্ খাঁটা।
পুব ডুয়ার্গ্যা মাদার কেঁটা ॥
মাদার কেঁটা হেট করি।
আস্তন্ লক্ষ্মী বল করি ॥
আস্তন্ লক্ষ্মী যাইবাক কই।
খাট বিছাই দে বস্তক গই ॥
খাটর তলে বাঘর ছা।
হাড়ুম হুড়ুম করে রা।
যে ন মাণ্ডে তারে খা ॥—চট্টগ্রাম

আস্তক অর্থ আসুন, বস্তক অর্থ বসুন ; লক্ষ্মী আসুন, গৃহে বসুন, কিন্তু গৃহটি যে নিরাপদ নহে, তাহাও বলিতে ভুল হয় না; কারণ, খাটের নীচেই বাঘের ছানা বাড়িতেছে।

বাঘের মাথায়ও প্রদীপ জ্বলিতে শুনা যায়—

১৪

চুরে হেলে বাঘে খেলে,
বাঘের মাথায় পিদিম জ্বলে।—২৪ পরগণা

রবীন্দ্র-সংগ্রহের একটি মাত্র ছড়ায় 'হুমো' নামক একটি জীবের নাম পাওয়া যায়, ইহার অর্থও বাঘ—

১৫

খোকো ঘুমো ঘুমো।
তালতলাতে বাঘ ডাকছে দারুণ হুমো ॥

—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিম্নোক্ত ছড়াটি দ্বারাও এই উক্তির সমর্থন লাভ করা যাইতেছে—

১৬

যাদু ঘুমো রে ঘুমো,
শান্তিপুরে বাঘ এ'সেছে দারুণ হুমো।—যোগীন্দ্র

শান্তিপুরে বাঘের অশান্তি যে নিতান্ত দুঃখের বিষয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এইবার বাঘের শতনাম শুনিয়া এই বিষয়ক আলোচনা শেষ করি—

১৭

এক বাঘের নাম এঁতা।
বুড়ীর নিল খেঁতা॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম উগারের খুঁটি,
চাউল চাবায় মুঠি মুঠি॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম অই দই॥
গোয়াল মারিয়া খাইল দই॥
এক বাঘ এক বাঘ।
এক বাঘের নাম আমলা,
বন্দ মারে বামলা।
এক বাঘের নাম লাড়ুর লুতুর,
ছুতার মারিয়া আন্‌লো আঁতুর।
এক বাঘের কপালে ফোঁটা,
বৈরাগী মারিয়া আন্‌ল লোটা।
এক বাঘর নাম এঁকী,
ঘরত আন্‌ল ঢেঁকী।—মৈমনসিং

অন্যান্য পশু

শৃগাল ও বাঘ ব্যতীত বাংলার ছড়ায় আর কোন পশুর নামই খুব বেশি শুনিতে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পশু সম্পর্কে দুই একটি করিয়া মাত্র ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে কয়েকটি পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের নাম এক সঙ্গে পাওয়া যাইতেছে—

১

চিন্তামণি চিন্তামণি হাটে গিয়াছে,
চিন্তামণি বউগুলি সব দেখতে গিয়েছে।
পথে ছিল কালো ঘোড়া দাবড় দিয়েছে,
সেই দাবড়ে গাছে উঠেছে।
গাছে ছিল কাঠ্ঠোকরা ঠোকর দিয়েছে।
সেই ঠোকরে ধূলোয় পড়েছে।
ধূলোয় ছিল বিষপিঁপড়া কাম্ড়ে ধরেছে,
সেই কামড়ে জলে পড়েছে।
জলে ছিল কাল কেউটে জড়িয়ে ধরেছে।—২৪ পরগণা

উপরে ঘোড়ার দাবড় দিবার কথা শুনিয়াছি, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার কথাও কোন কোন সময় শুনা যায়, কিন্তু তাহাতে অশ্বের পশু হিসাবে কোন বিশেষত্বের পরিচয় প্রকাশ পায় না—

২

রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চড়ি যায়।
পথত্ পাইয়ে লাল কৈঁয়রা
সীতারে হরি নিয়ে রাজা ডোম যায়।—চট্টগ্রাম

সীতা হরণের ব্যাপারে রাবণ রাজারই অপবাদ আছে, এখানে ডোম রাজার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে ঘোড়ার পা দিয়া বাড়া বাঁধিবার এবং হাড়ির পা দিয়া চাউল চাপিবার অসম্ভব কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৩

ওভি বেভি ভইন ঝি বেভি,
তোর লাই বুলি তিন দিন হাঁটি।
ঘোড়ার ঠেঙ্গে বাড়া বান্ধি,
হাতির ঠেঙ্গে চইল চালি।
চইল চালনি ঘরত নাই,
খাজনা দিতাম মনত নাই।—চট্টগ্রাম

ওভি বেভি শব্দের অর্থ ও বেটি। মর্কট অতি কুৎসিৎ জীব, ইহার আচরণও অত্যন্ত বিরক্তিকর, যথার্থ কৌতুককর নহে। সেই জন্য শিশুর ছড়ায় ইহার নাম বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না, দুই তিনটি মাত্র ইহার নিদর্শন আছে—

৪

আয় ঘুমনি আয়,
বাঁদরে তেঁতুল খায়,
তারা নুন পাবে কোথায়?
শেওড়া গাছের নুন
আর তেঁতুল গাছের তেল,
তারা তাই দিয়ে দিয়ে খায়।—২৪ পরগণা

৫

বাঁদরে তেঁতুল খায়,
তারা নুন কোথা পায়?
তারা আলন মালন খেয়ে,
বনকে পালায়।—বাঁকুড়া

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে একটি হনুমানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

৬

ভাইরে দাদারে গাছে গাছে হনু,
মা গেছে গরু বাঁধ্‌তে এ'সে দেবে নমু।—মেদিনীপুর

৭

ও হনুমান কলা খাবি,
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি ?
একটা ক'রে পয়সা পাবি।—যোগীন্দ্র

হাতী এত বড় জীব, কিন্তু তাহার সম্পর্কে ছড়ায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই—

৮

হাতি, হাতি, হাতি,
হাতি যায় বাদশার নাতি।
হাতি ধুপুর ধুপুর যায়,
হাতি মিটি মিটি চায়।—২৪ পরগণা

ইহার দেহের বৃহৎ আয়তন এবং কুৎসিৎ গঠন শিশুমনের কোন কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বিড়াল এত পরিচিত জীব বলিয়াই বোধ হয় ছড়ায় বিশেষ কোন স্থান লাভ করিতে পারে না। যে জীবের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করা যায় না, কেবলমাত্র তাহাদিগকে লইয়াই ছড়া রচিত হয়, যাহার সম্পর্কে কিছু জানি, কিছু জানি না তাহাই ছড়া রচনার প্রেরণা দিয়া থাকে, কিন্তু যাহার সম্পর্কে সব কিছুই জানি, যাহারা নিত্য জীবনে প্রত্যক্ষ গোচর, তাহাদের সম্পর্কে ছড়া রচিত হয় না। বিড়ালের সম্পর্কে নিম্নে তুইটি মাত্র ছড়া উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল—

৯

মোড়লদের তিনটি বউ বাড়া ভাত খায়,
এ পাত খায় ও পাত খায় বিড়ালে দোষায়।
বিড়াল গিয়ে পড়্ল পুকুরের জলে,
বিড়ালের লেজ ধরে টানাটানি করে।—মুর্শিদাবাদ

১০

খোকন যাবে শশুর বাড়ী সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে কুনো বিড়াল কোমর বেঁধেছে।—২৪ পরগণা

আদর করিয়া পোষা বিড়ালকে মিনি বা মেনি বলিয়া ডাকি, মিনি নামেও তাহার সম্পর্কে দুই একটি ছড়া আছে, এখানে একটি উদ্ধৃত করা যায়—

১১

আয়রে আয় মেনি,
খোকার দুধে চিনি।
দুধ খাবে না রাগ ক'রেছে
খোকন যাদুমণি.
আয় রে আয় মেনি।—যোগীন্দ্র

ইংরেজি 'পুষি' (pussy) শব্দটিকেও বাংলায় আমদানি করিয়া যোগীন্দ্রনাথ বিড়াল সম্পর্কে একটি ছড়া রচনা করিয়াছেন।

কাঠবিড়ালী ক্ষুদ্র জীব, নিকটে আসিয়াও সে দূরে চলিয়া যায়, তাহার সম্পর্কে এক আধটুকু কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নহে। তথাপি তাহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু ছড়া নাই, একটি এখানে উদ্ধৃত করি—

১২

কাঠবিড়ালী কাঠবিড়ালী পিছন ফিরে চা,
তোর বিয়েতে নাচ্‌তে যাবো বায়না দিয়ে যা।—বীরভূম

কিন্তু ছড়াটির মধ্য দিয়া কাঠবিড়ালীর কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই, বায়না পাইলে সকলের বিবাহেই নৃত্য করা যায়, কেবল কাঠবিড়ালী বলিয়া কোন কথা নাই।

এই প্রকার আর একটি ছড়া,

১৩

কাঠবেড়ালী কাঠবেড়ালী কাপড় কেচে দে,
তোর বিয়েতে নাচ্‌তে যাব ঝুম্‌কো কিনে দে।
ঝুম্‌কোর ভিতর পাকা পান,
দিদির বর মোছলমান।—বীরভূম

যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার 'খুকুমণির ছড়া'য়, ইহার শেষাংশ নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই ভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন—

ঝুম্‌কোর ভিতর পাকা পান,
বিবি হচ্ছে মোছলমান।—যোগীন্দ্র

ইন্দুরের কথাটিও ছড়ায় বাদ পড়ে নাই। কখনও ইহার অনিষ্ট করিবার, কখনও ইহার ইষ্ট করিবার কথা স্মরণ করা হয়—

১৪

ঘুঙ্গ্যা উন্দুর ঘুঙ্গ্যা উন্দুর নল বনেতে বাসা,
আমার গোলার ধান খায় হেনা লোচা লোচা॥
আড় কাড়িল বেড় কাড়িল,
এক্কে রাতে কাড়ি নিল তের রত্তি সোনা।—চট্টগ্রাম

১৫

ফাঁদে পড়ে কাঁদে হাঁস প্যাক প্যাক করে,
ইঁদুর আসিয়া ফাঁদ কাটিয়া বাঁচাইল তারে।—২৪ পরগণা

১৬

তাইরে নাইরে বন্ধুরে,
কলা খাইল ইন্দুরে।
কলার ভিতরে আলি নাই,
পয়সা দিতে ম্যানা নাই।—ঢাকা

পূর্বেই বলিয়াছি, পশুপক্ষীর যথার্থ ক্ষেত্র উপকথা, ছড়া নহে; সেই জন্য ছড়ায় ইহাদের উল্লেখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

আয় আয় টিয়ে

ছড়ায় পশুর তুলনায় পক্ষীর নাম যে বেশি পাওয়া যায়, তাহা নহে; তবে পশু অপেক্ষা পক্ষীর যে জাতিগত বৈচিত্র্য বেশি পাওয়া যায়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তবে পক্ষী সম্পর্কেও ছড়ায় একই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিত্য পরিচিত জগতের পক্ষী অপেক্ষা যাহারা কিছুমাত্র চেনা এবং অধিক মাত্রাতেই অচেনা, তাহাদের কথাই ছড়ায় উল্লেখ দেখা যায়। সেইজন্য কাকের মত পরিচিত পক্ষীর ছড়ায় কোন উল্লেখ নাই; অথচ টিয়া বুলবুলির উল্লেখ আছে। কাক কুৎসিৎ পক্ষী, ইহার আকৃতি এবং প্রকৃতি উভয়ই অনভিপ্রেত। যে কারণে কুকুর ছড়ায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেইজন্যই কাকও ছড়ায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে উপকথায় কাকের মূঢ়তা বিষয়ক বহু বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

পূর্বে কতকগুলি প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়া এবং বিবাহের অধিবাস সংক্রান্ত ছড়ায় যে ঘুঘু পক্ষীর নাম বার বারই শুনিয়াছি, তাহা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ ভাবে পক্ষী অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই, সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। ছড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পক্ষীর নাম রূপক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে; তথাপি এই অধ্যায়ে যে সকল পশু-পাখীর এক আধটুকু বাস্তব পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের বিষয়ই আলোচনা করা উদ্দেশ্য। ঘুঘুর কথা বাদ দিলে পক্ষী হিসাবে বাংলার ছড়ায় প্রথমই টিয়া বা তোতা পাখীর উল্লেখ করিতে হয়। ইহাকে নানাভাবেই ছড়ায় আহ্বান জানান হইয়াছে; ইহাকে কখনও টিয়া বা কখনও তোতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার বিশেষ কোন জাতি যেমন চন্দনা কিংবা অন্য কিছুর উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না।

১

আয় আয় টিয়ে
তোর দিব বিয়ে।
রঙীন জামা গায়ে দিয়ে

ঠোঁটে লাল রঙ দিয়ে
যাবি হেঁসে হেঁসে।
আয় আয় টিয়ে ॥—বীরভূম

টিয়ার গায়ের সবুজ রঙটি যেন ইহার একটি রঙিন জামা, ঠোঁটটি যেন লাল রঙে রাঙ্গা। এখানে টিয়ার যে প্রত্যক্ষ বর্ণনাটি শুনিতে পাওয়া গেল, সর্বত্র এমন পাওয়া যায় না। এমন কি, তাহার রঙটি ঘন সবুজ হইলেও তাহাকে লাল গামছা গায় দিয়া আসিবার জন্য বলা হইতেছে—

২

টিয়ে টিয়ে টিয়ে
লাল গামছা দিয়ে,
লাল গামছা লবো না,
তসর কাপড় লব,
তসর করে খসড় মসড় ধোপা বাড়ী যাবো।
ধোবাদের তেল আমলা,
মালীদের ফুল,
এমন ঝোঁটন বেঁধে দিব হাজার টাকা মূল।—হুগলি

পূর্বে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মত একটি ছড়া আমরা শুনিয়াছি—

৩

আয়রে আয় টিয়ে,
ঘোষের পাড়া দিয়ে।
খোকা আমার পান খেয়েছে,
শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে।—২৪ পরগণা

৪

আয়রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভয়া দিয়ে।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে—ঐ

যে টিয়া নায়ে ভরা দিয়া আসে, সে ত আর যাহাই হউক, আকাশচারী নহে। তারপর টিয়া সম্পর্কে আমরা পূর্বেও শুনিয়াছি—

৫

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গোকি আইল দেশে,
টিয়া পাখীতে ধান খাইল খাজনা দিব কিসে।—চট্টগ্রাম

কেবল মাত্র এখানেই টিয়ার আচরণটি বাস্তব হইয়াছে। টিয়ার ঠোঁটের এবং ডানার দুই পাশের লাল রঙটি সিঁদুর বলিয়াও ভ্রম হয়। সেই জন্য তাহার সম্পর্কে সিঁদুরের কথাও আছে—

৬

টিয়ার মার বিয়া,
সিঁথায় সিন্দূর দিয়া।—ঢাকা

টিয়া পাখীকে তোতা পাখী নামেও জানা যায়—

৭

উতরথুন্ আইএর তোতা পাখ লাড়ি লাড়ি।
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা করে চাতুরালী॥
বার্গ্যা বাঁশর আগা নয়' জায়ত বেতর বান।
সেই ঢুলইনে ঢুলায়, যেন পূর্ণমাসীর চান॥—চট্টগ্রাম

৮

উতর থুন আইস্তে তোতা ঠোঁট লাড়ি লাড়ি।
পারার উয়র বইস্তে তোতা করে চতুরালি॥
মায় দিল শংখ সিঁদুর বাপে দিল শাড়ী।
সে শাড়ী উড়াইয়া নিল নিকুঞ্জ বিহারী॥—চট্টগ্রাম

উদ্ধৃত ছড়াগুলি হইতে দেখা যাইবে, তোতাপাখীর বিশিষ্ট আচরণ সম্পর্কে এখানে কোন কথা নাই, যাহা আছে তাহা যে কোন পাখীর সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইতে পারে; কেবলমাত্র রহস্যলোক হইতে উড়িয়া তোতার নামটি এখানে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলিও তাহাই—

৯

আতা গাছে তোতা পাখি,
ডালিম গাছে মউ।
"কথা কও না কেন বউ।"

"কথা কব কী ছলে,
কথা কইতে গা জ্বলে ॥"—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে খোকার সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষীর সম্পর্কের যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে টিয়ারও নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

১০

খোকা মোর লক্ষ্মী।
ধর্যা দিব পক্ষী ॥
খোকা মোর উল্কু।
ধর্যা দিব ঘুঘু ॥
খোকা মোর হাওই।
ধর্যা দিব বাওই ॥
খোকা মোর টিয়া।
খোকার দিব বিয়া ॥
খোকা আমার ময়না।
বৌয়ে চায় গয়না ॥
না দিলে ত হয় না।
খোকা মোর ভাল।
খোকার বউ এলে,
ঘর করবে আলো ॥
খোকা মোর ভাল।
আম কুড়াতে গেল,
আমের জালি নিয়া,
হাসিতে হাসিতে এ'ল ॥—ঢাকা

ময়না ময়না ময়না

টিয়ার পরই ময়নার কথা উল্লেখ করিতে হয়। বাংলায় আমাদের নিতান্ত পরিচিত যে একটি পাখীকে শালিক বলিয়া জানি ইংরেজিতে তাহাকেই common *mayna* বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অবশ্য শালিকের অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে যে শালিকটি আমাদের ঘরের আশে পাশে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়, কাকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াই কাকেরও উচ্ছিষ্ট ভাত খাইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ভাবে ময়না বলিয়া পরিচিত। ইহার মাথাটি কালো, ঠোঁট ও দুইটি পা হলুদ বর্ণ এবং কানের দুইধারে খানিকটা জায়গায় যে লোম নাই, তাহার চামড়াও হলুদ রঙ। ইহার শরীরের অন্যান্য অংশের রং বাদামী। ডানার ভিতর, লেজের অগ্রভাগ ও নীচের দিকটি সম্পূর্ণ সাদা, উড়িবার কালে ইহার সাদা রঙ চোখে পড়ে, কিন্তু বসিয়া থাকিলে ইহার দেহের কোন অংশ সাদা বলিয়া মনে হয় না। ইহাই সাধারণ ভাবে ময়না, শালিখ কিংবা শারি বলিয়া বাংলার ছড়ায় পরিচিত; ময়না বলিতে এখানে সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়ী কিংবা সিঙ্গাপুরী ময়না বুঝায় না। ময়না কথাটির মধ্যে যে উচ্চারণ-গত মাধুর্য আছে, তাহার জন্য ইহা নানা ভাবে নানা উদ্দেশ্যে ছড়ার মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেবল মাত্র বিশেষ পাখী রূপেই ব্যবহৃত হয় নাই। শিশু কন্যাটি যে কারণে অকারণে কেবল মিষ্ট কথা কহিয়া যায়, তাহার ময়না নামটি বড় সার্থক হয়। সেইজন্য ছড়ায় গানে ময়নার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় উচ্চারণ মাধুর্যের জন্য শালিখের পরিবর্তে ময়না শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এখানে ময়নাকে ভাত খাইবার জন্য আহ্বান করিবার সূত্রেই ময়নার মত মুখরা শিশু কন্যাটিকে ভাত খাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে—

১

ছবির পাখী ময়না
টিয়া কথা কয় না
খুকুর খুকুর ময়না
ভাত খাবিত আয় না।—২৪ পরগণা

ইহার আর একটি পাঠ—

কুতুর কুতুর ময়না,
ভাত খাবিত আয় না।

ময়না যে উত্তর দিক হইতে উড়িয়া আসিয়া কুল গাছের শাখা আশ্রয় করিয়া চাতুরালি প্রকাশ করে, তাহা একাধিক ছড়ায় শুনা যায়, চতুরতার দিক দিয়া কাকের পরই ময়নার (common *mayna* বা শালিখ) স্থান—

২

উতরথুন্ আইয়ের্ ময়না,
পাখ লাড়ি লাড়ি।
বরই গাছত্ বৈস্তে ময়না,
করের্ চাতুরালী ॥—চট্টগ্রাম

৩

উতর থেকে এল ময়না
পাখ নাড়ি' নাড়ি',
কুল গাছে ব'সে ময়না
করে চতুরালি।—২৪ পরগণা

আধুনিক একটি প্রবাদ-সংগ্রহে উদ্ধৃত ছড়াটি সংগৃহীত হইয়াছে; বলা বাহুল্য ইহা ছড়া, প্রবাদ নহে এবং এ'কথাও মনে হয়, দুই সংখ্যক ছড়াটি হইতেই প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া ইহাকে একটি আধুনিক রূপ দিয়া উক্ত প্রবাদ সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে; কারণ, দুই সংখ্যক ছড়াটি ষাট বৎসর পূর্বে (সা-প-প, ১৩০৯, পৃঃ ৮৫) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তিন সংখ্যক 'প্রবাদ'টি মাত্র দশবৎসর পূর্বে (সুশীলকুমার দে, 'বাংলা প্রবাদ' ১৩৫৯, প্রবাদ সংখ্যা ৮০৮) প্রকাশিত হইয়াছে।

৪

ও আমার জাদু বাছা কোন্ বনেতে যায়।
পিঞ্জরাতে বসি ময়না চিকন দানা খায়।
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া ন চায়।

বৈলে ধৈর্গ্যো খোবা খোবা।
চিলে মার্গ্যো এক্কৈ ছোপা।
কেয়া রে চিল ছোপ, মারিলি।
সোনার তুআ গোট ভাঙ্গিলি।
সোনা নয় রূপার দলা।
বান্ধা বাড়ীর টেঁয়ার ছালা।—চট্টগ্রাম

যদিও মুখ্যত সতীন কাঁটা দূর করিবার ময়নার কোন সাধ্য নাই, তথাপি ইহাকেই যে এই অনুরোধ জানান হয়, তাহা কেবল মাত্র 'হয় না'র জন্যই—

৫

ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।—ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি যে প্রবাদের লক্ষণাক্রান্ত, এই বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

৬

বক কি কখনও ময়না হয়?
জলের দিকে চেয়ে রয়।—২৪ পরগণা

এখানে ময়না বলিতে বিশেষ গুণসম্পন্ন পাহাড়ী ময়নাই বুঝিতে হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সারি, শালিখ এবং সাধারণ ময়না একার্থ-বাচক, এখানে সাইর বা সারি নাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে,

৭

সাহ'র শুয়া তুয়া পক্ষী গভীন বিলে চরে।
সাইরটা বুলি ডাক দিলে বুক জুড়িয়া পড়ে॥

শুয়া শব্দের অর্থ স্ত্রী-শুক, কিন্তু বাংলার ছড়ায় আসিয়া কল্প জগতের পশুপক্ষী প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়াছে, সেইজন্য শুয়া অর্থে এখানে সারিকা বা স্ত্রী-শালিখ।

৮

সাইর নাচে শালিখ নাচে মাদার পুষ্প খাইয়া,
দুধের ছাওয়াল নাচে মায়ের কোল পাইয়া।—২৪ পরগণা

মাদার পুষ্প শালিখের খাদ্য কি না, তাহা পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতে পারিবেন, কিন্তু মায়ের কোল পাইয়া যে দুধের ছাওয়াল নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা বাংলার ঘরে ঘরেই পরীক্ষিত।

কখনও কখনও শালিক শব্দটিও শুনিতে পাওয়া যায়—

৯

টিম্ টিম্ টিম্
ভাষ শালিকের ডিম্
বাঁশী যদি না বাজিস্
কচু বনে ফ্যালায়া দিব,
গা থাজয়ে মর্ মর্ মর্।—ঢাকা

ইহা প্রকৃত পক্ষে আম আঁটির বাঁশী বাজাইবার ছড়া। বাঁশী যদি কোন কারণে না বাজিত, তবে এই ছড়া বলিলেই বাঁশী বাজিয়া উঠিত বলিয়া শিশু বিশ্বাস করিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, শালিকের অনেক প্রকার জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে গাঙ শালিক, গো-শালিক, ভাত-শালিক ইত্যাদি নাম সুপরিচিত। এখানে রাম শালিকের নাম পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ যে সকল শালিক আকারে একটু বৃহৎ, তাহাদিগকেই রাম শালিক বলা হইয়াছে। লথা পায়রাকে দেখিলে মনে হয়, পায়ে মোজা পরিয়াছে, কারণ, ঘন রোম দ্বারা ইহার পায়ের দিকটা আবৃত, কিন্তু কোন শালিকের তেমন দেখা যায় না, সুতরাং এই বর্ণনার কোন বাস্তব মূল্য নাই—

১০

রাম শালিক রাম শালিক পায়ে দিয়ে মোজা
তেলের ভাঁড়ে চান করে ফিঙে হল রাজা।
বনজাত খায় মাছ মোচড়ায় দাড়ি,
উচিত কথা বলতে গেলে দেয় ঝাটার বাড়ি।—মুর্শিদাবাদ

বর্ণনাটি পড়িলে মনে হইবে ইহাও রূপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিবিধ পাখী

যদিও বাংলার লোক-কথায় টুনটুনি, চড়ুই, কাক ইত্যাদি পাখীর বার বার উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি ছড়ায় ইহাদের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; এমন কি, অন্যান্য পাখী সম্পর্কেও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না, কেবল কোন কোন পাখী সম্পর্কে দুই একবার উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। চড়ুইয়ের সম্পর্কে ইতিপূর্বে একবার উল্লেখ শুনিয়াছি, 'চড়াইতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে।' ইহাতে চড়ুই পাখীর বাস্তব পরিচয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু চড়ুই পাখী সম্পর্কেও এই প্রকার ছড়া আর শুনিতে পাওয়া যায় না। টুনটুনি সম্পর্কে এই ছড়াটিই মাত্র শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—

১

কান কাটার মা বুড়ি,
যায় গুড়িগুড়ি।
এক হাতে নুনের ভাঁড়
আর হাতে তার ছুরি।
কান কাটার মা আসিস্ না,
বড় ছুরি শানাস্ না।
খুকুর দুয়ার মাড়াস্ না।
ঝিনুক বাটি ঝুনঝুনি,
খুকুর সই টুনটুনি।—২৪ পরগণা

এখানেও টুনটুনির বাস্তব প্রকৃতির কোন পরিচয় নাই, কেবল খুকুর ঝিনুক বাটি এবং ঝুনঝুনির সূত্রেই টুনটুনি পাখী এখানে আসিয়াছে। সুতরাং টুনটুনি এখানে নিতান্ত গৌণ। টুনটুনি বিষয়ক আর একটি ছড়া সুদূর চট্টগ্রাম হইতেও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহার মধ্যে কাকের নামও শোনা যায়—

২

টাওনি ডাইলের টুউনি,
হারগউজা গাছর বুউনি।

সাত কাউআ আইএ যায়,
পাড়ার মাঝে খুৎ খায়।
কহরে কাউয়া ভাঙ্গি চুরি চুরি,
কারুতে আছে কারুতে নাই।—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে যে ঐকতান বাদনের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে টুনটুনিরও একটি সামান্য অংশ আছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহা কেবল মাত্র টুনটুন করিয়া তাল ঠোকা, ইহার বেশি কিছু নহে—

৩

কুকুরে বাজায় টুমটুমি,
বানরে বাজায় ঢোল।
টুনটুনিয়ে টুনটুনালো
ইঁদুর বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি,
চেয়ে দেখনা খোকন মণি।—২৪ পরগণা

ঘুঘু পাখীকে শিক্ষা দিতে নিজে অসমর্থ হইয়া ভ্রমরকে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে আহ্বান জানান হইতেছে—

৪

ভ্রমর ভ্রমর রসিয়া,
তেঁতুল ফুলে বসিয়া।
ভ্রমর তুমি অমর হও,
ঘুঘুকে তুমি শিক্ষে দাও।—হুগলি

কিন্তু নিরীহ পক্ষী ঘুঘু কি যে অপরাধ করিল, তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যাইতেছে না, তবে ভ্রমরকে যখন শিক্ষাদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে, তখন অপরাধও যে একটা খুব গুরুতর নহে, তাহা অনুমান করিতেও বেগ পাইতে হইতেছে না।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটিতে সাধারণভাবে পাখীর কথাই বলা হইতেছে, কোন বিশেষ পাখী নহে।

৫

ঝোঁটা বান্ধে কোঁটা দি,
জাত মরিচর আগা দি।
যদি ঝোঁটা লড়িবি,
পাখীর হাতত পড়িবি।
পাইখ বেটা জোলাইয়া,
ঝোঁটা নিল উড়াইয়া। —চট্টগ্রাম

৬

এচি মেচি ধান টেল,
ধানর ভিতর বিলাই পৈল।
পক্ষীরাজ মাছ মারে,
ধোড়া সাপে লেজ নাড়ে।
এল ভাত বেল ভাত,
রাজা কহে যে চুরির হাত কাট।—ঐ

পক্ষীরাজ মাছ মারে দেখিয়া ধোড়া সাপের লেজ নাড়া কিছুই অসঙ্গত নহে, কিন্তু ধানের ভিতর যে কেন 'বিলাই' বা মার্জার পড়িতে যাইবে, কারণ, ইহা তাহার খাদ্য নহে, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না।

নিম্নের ছড়ায় পাখীটির নাম শুনা যাইতেছে হীরামন। ইহা কল্পলোকের পাখী, বাস্তব লোকের নহে—

৭

সাধ করি পালিলুম পাখী নামে হীরামন।
পিঁজরাত থাকি রে পাখী ডাকে ঘন ঘন॥—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটিতে হুট্ টুমাটুম নামক পাখীটিও কল্পলোকের জীব বলিয়াই মনে হইতেছে—

৮

তাল গাছেতে হুট্ টুমাটুম হুলো পাঁদারু।
চোত মাসের গরমিতে মলো মাগরু॥

তোমাদের কিসের আনাগোনা।
কুণ্ডলতার বাপ এসেছে তাক্ ধিনা ধিনা ধিনা॥—বর্ধমান

ইহাই নিম্নোদ্ধৃত আধুনিক ছড়াটিতে হাট্টিমাটিম হইয়াছে—

৯

হাট্টি মা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম্ টিম্।—যোগীন্দ্র

বলা বাহুল্য, এমন অভিনব বর্ণনা যুক্ত পক্ষী সম্পর্কিত কোন ছড়া বাংলার কোন অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হয় নাই, ইহা আধুনিক মুদ্রিত একটি ছড়া শ্রেণীর রচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্র-সংগ্রহে পাখীটির নাম হুতুমথুমো হইয়াছে, হুতুমথুমো হুতুম পাখী হওয়াই সম্ভব—

১০

তাল গাছেতে হুতুমথুমো কাল আছে পাঁদারু।
মেঘ ডাকছে ব'লে বুক করছে গুরু গুরু॥
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
উড়ে মেড়ার বাপ আসছে দিদিন্ ধিনা ধিনা॥ —রবীন্দ্র-সংগ্রহ

আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ বক পক্ষীটি সম্পর্কেও দুই একটি ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

১১

বক মামা বক মামা টিক দিয়ে যাও,
গোলাভরা ধান আছে দুটি নিয়ে যাও;
আমার নখেতে একটা টিক দিয়ে যাও। —মুর্শিদাবাদ

১২

বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যা,
নারকেল গাছে কড়ি আছে গুণে নিয়ে যা।—যোগীন্দ্র

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে বক প্রথমতঃ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পরে বাস্তবের জগতে একাকার হইয়া গিয়াছে—

১৩

বগাবগী হাটে গেছে কিন্যা আনছে কই,
বগায় মাথায় বোঝা থুইয়া বগী গেছে কই ?
ও বগী, তুই বাড়ীত আয়,
তোর দুইটি ছাও কান্দে আধারি চায়।
নিত্যি নিত্যি খায় রে বগী ঝিলে আর বিলে,
আইজ বুঝি গেছে বগী ক্ষীরোদ নদীর কূলে।
ক্ষীরোদ নদীর কূলে গিয়া ধরছে শউলের পোনা,
মাড়ুর মুড়ুর ভাঙছে পোনা রক্তে দিছে থানা।
ও বগী তুই বাড়ীত আয়।
তোর দুইটি ছাও কান্দে আধারি চায়। —ঢাকা

ময়ূর পক্ষীটিকে বাংলাদেশে সচরাচর বড় দেখা যায় না, তথাপি তাহার নৃত্যের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়—

১৪

বুনো ওল বাধালো গণ্ডগোল
আনারসকে নিন্দা করে,
ময়ূর পাখীর নৃত্য দেখে
কাল পেঁচাতে লেজ নাড়ে। —২৪ পরগণা

বৌ কথা কও পাখীটি পূর্ব বাংলায় চৈতার বৌ বলিয়া পরিচিত, তাহার নামেও ছড়া আছে, ছড়াগুলির মধ্যে তাহার ডাকটির অনুকরণ করা হয়—

১৫

চৈতার বৌ লো ছাতু দে লো॥
পচা ছাতু খামু না লো॥
ছাতুর মধ্যে আঠালি
কত রঙ্গ দেখালি॥ —ঢাকা

১৬

চৈতার বৌ গো;
টাকা দে গো।

কাঁঠাল পাকে
লোকে দেখে। —মৈমনসিং

কুর্গাল পাখী মৎস্যখাদক, পূর্ব বাংলার খাল বিলের ধারে বাসা করিয়া থাকে, চিলের মতই ইহার স্বভাব, তবে চিল অপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং অধিকতর শক্তিশালী। তাহার সম্পর্কে একটি ছড়া এই—

১৬

খাল কূলে কূলে লাগাইলম কচু
কুর্গালে কৈল বাসা,
অজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ করি
গায়ে নো সহিল কথা। —চট্টগ্রাম

কুর্গাল পাখীই কোড়াল পাখী বলিয়া পরিচিত, তাহার সম্পর্কেও ছড়া আছে। চট্টগ্রামে প্রচলিত একটি ছড়ার এই ভাবে পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

১৭

কোড়াল বলে কোড়ালী এ'বার বড় বান,
উঁচু ক'রে বাঁধো ভিটে খুঁটে খাবো ধান।
ধান খাবো না পান খাবো না খাব সরের নাড়ু,
দুই হাত ভরিয়ে দেব সুবর্ণের খাড়ু।
সুবর্ণের খাড়ু না রে এ যে দেখি রাঙ,
কোথা যেয়ে পাবো আমি পদ্মাবতীর গাঙ্।
পদ্মাবতীর গাঙ দিয়ে সাধুর নাও চলে,
আড়াই কুড়ি ডিম লয়ে কোড়াল ডাক ছাড়ে।—যোগীন্দ্র

লেজ ঝোলা নামক পাখীটির কথা একাধিক ছড়াতে পাওয়া যায়। লেজ ঝোলা শব্দটি বর্ণনাত্মক, অর্থাৎ দীর্ঘ পুচ্ছ বা যাহার লেজ ঝুলিয়া আছে, ইহা দ্বারা তাহাই বুঝায়। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর পাখীকে Bird of paradise বলা হয়; বাংলাদেশে ইহাদিগকে বিশেষ দেখা যায় না, সুতরাং বাঙ্গালী শিশুর নিকট ইহা অবাস্তব। পক্ষীটি নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেইজন্য ইহা স্বপ্নলোকের অধিবাসী হওয়াই সম্ভব। এই ছড়াগুলি প্রকৃতপক্ষে ঘুমপাড়ানি ছড়া, কিন্তু

তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে পাখীর সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের উল্লেখ করা হয় বলিয়া এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১৮

আয়রে পাখী লেজঝোলা
গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা ॥
আয়রে পাখী হুমো।
খোকাকে নিয়ে ঘুমো ॥
খাবি আর কলকলাবি।
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি ॥—বর্ধমান

১৯

আয় রে পাখী লেজঝোলা,
খোকাকে নিয়ে কর খেলা।
খাবি দাবি কলকলাবি,
খোকাকে তুই খেলা দিবি।—মেদিনীপুর

২০

আয়রে পাখী আয়।
আমার গোপালকে দেখ্‌সে আয় ॥
আয়রে পাখী হুমো।
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো ॥
আয়রে পাখী লেজ ঝোলা।
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা ॥—বাঁকুড়া

পায়রার কথাটি পূর্বে একবার বলিয়াছি,—

২১

খকন খকন পায়রাটি কোন বিলেতে চর,
খকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড়।—বাঁকুড়া

বাস্তব জগতের কুৎসিৎ আকৃতি কাকটির কথাও কখনও কখনও স্মরণ করা যে না হয়, তাহা নহে, তবে ইহার দৃষ্টান্ত বড় বিরল—তবে খোকাকে খেলা দিবার ও ভাত খাওয়াইবার বেলায়ই ইহাকে সাধারণতঃ স্মরণ করা হইয়া থাকে—

২২

আয়রে কাগা বস্‌রে ডালে
ভাত দিব তুকে সোনার থালে,
খাবি দাবি কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে খেলা দিবি।—বীরভূম

২৩

কা কা কা কাকের ছানা,
ভাত খায় না খোকন ধনা।
কাগা বগা আয় আয়,
দেখ্‌সে খোকা ভাত খায়।—ঐ

কখনও কখনও রূপক অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়—

২৪

কাক ঝি ঝি বকুল-বিচি,
কাকের গলায় শিকল গাছি ;
শিকল ধরে দিলাম টান,
ঝিঁ ঝিঁ ভেঙ্গে খান খান।—যোগীন্দ্র

২৫

কাউয়া ভাই কা-কা ;
তুইখার মারে লইয়া যা ;
কোন্ দিন আইবে কইয়া যা।—মৈমনসিং

'কালো জামা গায়' পাখীটি কাক হওয়াও অসম্ভব নহে, তবে পিছের ঘাঘরি ফাটা বলিয়া ফিঙ্গে বলিয়াও সন্দেহ হওয়াও সম্ভব—

২৬

আয়রে পাখী আয়,
তোর কালো জামা গায় ;
তোর পিছের ঘাঘরি ফাটা
চন্দ্র নূপুর পায়,
আয়রে পাখী আয়।—২৪ পরগণা

দুধকলা আহারকারী 'চঞ্চলা' নামক কোন পাখী আছে বলিয়া জানা যায় না, তবে খঞ্জনের স্বভাবটি চঞ্চল বলিয়া ইহাকেও এখানে মনে করা হইতে পারে, তবে দুধকলা ত খঞ্জনের খাদ্য নহে !—

২৭

আয়রে পাখী চঞ্চলা,
খেতে দেব দুধ কলা।
আসবি যাবি খেল খেলাবি
খোকাকে নিয়ে খেলা করবি।—মেদিনীপুর।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় টেকা নামক বনে পাখীর বাসাটির কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

২৮

আয় আয় রে যাই চটা,
টেকা বনে তোর বাসা।
আমার খোকন বড় হটিয়া
ভাঙি দিব তোর বাসা।—মেদিনীপুর

করলী পাখীটি যে কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না, কোড়াল নামক মৎস্যখাদক এক শ্রেণীর পাখী আছে, ইহা তাহা কিংবা পূর্বে যে কুর্গাল নামক পাখীর উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহাও হইতে পারে ; কিন্তু বর্ণনাটি হইতে মনে হয়, পাখীটির নাম ঠোঁঠাও হওয়া অসম্ভব নহে, ঠোঁঠী শব্দের অর্থ দীর্ঘ ঠোঁট যুক্ত—

২৯

ঠোঁঠী ঠোঁঠ কড়লী আঠার বিলে চরে,
তহত ঠোঁঠীর পেট ন ভরে চোমর বিলাস করে।—চট্টগ্রাম

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে ফিঙ্গের বাসার ঠিকানাটি সংগ্রহ করা হইতেছে, সম্ভবতঃ যাদুর বিয়েতে তাহার নামে নিমন্ত্রণ পত্র যাইবে—

৩০

ফিঙ্ ফিঙ্গেটি বাবুই হাটি কোন্‌খানে তোর বাসা,
আমার যাদুর বিয়ে হবে বৌটি হবে খাসা।—পাবনা

বাদুড়কেও পাখীর মধ্যেই ধরিতে হয়, ইহারা স্তন্যপায়ী হইলেও দুইখানি ডানা লইয়া উড়িয়া বেড়ায়, সুতরাং ইহারা পাখী ছাড়া আর কি? ইহাদের সম্পর্কেও ছড়া শুনিতে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নহে—

৩১

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে,
টোপর মাথায় দে।
তোরা দেখতে যাবি কে?
চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংরা কাঠি দে।—২৪ পরগণা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে বাদুড় অর্থে শিশুকে বুঝাইতেছে—

৩২

বাদুড় বাদুড় কলা তিতা,
তোর শাশুড়ী আমার মিতা;
অলি অলি বাদুড়ের ছাও,
তোমার মা ঘরে নাই শুয়ে নিদ্রা যাও।—যোগীন্দ্র

৩৩

পুকুরের দহিন পারে লাগাইয়াছি ধন্যা,
ছোডু কালে বিয়া করি ফেলাই গেল কন্যা।
পুকুরের পুব পারে লাগাইয়াছি খাজুর,
তারে খাইক ফেলায় চেওচ্চা উবাস্যা বাদুড়।
পুকুরের উত্তর পারে লাগাইয়াছি কলা,
পাতা কাডি ভাত বাড়ি ডাইক্কা ভাঙ্গি গলা।—চট্টগ্রাম

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগ্রহে ইহাই এই পরিবর্তিত রূপ লাভ করিয়াছে—

৩৪

পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইয়াছি ধন্যা,
বাছি বাছি তুলে পুষ্প রাজকুমারী কন্যা।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইয়াছি বট,
বিয়া করে রেখে আসে মাথার মুকুট।

পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি খাজুর,
খাজুর খেয়ে চোছা ফেলে পাপিঠ বাদুড়।—যোগীন্দ্র

৩৫

আয়রে আমার সাধের হাঁস—তই তই তই,
হল্‌দি ঘি না বাট্যা থুইছি তোরা রইলি কই?
সকাল সকাল বাড়ীত আয়,
ঘাটের পথে হিয়াল চায়।
কুড়াল পক্ষী চাহিয়া রইছে ধইরা লইয়া যায়,
আয়রে আমার সাধের হাঁস সকাল সকাল আয়।—ঢাকা

৩৬

বালি হাঁস কড়্ কড়্,
আণ্ডা পাড়ে ঝর্ ঝর্।
উগ্‌গা আণ্ডা পাইলাম গো,
চালে গুইজ্যা থুইলাম গো।
চালে আইল চাল কুমড়া,
বেড়াত আইল ঝিঙ্গা,
কানা ছেড়ির বিয়ার মইধ্যে
কুত্তায় বাজায় শিঙ্গা।—ঢাকা

মাছ ধরনে যাব

মাছের মত প্রিয় বাঙ্গালীর আর কিছুই নাই; ইহা খাইতে আনন্দ, দেখিতে আনন্দ, ধরিতে আনন্দ, ইহার কথা ভাবিতেও আনন্দ। অতএব এ'হেন বস্তু ছড়ার মধ্যে স্থান লাভ করিবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মাছ ধরিতে যাওয়ার কল্পনাটির মধ্য দিয়াই শিশুচিত্তের উল্লাস যেন সহস্রধারায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে—

১

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারেতে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

মাছের কাঁটা পায়ে ফুটিলে যদি দোলায় চড়িয়া যাইবারই সুযোগ পাওয়া যায়, তবে সেই কাঁটা ইচ্ছা করিয়াই সকলে পায়ে ফুটাইতে চাহিবে—

২

আয়রে পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরনে যাব,
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলে দোলায় চড়ে' যাব।
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি,
গণতে গণতে বাপের বাড়ী।
বাবা দিল সরু শাঁখা মা দিলে চুড়ি,
খপ্ করে' মা বিদায় কর বৃষ্টি এল ভারী।—২৪ পরগণা

৩

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ মারনে যাবি।
মাছের কাঁটা ফুটলে পায় দোলায় চেপে যাবি॥
দোলায় আছে দু'পোণ কড়ি গুণ্‌তে গুণ্‌তে যাবি॥
ছোট শাঁখ বড় শাঁখা ঝুমুর ঝুমুর করে।

এক তোলা খয়ের খেয়ে দাঁত ফর্ ফর্ করে।
আর এক তোলা খয়ের খেয়ে দুর্গা হেন জলে॥
দুর্গা হেন জলটুকু ঝিকিমিকি করে।
তাতে ব'সে বাপু ঠাকুর কন্যা দান করে॥
কন্যা দান কর্‌তে কর্‌তে চখে এলো কলু।
ধর বাবা লাল গামছা মোছ বাবা মু॥—বর্ধমান

মাছ ধরিতে ধরিতে যে ছেলের পাল কতদূর চলিয়া যাইত, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়—

৪

আয় রে রে ছেলের বাতা মাছ ধরনে যাব।
মাছের কাঁটা পায় ফুটলে দোলায় চড়ে যাব॥
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গুন্তে গুন্তে যাব।
ছোট শাঁখা বড় শাঁখা রুনুঝুনু বাজে।
দুর্গা হেন জলটুকু ঝিকিমিকি করে॥
তাতে বসে বাবা খুড়ো কন্যা দান করে।
কন্যা দান কত্তে কত্তে চোখে পড়ল লো।
হাত পেতে নাও গামছা চোখের পুছলো॥
আজ থাক রে বর কনেরা ষষ্টি মধু খেয়ে।
কাল যাবে রে কনেরা সংসার কাঁদিয়ে॥
আগে কাঁদে মাসি পিসি তার পর কাঁদে পর।
কান্‌তে কান্‌তে গেল খুড়ো ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
ও খুড়ো তুই পুড়ে মর॥
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর॥
এই থানটি খেলেছিলাম ভাড় টাঠি নিয়ে।
এই থানটি রুধে দাও ময়না কাঁটা দিয়ে।
চাঁদ উঠল, ফুল ফুটল ঝলক মলক দিয়ে।
তর বেটা পান-খেয়েচে শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে॥—বাঁকুড়া

তবে একটি বিষয়ে ছড়াগুলির মধ্যে একটি ঐক্য দেখা যায় যে, মাছ ধরিতে ইহাদের মধ্যে সর্বত্রই কন্যাদানের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে—

৫

আয় আয় রে টকামনে মাছ ধরতে যায়।
মাছের কাঁটা পায় পশনে দলায় উঠ্যা রইব ॥
লাড়াগাছে ঝাড়া দিলে ফুল নাইক পড়ে।
তুলসিমঞ্চে জল দিলে বত্রিশ টাকা ঝড়ে ॥
বত্রিশ টাকার ঘি কলসি গো সরু চাউলের ভাত।
রাম যাইছন ব্যা হইতে ষোল পোর বাপ ॥
এ্যাত টাকা লিলু বাফ্ দিলু বুড়া বরে।
আর যেদি লিতু দুটাকা দিতু ভাল ঘরে ॥
খাইত চির কাল।—মেদিনীপুর

মাছের রাজা রুই কাতলা, জলের মধ্যে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেও বুঝি আনন্দ আছে; কিন্তু ছড়ার মধ্যে কোন চিত্রই যেমন স্থায়ী হইতে পারে না, এখানেও রুই কাতলার আনন্দ ছবি বুদ্‌বুদের মত মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়—

৬

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন রেখেছে
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে ॥
দু-পারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে ॥
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।
ঝুমু ঝুমু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে ॥
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান দে, বকুলতলা দে ॥
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা ॥
সীতেনাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব।

চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা, জল পাব চিতপুরের মাঠ॥
চিতপুরের মাঠেতে বালি চিকচিক করে।
সোনা-মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥—রবীন্দ্র-সংগ্রহ

মাছ ত কতই আছে, কিন্তু ইলিসের মত মাছ কোথায়? ইহা রাজভোগ্য মাছ, ইহার বন্দনায় বাঙ্গালী মাত্রই মুখর হইয়া উঠে—

৭

রাজার ভুঞ্জনী মাছ, অতিথ ভুলাও রে মাছ,
রান্ধনী-পাগল মাছ ইলিশারে॥
ইলিশ উঠিয়া বলে খলিসা রে ভাই,
উজান রাজ্যি ছাইড়্যা চল ভাইট্যাল রাজ্যি যাই,
মাছ ইলিশারে॥
ভাইট্যাল রাজ্যি গিয়া ইল্‌শা ফিরে ঘাটে ঘাটে,
এই ইলিশ বন্দী অইল সোনার ঝাঁকি জালে,
মাছ ইলিশারে॥
ইলিশা লইয়া জালো ফিরে বাড়ি বাড়ি,
সেই ইলিশার দাম হইল সোনায় একুশ ভরি,
মাছ ইলিশারে॥
ইলিশ কাটিতে কন্যার দা-য়ে নাই সেই ধার,
হাতের ভাঙ্গ্‌ল শঙ্খচুড়ি গলার ছিঁড়ল হার,
মাছ ইলিশারে॥—মৈমনসিং

খল্‌সে মাছটির গায়ে রঙ বে-রঙের আঁষ থাকে, দেখিলে মনে হয়, যেন একটি শাড়ী পরিয়া আছে, সেইজন্য ইহার সম্পর্কে খল্‌সে রাণী কথাটি বড়ই উপযোগী, কথাটি শুনিলেই ইহাকে স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়—

৮

আলো লো খলসে রাণী, চিনা ক্ষেতে হাঁটু পানি,
মেঘ কৈ হল লো
চিনা ক্ষেতে বোয়াল মাছ, বেঙা বেঙি পেয়ে লাজ
মুচ্‌কি হাসে লো।—নদীয়া

টাট্‌কা খয়রা মাছটিও ছড়ার রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাও উপেক্ষিত হয় নাই—

৯

তোরা মাছ নিবি রে পাড়ার গেরোস্তরা,
আমার জেলে মাছ ধরেছে টাটকা খয়রা।
মাছ ধরে দেব না ও মাছ ধরে দেব না,
বাড়ীতে আছে কচি ছেলে আসতে পাব না।—মুর্শিদাবাদ

চেলা মাছ পাবদা মাছ ইহারাই বা কতটুকু মাছ? কিন্তু ইহাদের সঙ্গেও একটি যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, ছড়ায় তাহাও স্মরণ-যোগ্য—

১০

চেলা মাছ খেলা করে
পাবদা মাছের দাড়ি
কোন্ রাস্তায় যাব রে ভাই
বীরেন স্যাকরার বাড়ী।—২৪ পরগণা

পুঁটি মাছের মত ক্ষুদ্র জীব আর নাই, তথাপি ইহার মুক্তার মত উজ্জ্বল দুইটি চোখ, রূপার পাতের মত আঁষগুলি সহজেই আমাদের হৃদয় মন দুই-ই হরণ করিয়া লয়। তাহার কথাও ছড়ায় বাদ যাইবার নয়—

১১

ছা পুঁটি ছা,
বগলা কুটি খা।
বগলার পেটের ভিতর কৈ মাছের ছা,
ভাল করে খা
ছা পুটি ছা।—২৪ পরগণা

বর্ষার নূতন জল পাইলে পুঁটি মাছ তাহাতে অগণিত ডিম পাড়ে—

১২

উত্তরেতে জগোমগো পশ্চিমেতে বান,
পুঁটি মাছ ডিম পেড়েছে পাহাড় সমান। —রাজশাহী

চিতল মাছটিও বাঙ্গালীর সুপরিচিত, একটি খেলার ছড়ার সূত্র ধরিয়া চিতল মাছটির কথাও ছড়ায় আসিয়া গেল।

১৩

নালারে ছাইলা পি'ল্যা দু'ম্মা এসেছে।
দুম্মার মাথায় লীল টুপি দাদা দেখ্যাছে।
দুটা চিতহল মাছ ভাইসা উঠ্যাছে।
একটা লিলে জগৎরাণী একটা লিলে টিয়া।
টিয়ার মাকে বিয়া করি লাল শাড়ী দিয়া।
শাড়ী লিবনারে লিবনা তসর আইন্যা দে।
তসর করে ঘসর ফসর ডুলি আইন্যা দে।
ডুলিতে ঢোঁড়া সাপ ফোঁস মার্যাছে।
কাঁদিস্ না টে কাঁদিস্ না যাস্ মায়ের বাড়ী
মায়ের বাড়ী তেল সিন্দুর পরের বাড়ী ফোক্কা।
কি লক্ষ টাকার খোপ্পা। —ঢাকা

শিবের গাজনের মধ্যেও কাতলা মাছের কথা আসিয়া পড়িয়াছে; গাজন উৎসবে, পূজায় পার্বণে মাছের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নাই।

১৪

আমরা দুটি ভাই,
শিবের গাজন গাই।
একটি করে পয়সা পেলে,
দক্ষিণে চলে যাই;
দক্ষিণের মেয়েগুলি নাইতে নেবেছে,
দু'ধারে দু'টি কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে,
দাদাগো বড্ড লেগেছে। —২৪ পরগণা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় কাতলা মাছের কথা না থাকিলেও উপরি-উদ্ধৃত ছড়ার সুরটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—

১৫

আমরা দুজন ভাই,
অড়হর কড়াই খাই ॥
গাড়ীর পিছে বাড়ি দিলে,
পাল্কী চ'ড়ে যাই।
ভাই আমরা গরীব লোক
পাল্‌কি চড়ে যাই ॥ —২৪ পরগণা, সুন্দরবন

মাছের কথা বলিলাম, কিন্তু এইবার ব্যাঙের কথাও বাদ দিতে পারি না, ছড়ার মধ্যে ব্যাঙের একটি বিশেষ স্থান আছে, ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি স্বভাবতঃই শিশুর কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্যাঙের মধ্যে নানা জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যাঙ কট্ কট্ করিয়া শব্দ করে বলিয়া তাহাদিগকে করকট্ ব্যাঙ বলে।

১৬

সাত তাঁতি কর্‌কট ব্যাঙ্
মাতির পাতে বাছুর ঠ্যাঙ্গ। —২৪ পরগণা

ব্যাঙের এই বীরত্ব কাহিনীটিও শুনিতে পাওয়া যায়—

১৭

তাঁতির বাড়ী ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা ;
খায় দায় গান গায়, তাইরে নাইরে না।
সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ঘনাল,
আক্রাবাড়ী নিয়ে তাঁতী ব্যাঙের ছা মারিল।
আজিডেঙ্গা কাজিডেঙ্গা মধ্যে ধনে খালি,
যেখান হ'তে এ'ল ব্যাঙ্গ চৌদ্দ হাজার ঢালি।
হুগলির সহরের ভাই ব্যাঙের অভাব নাই,
যেখান হ'তে এল ব্যাঙ সনাতন সেপাই।

স্থতা নাতা নিয়া তাঁতী চলল মণির হাটে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ আগুলিল পথে।
স্থতানাতা নিয়া তাঁতী উঠিল গিয়া ডালে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ থাপ্‌পর মারল গালে।
স্থতানাতা নিয়া তাঁতী নাম্‌ল এ'সে ভূঁয়ে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ মার্‌ল লাথি মুয়ে।
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতী যায় গড়াগড়ি,
চৌদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতী করে হাই ফাঁই,
না মার না মার মোর তাঁতীরে গোঁসাই। —যোগীন্দ্র

ব্যাঙের ডাককেই ব্যাঙের বাঁশী বাজানো বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

১৮

আয়রে পরিহান পাখী, খাঁচায় করে রাখি,
সাপের গলায় ফুলের মালা, ব্যাঙে বাজায় বাঁশী ॥—ঐ

১৯

ইজির বিজির জিজির-খা,
পরজাপতি উড়ে যা।
সাপের মাথায় কণ্ঠমালা
ব্যাঁঙে বাজায় বাঁশি,
ঘোগ্‌রা পোকে নিত্য করে চল্‌ল গয়া কাশী।—ঐ

২০

হাতী ব্যাঙ ও ছুঁচোর একটি সংলাপও শুনা যায়—

ব্যাঙ। কুলোকানী ম্‌লো দাঁড়ী ডিঙ্গিয়ে গেলি মোরে?
হাতী। থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাব্‌ড়া নাকী ধর্মে রেখেছে তোরে।
ব্যাঙ (ছুঁচোর কাছে গিয়া)
গন্ধ ভুরভুর কর্পূর দাস, আমার নাকি থ্যাবড়া নাক?

ছুঁচো। ঘরে যাও রূপে বিদ্যাধরী,
ছার কথা কি ধরাট করি ?—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় ঐকতান বাদনের চিত্রটিও মনোরম—

সোনার ব্যাঙ তান ধরেছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ,
চিংড়ী মাছে বাজায় তবলা ছড়ায়ে দু'টি ঠ্যাঙ্।
কাতলা মাছ বাজায় বাঁশি, রুই বাজায় কাঁসি।
আড় নয়নে তাকায় বসে বাঘের বিড়াল মাসী॥ —বীরভূম

সপ্তম অধ্যায়

অতি-প্রাকৃত

আদিম সমাজ হইতেই এই বিশ্বাস প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট প্রাকৃত জগতের অন্তরালেও একটি অদৃশ্য শক্তি বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি, এমন কি, মানুষের সুখ দুঃখও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মানুষের মধ্যে আত্মার অস্তিত্বের অনুভূতি হইতেই সর্বপ্রথম এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল ; কারণ, আদিম মানব দেখিতে পাইল যে, আত্মা বা প্রাণহীন মানুষ জড়ের তুল্য এবং আত্মাযুক্ত বা প্রাণবান্ লোক সক্রিয়। সুতরাং আত্মাই সকল ক্রিয়া(action)র মূল। মানুষের পক্ষে ইহা যেমন সম্ভব, প্রাকৃত জগতের পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে ; কারণ, প্রাকৃত জগতের মধ্যেও দেখা যায়, গাছ অঙ্কুর হইতে মহীরূহে পরিণত হইতেছে ; নদী, উপনদী মহানদীতে পরিণত হইতেছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যেও আত্মারূপী একটি শক্তি অদৃশ্য থাকিয়া ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়াছেন, এই প্রকার অদৃশ্য কিংবা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের নামই ধর্ম। নদীকে উদ্দেশ্য করিয়া বাংলায় ভাদুলী ব্রতে ব্রতিনীরা যখন বলে,

নদী নদী কোথা যাও,
বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও।

তখন নদীর যে নিরুদ্দিষ্ট বাপ এবং ভাইয়ের সংবাদ দিবার শক্তি আছে, তাহাই বিশ্বাস করা হইয়া থাকে, নদীর এই অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের নাম ধর্ম। উচ্চতর ধর্মবিশ্বাসে ঈশ্বরও একটি অলৌকিক শক্তি, সুতরাং ঈশ্বর বিশ্বাসও ধর্ম। জড় জগত সম্পর্কিত এই অলৌকিক বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া বাংলায় নানা ব্রত, পার্বণ ও ধর্মোৎসব জন্মলাভ করিয়াছে।

সমাজের উপরিস্তরে ধর্মচিন্তার যে ধারা উপনিষদ-দর্শন-স্মৃতি ও শ্রুতির পথ বহিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় লাভ করা সহজ। কিন্তু ইহা অনেক সময় বহির্মুখী পরিচয়ের ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া অন্তরের উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠিতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান এক বিষয়,

ধর্মের সত্য সম্বন্ধে উপলব্ধি আর এক বিষয়। ভারতীয় ধর্মের তত্ত্ব ও তথ্য লিখিত শাস্ত্রের বিষয় হইয়াছে বলিয়া তাহা পাঠ করিয়া সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজসাধ্য হইলেও, তাহার সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া জীবনে তাহা আচরণ করা সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নাই। অথচ এ কথা ত আমরা সহজেই অনুভব করিতে পারি যে, ধর্মের আবেদন মস্তিষ্কে নহে, বরং হৃদয়ে। কিন্তু যে ধর্মচিন্তা লিখিত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই হৃদয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে। আজ পৃথিবীর বহু উচ্চতর ধর্ম তাহাই হইয়াছে। কিন্তু ধর্মের আশ্রয় ব্যতীত সমাজ-বন্ধন সুদৃঢ় হইতে পারে না, এ কথাও আমরা বুঝিতে পারি। সুতরাং এ কথা মনে হইতে পারে যে, সমাজের উপরিস্তরে ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানগম্যই হইয়া থাকে, তবে সমাজের বন্ধনই কি ভাবে রক্ষা পাইতেছে?

এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, আজ ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপরিস্তর নিতান্ত শিথিলবদ্ধ, একদিন ইহার মধ্যে যে সুদৃঢ় সংহতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ ইহার মধ্যে তাহা আর নাই। নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা তাহার কারণ বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও, নাগরিক জীবন হইতে ধর্মের উপলব্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই এই বিষয়টি ত্বরান্বিত হইয়াছে। কিন্তু নাগরিক জীবনই ভারতীয় জীবনের একমাত্র পরিচয় নয়; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আজ ভারতীয় সমাজ-জীবনে ধর্মবোধের অস্তিত্ব থাকিত না। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সর্বক্ষেত্রেই ধর্মবোধ বিলুপ্ত হইবার জন্য নাগরিক জীবনকেই একমাত্র দায়ী করা যায় না। কারণ, ভারতবর্ষেই এমন নাগরিক সমাজও আছে, ধর্মবোধ দ্বারাই তাহার সংহতি এখনও রক্ষা পাইতেছে। দক্ষিণ ভারতের নগর-নগরীগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। ইহার কারণ, ধর্মমন্দির কেন্দ্র করিয়াই সে দেশের সমাজ-জীবন একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল—শিল্প-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া নয়। একদিন ধর্মসংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই সেই নাগরিক জীবনের সমাজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাহার ঐতিহ্যের ধারা আজ পর্যন্ত সেখানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতের অধিকাংশ নগর-নগরীই শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তি করিয়া গড়িয়াছিল; এমন কি, যে সকল নগর একদিন নিতান্ত ধর্মকেন্দ্রিকও ছিল, ভারত ইতিহাসের মধ্য যুগের

অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের সময় তাহাদের সমাজ-সংহতি নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে, ক্রমে তাহাদের মধ্যেও শিল্প-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়া তাহাদের মৌলিক পরিচয় লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্যেও সামাজিক সংহতি আজ আর রক্ষা পায় নাই।

ইহাই যদি ভারতীয় উচ্চতর সমাজজীবনেব পরিচয় আজ হইয়া থাকে, তবে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ আজ কিসের উপর দাঁডাইয়া আছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, সমাজের পরিবর্তন ইহার উপরিস্তরে যতখানি সহজে সম্ভব হয়, ইহার নিম্নতর স্তরে তত সহজে সম্ভব হয় না। উপনিষদ-দর্শন-স্মৃতি-শ্রুতি যে সমাজকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার অগ্রগতির পথে যে বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহাব ভিতব দিয়া তাহার একটি মৌলিক আদর্শ অবিচল থাকিতে পাবে নাই। কিন্তু এই সমাজের বাহিরে আরও একটি সমাজ আছে এবং চিরকালই ছিল, তাহাব জীবন ও ধর্মচিন্তার যে একটি পরিচয় আছে, তাহা বহুলাংশে অবিচল হইয়া আছে বলিলেও ভুল করা হয় না। সেই সমাজটির পবিচয় আমরা জানি না। কারণ, একদিকে ইহার প্রতি আমাদের সহানুভূতির এবং অন্যদিকে ইহাব বিষয়ক লিখিত তথ্যাদির অভাব। ভারতের ধর্মচিন্তা বলিতে যে আমরা বেদ-উপনিষদ-স্মৃতি-পুরাণ বুঝি, ইহার কারণ, ইহাদেব সম্পর্কে লিখিত তথ্য আমাদেব সম্মুখে আছে, কিন্তু এই সম্পর্কে এই কথা মুহূর্তেব জন্যও চিন্তা করিয়া দেখি না যে, নিতান্ত মুষ্টিমেয় সমাজকে আশ্রয় কবিয়া এই লিখিত শাস্ত্রেব বিকাশ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের কতখানি যোগ আছে? এখনও ভারতীয় সমাজের সংহতি সমাজের যে সুবৃহৎ অংশের মধ্যে রক্ষা পাইতেছে, কোন্ শক্তি সেখানে সক্রিয় থাকিয়া তাহাব সংহতি রক্ষা কবিবাব কার্যে সহায়ক হইয়াছে?

বাংলাদেশের কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নাগরিক জীবনের অন্তরাল দিয়াও গ্রামীণ সমাজেব এমন একটি জীবনধারা প্রবহমাণ রহিয়াছে যে, তাহার মধ্য দিয়াই বাংলার সমাজজীবনের সংহতি এখনও রক্ষা পাইতেছে। নাগরিক জীবনে আসিয়া বাঙ্গালীর জীবনধারায় বাহির হইতে যে পরিবর্তনই দেখা দিক না কেন, এখনও তাহারই শক্তি অদৃশ্য

থাকিয়াও এই দেশের সমাজকে রক্ষা করিতেছে, তাহারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা নাগরিক জীবনের নানা বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইবার প্রয়াস পাইতেছি। বাঙ্গালীর জীবনের ইহাই মর্মমূল। এই মূল যেদিন সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যাইবে, সেদিনই জাতীয় জীবনে যথার্থ দুর্যোগ অনিবার্য হইয়া উঠিবে; কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই, নাগরিক জীবনেও তাহার প্রভাব আমরা নানাভাবে অনুভব করিতেছি এবং নাগরিক জীবনকে অনেক সময় সেই আদর্শে গঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। বাংলার সেই সমাজের সংহতি ধর্মাচার দ্বারাই এখনও রক্ষা পাইতেছে, অন্য কোন বিষয় দিয়া নহে। কাবণ, নাগরিক জীবনের বহির্ভূত যে বিস্তৃত সমাজ আছে, তাহাব এখনও ধর্মবোধই প্রধান অবলম্বন। অনেকের বিশ্বাস যে, এই ধর্ম ধর্মই নহে, কিংবা উচ্চতর সমাজধর্ম বলিতে যাহা বুঝি, ইহা তাহা নহে। অনেকে ইহাকে 'আদিম ধর্ম' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, অথচ তাহার যে কি শক্তি কিংবা রূপ, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। 'আদিম ধর্ম' বলার ভিতব দিয়া উচ্চতর সমাজের ইহাব প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই ধর্ম 'আদিম' ধর্মই হউক, কিংবা নিরক্ষর সমাজের গ্রামীণ ধর্মই হউক, ইহার চিন্তাধারার মধ্য দিযাও যে একটি প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কারণ, এই শৃঙ্খলা না থাকিলে ইহার প্রাণশক্তি রক্ষা পাইত না, কিংবা একটি সুবিপুল সমাজ-দেহ ইহা ধারণ কবিয়া রাখিতেও সক্ষম হইত না। কিন্তু উচ্চতর ধর্মের বিষয় লইয়া যে-ভাবে আলোচনা হইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া টীকা-টীপ্পনী-ভাষ্য রচনার ভিতর দিয়া ইহার যে রকম বিশ্লেষণ হইয়াছে, আদিম ধর্মের তাহা আদৌ হয় নাই। সুতরাং এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গ্রামীণ ধর্ম নিতান্ত স্বেচ্ছাচারপ্রসূত। সমাজ-জীবন সম্পর্কে আমাদের অবজ্ঞার ইহা অপেক্ষা জীবন্ত প্রমাণ আর কিছুই হইতে পারে না। যে ধর্ম এবং তৎসম্পর্কিত আচার সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গ্রামীণ সমাজ-জীবনকে ধারণ করিয়া আছে, তাহা যে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারমূলক হইতে পারে না, তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন করে না; গ্রামীণ ধর্মও স্বেচ্ছাচার-প্রসূত নহে। ইহার মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে, ইহারও একটি সুসঙ্গত নিয়ম আছে,- তাহা লিখিত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বলিয়াই ইহা অবজ্ঞেয় হইতে পারে না; বরং দেখা যায়, লিখিত শাস্ত্র বিভিন্ন কালে বিচিত্র বহির্মুখী বিষয়ের প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া

নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কিংবা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াও গিয়াছে। কিন্তু গ্রামীণ ধর্ম গ্রাম্য-জীবনে সজীব এবং সক্রিয়, ইহার বিনাশ নাই, যতদিন গ্রাম্য জীবনের সংহতির সামান্যতম অবশেষও বর্তমান থাকিবে, ততদিন তাহা বিলুপ্ত হইবে না।

বাংলার গ্রামীণ জীবনের ধর্ম ও আচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার দুইটি প্রধান বিভাগ—একটি বিভাগ আকাশস্থ সূর্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আর একটি মর্ত্যলোকের কৃষিভূমি বা পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক কৃষিভিত্তিক সমাজেরই ইহাই লক্ষণ—ইহার মধ্যে সূর্য এবং পৃথিবী উভয়েই উপাস্য; ইহার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট; তাহা এই যে, সূর্যের তাপ দ্বারাই ধরিত্রীর রস ও পুষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়। আদিম জাতির বিশ্বাস, সূর্য অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিরও নিয়ামক। সুতরাং সূর্যকে নানাভাবে প্রসন্ন করিতে পারিলেই ধরিত্রীর শস্যসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বাংলার গ্রামীণ সমাজেও নানাভাবে সূর্যেরই পূজা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বাংলার পল্লীসমাজের মধ্যে ধর্মপূজা, ইতুপূজা এবং লৌকিক যে সব শিব, যেমন তারকেশ্বর, এক্তেশ্বর, রাঢ়েশ্বর, মহুলেশ্বর ইত্যাদির পূজা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই সূর্য পূজা, হিন্দু-প্রভাববশতঃ কালক্রমে এই আদিম কৃষিসমাজের উপাসিত সূর্যই কোথাও ধর্ম এবং কোথাও শিব বলিয়া আজ পরিচিত হইতেছেন। পূর্ববঙ্গে লৌকিক উপাসনার ভিতর দিয়া সূর্যের রূপটি আরও প্রত্যক্ষ হইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে মাঘমণ্ডল ব্রত, রালদুর্গার ব্রত, সূর্যের ব্রত, করম পুরুষের ব্রত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়; ইহাদের প্রত্যেকটিই সূর্যের পূজা।

তারপর বাংলাদেশের বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে যত গ্রামদেবতার স্থান আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর দিয়াই ধরিত্রী পূজার বিভিন্ন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রামদেবতার পূজার কোন প্রতিমা নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু পৌত্তলিকতা এই দেশের সমাজের উচ্চতর স্তরে যে প্রতিষ্ঠাই স্থাপন করুক না কেন, বাংলার পল্লীর সাধারণ জনসমাজের মধ্যে তাহার যে কোন প্রভাব নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিন্দুরলিপ্ত মাটির ক্ষুদ্র টিপিই সাধারণতঃ গ্রামদেবতার প্রতীক, কখনও জিনিসটিকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিবার জন্য সেখানে একটি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া রাখা হয়। কখনও

কখনও বা বৃক্ষমূল তাহার আশ্রয় হয়। ধরিত্রীর ভিতর হইতে রস আহরণ করিয়া বৃক্ষ বাঁচিয়া থাকে, সুতরাং বৃক্ষের মধ্যেও ধরিত্রীরই শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সেই সূত্রে বৃক্ষপূজাও ধরিত্রী পূজা। ধরিত্রীর আর একটি প্রতীক্ সর্প। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিম জাতির মধ্যে ধরিত্রীর সঙ্গে সর্পের একটি সুনিবিড় সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইহার মনস্তত্ত্বগত তাৎপর্য যাহাই থাকুক না কেন, বাহির হইতে একটি সহজ তাৎপর্য সাধারণভাবেই উপলব্ধি করা যায়; তাহা এই যে, সর্প মাটির নীচে বাস করে, সুতরাং মাটির সঙ্গে তাহার একটি সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমানের ভিত্তিতেই পৃথিবী ও সর্প একাকার (identified) হইয়া যায়। সুতরাং বাংলার সর্পপূজা তো এক হিসাবে পৃথিবীরই পূজা! এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাংলার গ্রামীণ সমাজে যে কয়েকটি প্রধান উৎসব আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই একাধারে সূর্য ও অপরদিকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজের প্রধান জাতীয় উৎসব গাজন, তাহা সূর্যেরই উৎসব, তাহার পরই দুর্গোৎসব—তাহা ধরিত্রীর পূজা ও উৎসব। সামন্তরাজদিগের হাতে পড়িয়া দুর্গোৎসব বাহির হইতে একটি হিন্দুপরিচয় লাভ করিলেও ইহার আচারগুলি আজিও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ধরিত্রী উপাসনাই ইহার ভিত্তি। দুর্গোৎসবের মধ্যে নানাদিক হইতে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের উৎসবের উপকরণ যেমন আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে, গাজনোৎসবের মধ্যে বাঙ্গালীর আচার জীবনের অগ্রগতির ধারায় বিচিত্র উপকরণ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে—তাহার ফলে এই উভয় অনুষ্ঠানই আজ অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে।

বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের একটি প্রধান অঙ্গ মেয়েলী ব্রত। 'মনুসংহিতা'য় স্ত্রীজাতিকে যজ্ঞ কিংবা ব্রতে অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, তথাপি বাংলাদেশে স্মৃতি কিংবা পুরাণ বহির্ভূত ব্রতাচারে স্ত্রীজাতি বহু দিন যাবৎই অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, স্মৃতির শাসন এ'দেশে তাহারা স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে যে অনার্য সমাজের ব্যাপক প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সেইজন্য শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও এ'দেশে মেয়েলী ব্রত এত জনপ্রিয় হইয়াছিল। ব্রতগুলির জন্য সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রীয় মন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই ইহাদের জন্য বাংলা ছড়া রচিত

হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্য দিয়া বাংলা ছড়ার আর একটি বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে। যদিও অলৌকিক বিশ্বাস হইতেই ব্রতের ছড়াগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল, তথাপি এ কথা সত্য যে, ব্রতিনীদিগের কোন অলৌকিক লক্ষ্য ইহাদের মধ্য দিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ পুরুষ দান-ধ্যান-তীর্থপর্যটন করিয়া যেমন স্বর্গ কামনা করিয়াছে, তেমনই স্ত্রীগণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের ঐহিক কল্যাণ কামনা করিয়াছে। সেই জন্য ইহাদের কামনা বাসনার অভিব্যক্তি স্বরূপ ছড়াগুলির মধ্যেও মানবিক জীবনের বাস্তব অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। এই গুণেই ইহারা আলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।

কেবল মাত্র মেয়েলী ব্রত ছাড়াও সাধারণ পল্লীবাসীর ধর্মকর্ম উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও ছড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে; কারণ, ইহাদের মধ্যেও সংস্কৃত মন্ত্র কিংবা শাস্ত্রবিধি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দেখা যায়। পুরুষের উৎসব সংক্রান্ত ছড়াগুলিও অনেকাংশে ব্রতের ছড়ারই লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং ইহাদিগকেও একই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশে কথায় বলে 'বার মাসে তের পার্বণ।' প্রত্যেক মাসেই উৎসব অনুষ্ঠান ব্রত পার্বণ যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সেইজন্য মাস অনুযায়ীই ইহাদের আলোচনা করা সঙ্গত।

অগ্রহায়ণ

মধ্যযুগ পর্যন্তও বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর গণনা করা হইত, সেইজন্য সংস্কৃতে অগ্রহায়ণ মাসকে মার্গশীর্ষ বলা হইয়া থাকে। কৃষি ভিত্তিক সমাজে যে মাসে বৎসরের নূতন শস্য গৃহে প্রথম আনিয়া সঞ্চয় করা হয়, অর্থাৎ যে মাসে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই মাসই বৎসরের প্রথম মাস হইবে, ইহা নিভান্তই স্বাভাবিক। বাংলাদেশেও তাহাই ছিল, সেইজন্য মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের বারমাসীগুলি অগ্রহায়ণ মাস হইতেই সূচনা হইয়াছে। সেই দিক হইতে বিচার করিয়া বাংলার বারমাসে ত্তের পার্বণের বৃত্তান্তও অগ্রহায়ণ মাস হইতেই সূচনা করা আবশ্যক।

মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারমাসীতে বলিয়াছেন,

মাস মধ্যে মাইশর আপনি ভগবান্।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,

'মাসানাং মার্গশীর্ষোহহম্ ঋতূনাম্ কুসুমাকরঃ'।

সুতরাং অগ্রহায়ণ মাস কেবল বৎসরের প্রথম মাস বলিয়াই নহে, অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস। সেইজন্য অগ্রহায়ণ মাসে বাংলাদেশে বহু সংখ্যক মেয়েলী ব্রতেরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ব্রতগুলির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নহে। শুধু বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষে যে ছড়ার আবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাদের পরিচয় দেওয়াই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

অগ্রহায়ণ মাসের মেয়েলী ব্রতের কথা উল্লেখ করিতে হইলেই প্রথমেই সেঁজুতি ব্রতের উল্লেখ করিতে হয়। যদিও সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় শিব শীর্ষ স্থান অধিকার করেন, তথাপি ইনি প্রকৃত পক্ষে সূর্য দেবতা; কারণ, সূর্যেরই স্বামিপুত্র ও পার্থিব সম্পদ দিবার শক্তি আছে, শিবের তাহা নাই। গৃহের উন্মুক্ত অঙ্গিনায় এই উপলক্ষে বিস্তৃত আলপনা আঁকিতে হয় এবং আলপনার মধ্যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি অঙ্কিত করিয়া প্রত্যেকটি বস্তুর নিকটই ব্রতিনীগণ ছড়ার ভিতর দিয়া নিজেদের কামনা প্রকাশ করে। যেন এই বস্তুগুলির কুমারী জীবনের সেই সকল বাস্তব কামনা পূর্ণ করিবার শক্তি আছে। এই

বিশ্বাস অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস বলিয়াই ছড়াগুলি এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় যে সকল বস্তুর চিত্র আঁকিতে হয়, তাহা এই— ১। ষোল ঘর ২। দোলা ৩। কোঁড়া ৪। বেগুন পাতা ৫। শরগাছ ৬। বেনাগাছ ৭। বাঁশের বেড়া ৮। গঙ্গা ও যমুনা ৯। সুপারি গাছ ১০। চন্দ্র ও সূর্য ১১। হাট ঘাট ১২। গোয়াল ১৩। অশ্বত্থ গাছ ১৪। বঁটি ১৫। খ্যাংরা ১৬। শিবমন্দির ১৭। আতা পাতা ১৮। নাট মন্দির ১৯। পাকা পান ২০। তেকোনা প্রদীপ ২১। হাতে পো ও কাঁখে পো ২২। ঢেঁকি ২৩। খাট পালঙ্ক ২৪। ধাতা কাতা ২৫। আম কাঁটালের পিঁড়ি ২৬। ঘি ও চন্দনের বাটি ২৭। পিটুলির সব রকম গয়না ২৮। রান্নাঘর ২৯। ঢেঁকি কর্কটি ৩০। আর্শী ৩১। উদবিড়ালী ৩২। বেড়ী ৩৩। হাতা ৩৪। পাখী ৩৫। কুলগাছ ৩৬। কাজল লতা ৩৭। নক্ষত্র ৩৮। সিন্দূর চুপড়ি ৩৯। পানের বাটা ৪০। শাঁখ ৪১। ময়না ৪২। দশ পুতুল ৪৩। ইন্দ্র ৪৪। তেরাজ ৪৫। খট্টাডুমুর ৪৬। ধানের মরাই ৪৭। তালগাছ। ৪৮। থুথু ফেলা, ৪৯। থৌ ৫০। কুঁচকুঁচুতি ৫১। শিব, শিবের চিত্রটিই আলপনার শীর্ষদেশে স্থাপন করা হইয়া থাকে।

উক্ত প্রত্যেকটি বস্তুর চিত্রের উপর দূর্বা দিয়া ছড়া বলিয়া কুমারী মেয়েরা নিজেদের মনস্কামনা জানাইয়া থাকে। যেমন, শিবের আলপনা চিত্রের নিকট গিয়া বলে—

১

হে হর শঙ্কর দিনকর নাথ।
কখনও না পড়ি মূর্খের হাত। —২৪ পরগণা

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, শিবকে এখানে দিনকর বা সূর্য বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, সুতরাং পুর্বে যে বলিয়াছি, এই শিব পৌরাণিক শিব নহেন বরং সূর্য তাহা এখানেও প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রকার দোলার নিকট গিয়া বলিবে—

২

দোলায় আসি দোলায় যাই,
সোনার দর্পণে মুখ চাই।

বাপের বাড়ীর দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ী যায়.
আসতে যেতে দোলাখানি
ঘৃত মধু খায়।—ঐ

এই প্রকার প্রত্যেকটি চিত্রের নিকট গিয়াই মনস্কামনা জানাইতে থাকিবে। কোন্ চিত্রের নিকট কি কামনা জানাইবে, ছড়াগুলির মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুতরাং এখন কেবলমাত্র ছড়াগুলি উদ্ধৃত করিলেই চলিতে পারে।

উদ্ধৃত ছড়াগুলির কোন আঞ্চলিক পাঠান্তর দেওয়া হইল না, ইহার কারণ, এই শ্রেণীর ছড়ার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর হয় না; কারণ, ইহারা আচারে (ritual)র অন্তর্ভুক্ত। ইহার কারণটি পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

৩

নাট মন্দির জোড় বাঙ্গালা
দোরে হাতী, বাইরে ঘোড়া॥
ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত
সরু ধানে, কালো পুতে
জন্ম যায় যেন এয়োতে॥
বেগুনপাতা ঢোলা ঢোলা,
মার কোলে সোনার তোলা।
মায়ে যখন পুত বিয়াবে, কড়াতিরো রাত পোয়াবে॥
সাঁঝ ভোজন সেঁজুতি, যোল ঘরে যোল ব্রতী।
তার এক ঘরে আমি ব্রতী, ব্রতী হ'য়ে মাগলাম বর,
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ মার ঘর॥
চড়ারে চড়ীরে, এবার বড় বান,
উচু ক'রে বাঁধবো মাচা
বোসে বোসে দেখবো ধান।

পাকা পান মর্ত্তমান
আমার স্বামী নারায়ণ
যখন যাবেন রণে
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে ॥—ঐ

বাঙ্গালী যে যোদ্ধজাতি ছিল, এই ছড়াটি হইতে তাহাব পরিচয় পাওয়া যাইবে ; কারণ, বাংলার নারীগণ স্বামীকে যুদ্ধে জয়লাভ করিযা নিবাপদে ঘরে ফিরিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইতেছে। তারপর--

হাতে পো কাঁখে পো।
আমার যেন পৃথিবীতে না পড়ে নো ॥
কাজল পাতা কাজল পাতা বাসর ঘর,
দাও গো মালিনী ! বব।
যাই গো ঘর ॥
মাকসা মাকসা চিত্রের ফোঁটা
মা যেন বিয়োন চাঁদপানা বেটা ॥
আমি পুজা কবি পিটুলির রান্নাঘর,
আমার যেন হয় কোটার রান্নাঘর।
গঙ্গা যমুনা পূজন,
সোনার থালে ভোজন।
চন্দ্র সূর্য পুজন, সোনার থালে ভোজন,
রূপার ঘট, রূপার গাড়ু।
আমার যেন হয় শাঁখা সোনার খাড়ু ॥
যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।
নক্ষত্র পুজা করে ঘরে চলে যাই ॥
আমি পুজা করি পিটুলির গোয়াল,
আমার যেন হয় সত্যিকারের গোয়াল ॥—ঐ

প্রত্যেক পরিবারই বহু পুত্রসন্তান কামনা করিত, সেইজন্যই ব্রতিনীর মুখে শুনিতে পাইতেছি, 'যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।'

বহুবিবাহ-পীড়িত সমাজের মধ্যে সতীনের আশঙ্কা কুমারীজীবনেরও স্বস্তি বিনষ্ট করিয়া দিত ; সেইজন্য সেঁজুতিব্রতে সতীন হইতেও নিরাতঙ্ক হইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে—

৪

ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয় না ॥
হাতা হাতা হাতা।
খাই সতীনের মাথা ॥
বেড়ি বেড়ি বেড়ি।
সতীন মাগী চেড়ী ॥
পাখী পাখী পাখী।
সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে,
ছাতে উঠে দেখি ॥
থুংকুড়ি থুংকুড়ি থুংকুড়ি।
সতীন যেন হয় আঁটকুড়ি ॥
বঁটি বঁটি বঁটি।
সতীনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি ॥
উদ্‌বিড়ালী খুদ খায়।
স্বামী রেখে সতীন খায় ॥
কুলগাছ কুলগাছ ঝোঁকুড়ি।
সতীন আবাগী মেকুড়ি ॥
সাত সতীনের সাতটা কৌটো।
আমার আছে নবীন কৌটো ॥
নবীন কৌটো নড়ে চড়ে।
সাত সতীন পুড়ে মরে ॥
ঢেঁকিশালে গুলো।
আর ঠুস্ করে ম'লো ॥
অশথ কেটে বসত করি।
সতীন কেটে আল্‌তা পরি ॥—ঐ

ক্ষুদ্র বালিকার বুকে সতীনের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার যে প্রবৃত্তির বীজ এখানে বপন করা হইতেছে, তাহাই পরিণামে মহামহীরূহে পরিণত হইয়া এক একটি পরিবারকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করিয়াছে। এখানেই তাহার শেষ হয় নাই, এই বিষয় আরও আছে—

৫

কুল গাছটা কেঁকুড়ী
সতীন আবাগী মেকুড়ি।
ময়না, ময়না, ময়না।
যদি সতীন হয়—
মরে যেন রয়।
বেড়ী বেড়ী বেড়ী
সতীন মাগী চেড়ী।
খ্যাংড়া খ্যাংড়া খ্যাংড়া
সতীনকে ঝেঁটিয়ে করব দিশেহাবা।
কাঁটা কাঁটা কাঁটা,
মারি সতীনের মুখে ঝাঁটা।
এই জন্য আমি পুজি ভোলা মহেশ্বর,
সতীন হলেই যেন সদ্য সদ্য মরে,
এই ভিক্ষে মাগি প্রভু তব পায়,
আশীর্বাদ কর প্রভু যেন সতীন নাহি হয়।—ঐ

সতীনের মুখে ঝাঁটা মারিবার সঙ্কল্প লইয়া ছড়াটির সূত্রপাত হইলেও মহেশ্বরের নিকট সতীন না হইবার প্রার্থনা দিয়াই ছড়াটি শেষ হইয়াছে। কিন্তু যে মহেশ্বর নিজের পরিবারেই সতীন নিবাবণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, তিনি অন্যকে এই বিষয়ে কি করিতে পারেন? তথাপি সে যুগে কি অস্বস্তির মধ্য দিয়াই যে কুমারীজীবনের সূচনা হইত, এই ছড়াগুলি তাহার প্রমাণ।

বেগুনপাতার আল্‌পনায় হাত রাখিয়া মেয়েরা বলে—

৬

বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা
মার কোলে সোনার তালা।—ঐ

মাকড়সায়—মাকড়সা, মাকড়সা চিত্রের কোঁটা,
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা।—ঐ

৭

সাঁজ পুজন সেঁজুতি,
গোল ঘরে ব্রতী।
তার এক ঘরে আমি ব্রতী।
ব্রতী হয়ে মাগি বর,
ধনে পুত্রে গড়ুক বাপ মার ঘর।

পূর্বেই বলিয়াছি, মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা বিশেষ পরিবর্তিত হয় না; কারণ, ইহারা আচারের সঙ্গে সংযুক্ত। আচারবিষয়ক ছড়াগুলি অত্যন্ত রক্ষণশীল, কারণ, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই আচার পালন করা হইয়া থাকে; সমাজ মনে করিয়াছে, আচার পালনে যদি কোন ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের উদ্দেশ্য পালনও ব্যর্থ হয়। সুতরাং ইহাদের খুঁটি-নাটি সম্পর্কে সমাজ অত্যন্ত অবহিত থাকিত। বাংলার সর্বত্র ব্রতের ছড়াগুলি প্রচলিত থাকিলেও ইহাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ক ছড়ার মত বিশেষ আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায় না; সেইজন্য ইহাদের পাঠান্তরও পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহা শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি মাত্র।

তারপর কোঁড়ার নিকট গিয়া বলিবে—

৮

কোঁড়ার মাথায় ঢালি মউ,
আমি যেন হই রাজার বউ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি চিনি,
আমি যেন হই রাজার রাণী।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি,
আমি যেন হই রাজার ঝি।—ঐ

বেগুন পাতার আলপনার নিকট গিয়া কোন কোন স্থানে এই ছড়া বলিতে শুনা যায়—

বেগুন পাতা ঢলা ঢলা,
মায়ের কোলে সোনার তোলা।

হেন মা পুত বিওলি,
শুভক্ষণে রাত পোহালি।—ঐ

জননীর পুত্রসন্তান প্রসব করাকে দেবতার আশীর্বাদ বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া নিজের জীবনের বাসনাই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তারপর—

গৌর গৌর গৌর চেপ্টান পাতা,
মার মা বিয়োয় যেন সোনা হেন বেটা।—ঐ

এখানে মার মা বলিতে যদি মাতামহীর কথা বলা হইয়া থাকে, তবে বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার মত হয়। বেগুনপাতা কিংবা বেগুন দেখিয়া কেন যে সদ্যপ্রসূত শিশু সন্তানের কথা মনে হয়, তাহা মনোবৈজ্ঞানিকগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিবেন। তারপর ভ্রাতার প্রশস্তি—

৯

শর শর শর, আমার ভাই গাঁয়ের বর।
বর বর ডাক পড়ে, গুয়ো গাছে গুয়ো ফলে।
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে,
অন্যের ভাই কুড়িয়ে গেলে।
বেনা বেনা বেনা,
আমার ভাই গাঁয়ের সোনা।
সোনা সোনা ডাক পাড়ে,
গা শুচি গুয়ো পড়ে।
বাঁশের কোঁড়া রূপের ঝোড়া,
বাপ রাজা, ভাই প্রজা।
গুয়ো গাছ সুপোরি গাছ, মুটি ধরে সাজা,
বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর ভাই হয়েছেন রাজা।—ঐ

ব্রতিনী নিজের সম্বন্ধেও এই বাসনা জানায়—

১০

গঙ্গা যমুনা যোড় হই,
সাত ভায়ের বোন হই।

সাবিত্রীর সমান হই,
গঙ্গাযমুনা পুজ্যন,
সোনার থালে ভোজ্যন।
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু,
শাঁখার আগে সুবর্ণের খাড়ু।

শুধু মাত্র শাঁখা নহে; কারণ, শুধু মাত্র শাঁখায় কোন ঐশ্বর্যের প্রকাশ নাই, ইহা এয়ো মাত্রেরই নিতান্ত সাধারণ চিহ্ন; কিন্তু শাঁখার আগে যদি সোনার খাড়ু বা বালা থাকে, তবেই ঐশ্বর্যের পরিচায়ক হয়।

১১

হে হর মাগি বর,
স্বামী হোক রাজ্যেশ্বর।
সতীন হোক দাসী;
বছর অন্তর একবার ক'রে
বাপের বাড়ী আসি।

দীর্ঘদিন পিত্রালয়ে পড়িয়া থাকিবার যে অপমান, তাহা বালিকা কন্যার কাছেও দুঃসহ, কিন্তু বৎসরের মধ্যে একবার মাতাপিতাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষাও দুর্বার। সুতরাং একবার আসিতে যাইতে পারিলেই একদিকে নিজের মর্যাদা, অপরদিকে অন্তরের একান্ত কামনা পূর্ণ হইতে পারে। কন্যার পিতৃগৃহে বৎসরে একবার আসা যাওয়ার বিষয়টিই বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়া এক অভিনব অধ্যাত্ম পরিচয় লাভ করিয়াছে।—

১২

আতা পাতা ফুল দেবতা,
সিঁথেয় সিঁদুর পায়ে আল্‌তা।
নাট মন্দির বাঙ্গলা যোড়া,
দোরে হাতী বাইরে ঘোড়া,
দাসদাসী গো-মহিষী গির্দে আশে পাশে,
রূপ যৌবনে সদাই সুখী স্বামী ভালবাসে।

পাকা পান মর্তমান,
আমার স্বামী নারায়ণ।
যদি যান পাস্থরে,
তবে দিও স্মুরে।

বহুবিবাহ-পীড়িত সমাজে স্বামীর পক্ষে একটি স্ত্রীকে ভুলিয়া যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে, কিন্তু নারায়ণ যদি সহায়ক থাকেন, তবে তিনিই স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। দাম্পত্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এখানে অলৌকিক দৈব শক্তিকে আহ্বান করা হইতেছে।

১৩

ত্রিকোণা প্রদীপ চৌকোণা আলো,
অমুক দেবী এত করে জগতের আলো।
হাতে পো কাঁখে পো,
পৃথিবীতে আমার যেন না পড়ে লো।
ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনুন জ্বলন্ত,
কালো ধানে রাঙ্গা পুতে,
জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে।
আম কাঁটালের পিঁড়িখানি ঘি ঝর ঝর করে,
আমার ভাই অমুক সেই বোস্‌তে পারে।
ঘি চন্দন দিয়ে পুজি অভিলাসে,
বেনারসী শাড়ী পরি যেন রাত্রিবাসে।—ঐ

তারপর বালা, অনন্ত, মাকড়ী, নথ ইত্যাদি প্রত্যেকটি আলপনার নিকট গিয়া ইহাদের নাম করিয়া বলিবে—

আমি দিই পিটুলির বালা,
আমার হোক সোনার বালা। ইত্যাদি

তারপর,

ঢেঁকি লো কর্কটি,
শো হাটে ঘাটে;
আমার শো ছাপর খাটে।

আর্শী আর্শী আর্শী,
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী।—ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রতের ছড়ার পরিবর্তন হয় না। যদিও যে যুগে ফার্সী ভাষা পড়িলে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত, সেই যুগের অবসান হইয়া গিয়াছে, তথাপি সেই যুগের পরও ছড়াগুলি পরিবর্তিত হয় নাই। আজিও যাহারা সেঁজুতি ব্রত করে, তাহারাও ফার্সী পড়া স্বামীই কামনা করে, ফার্সীর স্থলে ইংরেজী কিংবা হিন্দী কথা বসাইয়া লইয়া ইহাকে যুগোচিত পরিমার্জনা করিয়া লয় নাই।

তারপর—

কাজললতা কাজললতা বাসর ঘর,
দাও মা মেলানি যাই শ্বশুর-ঘর।
কুঁচ কুঁচুতি কুঁচুই বন,
কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ?
মোহর এ'ল ছালা ছালা,
তাই তুলতে এত বেলা। —ইত্যাদি

অগ্রহায়ণ মাসে পশ্চিমবঙ্গে আর একটি ব্রত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, তাহার নাম ইতু ব্রত। ইতু শব্দটি আদিত্য শব্দ হইতে জাত, যেমন আদিত্য >আইত্ত>ইত্ত, ইত, ইতু। অনেকে মনে করেন, ইহা সূর্য অর্থে 'মিত্র' শব্দ হইতে জাত, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সুতরাং ইতু পুজাও লৌকিক সূর্যপূজারই একটি রূপ। পূর্ববঙ্গে এই ব্রত প্রচলিত নাই, বরং ইহার পরিবর্তে মাঘমণ্ডল নামক সূর্যব্রতের ব্যাপক প্রচলন আছে, সে কথা যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত ইতু ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। আদিত্যের সংখ্যা দ্বাদশ, সেইজন্য বার বৎসর এই ব্রত করিতে হয় এবং সূর্যের ব্রত বলিয়া কেবলমাত্র রবিবারই এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার নিয়ম।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের নারীগণ ইতুপূজা করে। নারীগণ এই ছড়া বলিয়া ইতুর শরাবে জল ঢালে—

১৪

ইতু ইতু ব্রাহ্মণ।
তুমি ইতু নারায়ণ॥
তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিম কালে দিও থল॥
সুষমী-কলমী ঢল ঢল করে।
রাজার বেটা বচ্ছি গাড়ে॥
গাড়ুক বচ্ছি উড়ুক চিল।
সোনার কোঠা রূপার খিল॥—বাঁকুড়া

সূর্যের নিকট স্বামীর বর এবং বিবাহিত জীবনের সুখসমৃদ্ধিই প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে নিয়তিকে যে কেহই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, তাহাই নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে ব্যক্ত হইয়াছে—

১৫

ঝুমঝুমাঝুম বাদ্য বাজে,
সাজিয়ে কনে নতুন সাজে;
মা বাপে দেন বরের করে কতই মনের সাধে।
মা-বাপ কামনা করেন
ভালো ঘরে ভালো বরে দিবেন ব'লে ঝি—
কপাল যদি মন্দ হয় মা বাপে তায় করবেন কি?—ঐ

ছেলে ভুলানো অনেক ছড়াই যে ব্রতের ছড়া হইতে গৃহীত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি তাহার প্রমাণ। ইতুর ব্রত উপলক্ষেও এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে—

১৬

আম-কাঁঠালের পিঁড়ি খানি ঘি ম' ম' করে,
তারির উপর বাপ খুড়ো কন্যা দান করে।
বাপ যায় রে নায় খুড়ো যায় রে তড়ে (তটে)।
শিশু কালে বিয়ে দিলি সদায় আগুন জ্বলে॥

—২৪ পরগণা

ব্রতের উদ্দিষ্ট দেবতা মাত্রই স্ত্রী, সেইজন্য অনেক সময় সূর্যদেব ইতুকেও ইতু লক্ষ্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়া স্ত্রী দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হয়।

১৭

অষ্টলোক পালনী মাতা সংসারের সার,
জগৎ পালনে মাতা যারে অবতার।—ঐ

খোয়া ব্রত পূর্ব বাংলার বহুল প্রচলিত একটি মেয়েলী ব্রত, পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রচলন নাই। কার্তিক সংক্রান্তি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। গোময় এবং মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রতিনীরা একটি শিব তৈরী করেন, তারপর তাহা তুলসী তলায় রাখিয়া ফুল দূর্বা দ্বারা পুজা করেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন কলা গাছের ছোট একটি ভেলা তৈরী করিয়া ব্রতিনীগণ তাহাতে ত্রিশটি শিব অর্থাৎ প্রতিদিন পুজিত এক একটি শিব ও ব্রতের ফুলদূর্বা স্থাপন করিয়া একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহা জলে ভাসাইয়া দেয়। জলন্ত প্রদীপটি যে সূর্য দেবতার প্রতীক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেবল মাত্র হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাতে শিবের নাম আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে ব্রতের রীতিটির মধ্যে একটু ব্যতিক্রম আছে। সেখানেও সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ব্যাপিয়া থুয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয় এবং চারি বৎসরে এই ব্রত সমাপ্ত হয়। প্রাতে কিছু না খাইয়া মাটিতে বৃত্তাকার খাদ খনন করিয়া তাহার চারিদিকে চারিটি ও মধ্যে একটি থুয়া বা মাটির মঠ বসাইয়া ছড়া পাঠ করিতে হয়। এখানে শিবের পরিবর্তে মাটির মঠ পুজিত হইতে দেখা যাইতেছে, ক্রমে মাটির মঠই শিবলিঙ্গের আকৃতি লাভ করিয়াছে।

১৮

থুয়া পুজে থুয়ানী,
আগন মাসের বৌয়ানী,
হাতে কলসী, কক্ষে পোলা,
থুয়া পুজিয়া গেলেন মাকে নমস্কার করিতে—
মা বলেন, রণে আয়তি,
জনে সায়তি
ভাদ্রমাসের গঙ্গাজলের মত পরিপুর্ণ থাকিও।—ঢাকা, বিক্রমপুর

১৯

থুয়া থুয়াস্তি,
ঘরে দাও সোয়াস্তি।
কড়া কড়া ভাতে
সরপড়া বেন্ননে কাল পুতে।
কাল যেন যায় মোদের জন্মায়ন্তে॥—ঐ

২০

খোরা পুজি থুরি—আগন মাস্যা বৌয়ারী,
কাঁখে ঝারি থুয়ানী—খোয়া পুজে জন্মের আয়রাণী।—মৈমনসিং

কোন কোন অঞ্চলে পৌষ মাসেও খোয়া ব্রত করিবার রীতি আছে তাহাকে পৌষ খোয়া বলে। তাহার ছড়া এই—

২১

পৌষ থুয়া লাতি পাতি—বাপের ধন কান্ধে ছাতি;
ভাইয়ের ধন—পায়ে আল্তি।
সোয়ামীর ধন হাস্যা—পুত্রের ধন কান্দ্যা;
মুই বর্তীয়ে বর্ত করি—সিংহাসনে বস্যা।—ঐ

নিম্নলিখিত ছড়াটি থুয়া ব্রত উপলক্ষে পুর্ববঙ্গে শুনিতে পাওয়া গেলেও ইহা রণে এয়ো ব্রত উপলক্ষেও শুনিতে পাওয়া যায়। রণে এয়ো ব্রতের উদ্দেশ্য ইহার নাম হইতেই স্পষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ স্বামী যুদ্ধে গেলেও যে ব্রত উদ্‌যাপন করিলে স্ত্রী এয়ো থাকিতে পারে, অর্থাৎ স্বামী যুদ্ধ হইতে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। ইহার কথা পুর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি—

২২

আকালে ভাতস্তি হইও,
সকালে স্থতস্তি হইও,
রণে আইয়ো হইও
জনে সায়ুতি হইও।

আকালে ভাতন্তী ;
সকালে সুতন্তি ;
রণে বনে আয়তী
ধনে জনে সুয়তী।
রণে এয়োব্রত ক'রে হই যেন স্বামীর সোঁ।—
যতকাল থাক্‌ব বেঁচে যেন না পড়ে আমার নো॥—ঢাকা

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষে বরিশাল জিলায় যে কাক বলি অর্থাৎ কাককে আহার দেওয়া হয়, সেই উপলক্ষে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি প্রায় সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়—

২৩

দাড় কাউয়ারে আহ্বান কর‍্যা,
পাতি কাউয়ারে বলি দিয়া,
কোঁ কোঁ কোঁ,
আজ কৈলাম যোগের বাড়ী শুভো নবান্নো॥
আইয়ো যাইয়ো কাক বলি লইয়ো,
হাত ভর‍্যা সন্দেশ দিমু—
পেট্‌টী ভর‍্যা খাইয়ো॥—বরিশাল

প্রতি মাসেই মঙ্গলবারে বিভিন্ন নামে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত কুলুই মঙ্গলচণ্ডী ব্রতে এই ছড়াটি শুনিতে পাওয়া যায়—

২৪

সোনার মঙ্গলচণ্ডী রূপোর বালা,
কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা ?
হাস্‌তে খেল্‌তে পাটের শাড়ী পরতে,
সোনার দোলায় দুল্‌তে শাঁখা শাড়ী পরতে।
তেল হলুদ মাখ্‌তে আঘাটায় ঘাট করতে,
আপথ পথ করতে অরাজকে রাজ্য দিতে,

আই বুড়োর বিয়ে দিতে, হাপুতির পুত দিতে,
নির্ধনের ধন দিতে চোরের বন্ধন ঘুচুতে,
কানার চক্ষু দিতে অন্ধের নড়ি দিতে,
তাই এত বেলা।—২৪ পরগণা

ছড়াটি হইতেই ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট হইবে। অগ্রহায়ণ মাস কেবল মাত্র বৎসরের প্রথম মাস ছিল বলিয়াই নহে, বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে অগ্রহায়ণ মাসই সমৃদ্ধতম মাস ছিল। কিন্তু তথাপি অগ্রহায়ণ মাসে সেই সমৃদ্ধির সূচনা, পৌষ মাসেই তাহার পরিপূর্তি। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ধরিয়া মাঠের ধান কাটা হইতে থাকে, পৌষ মাসেই ইহার সঞ্চয় পরিপূর্ণ হয়। সেই জন্য পৌষ মাসই বাঙ্গালীর লক্ষ্মী মাস।

ব্রতের প্রধান অবলম্বন কথা, ছড়া নহে। তথাপি কথা প্রসঙ্গে কিংবা ব্রতের কোন কোন আচার পালন করিবার সময় ছড়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। ব্রতের সঙ্গে ছড়ার ইহার বেশি কিছু সম্পর্ক নাই।

উদ্ধৃত ছড়াগুলি হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ব্রতের ছড়াগুলি কাব্যগুণ প্রায় বর্জিত বলিলেই হয়। ইহার কারণ, আচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ইহারা আচার পালনের সময় ব্যতীত আর কোন সময় আবৃত্তি করা হয় না। ইহারা পুজার মন্ত্রস্বরূপ, মন্ত্রের যেমন কোন কাব্যগুণ নাই, ইহাদের মধ্যেও কোনও কাব্যগুণ নাই। তবে কোন কোন ছড়ায় যে সেই গুণ একেবারেই প্রকাশ পায় নাই, তাহাও বলা যায় না। মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়াই তাঁহার নিদর্শন। তাহাদের কথা যথাস্থানে বলিব।

পৌষ

পৌষ মাস বাংলার লক্ষ্মী মাস, কৃষিভিত্তিক বাংলার সমাজে বৎসরের মধ্যে ইহাই সমৃদ্ধতম মাস। সেইজন্য এই সময়ই বাংলার শ্রেষ্ঠ শস্যোৎসব (harvest festival) বা পৌষ পার্বণের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ছড়ায় গানে এই পৌষ মাসকে বাংলার কৃষক নানা ভাবে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে।

পৌষ পার্বণের ছড়ার দুইটি প্রধান ভাগ, প্রথমতঃ পৌষের আবাহনসূচক ছড়া ও দ্বিতীয়তঃ মাগনের ছড়া। পৌষ মাসে গৃহস্থের গোলা ধানে পরিপূর্ণ থাকে, সেইজন্য সেই সময়েই তাহার সামাজিক কিংবা গোষ্ঠীজীবনের নানা কর্তব্য পালন করিবার সুযোগ হয়। সুতরাং সমবেতভাবে গ্রাম্য অনুষ্ঠান সেই সময়ই পালন করা সম্ভব হয়। এই উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া উদ্যোক্তারা যে মাগন সংগ্রহ করে, সেই উপলক্ষে এক বিপুল সংখ্যক ছড়া রচিত হইয়াছে। তাহা পৌষ পার্বণের ছড়ার একটি বিশেষ অংশ। প্রথমতঃ পৌষের আবাহনসূচক ছড়াগুলি উল্লেখ করা যাক—

১

এসো পৌষ যেয়ো না—
ভাতের হাড়িতে থাক পৌষ যেও না।
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেও না।
গোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেও না।
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেও না।—হুগ্‌লি

২

এস পৌষ যেও না। জন্মে জন্মে ছেড়ো না॥
পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি। হাতে নড়ি, কাঁকে ঝুড়ি।
পৌষ আস্‌ছে গুড়ি গুড়ি॥
আন্‌বো গাঙ্গের জল, ঘরে বসে নেয়ো খেয়ো।
বাহার পেটটি হয়ো, ঘরে বসে পিটে খেয়ো,
এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো॥—বর্ধমান

৩

পৌষ মাসে পৌষ আগোলা, ধান কাপাসে ঘর আলা,
এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না,
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস, না যাও ছাড়িয়ে,
গাল ভরে পান দেবো কটোরা পুরিয়ে,
আদারে পাঁদারে পৌষ, বড় ঘর চেপেই বোস্।—বীরভূম

৪

পুষালু গো রাই।
আমরা ছোপ্‌ড়ি পিঠ্যা খাই॥
ছোপ্‌ড়ি লোপ্‌ড়ি, গাঙ্গ সিনাতে যাই।
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাড়ি, ঝারির জল খাই॥
চার্ মাস বর্ষা আমরা পোখোর না যাই॥
হাতে পো,
কাঁখে পোঁ;
পৃথিবীতে জুড়ালো লো,
না পড়্‌লো লো॥
এস পো যেয়ো না।
জন্মে জন্মে ছেড়ো না।
কাল খায়েছ পিঠ্যাভাত, আজ খাবে গাঙ্গের জল॥
এ বছর যাও পুষালো কাঠের মালা পরে।
আর বছর আন্‌ব গা ডুব তুলসী দিয়ে॥—সাঁওতাল পরগণা

৫

এমনি করে এস পৌষ জনম জনম,
আমরা যেন উপোস না যাই কোন বছর।
এসো পৌষ বড় ঘরে, এসো পৌষ খামারে,
এসো পৌষ আমার ঘরের মেঝেয় চেপে বোস।
এমনি করে এসো পৌষ এমনি করেই এসো॥—২৪ পরগণা

অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকিয়া উঠিলে গৃহস্থ কোন এক শুভ দিনে আপনার ক্ষেত্র হইতে এক মুঠ ধান গাছ কাটিয়া আনে এবং নূতন কাপড় দিয়া তাহা জড়াইয়া ঘরের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব দিন গৃহিণীরা সেই ধানগাছ কয়টি পূজা করিয়া এক একটি শীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট-চৌকি, গোলা, গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন এবং ছড়া বলেন--

৬

আওনি বাওনি চাওনি।
তিন দিন পিঠা খাওনি॥
তিন দিন না কোথা যেও।
ঘরে বসে পিঠা খেও॥—ঐ

ইহাকে আওনি বাওনি অনুষ্ঠান বলা হয়।

এইবার মাগনের ছড়াগুলির কথা উল্লেখ করিতে হয়। লক্ষ্মীর নামে মাগন সংগ্রহ করিতে গিয়া পল্লীর মুসলমান বালকেরা এই ছড়া আবৃত্তি করে। ইহাদের মধ্যে মাগনের প্রার্থনা এবং মাগন দাতার প্রতি শুভ কামনা প্রকাশ পাইয়া থাকে—

৭

কাল তুলসী কাল তুলসী চিরোল চিরোল পাত,
ধান দাও ধান দাও মা লক্ষ্মীর হাত।
ধান দিতে শিকে নড়ে, ঝুর ঝুরিয়ে টাকা পড়ে।
একটা টাকা পাইরে, বেনে বাড়ী যাইরে।
বেনে বাড়ীতে ঘুঘুর বাসা, তা দেখতে লাল তামাসা।
বল ভাই শিব এক কাঠা চালে লটা বড়ি লিব।
যে দিবে কাঠা কাঠা। তার হবে লাল ব্যাটা॥
যে দিবে মুঠি মুঠি। তার হবে কাল কাল সাত বিটি॥—মুর্শিদাবাদ

যে কাঠা ভরিয়া দান করিবে, তাহার রাঙা ছেলে হইবে; কিন্তু যে মুঠি ভরিয়া দান করিবে, তাহার কালো কালো সাত মেয়ে হইবে। কালো মেয়ে সাধারণ গৃহস্থেরও অভিশাপ ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং ইহার পর কাঠা ভরিয়া দান করা ব্যতীত আর উপায় কি?

৮

কাল তুলসী কাল তুলসী, চিরল চিরল পার,
ধান দাও ধান দাও লক্ষ্মীর হার।
ধান দিতে সিকি নড়ে, ঝুর-ঝুরিয়ে টাকা পড়ে।
এক টাকা পাইরে; বেনের বাড়ী যাইরে।
বেনের বাড়ী ঘুঘুর বাসা, তা দেখতে লাগ্‌তে বাসা।
বল ভাই শিব, এক কাঠা চাল দশটা বড়ি নিব।—ঐ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ছড়াগুলি মুসলমান রাখাল বালকেরাই প্রধানতঃ আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখানে লক্ষ্মী এবং শিবের যে নাম উল্লেখ করা হইতেছে, তাহার অর্থ এই নহে যে, তাহারা ইহা দ্বারা শিব কিংবা লক্ষ্মীর পূজা করিবে। শিব এবং লক্ষ্মী এখানে কৃষি সম্পদের অধিষ্ঠাতা দেবতা মাত্র, ইহাদের কোন পৌরাণিক পরিচয় এখানে নাই।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া কয়টি সাধারণ ছেলে খেলার ছড়ার মত, কেবল শেষ পদ দুইটি বাদ দিলে, ইহাতে লক্ষ্মী মাস কিংবা মাগনের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অনেক সময় খেলার ছড়া এইভাবে ব্রত বা মাগনের ছড়ায় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—

৯

ঠাঙ্গা ঠাঙ্গা,
ঠাঙ্গায় মারলাম কোপ,
বেরাল দুই গোঁপ
গোঁপে মারলাম থাবা,
ফক্‌রে বলে বাবা।
বল ভাই শিব, এক কাঠা চাল দশটা বড়ি নিব।—ঐ

১০

কান কুড়্ কুড়্ ইন্দুরটি,
মেঝে করে খাদ,
মাল কাট, মেলেনি কাট, কাট ঢেঁকির মোনা।
অর্ধেক রাতে কাট নিলু বৌর কানের সোনা।

বৌর কানে সোনা নিয়ে ঝিয়ের কানে দেয়,
কোনকানকার গেছো ইন্দুর হাত তাব্ড়ি দেয়।
বল ভাই শিব, এক কাঠা চাল দশটা বড়ি নিব -ঐ

১১

একমুঠ সরষা একমুঠ র‍্যায়,
ছিটাতে ছিটাতে বাথান য্যায়।
বাথানে আছে কপলা গ্যায়,
কপলা গ্যায়ের দুদ্ধু খ্যায়।
দুদ্ধু খ্যায়য়া জলকে য্যায়।
জলে আছে ল্যাখা জোখা,
ফুট্যাছে ফুল থোকা থোকা।
অ্যালন বিবির আলন পাঁও,
চম্পা বিবির খরম পাও।
ঐ পাওটা লিবো
যত্তন কইরা থুবো॥ —ঐ

কৃষকের আর এক সম্পদ গো, লক্ষ্মীমাসে তাহারও গুণকীর্তন শুনা যায়—

১২

পিড়রে কদম্বের আছুর,
কাঁদেরে গোয়ালার নারী হারায়ে বাছুর,
তার মাঝে এক কন্যা যুবা দেখি ভাল,
একসের দুধ আইনে ব্রাহ্মণে বিলাল।
পিড়রে কদম্বের আছুর,
কাঁদেরে গোয়ালার নারী হারারে বাছুর!
তার মাঝে এক কন্যা যুবা দেখি ভাল;
এক তোলা সোনা আইনা পীরকে বিলাল।—পাবনা-রাজসাহী

১৩

আইল রে আমশালুকা দাঁতে কর‍্যা কুট।
হাম্‌রা মাঙ্গিয়া খাই এই মাস পুষ॥

এই মাস পুষরে বনে প'লো টাটি।
এক্কি ঝাঁকে উড়ান দিলাম নও জোড়া পাখী॥
নও জোড়া পাখীরে ইকর বিকর,
চোরা ব্যাটা করছে ভাঁসা (বাসা) টুয়ের উপর।
টুয়েরি খ্যাড় গোছা কোরছে লোছা গোছা,
আউর যায় বাউর যায় পত্তি করে ভাঁসা।
চাষা ব্যাটার কামাই খায় বড় বড় আজা।
খায় আর মোচড়ে দাঁড়ি
আগুন লাগুক দুষমনের বাড়ী।
ছিকা লড়ে ছিকা চড়ে দুদ্দুড়াতে ট্যাকা পড়ে,
একটা ট্যাকা পাল্যামরে বান্যার বাড়ী গেলামরে,
বান্যার বাড়ী ঘুঘুর ভাঁসা একে ভাঁসা নও নও টাকা,
নও ট্যাকা দিয়া কিন্‌লাম গাই,
গাইর নাম মোনামুনি,
দুধ হয় আঠার হাড়ি,
আজা খায় রাজা খায়
কত্তক দুধ ঢেউ যায়।—বগুড়া

মাগন-প্রার্থী বালকেরা গৃহস্থের গৃহটির নানাভাবে প্রশংসা করিয়া থাকে—

১৪

আইর‍্যা নলের বেড়া,
যাই উত্তর পাড়া।
উত্তর পাড়া ঘরটি
সোনার লড়ি থামটি।
সোনা চেয়ে রূপা ভালা,
ঐ বাড়ীখান দেখ্‌তে ভালা,
দেখ্‌তে ভালা, উঁচা টুই,
ট্যাকা আছে মোচা দুই।—বিক্রমপুর, ঢাকা

১৫

শিবরে ভাই শিবানী সাজে।
কানা কড়ি ঝুমুক বাজে।
বাজুক ঝুমুক বাজুক তাল
এই ঘরখান জগৎ মোড়লের।
জগৎ মোড়লের ঘরখানি রে
সোনাদানা পাঁচখানি রে।
সোনারে কাটুরা হাঁস
বাঁস লিয়া হাসাম্বোর,
পায় না লিয়া বাত্তি জোর।
বাত্তি জোরে হাম গুয়া
হামার খেড়ু খায় গুয়া।
গুয়া খায় কড়মড়
পান খায় পিত্‌ ফেলে।
পিত্‌ ফেলিতে নাম্‌লো জুলি
কে কে যাবি বিকমপুরা।
বিকমপুরা কালাপানি
ভাত চড়াতে পুতরানী।
পুত গেলো তোর আলে ডালে
মা গেলো মরিচের ডালে।
মরিচ গুটিক আলঝাল।
তাতে পড়ল গুটিক চাল।
গুটিক চাল ঠানাঠান্‌ বাজে।
সে গুন্থা পাহাড়া জাগে।
ও পাহাড়া লাড়্‌ চাড়্‌।
তাকে দিব ডাহিন কড়্‌।
ডাহিনের কড় পিতলের চাকী।
দান দে মহাদেবের বেটি।

দান দিতে সীতা লড়ে,
ঝুঝ্‌ঝুড়িয়ে টাকা পড়ে।
একটি টাকা পাইরে,
বাইনার দোকান যাই রে।
বাইনা দোকান ঘুঘু পোষা,
রাত পোহাল তিন তামাসা।—ঢাকা

বেণের বাড়ীতে যে ঘুঘুর বাসায় টাকা সঞ্চিত হয়, এ'কথা একাধিক ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়। বেণে ঘুঘু প্রকৃতির লোক, তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা দুরূহ, কিন্তু সেও লক্ষ্মীর নামে মাগন দিয়াছে, ইহাই বক্তব্য—

১৬

ছিকা লড়ে, ছিকা চড়ে,
ঝম্‌ঝমাইয়া ট্যাকা পড়ে;
একটা ট্যাকা পাল্যাম্ রে
বাইন্যা-বাড়ী গেলাম্ রে।
বাইন্যা-বাড়ী ঘুঘুর বাসা,
এক এক ঘুঘু নও নও বাসা,
নও নও বাসে নও নও পণ,
আমরা পাব কয় পণ।—বিক্রমপুর, ঢাকা

'বাইন্যা বাড়ী ঘুঘুর বাসা'—এই বেণেই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মুরারি শীল নামে অমর হইয়া রহিয়াছে। মুরারি শীল এই ঘুঘু।

পৌষ সংক্রান্তির এক শ্রেণীর মাগনের ছড়া আছে, প্রায় সমগ্র বাংলা দেশময় ইহাদের প্রচার হইয়াছিল, ইহাদের বিস্তার (distribution) লক্ষ্য করিবার যোগ্য। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর পৌষ পার্বণ উৎসবের মধ্যে একটি সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য ইহাদের বিস্তার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই ছড়াগুলির প্রথম পদটি প্রায় সর্বত্রই অভিন্ন, তাহা এই,—'এলাম রে ভাই অরণে, লক্ষ্মী দেবীর শরণে'—কোনও কোনও স্থলে সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র দেখা যায়।

১৭

এলাম রে ভাই অরণ্যে দেবী দুর্গার চরণে,
দেবী দুর্গা হাঁসে, চম্পার ফুল ভাঁসে।
এ চম্পা নজীর মা,
বাহিরে এসে দে দান
দেয় দান থয় কুলাতে .
শিবের নাঙ্গল ফুল গড়াতে।
ঐ নাঙ্গল খান চালে
বুড়া বুড়ীর গালে।
বুড়াবুড়ীর নাম কি? টুকনা টুকনী।
ভাত খায় আপনি।
ভাত খায় বিড়ালকে দোষে,
ইংপুর বাড়ি চিংকুর কোষে
যে দিবে কাঠা কাঠা
তার হবে পাঁঠা কাটা,
লিবো এক কুলা ধান লিবো।—মুর্শিদাবাদ

প্রার্থনা বিশেষ কিছু নয়, মাত্র এক কুলা ধান! পৌষ মাসে বাংলার যে কোন গৃহস্থের পক্ষে এক কুলা ধান কিছুই নহে। পরের ছড়াটি হইতেই দুর্গার পরিবর্তে লক্ষ্মীর নাম শুনিতে পাইব; সুতরাং এখানেও দুর্গা অর্থে লক্ষ্মীই, অসুরমর্দিনী চণ্ডী নহেন।

১৮

আলোরে অরণি মা লক্ষ্মীর চরণি।
মা লক্ষ্মী দিল বর ধান কড়ি বার কর,
ধান দিবু না দিবু কড়ি তোক্ করমু নড়ি ধরি,
নড়ি ধরি রাম রে সোনার কড়ি ফল রে,
সোনা না উপার মালা এ ঘরখান জগত মালা
জগত মালা ইলি ঝিলি হামার ঘরক খায় লিলি,
লিলি খা'তে বড় মন পান্তাভাতে ঢালে নুন।

পান্তাভাত শ্যাড়শ্যাড়া খেড়্যাবাড়ী খ্যাড়খ্যাড়া,
খেড়খেড়াতে লাগ্‌লো হুড় কে কে যাব বিরামপুর,
বিরামপুর পাত পাড়া তিছয় আঠার ঘোড়া,
ঘোড়া ঘুড়ি বুঝ্যা লব শ্যাল গোটা ছুই মার‍্যা লব।
শ্যাল মারুতে আছি ও ছি।
সাত বামনের সাত শ্যাট বুড়ো বামনের হাড়্যা প্যাট,
হাড়্যা প্যাটোত মারমু গুড়ি ছোল বাড়ান আড়াই কুড়ি।
ছোলের নাম কি?—আখাল গোপাল।
বুড়ার নাম কি?—বুড়া গোপাল।
বুড়ির নাম লেজকাটা ভোম্‌রি।—বগুড়া

১৯

আইয়োরে ভাই অরণে। লক্ষ্মীদেবীর চরণে॥
লক্ষ্মী দেবী দিলান্‌ বর। ধান কড়িটি বাইর কর॥
ধান না দিয়া দিলে কড়ি। তারে করলাম্‌ লড়ি ধড়ি॥
লড়ি ধড়ি সাম্‌রে। সোনার মুকুট বান্ধরে॥
সোনা না রূপা ভালা। এই ঘরখান দেখতে ভালা॥
ছিক্কাই লড়ে ছিক্কাই লড়ে। ঝুম্মুর ঝুম্মুর কড়ি পড়ে॥
ওগ্‌লা কড়ি পাইলাম্‌রে। বাইন্যা বাড়ীৎ গেলামরে॥
বাইন্যা বাড়ীৎ বাঘের ছাও হেক্কুর হুক্কুর করে রাও॥
বড় বড় ঘরণী। মশা বড় চাটুনী॥
কেন গো মশা এত মন। আমাদের দিবা কত ধন॥
আমিত মাগিয়া খাই। লক্ষ্মীর চরণ গাই॥
লক্ষ্মী গেলাইন্‌ নাগরপুর। কিইন্যা আন্‌লাম্‌ চাম্পাফুল॥
মধ্যে একখান সমুদ্দুর। সমুদ্দুরের মধ্য দিয়া সাধের নাও চলে॥
আড়াই কুড়ি ডিম লইয়া কুঁড়ায় ডাক ছাড়ে॥
কুঁড়ায় বলে কুঁড়ী এইবার বড় বান।
বান খামু না ধান খামু, খামু ভাঙ্গের লাড়ু।
ছুই ঠোটে চাবাইয়া খামু সবনের লাড়ু॥

সবনের লাড়ুর মধ্যে রঙ্গী দুইটি ধান।
কোথায় গিয়া পাব আমি পদ্ম ফুলের গাং॥
পদ্ম ফুলের গাঙ্গের মধ্যে সাধের নাও চলে।
ছড় কুড়ি ছয় ডিম লইয়া কুঁড়ায় ডাক ছাড়ে॥
একটা ডিম পাইলাম্ চালে গুইঞা খুইলাম্॥
চালে ধরে কুমরা বেড়ায় ধরে লাউ।
একই চুমুকে খাইলাম্ সাত পাইলা জাউ॥
আম তলার পানিটুকু জাম তলা দিয়া যায়।—পূর্ব-মৈমনসিং

২০

আইও রে ভাই অরণে। মা লক্ষীর চরণে॥
মা লক্ষী দিল বর। চাইল কড়িটি বাইর কর॥
চাইল দিবি না দিবি কড়ি। তারে করিব লড়ি দড়ি॥
লড়ি দড়ি শ্যাম রে। রূপার কড়ি রাম রে॥
এই ঘরখান দেখিতে ভালা। রূপার কড়ি জগৎ মালা॥
হেজার কাটা লোহার বিষ। মাইগ্যা পাইলাম ধানের শীষ॥
ধান শীষ না পাইয়ারে। মাগুন লইলাম চাইয়ারে॥

—পশ্চিম মৈমনসিং

২১

আইলাম রে অরণে লক্ষী মায়ের চরণে,
লক্ষী মায় দিলেন বর ধান চাউল বাইর কর।
ধান দিয়া, না দিয়া কড়ি ঐ বাড়ী পাইম্ সোনার লড়ি।
সোনার লড়ি পাইম্ রে শ্যাম সুমারি কাইম্ রে।

—ঢাকা, বিক্রমপুর

২২

আইলাম রে স্মরণে, লক্ষী দেবীর চরণে।
লক্ষী দেবী দিলেন বর ধানে চাউলে ভরুক ঘর।
চাউল না দিয়া দিলাম কড়ি, পাঁচ খাটালে টাকারে লড়ি।

একটি টাকা পাই রে, বাইন্ঠা বাড়ি যাই রে।
বাইন্ঠা বাড়ি ঘুঘুর বাসা, টাকা ভাঙ্গায় নাছু বাচ্চা।
ঠাকুর কুলাই ভো ॥—ববিশাল

২৩

তাইএর্ বে হবণে,
লক্ষ্মী দেবীব চবণে।
লক্ষ্মী দেবী দিয়ে বল,
হেডব চডি পড়ে কহল ॥
তাব মাঝে সোনাব দানা,
সোনা নয় রূপা নয়,
মধ্যে একগুআ টেঁয়াব ছালা।
একগুযা টেঁয়া পাইলাম্ বে,
বান্থা বাডীত্ গেলাম্ বে,
বান্থা বাডীব কন্ ঘাঁটা,
পুব দুযার্গ্যা মাদাব কেঁডা,
মাদাব কেঁডা হেট কবি,
মত্যা আইএব্ বেইট কবি,
আইবা মত্যা যাইবা করি (বা 'কই') ?
ঘাঠ পেলাইতা যাওবে,
ঘাঠব তলে বাঘব ছা,
হুম্মুব হাম্মুব কাবে বা,
ও বাঘা খাইম্ বে,
বনে বসি খাইম্ বে,
বনেতে নিবাস বনেতে নির্মূল,
মাথা ভবণ তেল,
ঘহব বাহু মিলাই গেল্ ॥ —চট্টগ্রাম

অনেক সময় মাগন সংগ্রহ কবিয়া বাখাল বালকেরা মাঠে গিয়াই বাঘাই নামক ব্যাঘ্র দেবতার পুজা করিয়া থাকে। এই সকল ছড়া মৈমনসিংহ জিলায় 'বাঘাইর বয়াত' নামে পবিচিত।

২৪

আইলামরে আইলামরে।—
আইলামরে ভাই অরণে,
লক্ষ্মীদেবীর চরণে॥
লক্ষ্মীদেবী দিলাইন বর,
চাইল কড়িটি বাইর কর।
চাইল আনিয়া দিল কড়ি।
তারে করব লড়ি দড়ি॥
লড়ি দড়ি শ্যামার।
সোনার মটুক রানার॥
সোনার মটুক রূপার খিলা।
ঐ ঘরখান দেখ্‌তে ভালা॥
গৌর ভালো গৌর ভালো।
গৌর বড় কাটুনী।
মাইয়া বড় টিটুনী॥
কেন গো মা বিরস বদন।
আমায় দিবি কত ধন?
আমিত মাগিয়া খাই।
'বাঘাইর বয়াত' গাই॥
বাঘাই গেছে নাগাইপুর।
আমার বাড়ী মথুরাপুর॥
আইতে যাইতে অনেক দুর।
মধ্যে একটা সমদ্দুর।—মৈমনসিং

২৫

এই বাড়ীৎ আইলাম আগে দুষমন্ বাদীরে খাইল বনের বাঘে,
বড় ঘর বড় ঘর, বড় ঘরের উলুর ছানী, লক্ষ্মী আইলান চারি কানি।
আইলান লক্ষ্মী দিলাইন বর, চাউল কড়িটি বাইর কর।
চাউল দিবি না কড়ি দিবি, বাঘাইর নামে সিন্নী দিবি;

চাউল না দিয়া দিলে কড়ি তারে কড়ি লড়িধরি
লড়িধরি আনরে, সোনার মুটুক ভাঙ্গরে!
সোনা না রূপা ভালা, এই ঘর খান দেখতে ভালা।
বড় বড় চাটুনী, গীরতাইন বড় গাথুনী।
ও গো গীরতাইন আনাইর বর, আমারে দিবি কত্তর ধন?
আমি মাগিয়া খাই, বাঘাইর চরণ গাই।
বাঘাই গেলেন্ চাগাইপুর, কিন্তা আন্‌লাইন্ চাম্পাফুল।
চাম্পাফুল বর্তমান, হাইস্তা হাইস্তা কর দান।
দান কইরা পাইবা কি?—সূতার কাপড় হরতকী।—মৈমনসিং

এখানে গীরতাইন শব্দের অর্থ গৃহিণী, গৃহ ও গৃহিণীর সুখ্যাতি করা মাগনের ছড়ার একটি বিশেষত্ব।

২৬

আইলামরে ভাই বড় বাড়ী, লাউ জিঙ্গলা কলাবাড়ী।
কলা বাড়ীর ধলা লাউ, সেই সব বাড়ী নিম লাউ।
নিম ধরছে উজাইয়া, সারা সংসার ভাসাইয়া।
সাগর সংসার নারীর কুল, নারীর মাথাৎ নাইকা চুল।
সেই নারী কুল পিন্ধে, শীতের কাঁটা কান বিন্ধে।
শীতের কাঁটা লোহার বেল, মাপতে পাইলাম ধান দেন;
ধান দেন গো বাড়ীৎ যাই, শীতে বড় কষ্ট পাই।
ঢালা ঢালা কচুর পাতা দাঁত মরাইলাম ছাই,
হাত্তী আইয়ে ঘুড়া আইয়ে ফুল মাণিকের ভাই।
ফুল মানিকের ভাই নারে উড়ান্তা কইতর,
উড়িতে উড়িতে যায় খুপের ভিতর।
একজুড়া খুপ নারে নয় জুড়া পিতল;
তা দিয়া গড়াইলাম একখান নাও—
তারির মধ্যে চড়িয়া যায় দেবী দুঃখ্যার মাও।
দেবী দুঃখ্যার মা নারে হাসিতে হাসিতে,
কাল কাল দুই ছুকরী আইল নাচিতে নাচিতে।

আইওরে ভইন সকল জলেরে যাই,
জলেরে যাইতে শ্রীফল খাই
শ্রীফল খাইতে দাঁতে ফুটল কাঁটা,
আইজ হইতে ফুরাইল সতীনের খুটা।
সতীন্ সতীন্ বহুদূর, মেল্যা মারলাম চাম্পাফুল,
আয়রে চাম্পা কলা গাছ বাইয়া,
ছয়কুড়ি লাথ মারি তর ঘেগ্ বাইয়া॥—মৈমনসিং

নিম্নে কুলমাণিক নামক এক দেবতার নাম শুনিতে পাইব, এখানে তাহাকেই ফুলমাণিক বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে।

২৭

থুব রানী থুব বাজে, চাউল কড়িটি জোর বাজে,
চাউল দিবে না দিবে কড়ি, তারে কড়ি লড়িধরি,
লড়ধরী সামরে, রূপার থামে বান রে!
রূপা কি সুনা সোনা ভালা, এই ঘরটী দেখতে ভালা;
ঘর বুলে ঘরণী, মায় বুলে ছাঠুনী,
কেন গো মা বিরস বদন, আমাবে দিবা কত মণ?
আমি ত মাগিয়া খাই, বাঘেব বয়ান গাই,
বাগাই গেছে নাগাইপুব, বিচ্যা আন্‌ছে চাম্পাফুল;
চাম্পাফুল বর্তমাইন, হাস্যা হাস্যা দেইন ধান,
দেও ধান যায় দূর, আমাব বাড়ী অনেক দূর।
মধ্যে পড়ল সমদ্দুর।—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে জঙ্গলী পীরের মাহাত্ম্য কথা শুনিতে পাইতেছি। জঙ্গলী পীর জঙ্গল বা অরণ্যের অধিকর্তা, ইংরেজিতে তাহাকে Sylvan god বলা যায়।

২৮

ছত্তর ছত্তর জংলী পীরের ছেলে আইল বাড়ীর ভিতর,
জংলী পীরের ছেলে দেখ্যা যেবা করে হেলা,
তার দুইটি চোখ খায় ঠিক দুপইরা বেলা।

ছেলা নারে ঢুলা নারে গায়ে আইল জর,
কেমনে সইব জঙ্গলী পীরের ভর,
জঙ্গলী পীর খাটা খুটা মুখে চাপদাড়ি
লীল ঘুড়া (ঘোডা) দৌডাইয়া যায় গুয়ালনীর বাড়ী।
গুয়ালিনী বুলে আছে দানা, গুয়াল বুলে নাই,
বাতানে পডিয়া কান্দে নবলক্ষ গাই।
নয়লক্ষ গাই নাবে নয়লক্ষ বাছুবী।
বন্ধগুন্ধ লাইডা দিছে গরুর চামরী,
এক বেটা ফকিবে চড কবল থানা,
সাত দিনেব মবা গাভী উঠ্যা লইল দানা।—ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে কোন অলৌকিকতাব লক্ষণ নাই, বরং গৃহস্থ জীবনের প্রাত্যহিক একটি চিত্র এখানে নাটকীয় পবিচয় লাভ কবিয়াছে—

২৯

গুড গুড বাট টই ,মাবি বাই বাই সই!
হাল্ ভাইতে যাব আমি, ভাত বান্ধিও তুমি।
হালে ভাইতে যাবে তুমি, শুধু ভাত বান্ধব আমি।
শুধু ভাত বান্ধব আমি হালের পাজন ভাঙ্গবে তুমি।
হালের পাজন ভাঙ্গ্ব আমি বাপেব বাডী যাবে তুমি?
বাপেব বাডী গেলে তুমি চুল ধবিযা আনব আমি।
কান্ধ ভবিয়া ঢাল্বে তুমি গাঙ্গে নিয়া ধুইব আমি।
গাঙ্গে নিয়া ধুইবে তুমি, মাছ হইয়া যাইব আমি।
মাছ হইয়া গেলে তুমি, জাল দিয়া ছাপ্ব আমি।
জাল দিয়া ছাপ্লে তুমি গর্তের মধ্যে যাব আমি।
গর্তের মধ্যে গেলে তুমি লাঠি দিয়া খুঁজব আমি।
লাঠি দিয়া খুঁজলে তুমি ছনের নীচে যাব আমি!
ছনের নীচে গেলে তুমি, আগুন ধরাইয়া দিব আমি।
আগুন ধরাইয়া দিলে তুমি চিল হইয়া যাব আমি,
চিল হইয়া গেলে তুমি তীর মারিয়া ফেলব আমি।

৩০

বাঘা বুলে বাঘুনী অরুণ বনে যাইও,
করু মামুদের গরু দেখলে ছেলাম জানাইও।
মানুষ খাইবা গরু খাইবা আর খাইবা কি?
সামনে আছে দেইখ্য চাইয়া করু মামুদের বাড়ী।
করু মামুদ করু মামুদ কি কর বসিয়া?
দুনাল্যা দুই বন্দুক লইয়া বাঘ শীকারে যাই।
বাঘ শীকারে গিয়া দেখি বাঘা ডুরী নাই।
বাঘা ডুরী মেল্যা মারল তারাগড়ের মধ্যে,
খুন্তা বলায় কামড় মারল টেগ্রা চোখের মধ্যে।
মামদির মা গো মামদির মা, বলি একটা কথা,
চোখের মধ্যে বাট্যা দেওরে দারুণ চুতরার পাতা।
দারুণ চুতরার পাতা দিলরে বাটিয়া,
ছয় মাস ধইরা খাজ্জুয়ায় চোখ মুড়া নোখ দিয়া।

এখানে খুন্তা বলা শব্দের অর্থ খুদে বা ক্ষুদ্র বোলতা, টেগ্রা শব্দের অর্থ টেরা, চুতরা শব্দের অর্থ বিছুটি এবং খাজ্জুয়ার শব্দের অর্থ চুলকায়।

৩১

পুব দুয়াইরা পুব দুয়াইরা—
পুব দুয়াইরা কানাইর ঘর, আগা পাছা চাইর ঘর।
চাইর ঘরের ভমরের নাতি,
আইলাইন গো বাঘাইর নাতি।
আইলাইন্ বাঘাই দিলাইন বর, ধান চাউল বাইর কর
ধান দিবে না কড়ি দিবে, বাঘাইর নামে সিন্নী দিবে,
ওহো হো বাঘাই পান জুরী,
যোল্ল সতর বাচ্চা লইয়া নামিছে বাঘুনী।
যোল্ল সতর বাচ্চা নারে যোলখানি গাঁও,
আমার বাঘাইরে নি দেখেছ কোন গাঁও।

আমার বাঘাইর হাত বুল্‌বুল্যা ছাগল,
সেই ছাগল দেখ্যা অইল লক্ষ্মীন্দর পাগল।
লক্ষ্মীন্দর লক্ষ্মীন্দর কি কাজ করিলে ?
মাঘ মাইসা সারা রাইত চাউল কড়িটি মাগাইলে।
চাউল দেও কড়ি দেও হাড়ী ভরা ঘি,
হাড়ী ভরা ঘি নারে গীরস্থের ঝি।
আমরারে সিন্নী দিতে যে করিল হেলা,
তার দুটি চোখ খাইব ঠিক দুপইরা বেলা।
ঠিক দুপইরা বেলা নারে আন্দিগুন্দি বায়,
আন্দিগুন্দি বাইয়া বেটী।

লক্ষ্মীন্দর যে কোন্‌ সূত্রে ছড়াটির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

৩২

স্বামীর কান্দ ভর দিয়া গুয়াল (গোয়াল) বাড়ি যায়,
গোয়াল ঘর গিয়া দেখে ষোল্ল সতর গাই।
চাউল না দিলে কড়ি না দিলে গুয়ালপাড়া যাই,
গুয়াল্যারা একজাৎ মাথ্যা তুলে ঘি,
সিন্নী দেও গো গীরস্থের ঝি
গুয়াল্যারা সাত ভাই নূতন কামেলা,
হাড়েগুড়ে টান্যা তুলে মরা গরুর চামড়া।
গুয়াল্যারা সাত ভাই ডক্কায় মাইলা বাড়ি।
এমুন সময় ডেফল্‌নী লা ডেফলনী পিঠা খাইবে নি ?
স্বামীর ডরে ভাইয়ের ডরে, পিঠা থইছে উগার তলে,
হাত বাড়াইয়া লাগাল পায়, ডেফল্‌নীরে বাঘে খায়।

৩৩

ছিক্কা লড়ে ছিক্কা লড়ে ঝামুর ঝুম্মুর টেকা পড়ে
ওগলা টেকা পাইলামরে, বান্যা বাড়ীৎ গেলামরে,
বান্যা বাড়ীৎ বাঘের ছাও, হাম্মুর হুম্মুর করে রাও।

আমি জানি না দাদা জানে, ছয়কুড়ি ছয় রাখাল কিনে,
রাখালরে দেয় মুড়্কী কলা, গরু লইয়া যায় শিমুল তলা,
বাঘা আর বাঘী সত্য করে, লাফ দিয়া তার ঘাড় চড়ে।
এক বাঘ রামা, গোয়াইলত নেয় গা দামা,
এক বাঘ একী, গোয়াইলত নেয়গা ঢেকী।
এক বাঘ উগারের খুটী, চাউল চাবায় খুঠী মুঠী ;
এক বাঘ উচিমুচি, ঘরত নেয় গা ভাঙ্গা খুচী
এক বাঘ মঙ্গলা, নিত্যই ভাঙ্গে জঙ্গলা।
এক বাঘ তারা, নিত্যই বানে বাড়া
এক বাঘ ঢইরা, ঘবত নেয় গা ধইবা,
এক বাঘ কানি, তাব তলপেট লাগল পানী
যাহা কিছু জানি সব আমরার শুনানী।

ছড়াটির মধ্যে ব্যাঘ্রের বিচিত্র নাম ও গুণকীর্তন শুনিতে পাওয়া গেল।

৩৪

চালে ধরে চাল কুমড়া বেড়ায় ধবে লাউ,
সেই লাউ দিয়া রান্ধ্যা খাইল সাত পাইলা জাউ।
সেই জাউ খাইয়া কোমব' করল বল,
একৈ ধাক্কায় ফালল গদাই বুড়ার ঘর।
গদাই বুড়া গদাই বুড়া খুডা বন্দি কব;
খুড়ায় পিন্দে সাত কাপড় খুড়ী পিন্দে সাড়ী।
সেই সাডী পিন্দিয়া আইল তিন বুড়াবুড়ী।
এক বুডায় রান্ধে বাড়ে দুই বুড়ীয়ে খায়,
তপুইড়া ধুড়পুইড়া পুলায় বাইছালী খেলায়।
আমতলার পানী পুটী জামতলা দিয়া যায়।—মৈমনসিং

উক্ত ছড়াটির মধ্যে বাঘের নাম নাই সত্য, কিন্তু একই উপলক্ষ্যে ইহাও গীত হয় বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৩৫

আইলাম রে ভাই কান্দি ভাইয়া,
বাঘ রইছে হরিণ লইয়া ;
হরিণ খাইয়া সেজা খায়,
সোনার লাঙ্গল ঘরে যায়।
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল,
ঘর-জামাইয়া জুড়ছে হাল।
জুড়ছে হাল জুড়ছে মই।
আমোন ধানের গুড়িত রে।
আমোন ধানের বড় বড় পাতা,
পোলায় খায় বুড়ীর মাথা।
—ও পোলা আমার রে
বানবাসী যায়াম্ রে—।
বনেতে বেরুয়া বাঁশ,
সেখানেতে নীল হাঁস।
নীল হাঁস নীল পেয়রা (পায়রা)।
হাত বাড়াইয়া পাইলাম ঘোড়া ;
মাথা ভইরা পাইলাম তেল
শরীর জুড়াইয়া গেল।
আইট্টা কলা ডিঙ্গার পাত,
ঘরগুষ্টি সেলামে থাক।
থুব, থুব।

থুব থুব শব্দটি মঙ্গলসূচক ধ্বনিমাত্র, বিভিন্ন প্রসঙ্গেই ইহা শুনা যায়।

৩৬

আর বাগ রে, আর বাগ রাইঙ্গা,
ঘর ফেলাইল রে, ঘর ফেলাইল ভাইঙ্গা।
আর বাগ রে, আর বাগ চৈতা,
বাওন মাইরা রে বাওন মাইরা নিল পৈতা।

এখানেও বাঘের নাম ও গুণগান শুনিতে পাওয়া গেল।

পৌষমাসে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে মুসলমান ফকিরেরা এই লক্ষ্মীর ছড়া বলিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে—

৩৭

লক্ষ্মীর পাঁচালী কিছু শোন দিয়া মন।
মন দিয়া শোন সবে লক্ষ্মীর বচন।
এক নাম ধৈরাছেন তিনি লক্ষ্মী নারায়ণী।
নর লোক বলে তারে জগত জননী।
লক্ষ্মী বলে কারে আমি করি মহারাজা,
অন্ন বিনা কারো শরীর করি ভাজা ভাজা।
সকাল বেলা ছড়া দেয় মা সন্ধ্যাকালে বাতি,
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি।
রাইন্ধ্যা বাইর‍্যা যেই নারী পুরুষের আগে খায়।
ভরা না কলসের জল তরাসে শুকায়।
স্নান কৈরা যেবা নারী মুখে দেয়রে পান।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান।
পায়ের উপর পাও থুইয়া যেই নারী বসে।
ছয় মাসের মধ্যে তার সিথার সিঁন্দুর খসে।
আউলাইয়া মাথার কেশ ফিরে পাড়াপাড়া।
নিশ্চয় জানিবা, মাগো, সে যে লক্ষ্মীছাড়া।
ধুপ ধুপাইয়া হাটে নারী চোখ পাকাইয়া চায়,
ঐ নারী অভাগিনী আগে পুরুষ খায়।
হিরল দাঁত, চিরল দাঁত যেবা নারীর হয়,
আড়াই মাসের মধ্যে তার পতি যাবে ক্ষয়।
বিছাইয়া সোয়ামির শয্যা পাও দিয়া ঠেলে,
সেই নারীরে ছাড়ি আমি নিশা ভোরের কালে।
হস্তিনী নারীর কথা শোন নারায়ণ,
উজল নয়নে চলে হস্তীর চলন।
শঙ্খমণি নারীর কথা শোন গুণমণি।
শঙ্খের সমান রূপ জলন্ত অগিনী।

সেই নারীর শুয়াস যদি লাগে পতির গায়।
ছয় মাসের মধ্যে বান্দার হায়াত হয় ক্ষয়।
পদ্মমণি নারীর কথা করি নিবেদন,
সেই নারীর শরীরে লক্ষ্মী থাকে সর্বক্ষণ।
সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চুড়া,
অসতী নারীর পতি ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।

প্রধানতঃ মুসলমান রাখাল বালকগণ নিম্নোদ্ধৃত ছড়া আবৃত্তি করে বলিয়া লক্ষ্মীদেবী এখানে লক্ষ্মীবিবি হইয়াছেন। দক্ষিণবঙ্গেও এই প্রকার বনদুর্গা স্থলে বনবিবি এবং ওলাই চণ্ডীর স্থলে ওলা দেবী নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

৩৮

আইলাম রে অরণে, লক্ষ্মীবিবির চরণে।
লক্ষ্মীবিবি দিল বর, চাইল কড়ি বাইর কর॥
চাইল দিয়া না দেয় কড়ি, বার মাস ভার লড়িগড়ি।
লড়িগড়ি শ্যাম রে, সোনা বান্ধা থাম রে!
সোনার হালুকা বাঁশ, আগ দুয়ারে থুইলাম হাঁস।
হাঁস ফালাইয়া দিলাম লড়, পায়রা পাইলাম বত্রিশ জোড়।
পায়রার নাম ডাকসুয়া, বাঘমারারা খায় গুয়া॥
গুয়া খায় আর কড়মড়ায়, দুই দাঁত তার ক্ষরক্ষরায়।
দুই দাঁত না রে দুই মুলা, ধান বাইর কর চাইর কুলা॥
ধান নয় রে টাকা-কড়ি, পাইলে সে নড়ি,
এক টাকা পাব রে, বাইনা বাড়ী যাব রে।
বাইনা বাড়ী ঘুঘুর বাসা, লবণ বিকায় পয়সা পয়সা।
হিয় রে, হিয় রে, চারিটা পয়সা দিয় রে।—ঢাকা

ঢাকা, বরিশাল এবং মৈমনসিংহ জিলার কোন কোন অঞ্চলে বাঘাইর পরিবর্তে কুলই ঠাকুরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কুলই ঠাকুরও ব্যাঘ্রের দেবতা বলিয়াই মনে হয়, কোন কোন ছড়ায় তাহাকে কুলমাণিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বে একবার তাহারই নাম ফুল মাণিক বলিয়া শুনিয়াছি।

৩৯

আইডারে আইডারে।—
আইলাম রে স্মরণে,
লক্ষ্মীদেবী বরণে।
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর,
ধান চাউলে গোলা ভর।
ধান না দিয়া দিলেন কড়ি,
তাতে হইল সোনার নড়ি,
সোনার নড়ি রূপার পাশা;
পাঁচ খাটালে টাকার ছালা,
একটি টাকা পাই রে,
বানিয়া বাড়ী যাই রে।
বানিয়া বাড়ী কত জন?
কুলাই রে দিবে কত ধন!
ঠাকুর কুলাই ভো॥—বরিশাল

৪০

আলুর পাতার ঠালুর ঠুলুর, দাঁত মড়াইতাম ছাই,
আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুল মাণিকের ভাই।
কুল মাণিকের ভাই নারে উড়িল কইতর,
উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর।
সোনা আর পিতল দিয়া বান্দাইলাম নাও,
সেই নাও চড়িয়া আইয়রে দুর্গার মাও।
দুর্গার মাও নারে হাসিতে হাসিতে,
কালা-কালী দুইডা ছেঁড়ী নাচিতে নাচিতে।
আয়রে বইন সকল জলেরে যাই,
জলেরে গি—ই—য়া ছিরফল খাই।
ছিরফল খাইতে খাইতে হাত ফুটলাম কাঁটা,
কাঁটা না কাঁটা না—
আইজ হইতে রইলাম আমি সতিনের খোঁটা।—মৈমনসিং

৪১

দাদায় গেছে বাঘাইপুর
কিন্যা আন্‌ছে চাম্পাফুল।
চাম্পা না রে মর্তমান,
এস গিরি কর দান।
এক ধান দুই ধান,
মধ্যে মধ্যে হল্‌দে ধান,
অরে হল্‌দে গুয়া খা,
পাড়ের বাঘ সরে যা।
কুলইর বর, কুলইর বর।—ঢাকা

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে যশোহর, খুলনা এবং ফরিদপুর জিলার কোন কোন অংশে হাল্‌ইর মাগনের ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, হালই সম্ভবতঃ হালের দেবতা—

৪২

শামুক খোলা শামুক খোলা—হালই
আমুরা কয়টি ঝিপুত পোলা— „
জাড়েতে কষ্ট পাই — „
দেও ধান নিয়ে যাই — „—যশোর, খুলনা

৪৩

এ বাড়ী কার রে— হালই
চাঁদমুখ যার রে— „
চাঁদমুখ কোতোরির ঠোঁট— „
পায়রা আসে দিল ঠোঁক— „
আয় পায়রা পড়সে— „
নোয়া বেগুন ধরসে— „
নোয়া বেগুন পিপ্পেল বীচি— „
ধান দাও সাড়ে পাঁচ খুঁচি— „
দেও ধান নিয়ে যাই— „
বাস্তর গোড়ায় ফুলজল ছড়াই—হালই।—ঐ

ছেলেভুলানো ছড়ার পদ যে ইহাদের মধ্যে কি ভাবে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—

৪৪

লড়িয়া রে লড়িয়া— হালই
হাতীর পিঠে চড়িয়া— „
হাতী গেল করিমপুর— „
পেয়ে এল চাম্পাফুল— „
চাম্পাফুল বর্তমান— „
ধান দাও লক্ষ্মীনাথ— „ —ঐ

ঢাকা অঞ্চলে হালইর পরিবর্তে ধোলো নাম শুনিতে পাওয়া যায়, ছড়ার অন্যান্য বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাইয়া হালই এবং ধোলো বা ধোলই যে একই প্রকৃতির গ্রাম্য দেবতা তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

৪৫

এ বাড়ীখানি কার, রে?
চাঁদমুখ যার রে!
চাঁদমুখে কোতোরের ঠোক্,
পায়রা আস্তে দিল ঠোক্।
আয় পায়রা পড়্‌সে;
লাক্ষা বাগুন ধর্‌'সে।
কুলোর পিঠে কুলো র'ল,
ধবলীরে বাঘে খা'লো।
দাও ভিখ্ পাইয়ে যাই,
ধোলোর গীত গাইয়ে যাই॥—ঢাকা

বরিশাল জিলায় হালই কিংবা ধোলোর পরিবর্তে নলিয়া নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

৪৬

আয়রে নলিয়া।
অস্তি ঘোড়ায় চড়িয়া॥

অস্তি ঘোড়ায় কি কাজ করে।
রাজার মায়না খাইয়া লড়ে॥
রাজার বাড়ী হাজার বাঁসা॥
তা দেখ্যা ওড়ে হাঁসা॥
হাঁসা ওড়ে দিয়া মোড়া।
পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া॥
ও পায়রা তরাসিয়া।
লোয়ার বাইগন তরাসিয়া॥
লোয়ার বাইগন সরল পথে।
ভিখ দেও আন্যা লক্ষ্মীর আতে॥—বরিশাল

পৌষ মাষের সংক্রান্তিতেই বাস্তু পূজা হয়, গোষ্ঠীগতভাবে সমগ্র গ্রামের নামে যে পূজা হয়, তাহার জন্য মাগন সংগ্রহ করা হইয়া থাকে; তাহাতেও ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

৪৭

ও গিরী, ও গিরী
বার করে দাও সোনার পিঁড়ি।
সোনার পিঁড়িতে বসবে কে?
বাস্তু ঠাকুর এসেছে।
বাস্তু ঠাকুর দেখেন বর,
—'ধানে-ধনে ভরুক ঘর।'
এ ঘর ভরে ও ঘর ভর,
কলাতলায় গোলা কর।
কলাতলায় হাটু পানি,
ধান লয়ে টানাটানি।
ধানে প'ল শোলা,
ধান হ'ল এক শ' বত্রিশ গোলা॥—ঢাকা

গিরী শব্দের অর্থ এখানে গৃহকর্ত্রী ধরিতে হইবে।

তোষলা বা তুঁষ তুষলীব্রত পৌষ মাসের প্রধানতঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। মানভূম জিলায় ইহা টুসু নামে পরিচিত, সেখানে ছড়ার পরিবর্তে যে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই টুসু গান—বাংলার লোক-সঙ্গীতের এক বিশিষ্ট সম্পদ। তুষ-তুষলীব্রতে গোবরের সঙ্গে নূতন ধানের তুঁষ মিশাইয়া নাড়ু প্রস্তুত করিতে হয়, নাড়ুর সংখ্যা ১৪৪ পর্যন্ত হইতে পারে। তারপর সেই নাড়ুর মাথায় এক একটি দূর্বা গুঁজিয়া দিতে হয়। সুতরাং ইহাতে ধরিত্রীর শস্যোৎপাদিকা শক্তিরই উদ্বোধন করা হইয়া থাকে বলিয়া মনে হইতে পারে। নাড়ু হাতে লইয়া সরিষা কিংবা মূলার ফুল দিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে হয়। ইহাদের মধ্যেও নারীজীবনের কামনা-বাসনার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়—

৪৮

তুষতুষলি জাঁতাজাতি।
বাপমার ধন, স্বামীর ধন, নিজের খ্যাতি ॥
ঘর করবো নগরে, মরবো ত সাগরে।
জন্মাব উত্তম কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
তুষুলি গো রাই, তুষুলি গো ভাই।
তোমার কল্যাণে খাই ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু।
আমার যেন হয় শাঁখার আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

৪৯

তুষ-তুষলী কাঁধে ছাতি।
বাপ-মা'র ধন যাচা যাচি।
স্বামীর ধন নিজপত্তি।
বাপের ধন কান্নাকাটি।
(আর) পুত্রের ধন পরিপাটি ॥
তুষলী গো রাই।
তুষলী গো মাই।
তোমার পূজায় আমি কোন বর পাই ?—২৪ পরগণা

পূর্ববাংলার মধ্যে ঢাকা বিক্রমপুরেও এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে দেখা যায়। সেখানকার ছড়াগুলি সামান্য পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়—

৫০

তুষ তুষালি কাঁধে ছাতি,
বাপের ধন লাতিপাতি,
ভাইয়ের ধন অতি দুর্গতি,
সোয়ামির ধন টগর বগর,
পুত্রের ধন অতি ঝগড় ।—ঢাকা, বিক্রমপুর

ভাইয়ের সংসারে বাস করিয়া ভাইয়ের ধন ভোগ করা যে দুর্গতির কারণ, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে ।

মানভূমে টুসুর গানের মধ্যে মধ্যে ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায় । একটির নিদর্শন এই—

৫১

আলা গো তুষকুন্নি ঘরে বাইরে গাইগুলি !
গেয়ের গোবরের সরষের ফুল ;
আমরা পুজি গো মা-বাপের কুল ॥—পুরুলিয়া

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া তোষলা ঠাকুরাণীর স্তুতিপাঠ করিতে হয়—

৫২

তুষ্ তুষলা তুষ পতি ।
কেন তুষলা এত রাতি ॥
বাপ মায়ের ধন যাচাযাচি ।
পুত্রের ধন নিল পতি ॥
আমরা যাব গৌড় ।
আনব দাদার মউড় ॥
দোব দাদার বিয়ে ।
লাগ ঝমাঝম দিয়ে ॥
কাঁটালের পিঁড়ে খানি ঘি মৌ মৌ করে ।
তায় বসে আই ঠাকরুণ জলপান করে ॥
জল পান করতে করতে হাতে ফুটলো কাঁটা ।
আমরা না খাইতে পারি ভুদে মায়ের পাঁঠা ॥

বাড়ন বাড়ন এ পৌষে আবার বাড়ন মাঘের শেষে,
মাঘ ঘণ্ট লাউ ঘণ্ট বাপ রাজা মা রাণী।
ফুল নাও গো তমলা রাণী।
তমলার মাথায় দিয়ে ফুল, ধনে পুত্রে উলখুল ॥—হুগলি

ছেলেভুলানো ছড়ার কিছু কিছু অংশ আসিয়া ইহাতে মিশিয়াছে। কিংবা এ কথাও মনে হইতে পারে যে, ব্রতের ছড়া হইতেই কিছু কিছু ছেলেভুলানো ছড়ারও সৃষ্টি হইয়াছে।

পূজান্তে মাটির সরাতে করিয়া তুষু বা গোবরের নাড়ুগুলি বিসর্জন দিতে হয়, তুষু বিসর্জনের প্রাক্কালে ছড়া—

৫৩

তোষলা, তোষ-তোষলা, তোষলা গো রাই।
তোমার দৌলতে আমরা দু'বড়ি পিঠা খাই ॥
দু'বড়ি ল'ব্ড়ি গাং সিনানে যাই,
গাঙ্গের জলে রাধি বাড়ি মগরার জল খাই ॥
চার মাস বর্ষা পোথন্না যাই।
পোথন্নায় দেখে এলাম দুয়ারে মরাই।—বাঁকুড়া

৫৪

তুষলী গেল ভেসে,
আমার বাপ ভাই এল হেসে।
তুষলী গেল ভেসে;
আমার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামিপুত্র এল হেসে। ইত্যাদি

মাঘ

মাঘ মাসেই স্থর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিকেই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। মাঘ মাসে স্থর্যের উত্তরায়ণের স্থচনাতেই বাংলার কুমারীদিগের মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থর্য ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাকে মাঘমণ্ডল ব্রত বলে। ইহা প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গে এই স্থর্যোৎসবটি অগ্রহায়ণ মাসে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। সেখানে ইহার নামও স্বতন্ত্র, ইহা পশ্চিমবঙ্গে সেঁজুতি ব্রত বলিয়া পরিচিত। তথাপি মাঘমণ্ডল ব্রতের সঙ্গে আচারগত ইহার আঞ্চলিক পার্থক্যও স্থষ্টি হইয়াছে।

ধর্মঠাকুর পূজার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে স্থর্যপূজার তিনটি স্বতন্ত্র ধারা আসিয়া একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—তাহা বৈদিক, স্কাইথীয় ও অনার্য। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মঠাকুর পূজার প্রচলন না থাকায় সেখানে এই স্বতন্ত্র ধারাগুলি বিশেষ একটি ধর্মাচার অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিবার স্থযোগ পায় নাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া প্রায় স্বাধীন ভাবেই বর্তমান আছে। অবশ্য এ'কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের উপর এক হিন্দুধর্মের সর্বজয়ী প্রভাবের ফলে এই স্বাতন্ত্র্যগুলি অনেক সময় খুব স্থস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায় না। তথাপি বৈদিক স্থর্যোপাসনার সঙ্গে ইহাদের স্থূল পার্থক্য অনুভব করিতেও বেগ পাইতে হয় না।

পূর্ববঙ্গের কুমারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘমণ্ডলব্রতের ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলার স্থর্যোপাসনার এক বিশিষ্ট ধারা বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহা ধর্মপূজার দেশ পশ্চিম বঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। ইহার নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি হইতেই ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাইবে।

চারি পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই কুমারী মেয়েরা এই ব্রত আরম্ভ করিয়া থাকে ইহা আরম্ভ করিবার পর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রতি মাঘ মাসের প্রত্যেক দিন ইহা উদ্‌যাপন করা হয়। পঞ্চম বৎসরে ইহা সম্পূর্ণ হয়। স্থর্যোদয়ের পূর্বেই কুমারীগণ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে, তারপর মাঘের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পুকুর ঘাটে কিংবা নিকটবর্তী নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা হাতে এক একটি করিয়া ফুল লইয়া জলের একেবারে ধারে গিয়া বসে এবং একজন মহিলার নির্দেশ মত

সূর্যদেবতা-বিষয়ক কতকগুলি লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া যায়। এই ছড়াগুলির ভিতর দিয়া তাহারা সূর্যঠাকুরের শৈশব, যৌবন-প্রাপ্তি, বিবাহ ও পুত্র লাভ ইত্যাদি বর্ণনা করে; এই সকল ছড়ার মধ্য দিয়াই নিজেদেরও ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে তাহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির যোগ এত নিবিড় যে, ইহা কোন ধর্মীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার পরিবর্তে, একান্ত গার্হস্থ্য ও বাস্তব অনুভূতির বাহন হইয়া আছে। উদয়োন্মুখ সূর্যের দিকে তাকাইয়া তাহারা গায়,—

উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকি মিকি দিয়া।
তোমারে পুজিব আমি রক্তজবা দিয়া॥
উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
উঠিতে পারি না আমি হিমানীর লাগিয়া॥

দুরন্ত মাঘের শীতে সূর্যের উদয়-মুহূর্তটি যতই বিলম্বিত হইতে থাকে, কুমারী ব্রতিনীগণ ততই অধৈর্য হইয়া গাহিতে থাকে,—

উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥
শিয়রে চন্দরের বাটি বুকে ছিটা পড়েরে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥

শীতের অলস সূর্য কুজ্ঝটিকার অন্তরাল হইতে কাতর চক্ষু মেলিয়া চাহিল। এইবার সূর্যের ধুতি-গামছা পরা, সূর্যের পুজা, আকাশ-রথে সূর্যের যাত্রা, খেয়াপার, সূর্যের বিবাহ করিবার ইচ্ছা, ঘটকের আগমন, সূর্যের বিবাহ, সূর্যের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা, গৌরীর সঙ্গে বিবাহান্তে তাঁহার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কাহিনী গীত হয়। উল্লিখিত মাঘমণ্ডল ব্রতের ভিতর দিয়া বাংলার সূর্যোপাসনার প্রাক্-পৌরাণিক যুগের একটি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। অতএব ইহার একটু বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

শীতের প্রভাতে পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়া কুমারী ব্রতিনীগণ গৃহে ফিরিয়া আসে। গৃহের সমস্ত আঙ্গিনা জুড়িয়া বিচিত্র আলপনা আঁকা হইয়া থাকে। ইহাদের পূর্বদিকে একটি বৃত্ত ও পশ্চিমদিকে একটি অর্ধবৃত্ত আঁকা হয়—ইহারা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র। ব্রতিনীগণ এই বৃত্তাকৃতি সূর্যের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া সূর্যবিষয়ক বিবিধ লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর এক একটি নূতন বৃত্ত এখানে যোগ করিতে হয়, পাঁচ বৎসরে পাঁচটি বৃত্ত পূর্ণ হইলে ব্রত সাঙ্গ হয়। এই বৃত্তগুলি বিবিধ রঙিন গুঁড়া দিয়া সুরঞ্জিত করা হয়। চন্দ্রসূর্যের চিত্র ব্যতীত সেই আঙ্গিনার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যবহারিক বস্তু, যথা—আয়না, চিরুণী, দোলা, থালা, গ্লাস ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সেঁজুতি ব্রতের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। এই সকল চিত্রাঙ্কনে চাউল ও ইঁটের গুঁড়ি ও ছাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—ইহাদিগদ্বারা যথাক্রমে সাদা, লাল ও কালো রং-এর কাজ চলিয়া থাকে। প্রতিদিন এই প্রকার চিত্রিত প্রত্যেকটি জিনিসের নিকট ব্রতিনী নানা ঐহিক বর প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেমন,—চিরুণীর নিকট এই বর প্রার্থনা করে, 'আমি পুজি গুঁড়ির চিরুণী—আমার লাগি থাকে যেন সোনার চিরুণী।' আয়নার নিকট প্রার্থনা জানায়, 'আমি পুজি গুঁড়ির আয়না—আমার লাগি থাকে যেন আভের আয়না', ইত্যাদি। পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই সূর্য উর্বরতা (fertility) বা উৎপাদন বৃদ্ধির দেবতা বলিয়া কল্পিত হ'ন, এখানেও বাংলার কুমারী কন্যাদিগের সূর্যের নিকট নানা ঐহিক বর প্রার্থনার মধ্যে যে তাহাদের মাতৃত্বেরও একটি সলজ্জ কামনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেইজন্য আদিম সূর্যদেবতার সঙ্গে নারী, বিশেষতঃ কুমারী নারীরই সম্পর্ক বেশী। পশ্চিম বঙ্গের কুমারীপুজার শিব, পুর্ববঙ্গের উক্ত কুমারী ব্রতের সূর্য ছাড়া আর কিছুই নহেন—এই বিষয়ে পুর্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ হইতে অধিকতর রক্ষণশীল। মাঘমণ্ডল ব্রত যে সময়ে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে, সেই সময়টিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—তখন হইতেই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, প্রকৃত পক্ষে ইহা পৃথিবীর বহু আদিম ও সভ্য জাতির সূর্যোৎসবের (sun-festival) অন্যতম সময়।

মাঘমণ্ডল ব্রত উপলক্ষে একটি সূর্যের ছড়া আবৃত্তি হইয়া করা থাকে—ইহা শিথিলবদ্ধ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ছড়ারই সমষ্টি—তথাপি পূর্ণাঙ্গ একটি আখ্যায়িকার রূপ লাভ করিয়াছে। ইহার বিষয়-বস্তুর মধ্যে যে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য ব্রতের ছড়া হইতে অধিকতর প্রত্যক্ষ।

শীতের প্রভাতে সূর্যঠাকুরের ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিতে চাহে না—অবশেষে তাঁহার মাতার অবিশ্রাম ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া পুর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিলেন—তাঁহার আভা ক্রমে রক্ত হইতে

স্বর্ণবর্ণে পরিণত হইল—পল্লীর গৃহচূড়া সেই আভায় রঞ্জিত হইয়া গেল। এইবার সূর্যঠাকুর রূপার বাটি হইতে তৈল ও সোনার বাটি হইতে গন্ধদ্রব্য লইয়া ক্ষীরসাগরে স্নান করিতে চলিলেন। স্নান করিয়া সূর্য-ঠাকুর একটি গামছা পরিধান করিলেন, তারপর তিনি ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূজা গ্রহণ করিয়া বারুই বাড়ীতে গিয়া পান হরীতকী দিয়া মুখশুদ্ধি করিলেন, তারপর যেখানে তাঁহার পূজা হইতেছে, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইবার পথে গৌরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল, বিবাহ করিয়া তিনি তাহাকে লইয়া নিজ গৃহে আসিয়া সংসার করিতে লাগিলেন। ছড়ার ভিতর দিয়া কাহিনীটি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

এখানে আকাশের সূর্যদেবতাকে বিবাহের বর কল্পনা করিয়া কুমারীগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

প্রথমেই সূর্যঠাকুরের ঘুম হইতে জাগরণের পালা—

জাগরণ

১

উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকি মিকি দিয়া!
"না উঠিতে পারি আমি শিশিরের লাগিয়া!"
শিশিরের পঙ্কমাটী শিয়রে থুইয়া,
উঠ্‌বেন সূর্য কোন্‌খান দিয়া?
উঠ্‌বেন সূর্য বামুন-বাড়ীর ঘাটখান দিয়া!
বামুন গো মেয়েরা বড় বড় সেয়ান।
পৈতা যোগায় বেহান বেহান॥
পৈতার কচুলান্যা জল পুকুরেতে ভাসে।
তাই দেখিয়া মাল্যানীরা খল্‌খলাইয়া হাসে॥
হাসিস্‌ না লো, খুসিস্‌ না লো, তুইতো আমার সই।
মাঘ মণ্ডলের বর্ত করুম্‌ ঘাট পামু কৈ?
আছে আছে লো ঘাট বামুন বাড়ীর ঘাট।
রাত পোহাইলে বামুনগো পৈতা ধোয়নের ঘাট॥
(এরূপ অন্যসকল ঘাটের নামকরণ)

ইহার পর মেলেনী বুড়ীর ঘাট, মেলেনী বুড়ীর ফুল,—

ফুলের গন্ধ জল পুকুরেতে ভাসে।
তাই দেখিয়া মাল্যানীরা খল্‌খলাইয়া হাসে ॥—ঢাকা, মাণিকগঞ্জ

রাতের অন্ধকারে নিমগ্ন, তারপর মাঘের কুয়াসায় আচ্ছন্ন সূর্যকে কুয়াসাজাল ছিন্ন করিয়া আকাশে উদিত হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে এবং তাহারই প্রত্যাশায় কুমারী ব্রতিনীগণ পুকুরধারে করজোড়ে বসিয়া মাঘের শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—

২

উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকি মিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি শিশির লাইগা।
শিশিরের পঞ্চবাটী শিয়রে থুইয়া,
সূর্য উঠ্‌বেন কোনখান দিয়া ?
বামন বাড়ীর ঘাটখান দিয়া।
বামনগ মাইয়াগা বড় স্যায়ান,
পৈতা যোগায় বিয়ান বিয়ান ;
মালিনী লো সই,
মাঘ মণ্ডলের বরত করুম, ঘাট পামু কই ?
আছে আছে লো ঘাট, বামন বাড়ীর ঘাট,
রাইত পোয়াইলে, বামনরা পৈতা ধোয় তাত।
পৈতার ময়লা খানি পুকইরেতে ভাসে,
তাই দেইখা মাইলানী খলখলিয়া হাসে।
হাসিস না লো মাইলানী, তুই ত আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের বরত করুম, ঘাট পামু কই ?
আছে আছে লো ঘাট, গোয়াল বাড়ীর ঘাট।—ইত্যাদি

—ঢাকা, চাঁদ প্রতাপ পরগণা

৩

উঠ উঠ সূর্যিমামা ঝিকিমিকি দিয়া
বামুন বাড়ীর পুব দিক্ দিয়া,

আইস আইস সুয্যিমামা আমাগ বাড়ী আইস,
আমাগ উঠানে রৌদ ছড়াইয়া বইস।
বড়সি বাইতে গেলাম পুকইরে আজ,
রাঘব বোয়াল পাইলাম মাছ।
পাইলাম পাইলাম কুটব কে ?
ওরা আইল কুটনী দা হাতে কইর‍্যা,
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া ;
নিজে কুট্‌লাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
কুট্‌লাম কুট্‌লাম রাধব কে ?
ওরা আইল রাধুনী কড়াই হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া।
নিজে রাঁধলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
রাঁধলাম রাঁধলাম খাইব কে ?
ওরা আইল খাওনী থাল হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া।
নিজে খাইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
খাইলাম খাইলাম কাঁটা কুড়াইব কে ?
ওরা আইল কাঁটা কুড়ানী গোবর হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া।
নিজে কুড়াইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা।
কুড়াইলাম কুড়াইলাম থাল ধুইব কে ?
ওরা আইল থাল ধুয়নী জল হাতে কইর‍্যা।
অগ দিলাম ধাক্কাধুক্কা দিয়া।
নিজে ধুইলাম যেমন তেমন কইর‍্যা ॥—ঢাকা, বিক্রমপুর

ছড়ার মধ্যে অবাধে আসিয়া অবান্তর প্রসঙ্গ প্রবেশ করে, ইহা ছড়ার একটি ধর্ম, ব্রতের ছড়াতেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

৪

ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া ॥

নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল ॥
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া ॥
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।
ভাসুর পো না লো গ্যাওর্ পো ॥
গ্যাওর পো হৈয়া কি কাম করে।
রাজার দুয়ারে পাশা খেলে ॥
খেলুক পাশা জিনুক কড়ি।
তা দিয়া কেন্‌বো মোরা সূর্যাই রাউলের পিড়ি ॥
সূর্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল।
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আঁচল ॥
নে নে ধোপাঝি নেত্‌খান ধুইয়া।
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া ॥
যাইট কাওন না লো ঝাড়ার মূল।
ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর ॥
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড্ডু।
মার্ লৈয়া আন্‌বেন লো সুবর্ণের খাড্ডু ॥
বাপের লৈয়া আন্‌বেন লো দোলা ঘোড়া।
ভাইর লৈয়া আনবেন গো পাজি পুথি ॥
বুইনের লৈয়া আন্‌বেন লো খেলার ডুখি।
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি ॥
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দরবনে যাও।
সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও ॥
ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটী।
আমাগো বাপ তাই লোহার কাঠি ॥
লোহার কাঠি হইয়া কি কাজ করে।
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে ॥
জয় দিব না লো জোকার দিব।

সোনার দুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব ॥
আগর চল লো দুয়ার মেল লো।
জুতি মালতী মেল্লিয়া মারলাম ঘরে।
কত নিদ্রা যাও রে সূর্যাল জোর বাসর ঘরে ॥
সূর্যাইর ঘরের দুয়ারে সোনার মৃদঙ্গ বাজে।
তবু না সূর্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙ্গে ॥

ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া ;
দুগুণ ছাতি মাথায় দিয়া রাঙা লাঠি হাতে কইর্‌আ
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান পৈতা কাটে অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান ফুল জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুন পৈতা গলায় দিয়া
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান মাটী জোগায় অতি বেয়ান।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
বারৈর মাইয়া বড় সেয়ান পান জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান তেল জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান কাপড় জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান ॥

সূর্যাই ওঠেন কোন বর্ণে
সূর্যাই ওঠেন তাম্বুল বর্ণে।
সূর্যাই ওঠেন কোন্ দিক্ দিয়া
সূর্যাই ওঠেন পুব দিক্ দিয়া
তিতৈল গাছের আড় দিয়া
তিতৈল গাছ মেলিল পাত
সূর্যাই ঠাকুর জগন্নাথ ॥

আমতলার শীতল পানি, তাতে সূর্যাইর গাডু গামছা ধোয়া পানি।
চন্দনতলার শীতল পানি, তাতে সূর্যাইর মুখধোয়া পানি॥

—ফরিদপুর, কোটালিপাড়া

৫

সূরুয উঠে রঙ্গে হৈয়া বামুন ঘরের পিড়া চাইয়া,
বামুন ঘরের বৌ খুন্দতি মাগ্যা আন্‌লাম চাউলের কচি,
চাউলের কচি শাইলের ভাত সূর্যে না খায় শুধা ভাত,
সূরুয ভাত খাও আইয়া কাপড় বান্ধাইয়া দিমু,
সূরুয ভাত খাও আইয়া —রস্তা ভোড়া দিয়া।—ত্রিপুরা-শ্রীহট্ট

৬

উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাও রে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥
শিয়ের চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়ে রে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥
কাঁস বাজে করতাল বাজে তবু সূর্যাইর ঘুম নাহি ভাঙ্গে রে।
গা তোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মাও রে॥

—মৈমনসিং ও বরিশাল

৭

ওঠ সূর্য উদয় দিয়া।
বাওনের ঘরের কোণ ছুঁইয়া॥
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান।
সূর্যাইর পৈতা জোগায় বেয়ান বেয়ান॥
ওঠ সূর্য উদয় দিয়া।
কাঁসারীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া॥
কাঁসারীর মাইয়া বড় সেয়ান।
পুজার সাজ জোগায় বেয়ান বেয়ান॥
ওঠ সূর্য উদয় দিয়া।
মালীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া॥

মালীর মাইয়া বড় সেয়ান।
পুষ্প জোগায় বেয়ান বেয়ান ॥—মৈমনসিং

এইবার কুয়াসাজাল ছিন্ন করিয়া সূর্যদেব আকাশে উদিত হইতেছেন, প্রতিমুহূর্তে আকাশের রঙটি যে এই উপলক্ষে বদলাইতেছে, তাহাও ছড়া রচয়িত্রীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—

৮

সূর্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য ওঠে আগুন বর্ণ ॥
সূর্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য ওঠে রক্ত বর্ণ ॥
সূর্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য ওঠে তাম্বুল বর্ণ ॥—মৈমনসিং

তাম্বুল বর্ণ শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ এখানে তাম্রবর্ণ। অগ্নিবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং তাম্রবর্ণের পার্থক্য কেবল মাত্র বর্ণ-সচেতনদৃষ্টিই অনুভব করিতে পারে।

এইবার সূর্যঠাকুরের স্নান করিবার পালা। মাঘের প্রভাতে স্নান করা কেবল সূর্যঠাকুর বলিয়াই সম্ভব। তাহার স্নানের উপকরণও বড় বিচিত্র, আতপ চাল ও দুধ, পুকুরের শীতল জল নহে—

স্নান

আ'ল চাউলে কাঁচা দুধে লাউল ছান করে।
ধোপাবাড়ী কাপড় থুইয়া লাউল শীতে মরে ॥
আ'ল চাউলে কাঁচা দুধে লাউল ছান করে।
শশুরবাড়ী বউ থুইয়া লাউল ভাতে মরে ॥
চাউল ধুমু, চাউল ধুমু, চাউলের মা লো পানি।
পাটি বিছাইয়া তুলল লাউল, যত বর্তীরে জানি ॥—ঢাকা

সংস্কৃত 'রাতুল' শব্দ হইতে লাউল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার অর্থ সূর্য, বা সূর্যঠাকুর। ছড়ার স্বাভাবিক অবান্তর কথার সূত্রে সূর্যের শাশুড়ীর

কথা নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে আমরা শুনিতে পাইব, কিন্তু ইহাতেই শুনিতে পাইব যে তাহার বিবাহ এখনও হয় নাই, সুতরাং যাহার বিবাহই হয় নাই, তাহার শাশুড়ী কোথা হইতে আসিবে?

১০

আলা চাউলে কাচা দুধে লাউলে স্নান করে।
শ্বশুরবাড়ী বৌ থুইয়া লাউলে ভাতে মরে।
লাউল ভাত খাও আইসা ঘরে,
তোমার শাশুড়ী বাইন্দা থুইছে কদম গাছের তলে।
মটকা কদমের ঠালা ভাইঙ্গা পড়ে মাথায়।
এপারে ওপারে কিসের বাইদ্য বাজে,
লাউলের বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে,
সাজাও সাজাও রে লাউল মাথায় মুকুট দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তারে দিমু বিয়া।
না দিমু না দিমু এমন গোদের দেন।
হাতে পায়ে চারিটি গোদ দেইখা পরাণ যায়।
যার আছে পারবতী তারে দিমু বিয়া,
পার্বতীর মাথায় নাই চুল,
ঘোড়ার মাথায় লম্বা লম্বা,
হস্তীর মাথায় থোপা থোপা,
তা দিয়া বান্ধুম লাউলের বৌর খোঁপা।
লাউলের বৌ লো সাধস্তি, কি কি সাধ খালি।
আদা, গুড় কুচি, কড়া কড়া ভাত,
লাউলে দিয়া পাইয়াছে ক্ষীরার পাত
ক্ষীরার পালো পেক পেক,
থামুনা ছুমুনা শিয়রেতে থুইমু।
রাত পোহাইলে কাকেরে দিমু,
সে কাক তোমার কি কাজ করে,
রাত পোহাইলে বাসি কাজ করে।

বাসি কাজ করিতে ফুটি লো কাটা,
এই হইল আমার জন্মের খোঁটা,
আজ যারে লাউল কাল আইস
বছর বছর ভুলনি লইও।—ঢাকা

লাউল হইল ফুলে সাজানো কোণাকৃতি শঙ্কু—মাটির জিনিস। প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া লাউল থাকে। কুয়াশা ঢাকা পুকুরে ফুলের পসরা বুকে লইয়া মোচার খোলায় 'লাউল' ভাসান হয়।

১১

আলা চাউলে গামছা দুধে লাউলে স্নান করে।
ছাপাই বাড়ী কাপড় ধুইয়া লাউলে শীতে মরে॥
আলা চাউলে গামছা দুধে লাউলে স্নান করে।
শ্বশুর বাড়ী মাউগ থুইয়া লাউলে ভাতে মরে॥
ও লাউল, ভাত খাও আইসা ঘরে।
তোমার শাশুড়ী রান্ধে খাড়ে মট্‌কার কদম গাছটির তলে॥
কদমের ডাইল ভাইঙ্গা পাছর পড়ে।—ফরিদপুর

১২

সূর্যঠাকুর ছান করলেন ধুতি-গামছা পাইলেন কৈ?
স্বর্গে ছিল কাপাস্তার ছাওয়াল, ধুতিগামছা দিছে সেই॥
ধুতি পাইলা সূর্যঠাকুর, পুজার ফুলদূর্বা পাইলা কৈ?
স্বর্গে ছিল মালীর ছাওয়াল, ফুলদূর্বা দিল সেই॥
ফুল দূর্বা পাইলা সূর্যঠাকুর ছিপকোশা টাট পাইলেন কে?
স্বর্গে ছিল তামার ছাওয়াল, ছিপ্‌কোশা দিল সেই॥—ঢাকা

১৩

সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর, মিষ্ট বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্য ঠাকুর নাইতে গেলেন কৈ?
নাইয়া ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈ?
বাটি বাটি কুমার আটি, সকল পুড়িয়া গেল।
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল।

গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই লইয়া।
আরেক বাটি গড়াম-নে চাক্কা সোনা দিয়া ॥—ঢাকা

১৪

উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ী,
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের বাড়ী।
কি কর গো সূর্যের বউ দুয়ারে বসিয়া ?
তোমার সূর্য আসবেন, বসিবেন খাটে ;
পাও থুইবেন রূপার খাটে ;
স্নান করবেন গঙ্গার ঘাটে ;
কাপড় মেলবেন চাপার ডালে ;
চুল শুকাইবেন বড় ঘরের টুয়ো
তৈল দিবেন সুবর্ণের বাটী (তে) ;
ভাত খাইবেন সুবর্ণের থালে :
বেন্নুন খাইবেন বাটী বাটী ;
আচাইবেন-পিচাইবেন গঙ্গার ঘাটে ;
দাঁত খোচাইবেন সোনার খোঁরকায় ;
পান খাইবেন বাটায় বাটায় ;
সুবারি কোটরা ভরা।—ঢাকা

১৫

উরু উরু দেখা যায় বাড়ী।
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ী।
সূর্যের মা লো। কি কর দুয়ারে বসিয়া ?
তোমার সূর্য আস্‌তেছেন ঘোড় ঘোড়ায় চড়িয়া।
আস্‌বেন সূর্য বস্‌বেন খাটে,
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
চুল মেল্‌বেন সোনার খাটে,
পা মেলবেন রূপার খাটে।
ভাত খাইবেন সোনার থালে, বেন্নন খাইবেন রূপার বাটিতে,
আচাইবেন ডাবর-ভরা পান খাইবেন বিড়া বিড়া,

সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা,
চুন খাইবেন খুটরী ভরা পেচ্‌কী ফেলাইবেন লাদা লাদা ॥
—ঢাকা

১৬

কি করছ লো লাউলের বউ দুয়ারে বইসা।
তোর লাউলে আইছে দোলায় চইড়া ॥
আস্‌বেন লাউলে বসবেন খাটে।
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে ॥
চুলগাছি মেইলা দিবেন চম্পার ডাইলে।
কাপড়খান মেইলা দিবেন বড় ঘরের চালে ॥—ফরিদপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়া দুইটি মন্ত্র বলে কুয়াসা ভাঙ্গার ছড়া; কুয়াসা দূর না হইলে সূর্যঠাকুর স্নান করিতে পারিবেন না, সেই জন্য ছড়া বলিয়া আকাশের কুয়াসা দূর করিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ইহার মধ্যেও ব্যক্তিগত জীবনের ঐহিক কামনা বাসনার কথা রূপ লাভ করিয়াছে—

১৭

কুয়া ভাঙ্গুম, কুয়া ভাঙ্গুম বেথলার আগে।
সকল কুয়া গেল বরই গাছটির আগে ॥
ওরে ওরে বরই গাছ, ঝুল্লন দে,
দু'কুড়ি ছয়টা বরই লিখিয়া দে ॥
লিখিতে পড়িতে একটা হইল উনা।
কাইটা কুইটা ফেলামনে শিবের কানে সোনা ॥
শিবের কানের সোনা না লো বেড়ার মাটি।
আপ্পন ভাই বৈন্‌ লোহার কাটী ॥
লোহা না লো, বিয়া করে।
পাড়া ভরিয়া লো জয় জোকার পড়ে ॥
জয় দিব না লো আমরা জোকার দিব।
সোনা দুইটি ভাই বৈন্‌ কোলে তুলিয়া নিব ॥—ঢাকা, মাণিকগঞ্জ

১৮

খুয়া ভাঙ্গুম খুয়া ভাঙ্গুম য়্যাচ্‌লার আগে,
সকল খুয়া ভাইঙ্গা গেল বড়ই গাছটির আগে।
দে দে, বড়ই গাছ ঝাড়া দে,
ছয় কুড়ি ছয়টা বড়ই লিখিয়া দে।
লিখিতে পড়িতে একটি হইল উনা,
কাটিয়া ফালামু শিবের কানের সোনা।
শিবের কানের সোনা না লো, লড়িয়া পিতল,
এই বর্ত করি আমরা মাঘের শীতল।
মাঘের জল ফুটি টলমল করে,
উইড়া যাইতে পক্ষীটি পইড়া পইড়া মরে।

—ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা

সূর্যঠাকুরের স্নান হইয়া গেল, এইবার পূজার ফুল তুলিবার ছড়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

ফুল তোলা

১৯

দক্ষিণ পারের মালীঝি জাগ নি?
আমার ফুলের ডালা লইবা নি?
হাতে কলসী কাখে পোলা, কেমনে লমু আমরা ফুলের ডালা?
জবার ডালে কে? ডাইল নামাইয়া দে।
সূর্য ঠাকুর চাইছে ফুল, সাজি ভইরা দে।
দক্ষিণ পারের মালীঝি ফুলেরে গে'লি,
কোন্ কোন্ ফুলে নাইলি ধুইলি?
কোন্ কোন্ ফুলে শুইয়া ঘুম দিলি?
কোন্ কোন্ ফুলে রাইত পোয়াইয়া আইলি?
জবার ডালে নাইলাম ধুইলাম;
চাপার ডালে খাইলাম লইলাম,
বকুলের ডালে রাইত পোয়াইয়া আইলাম।—ঢাকা

২০

জইৎ গাছে কে ? ডাল নামাইয়া দে।
সূর্যঠাকুর চাইছেন ফুল, সাজি ভরিয়া দে ॥
(অতসী, গাঁদা সব রকম ফুল)
আধা গাঙ্গে ঝড়বৃষ্টি, আধা গাঙ্গে মালী।
মধ্যখানে পড়্যা রইছে জইৎ ফুলের ডালি ॥
কৈ যাস লো মালিনী ফুলের সাজি লইয়া?
ফুল ফুটেছে নানান রকম জাল পড়ছে নোয়াইয়া ॥
আগের ফুল তুলিস্ না লো—কলি কলি।
গোড়ার ফুল তুলিস্ না লো—বালি বালি।
মধ্যের ফুল তুইল্যা আনিস্ নাগেশ্বরের মালী ॥
নাগেশ্বরের মালীরে !—কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি ?
কোন্ কোন্ ডালে খাইলি লইলি ? কোন্ কোন্ ডালে
নিশি পোহাইলি ?
'জইতের ডালে রাঁধলাম বাড়্লাম,
অতসীর ডালে খাইলাম লইলাম,
গ্যান্দার ডালে নিশি পোহাইলাম ॥'—ঢাকা

২১

ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়, ফুল গেল দক্ষিণ গাঁয়।
দক্ষিণ গাঁইয়া মালীরে।
ফুলের ডালা লবিরে ?
হাতে কলসী কাখে পোলা,
কেমনে লব মোরা ফুলের ডালা।—ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলির বিষয়বস্তু বাস্তবধর্মী, আকাশের সূর্যঠাকুর ইহার নায়ক হইলেও তিনি যে রক্তমাংসের দেহধারী সাধারণ মানুষেরই মত অনুভূতিশীল, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাদের পরিচয় অতি-প্রাকৃত নহে, বরং জীবনে যাহা প্রকৃত এবং বাস্তব তাহাই। ইহাদের মধ্য দিয়া সূর্যঠাকুরের মর্ত্যবাসিনী একটি কন্যার জন্য পূর্বরাগ প্রকাশ পাইয়াছে—

পূর্বরাগ

২২

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ।
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ॥
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ী।
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর বেড়ান বাড়ী বাড়ী॥
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়।
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর বিয়া করতে চায়॥—ঢাকা

সূর্যঠাকুর একদিন খেয়া নৌকায় নদী পার হইবার সময় নদীর অপর তীরে দুইটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাহার মনে যে ভাবের উদয় হইল, ছড়ায় তাহা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

ঐ পাবে দুই বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে শাড়ী,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী।
ও পার দুইটি বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে কেশ,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুব ফেরেন নানা দেশ।
ও পার দুইটি বাউনেব কন্যা মল খাড়ুয়া পায়,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুব বিয়া করতে চায়।—ফরিদপুর

প্রতিবেশীদিগের ইহা লক্ষ্য করিতে বাকি রহিল না, তাহারা নিজেরাই গিয়া সূর্যাই ঠাকুরের জননীকে অনুরোধ করিল—

ওগো সূর্যাইর মা,
তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে
বিয়া করাও না।—ঐ

২৩

যখনে জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
এই কন্যা বিয়া করবে সূর্য দিবাকর রে।
দিনে দিনে হইল কন্যা দশম বৎসর রে॥

সোনার কলসী লইয়া জল ভরিতে যায় রে।
'কোথা হইতে আইছ কন্যা, কোথায় তোমার ঘর রে।
কাহার কন্যা তুমি কিবা তোমার নাম রে॥
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপরে রে।'
'বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুরাতে ঘর।
উড়িয়া রাজার কন্যা আমি গৌরীমালা নাম॥
স্ববর্ণের কলসী আমার কক্ষের উপর।'—ফরিদপুর

বিদর্ভতে জন্ম মথুরায় ঘর অথচ উড়িয়া রাজার কন্যা, নায়িকাটির ইহাই পরিচয়। পরিচয়টি যে বিচিত্র, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বিদর্ভ এবং মথুরার কথায় ক্ষীণতম বৈষ্ণব প্রভাব থাকিলেও উড়িয়া রাজার পরিচয় বৈষ্ণব প্রভাব নিরপেক্ষ। রাজকন্যা যে বিদেশিনী, ইহাই বলা উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি বিদেশিনী নহেন, পুর্বোদ্ধৃত ছড়ায় শুনিয়াছি, তিনি বাংলা দেশেরই এক ব্রাহ্মণের কন্যা, রৌদ্রে কখন শাড়ী মেলিয়া দিতেছেন, কখনও চুল শুকাইতেছেন, তাহার পায় মল খাড়ু।

২৪

উড়িয়া রাজার দুইটি কন্যা বসিয়া রৈছে খাটে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুব ফেরেন মাঠে মাঠে।
উড়িয়া রাজার দুইকন্যা মেলিয়া দিছে শাড়ী।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ফেবেন বাড়ী বাড়ী॥
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে॥
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মলখাড়ু দিছে পায় রে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় রে॥—ফরিদপুর

বিবাহে কোন বাধা হইল না, সূর্য ঠাকুর কন্যার পিতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন,

বিবাহ

২৫

শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে।
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে॥

তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্যাইরে পাবে পতি ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্যাইরে কর দান ॥—ফরিদপুর

২৬

ব্রাহ্মণে উঠিয়া বলে ব্রাহ্মণীর স্থানে।
'কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে ॥
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্যাইরে পাবে পতি ॥
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খ বস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্যাইরে কর্‌ছি দান ॥'—ফরিদপুর

ব্রাহ্মণ দরিদ্র, কন্যার বিবাহ দিবেন, সঙ্গতি কোথায়? সূর্য ঠাকুরই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন,—

২৭

ব্রাহ্মণী বলেন—ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে।
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্যা দিবা কারে ॥
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে ॥
সূর্যদেবের বরে লাম্‌লো ঘরামি চৌদ্দ জন রে ॥
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।
সূর্যদেবের বরে লাম্‌লো ভূঁইমালি চৌদ্দ জন রে ॥
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।
সূর্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥
যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কিন্‌তে যায় রে।
সেই দোকানে ছাওয়াল সূর্যাই ছত্র ধরেন শিরে রে ॥
সাক্ষী থাইক্‌ক দেবধর্ম সাক্ষী থাইক্‌ক তোমরা।
অকুমারী গৌরা আমি ॥
সম্মান নারিকেল তেলে কামারে দোকান মেলে।
সোনা দিব সেরে সেরে (আরে) রূপা যত লাগে।
এমন করি গড়্‌বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥

দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে।
অর্ধেক গাঙ জুড়িয়া রে ফুল মটুকের ভরা আইসে ॥
আসুক আসুক আসুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে।
আমার গৌরমণির বিয়া শনি মঙ্গল বারে ॥—ঐ

পাত্র ও পাত্রী উভয়েরই গৃহে বিবাহের উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। ক্রমে আত্মীয় স্বজন বা নাইয়রী আনিবারও ব্যবস্থা হইল—

২৮

খাট খাট কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ।
সূর্যাই ঠাকুর বিযা করছে বড় সুন্দর বৌ ॥
ছোট ভাই উঠিয়া বলে, 'বড দাদা ভাই।
গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই ॥'
ছোট ভাই উঠিয়া বলে, 'বড় দাদা ভাই।
কলসী ভরা তেল দেও বউ আনিতে যাই ॥'
ছোট ভাই উঠিয়া বলে, 'বড দাদা ভাই।
থান ভরা সিন্দুর দেও বউ আনিতে যাই ॥'—ঐ

সূর্যের বিবাহের আয়োজন প্রায় পুর্ণ হইয়া আসিল। এইবার পুকুর হইতে মাছ ধরিয়া ভোজের আয়োজনের পালার সূত্রপাত হইল। সূর্যাইর পুকুরে জালফেলা হইল—

২৯

সূর্যগো পুকুরে ফেলাইলাম জাল,
তাতে না উঠিল কিছু মাছ ॥
(এইরূপ চন্দ্রদের পুকুর. লাউলের পুকুর)
উঠ্‌লো লো উঠ্‌লো লো মাছ, নিবে কে?
ওই আসে নেওনী ডুলা হাতে করিয়া ॥
যা যা নেওনী ধাক্কা ধুক্কা খাইয়া,
আমরা নিমুনে যেমন তেমন করিয়া ॥
নিলাম লো নিলাম লো, কুটিবে কে?
খাইবে কে?—খাওনী আসে থালা হাতে করিয়া ॥

আইঠা নিবে কে ?—আইঠানেওনী আসে গোবর হাতে করিয়া ॥
পান খাইবে কে ?—পানখাওনী আসে ডিবা হাতে করিয়া ॥
বিছানা পাতিবে কে ?—বিছানা-পাতনী আসে তোষক হাতে করিয়া ॥
শুইবে কে ?—শুয়নী আসে বালিশ হাতে করিয়া ॥
রাত পোহাইবে কে ?—রাত-পোহানী আসে কাউয়া হাতে করিয়া ॥

কাউয়া বলে কা !
রাত পোহাইয়া যা !—ঢাকা

৩০

সূর্যের পুকইরে ফালাইলাম জাল,
তা'তে উঠ্‌ল বাঘব বোয়াল।
উঠল লো নিব আইসা কে ?
ঐ যে আসে লেয়নি খালই হাতে কৈরা।
যা যা লেয়নি ধাক্কা-ধুক্কা খাইযা,
আপনে নিমনে যেমন-তেমন কৈরা।
নিলাম লো কুট্‌ব আইসা কে ?
ঐ যে আসে কুটনি দাও হাতে কৈরা,
যা যা কুটনি ধাক্কা-ধুক্কা খাইয়া,
আপনে কুটুমনে যেমন-তেমন কৈরা।
কুটলাম লো ধুইব আইসা কে ?
ঐ যে আসে ধুযনি খালই হাতে কৈরা।
যা যা ধুযনি ধাক্কা-ধুক্কা খাইযা,
আপনে ধুমনে যেমন-তেমন কৈরা।
ধুইলাম লো বাট্‌না বাটব কে ?
ঐ যে আসে বাট্‌না বাটনি বাটা হাতে কৈরা।
যা যা বাটনা বাটনি ধাক্কা ধুক্কা খাইয়া,
আপনে বাটুমনে যেমন-তেমন কৈরা।
বাট্‌লাম লো রাঁদব আইসা কে ?
ঐ যে আসে রাঁধুনি কড়াই হাতে কৈরা।

যা যা রাঁধুনি ধাক্কা ধুক্কা খাইয়া,
আপনে রাঁন্ধুমনে যেমন-তেমন কৈরা।
রাঁদলাম লো খাইব আইসা কে ?
ঐ যে আসে খায়নি থাল হাতে কৈরা।
যা যা খায়নি ধাক্কা ধুক্কা খাইয়া।
আপনে খামুনে যেমন-তেমন কৈরা।
খাইলাম লো আইঠা ধুইব কে ?
ঐ যে আসে আইঠা ধুয়নি গোবর হাতে কৈরা।
যা যা আইটা ধুয়নি ধাক্কা ধুক্কা খাইয়া।
আপনে ধুমনে যেমন তেমন কৈরা। ইত্যাদি
কাইয়া করে কা কা, আখার মাটী খা খা,
রাইত পোহাইয়া যা, কা কা কা।—ঢাকা

৩১

এপারে ওপারে কিসেব বাদ্য বাজে ?
রাইলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে।
সাজরে সাজন্তি রাইল মাথায় মটুক দিয়া,
আমার রাইলের বিয়া হইব দোলায় চড়িয়া।
দোলায় কড্‌মড় হাতীর জাঙ্গাল,
ধর্ম্মরাজার বাড়ী নারে একই দুয়ার।
ধর্ম্মরাজ বিয়া করায় গৌরী-পার্বতী,
রাইলগ ফুল ছিটি ছিটি
আইজ যাওরে রাইল কাইল আইস,
বচ্ছর বচ্ছর জয় জোকার দিও।
জয় দিমু না লো জোকার দিমু,
সোনাধারী ভাইগ আমার তুইলা কোলে লমু।—ঢাকা

লাউলের বিবাহের আয়োজনে—

৩২

কলা গাছের তলে লো, কাদা মাটি ;
তাতে ফেলাইলাম কাঁঠাল খানি।

কাঁঠালের আগায় লো, তুলা খানি ;
তাতে বসাইলাম বামুন হাটি ॥
বামুন ভাইয়া বামুন ভাইয়া, ভাতুলা তামাক খাইও।
আমার লাউলের বিয়ার সময় ফুলমন্ত্র পড়িও ॥—ঢাকা

৩৩

এ পারে লাউল ওপারে লাউল, কিসের বাদ্য বাজে ?
রাজার বেটা সওদাগর বিয়া করতে সাজে ॥
সাজে সাজন্তি লাউল মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজার কন্যা তুইলা দিব বিয়া ॥
সাজে সাজন্তি লাউল পায়ে নেপূর দিয়া।
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা, তুইলা দিব বিয়া ॥
হালা ধরি মালা ধরি ত্রিশূল ধরি ছাতি।
শিব শঙ্কর বিয়া করে গৌরী পার্বতী ॥
আন গৌরীরে ডাকু দিয়া,
জাত মালতীর তলা দিয়া দিয়া।
জাত মালতীর নাই ফুল,
গৌরীর মাথায় দীঘল চুল ॥—ঢাকা

অনেক ছেলেভুলানো ছড়া যে ব্রতের ছড়া হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, উপরি-উদ্ধৃত ছড়াটিও তাহার প্রমাণ। কারণ, ইহার শেষাংশের অনুরূপ ছড়া আমরা পূর্বেও শুনিয়াছি।

৩৪

ওপারে কিসের বাদ্য বাজে।
রাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে ॥
আম পাতা মচ মচ করে, কাঠাল পাতা মড়মড় করে,
শিবাই শঙ্কর বিয়া করে।
সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া।
ঘরে আছে গৌরা পার্বতী তুলিয়া দিব বিয়া ॥
সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা লৈয়া।
মায়েতে আশীর্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥

বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্যাই চিরঞ্জীবী হৈয়া।
সূর্যাই ঠাকুব যাত্রা কবেন বাপেব আজ্ঞা লৈয়া ॥
বাপেতে আশীর্বাদ কবেন শিবে হস্ত দিয়া।
বাচিয়া থাইক্কো ওবে সূর্যাই দিগ্বিজয়ী হৈয়া ॥
সূর্যাই ঠাকুব যাত্রা কবেন গুরুপুবৈতেব আজ্ঞা লৈয়া।
গুরু পুবৈতে আশীর্বাদ কবেন শিবে হস্ত দিয়া ॥
বাচিয়া থাইক্কো ওবে সূযাই বাজবাজেশ্বব হৈয়া।
আমেব ছত্র বিল্বপত্র দধিব আশ্রয় দিয়া।
সূর্যাই ঠাকুব যাত্রা কবেন (সুমখে) সোনাব ঘটি লইয়া ॥
জননীতে ধোয়ায় হাতে দুগ্ধেতে ডুবাইয়া।
অঞ্চলে মুছাইয়া মুখ বলে কর্ণে গিয়া ॥
এক্কেশ্বব যাও গো বাম দোসবে আসিও।
পবেব ঝিবে পাইয়া না জননী পাসব ॥
সূযাই ঠাকুব যাত্রা কবেন সুমখে সোনাব ঘটি।
আগে পাছে লোক লস্কব মধ্যে নাচে নটী ॥
সূযাই ঠাকুব যাত্রা কবিয়া এদিক ওদিক্ চান।
যেদিকে শোনেন বাজনাব শব্দ সেই দিক্ চলিয়া যান।
চন্দন গাছ কাটিয়া দেবে সূর্যাই হবেন পাব।—ঐ

জননীব আশঙ্কা বধূকে পাইয়া পুত্র জননীকে ভুলিয়া যাইবে, এই আশঙ্কাই ক্রমে বধুর প্রতি বিদ্বেষে পবিণতি লাভ কবিয়া শাশুডী-বধূব সম্পর্ক জটিল করিয়া তুলে।

৩৫

নব রত্তন পিঁডিখানি মধ্যে মধ্যে সোনা।
দেবগণে ধরিয়া তোলে পিডিব চাইরো কোনা ॥
দেবগণ দেবগণ রত্ন সিংহাসন।
চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন ॥
সূর্যাই ভাল বিচার কর,
নিকটিয়া ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর।

এক ফুল খোটেন সূর্যাই আরো ফুল চান।
মালিয়ার মালঞ্চ পুষ্প অধরে যোগান ॥
লামা লামা ডাক্ পড়ে লামা স্থিতি স্থলে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যা দান করে ॥
মানুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই রে তারা।
শীঘ্র করিয়া তুলিয়া ত্থাও রে সূর্যাইর বিয়ার দাড়া ॥
শাশুড়ীতে রাঁধেন দাড়া দুধে আর গুড়ে।
শালা বৌতে ঢালেন দাড়া সুবর্ণের থালে ॥
শাশুড়ী আইলেন ভাত দিতে খসিয়া পইল শাড়ী।
রাম রাম বলিয়া সূর্যাই নাকে দিলেন হাত।
কেন বা আসিলাম আমি শাশুড়ীর সাক্ষাৎ ॥
তোমরা বল আমার সূর্যাই পাগল পাগল।
আমার সূর্যাই পাগল নয় রে রসের নাগর ॥—ঐ

শাশুড়ী জামাতার পাতে অন্ন পরিবেশন করিতে আসিয়া কেন যে এমন দিশেহারা হইয়া গেলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। শেষ পদ দুইটিতে শিবের সঙ্গে সূর্যের চিত্রটি একাকার হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

৩৬

হাতীও পাইলাম, ঘোড়াও পাইলাম,—আর বামুনের ঝি!
খাট পাইলাম, জাজীম পাইলাম,—আর বামুনের ঝি!
লেপ পাইলাম, তোষক পাইলাম—আর বামুনের ঝি!—ঢাকা

৩৭

লাউল ঠাকুর লাউল ঠাকুর ভাত খাও আইসা ঘরে।
তোমার শাশুড়ী রাইন্ধা থুইছে জইৎ গাছের তলে ॥
জইতের মটকা ডাল ভাইঙ্গা পড়্‌লো ঘাড়ে।
লাউলের দুধমাখা ভাত ছচি হইয়া পড়ে ॥
খাও খাও লাউল ঠাকুর গোটা চারি ভাত।
আমরা শত বইনে ফেলবাম নে পাত ॥—ঢাকা

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার বৃত্তান্ত ভারতীয় সাহিত্যে অমর হইয়া আছে, এইবার আমরা বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র একটি বালিকার পতিগৃহে যাত্রায়

করুণ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইব, অনুভূতির গভীরতায় ইহাও কোন দিক দিয়াই হীন নহে।

পতিগৃহে যাত্রা

৩৮

সুবর্ণের খাটপাট নেতের মশারী।
তাহার মধ্যে শয়ন করেন সূর্যাই আর গৌরী॥
কাউয়ায় করে কল কল কোকিলের ধ্বনি।
'জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি॥'
'তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে'?
'ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে॥'
'শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে।
পরের মারে মা বলিলে কার প্রাণ ভরে॥
পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে॥'
দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের কাছে।
'আমারে যে নিতে আইছে লুকাইয়া রাখ পাশে॥'
'টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্‌সে তুল্যা থোব।
পরের লাগ্যা হইছ, গৌরা, পরেরে সে দিব॥'—ফরিদপুর

৩৯

'বিয়া করলা সূর্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি?'
'ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল উড়িয়া রাজার ঝি॥
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে।
উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে॥
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল ফেলিয়া আইলাম পথে।
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে॥'—ঐ

আকাশের দেবতা সূর্যঠাকুর উড়িয়া রাজার কন্যাকে লইয়া গৃহবাস করিবার জন্য নিজ গৃহে যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। স্নেহের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অশ্রুমুখী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে বিদায় দিতে গিয়া জননী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আশ্বাস দিলেন—

৪০

'আজ যাও গৌরী লো কাঁদিয়া কাটিয়া।
কাল আসিও গৌরী লো হাসিয়া রসিয়া॥
আজ যাও গৌরী লো ত্যানা-তোনা পরিয়া।
কাল আসিও গৌরী লো চেলির শাড়ী পরিয়া॥'—ঐ

দরিদ্র মাতাপিতা 'ত্যানা-তোনা' পরাইয়াই কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছেন, কিন্তু ধনীর গৃহে তাহাকে বিবাহ দিয়াছেন, যখন সে ফিরিয়া পিত্রালয়ে আসিবে, তখন তাহার সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রকাশ পাইবে। সুতরাং কন্যার পিতাকে ওড়িয়া রাজা বলা হইলেও তিনি যে কোন্ শ্রেণীর রাজা, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এইবার বধূ লইয়া সূর্যঠাকুরের স্বগৃহে যাত্রার পালা। কাহিনীর মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা করুণ। বিবাহের উৎসবাড়ম্বর শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরা বুঝিতে পাইল, এইবার তাহার পিতৃসংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে নীরবে মায়ের বস্ত্রাঞ্চলের নীচে গিয়া লুকাইল। মা তাহার মস্তকে স্নেহ হস্ত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—

৪১

'টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোটরে রাখিব।
পরের লাগা হইছ গৌরা পরেরে সে দিব॥' —ফরিদপুর

সমাজের নির্মম বিধান মাথা পাতিয়া লইয়া জননীর অন্তরের স্নেহবোধকে স্তম্ভিত করিয়া লইতে হইবে। শিশুকন্যা এ'যাবৎ মায়ের অঞ্চলের নীচে নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু আজ তাহা সে পাইল না,—

৪২

অর্ধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অর্ধেক গাঙ্গে খুয়া।
মধ্য গাঙ্গে বাদ্য বাজে গৌরা লবার লইঞা॥
আড়শী কান্দে পড়শী কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া।
গৌরার জনকে কান্দে গামছা মুড়ি দিয়া॥
গৌরার যে ভাই কান্দে খেলার সজ্জ লইয়া।
গৌরার যে মায়ে কান্দে শ্মশানে পাছাড় খাইয়া॥

মাতার ক্রোড়চ্যুতা অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা অবশেষে নৌকায় আরোহণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাত্রা করিল। অশ্রুমুখী জনতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদায় দিল; নৌকার ভিতর হইতে জনতার দূরাগত ক্রন্দনের ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল,—

'ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি॥
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভায়ের কান্দন শুনি॥
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি বাপের কান্দন শুনি॥'

অভিমানিনী কন্যা পিতার ক্রন্দন শুনিয়া বলিতেছে—

'এখন কেন কান্দ বাপধন মুখে গামছা দিয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥'

এমন কি, এইজন্য বালিকা তাহার মাতা ও শিশু ভাইটিকে পর্যন্ত দোষী করিতেছে—

'এখন কেন কান্দ, মাগো, শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ, ভাইগো, খেলার সজ্জ লইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া॥—ঐ

একটি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয় বুকে করিয়া লইয়া নৌকা নদী প্রবাহে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেল—ক্ষুদ্র আনন্দ-প্রতিমাটিকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়া অশ্রুমুখী জনতা শূন্য গৃহে ফিরিয়া গেল—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।'

কন্যা-বিদায় বাঙ্গালী গৃহের বিজয়া। ইহার বেদনা যে কত গভীর, তাহা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না,—সাহিত্যে ইহার অনুভূতি বাঙ্গালীকে কবি করিয়াছে, সাধনায় ইহাই মৃন্ময়ী দেবী-প্রতিমাকে চিন্ময়ী করিয়াছে।

বহু দূরাগত ক্রন্দন যখন আর নদীতীর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন অশ্রুমুখী গৌরা তাহার নববিবাহিত পতির দিকে ফিরিয়া তাকাইল।

তাহার আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইতেছে না—স্নেহময় স্বামী নবোঢ়া পত্নীর সকল অপরিচয়ের আশঙ্কা এই ভাবে দূর করিয়া দিতেছে—

৪৩

'তোমার দেশে যাব সূর্যাই বাপ বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার বাপ বাপ বলিবে তারে॥'
'তোমার দেশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা, মা বলিবে তারে॥'
'তোমার দেশে যাব সূর্যাই কাপড়ের দুঃখ পাব।'
'নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসাব॥' —ঐ

কন্যার পতিগৃহে যাত্রার ছড়াগুলি জীবনের সুগভীর বেদনার রসে অনুরঞ্জিত; ইহাদের মধ্য হইতে অতিপ্রাকৃত ভাব দূর হইয়া গিয়া ইহারা প্রকৃত জীবনধর্মী হইয়া উঠিয়াছে—

৪৪

'তোমার দেশে যাব সূর্য, মা বলিব কারে?'
'আমার মা, তোমার শাশুড়ী, মা বলিও তাঁরে॥'
'তোমায় দেশে যাব সূর্য, বাপ বলিব কারে'?
'আমার বাপ, তোমার শ্বশুর, বাপ বলিও তাঁরে'॥
'তোমার দেশে যাব সূর্য বোন বলিব কারে'?
'আমার বোন, তোমার ননদ'……ইত্যাদি। —ঢাকা

বাঙ্গালী ছড়া রচয়িত্রীর দৃষ্টির গুণে আকাশের দেবতা যে কি ভাবে মাটির মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাহাই এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৪৫

সূর্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া।
গৌরমণির মায় কাঁদে শানে আছাড় খাইয়া॥
আরসী কান্দে পড়সী কান্দে সকল কান্দে রইয়া।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া॥
আরসী কান্দে পড়সী কান্দে সকল কান্দে পর।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই ফর॥

'আগে যদি জান্‌তাম, মা-ধন, পরে নিবে তোরে।
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে॥
আগে যদি জান্‌তাম, মা-ধন, পরে নিবে তোরে।
কানের সোনা খসাইয়া থুইয়া কানে রাখতাম তোরে॥'
আগে যদি জানতাম, মা-ধন, পরে নিবে তোরে।
গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে॥'
আরসী কান্দে পড়সী কান্দে সকল কান্দে রৈয়া।
গৌরমণির যে বাপধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া॥
চৌদ্দ দাঁড়ের নৌকা খানি ষোল ছয়জন মাঝি॥
'নাইয়ারে দিব তার বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি।
ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি॥
এখন কেন কান্দ, মা-ধন, শানে পাছাড় খাইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, মা, দূরে না দিও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ, বাবা, মুখে গামছা দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, বাবা, দূরে না দিও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ, ভাই-ধন, মুখে কাপড় দিয়া।
সেই কালে কৈছিলাম, ভাই-ধন, দূরে না দিও বিয়া।
এখন কেন কান্দ, বুইন, খেলার সজ্জ লইয়া।
সেই কালে কৈছিলাম, বুইন, দূরে না দিও বিয়া॥
এখন কেন কান্দ, ভাইর বউ, লেমু পাস্তা লৈয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, বউ, দূরে না দিও বিয়া॥—ফরিদপুর

বালিকা বধূ, স্বামিগৃহে আসিয়া দীর্ঘকাল মাতাপিতার অদর্শনে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সকলের নিকট গিয়া তাহাকে পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে—

৪৬

আগাটনী পানবাটনী ধাই শাশুড়ী গো!
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?"

"কি জানি কি জানি বউ গো,
জিজ্ঞাস গিয়া তোমার শ্বশুরের ঠাঁই ॥"
"বাড়ীর কর্ত্তা শ্বশুর ঠাকুর গো!
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?"
"কি জানি কি জানি বউ গো,
জিজ্ঞাস গিয়া তোমার শাশুড়ীর ঠাঁই ॥",
"বাড়ীর গিন্নী শাশুড়ী ঠাকুরাণী গো।
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?"
"কি জানি কি জানি বউ গো।
জিজ্ঞাস গিয়া তোমার ননাসের ঠাঁই ॥"
"আনাজ তরকারী কুটনী ননাস ঠাকুরাণী গো।
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?
"কি জানি কি জানি বউ গো।
জিজ্ঞাস গিয়া তোমার ননদের ঠাঁই ॥"
"খেলনী বেড়ানী ননদ ঠাকুরাণী গো।
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?"
"কি জানি কি জানি বউ গো।
জিজ্ঞাস গিয়া তোমার দেওয়রের ঠাঁই ॥"
"লেখইয়া পড়ইয়া দেওয়র গো!
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা!"
"কি জানি কি জানি বউ গো।
জিজ্ঞাস গিয়া শিকদারের ঠাঁই।"
"আড়লের ভাঁড়লের কর্তা শিকদার হে!
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?
'কি জানি কি জানি বউ গো!
জিজ্ঞাস গিয়া তোমার সোয়ামীর ঠাঁই।"
"ঘরগৃহস্থী সোয়ামী হে!
আমারে নি নাইয়র দিবা? আমারে নি নাইয়র দিবা?"
"আনিব চিক্কন চাটিলের চটা।
ভাঙ্গিব গৌরা নাইয়রের ঘটা ॥—ঢাকা

পুত্রলাভ

পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, গৌরীর সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল—

৪৭

লাউলের বউর ঘরের পাছে ঢেঁকীশাকের আঁটি।
তাই খাইয়া লাউলের বউ একমাস গর্ভবতী ॥—ঢাকা

এইরূপে দুই মাসে কলমী শাক, তিন মাসে সরুষা শাক, চার মাসে ডাঁটা শাক, পাঁচ মাসে গিমা শাক, তৎপরে পাট শাক, কলাই শাক, মটর শাক, হেলেঞ্চা শাক এবং নালঞ্চা শাক।

গৌরীর সাধভক্ষণের কথাও ইহাতে বাদ যায় নাই—

৪৮

'লাউলের বৌলো সাধস্তি! কি কি খাইতে সাধ?'
'ঘরের ছাঁইচে নলভোগ' ছিম, তাই খাইতে সাধ।',
'লাউলের বৌলো সাধস্তি! কি কি খাইতে সাধ?'
'ঘরের ছাঁইচে কাজলা ছিম, তাই খাইতে সাধ।'
'বরইর অম্বল কড়কড়া ভাত ॥ লেমুপাতা পান্তাভাত ॥'—ঢাকা

সূর্যঠাকুর একটি পুত্র লাভ করিয়াছেন—

৪৯

'লাউলেগো বাগানে কে রে কাটে পাত?'
'লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত ॥'
'না কাটিও শিবাই রে না কাটিও পাত।
আমরা শত বইন কাটিব পাত ॥
পাত কাইটা ভাত খাইমু।
ভাত খাইয়া ঝিকটি খেলাইমু ॥
ঝিকটি খেলাইয়া লো শুধাই লো দূত।
কি দিয়া পুজ্‌মু লো লাউলের ঘরের পুত ॥

লাউলের ঘরে পোলা অইছে কি কি নাম থুইমু ?
আমগা হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু ॥
কলা গা হাতে দিয়া কলাই নাম থুইমু।
বেল গা হাতে দিয়া বেলাই নাম থুইমু ॥'—ফরিদপুর

৫০

'রাইলের কলা বাগে কেরে কাটে পাত ?'
'রাইলের ছোট ভাই সিপাই কাটে পাত।'
'না কাটিও সিপাইরে না কাটিও পাত,
বাইছা বাইছা কাট গিয়া বিচাকলার পাত।
বিচাকলার পাতে রে রাইলে না খায় ভাত,
বাইছা বাইছা কাট গিয়া কব্‌রি কলার পাত।
কবৃবি কলার পাতে রে রাইলে না খায় ভাত
বাইছা বাইছা কাট গিয়া সবরি কলার পাত,
বিচা, কবরি, সবৃবি কলার পাত,
তাত খাইবেন রাইলে ভাত।
খাইয়া ওঠ রাইল ঠাকুর খাইয়া ওঠ ভাত,
আমরা সাত বইনে ফালামু পাত।
পাত ফালাইয়া ঘাটে যামু, ঘাটে যাইয়া বইঞ্চর খামু।
বইঞ্চরের তলে তলে ঘুঘুরের বাসা,
আমাগ সাত বইনের একই আশা।
আইস গো, সাত বইন, ঝাপুরি খেলাই।
ঝাপুরি খেলাইতে পাইলাম টাকা,
তাই দিয়া দিমু আমরা রাইলের বউরে শাঁখা।
'রাইলের বউ লো সাধস্তি কি কি খাইতে সাধ' ?
আলা-চাইলের খট্‌খটি পান্থা ভাত।
খাইলাম না লো ছুইলাম না লো, শিয়রে থুইলাম,
রাইত খানি পোয়াইলে আড়া বনে দিলাম।'—ঢাকা

৫১

'আমের বউল আইল বাড়ী বাড়ী।
লাউলের বউরে দেইল ঢাকাই শাড়ী॥
লাউলের বউ লো সাধন্তী কি কি খাইতে সাধ।
ইলিস মাছ ভাজা পান্তা ভাত॥
তোমার লাউলে দিয়া পাঠাইছে ক্ষীরার রাইং।
ক্ষীরার রাইং না লো প্যাকের রাইং॥
খাইস্ না ছুইস্ না শিয়রে থুইস্।
লাউল ঠাকুর বাড়ী আইলে বিলাইয়া দিস্'॥—ফরিদপুর

সূর্ধাই ঠাকুরের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল—

৫২

'কৈ যাওরে লাউল! গামছা মুড়া দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে, বাজনা বাজাও গিয়া॥
লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে, কি কি নাম থুমু?
আম হাতে দিয়া রাম নাম থুমু; চরই হাতে দিয়া বলাই নাম থুমু॥
কমলা হাতে দিয়া কমল নাম থুমু॥
জল হাতে দিয়া জয় নাম থুমু॥
রাজার বেটা রাজার ছেইলা, রাজা নাম থুমু॥'—ঢাকা

কিন্তু কি করিয়া যে এই শিশু-সন্তান মানুষ হইবে, সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তা দেখা দিল—

৫৩

লাউলের ঘরের ছেইলা লো, দুধ খাইবে কিসে?
রাজার বেটা পাশা খেলিয়া বাটি জিনিয়া নিছে॥
পাশা খেলিয়া জিনিলাম কড়ি,
তা' দিয়া কিনিলাম কপিলেশ্বরী॥
কপিলেশ্বরী গাই কি বা ঘাস খায়?
পুকুরের চারি পাড়ে দূর্বা খায়॥

দূর্বা খাইয়া লো সই, শুকাইল দুধ।
কি দিয়া পাল্‌বো আমরা লাউলের ঘরের পুত ?
লাউলের ঘরের পুত না লো বেড়ার মাটি।
বর্তিগো ভাই বোন লোহার কাঠি ॥—ঢাকা

৫৪

আস লো শত বইন, জলেরে যাই।
জলেরে যাইয়া না লো ঝাপ্পটি খেলাই ॥
ঝাপ্পটি খেলাইয়া না লো পাইলাম টাকা।
তাই দিয়া দিলাম আমরা সূর্যের বউরে শাঁখা ॥
সূর্যের বউরে শাঁখা দিয়া না লো পাইলাম টাকা।
তাই দিয়া দিলাম আমরা চন্দ্রের বউরে শাঁখা ॥

(এইরূপ সকলকে)

সেই শাঁখা নিয়া না লো লাউলের পুতের খেলা।
খেল্‌তে খেল্‌তে না লো—দুপুর বেলা ॥—ঢাকা

৫৫

লাউলের ঘবের ছেইলারে লো কি কি গয়না দিমু ?
হাতজোখা বয়লা দিমু, হাত জোখা চুড়ি দিমু ॥
ডেনাজোখা তাবিজ দিমু, জসম দিমু ॥
গলাজোখা চন্দ্রহার দিমু, সূর্যহার দিমু ॥
বুকজোকা পাটা দিমু, বাঘের নখ বাঁধাইয়া দিমু ॥
কোমরজোখা টোডা দিমু, পাওজোখা খাড়ু দিমু।
পাওজোখা গুজ্‌রী দিমু, দুই চরণে নেপুর দিমু।
দশ আঙ্গুলে পুঁটি দিমু ॥
লাউলের ছেইলা নাচবে। রাজার রাজ্য হাসবে ॥—ঢাকা

৫৬

লাউলের ঘরের ছেইলারে লো কি কি গয়না দিমু ?
হাত জোড়া বালা দিমু হাত জোড়া অনন্ত দিমু ॥
গলা জোড়া চন্দ্রহার দিমু গলাজোড়া সূর্যহার দিমু।
বুক জোড়া পাটা দিমু বাঘের নখ বাঁধাইয়া দিমু ॥

কোমর জোড়া তোড়া দিমু পাও জোড়া খাড়ু দিমু।
পাও জোড়া মল দিমু দুই চরণে নূপুর দিমু॥
দশ আঙ্গুলে আঙ্গুটি দিমু।
লাউলের ছেইলা নাচবে রাজার রাজ্য হাসরে॥—ঢাকা

মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়ার প্রধানতঃ দুইটি ভাগ—প্রথমতঃ সূর্য ঠাকুরের বিবাহ-বিষয়ক ছড়া, দ্বিতীয়তঃ ব্রতের আচার সম্পর্কিত ছড়া। সূর্য ঠাকুরের বিবাহ-বিষয়ক ছড়াগুলি যেমন বাস্তব জীবনধর্মী, ব্রতের আচার-বিষয়ক ছড়াগুলি তেমন নহে, অন্যান্য আচার-বিষয়ক ছড়াগুলি যেমন হইয়া থাকে, ইহারাও তাহাই। অনেক দিক দিয়া ইহাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কুমারী মেয়েদিগের সেঁজুতি ব্রতের ছড়ার ঐক্য আছে। ইহাদেরও কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রত্যূষে জলশুদ্ধের ছড়া—

৫৭

কাগে না ছুঁইতে বগে না ছুঁইতে ;
ছুঁইলাম ছুঁইলাম দূর্বার আগে।
দূর্বা সরস্বতী কি বর মাগে ?
আঁই বর হাঁই বর বিয়ার বর মাগে।—মৈমনসিং

৫৮

চক্ষে মুখে পানি দিতে কি কি ফুল ফোটে ?
লাল সরষা দুইটি ফুল ফোটে।
কাগে না ছুইতে রে বগে নিয়াছিল,
মুই ছুইলাম দুপলার আগে।
দুপু দুপু সরস্বতী লড়ে না চড়ে,
লড়িয়া চড়িয়া কি বর মাগে ?
রাজার দুয়ারে পাশা করি।
পাশার কড়িটি লয়, লয় বুড়ি,
তাই দিয়া কিনলাম কবিলেশ্বরী।
দে দে কবিলা গোবর লাদা,
তাই দিয়া লেপুম আমরা সূর্যের জাগা।

জাগা লেইপা ঘাটে যামু,
ঘাটে যাইয়া বইঙ্খর খামু।
বইঙ্খরের নীচে ঘুঘুরের বাসা,
আমাগ সাত বইনের একই আশা।—ঢাকা

৫৯

চোখে মুখে পানি দিতে কি কি ফুল লাগে?
রাম লক্ষ্মণ দুটি ফুল লাগে।
সেই ফুলে খান কি? নস ভাইঙ্গা জল খান,
পুকুরের চারি পাড়ে দুকুলা খেলান।
দুপুর দুপুর সরস্বতী লড়ে না চড়ে,
লইড়া চইড়া কি বর মাগে,
রাজার দুয়ারে পাশা মাগে।
পাশা নারে নন্দপুরী,
ভাই গিয়াছেন বিক্রমপুরী।
মার লাইগা আনছেন কি?—শাঁখা শাড়ী।
বাপের লাইগা আনছেন কি?—দোলা ঘোড়া।
বইনের লাইগা আনছেন কি?—খেলার সাজু।
বৌর লাইগা আনছেন কি?—কুইয়া পুটি।
খাইব না ছুঁইব না শিয়রে থুইব,
রাইত পোহাইলে কাকেরে দিব।
সেই কাকে তোমার কি কাজ করে?
রাইত পোহাইলে বাসি কাজ করে।
বাসিকাজ করিতে ফুটিল কাঁটা,
এই হইল আমার জন্মের খোঁটা।
খুয়া ভাঙ্গে খুয়ানী এচলার আগে,
সকল খুয়া গেল বরই গাছটির তলে।
দে দে বরই গাছ ঝুন্নই দে,
ছয় কুড়ি ছয়টা বরই লিখিয়া দে।

লিখিতে পড়িতে গোটে হইল না,
কাইটা কুইটা ফেলিলাম শিবের কানের সোনা।
শিবের কানের সোনা নালো, লরিয়ার পিতল,
এই ব্রত করি আমরা মাঘের ভিতর।
মাঘের জলখানি টলমল করে
উইড়া যাইতে পক্ষীটি পইড়া পইড়া মরে,
হাতে নিলে ফটিক জলে।
বামুন ঝি লো সই,
মাঘমণ্ডলের ববত করতে ঘাট পাইমু কই ?
আছে, আছে লো ঘাট, বামুনবাড়ীর ঘাট,
রাইত পোহাইলে বামুনরা পৈতা ধোয় তাত।
পৈত্তার গোতলাইনা জল পুখইরেতে ভাসে,
তা দেইখা মাইলানী খটখটাইয়া হাসে।
হাসিস্ নালো মাইলানী তুইতো আমার সই,
মাঘমণ্ডলের ববত্র কবতে ঘাট পাইমু কই ?
আছে আছে লো বৈদ্যবাডীব ঘাট,
রাত পোহাইলে বৈদ্যরা সন্ধ্যাপূজা করে তাত।
পূজার গোতলাইনা জল পুখইরেতে ভাসে,
তা দেইখা মাইলানী খটখটাইয়া হাসে।
হাসিস নালো মাইলানী তুইতো আমার সই,
মাঘমণ্ডলেব ববত কবতে ঘাট পাইমু কই ?—ঢাকা

৬০

চোকে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে ?
রাম লক্ষ্মণ দুটি ফুল লাগে।
ওপার থেকে জিজ্ঞাসেন মালী—
"কি কি ফুলে মুখ পাখালি ?"
সেই ফুলে খান কি ?
নল ভেঙ্গে ডাল খান॥

যে জল ছোঁয় না লো কাকে আর বকে,
সেই জল ছুঁই মোরা দূর্বার আগে ॥
পুকুরের পাড়ে পাড়ে 'তুপুলাখানি'
তুপুর তুপুর সরস্বতী লড়ে না চরে।
রাজার তুয়ারে পাষাণ মাগে ॥
পাষাণ না লো ন' ন' বুড়ি।
ভাইয়েরা যাইবেন বিক্রমপুরী ॥
মায়ের জন্য আনবেন কি ?—শাঁখা সিঁন্দুর।
বাপের জন্য আনবেন কি ?—হাতী ঘোড়া।
বৈনের জন্য আনবেন কি ?—খেলানের সাজি।
সতের জন্য আনবেন কি ?—কুইয়া পুঁটি।
থাম্ না লো থাম্ না লো, শিয়রে থুমু।
রাতখান পোহাইলে কাউয়ারে দিমু ॥—ঢাকা, মাণিকগঞ্জ

এই ছড়ার শেষাংশে মা, বাপ, ভগ্নী ও সৎমার জন্য যে উপহার সামগ্রীর আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্রতনিঃসম্পর্কিত সাধারণ ছড়াতেও পাওয়া যায়।

ঘাটে যাইয়া সূর্যোদয়ে সূর্য প্রণামের পর অন্য এক গুচ্ছ দূর্বা দ্বারা জল দিতে হয়, তাহার ছড়া—

৬১

লও সূর্যাই লও তোমার পানি
লেখিয়া জুখিয়া ছয় কুড়ি পানি
ছয় কুড়ি পানির মধ্যে এক কুড়ি উনা
উনা দোনা ভরিয়া দিলাম মেঘের কানের সোনা।
মেঘের কানের সোনা নারে নাড়িয়া পিত্তল
ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিলাম বাড়ীর ভিত্তর ?
বাড়ীর ভিতর নারে আড়ু গাড়ু পানি
তাত্তেক্কা দিয়া আইলাম সূর্যে পানি।
সূরুজ ঠাকুর সূরুজ ঠাকুর দিয়া যাও বর
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর।—মৈমনসিং

সূর্যদেবতাকে অঞ্জলি দিবার ছড়া—

৬২

লও লও সুরুজ, লও তোমার পানি ;
লেখ্যা দিলাম আমি সাত চুল পানি ;
সাত চুল পানি নারে এক চুল উনা ;
উনা তুনা ভইরা দিলাম মেঘের কানের সোনা ;
মেঘের কানের সোনা নারে লাইড়া পিত্তল ;
লাইড়া পিত্তল নারে আওড়ার ভিতর।
আওড়ার ভিতর নারে হাঁটু গাড়ু পানি ;
তার থাইক্যা দিলাম চাঁন্দ সুরুজরে সাত চুল পানি।
সুরুজ ঠাকুর সুরুজ ঠাকুর উইঠ্যা দেও বর ;
বাপ ভাই সোয়ামী মোর হউক লক্ষীশ্বর।—ঐ

৬৩

লো লো সুরুয়াই লো তুবের পানি,
লিখিয়া লো পুকিয়া লো সাত বৌল পানি,
সাত বৌল পানি নারে এক বৌল সোনা,
এক বৌল সোনা নারে লাড়িয়ার পিত্তল
ধেক্যা দিয়া বাইর কর বাড়ীর ভিত্তর,
বাড়ীর ভিত্তর নারে হাটু গুটু পানি
তাত্রৈ দিয়া আইলাম সূর্যাইরে সাত বৈল পানি।

—ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট

এইবার সেঁজুতি ব্রতের মতই এক একটি আলপনার নিকট গিয়া এক একটি ছড়া বলিয়া মনস্কামনা জানাইবার পালা—

৬৪

আমি পুজি গুয়ার থাট, আমার হইব সোনার থাট।
মাঘ মণ্ডল, সোনার কুণ্ডল ; বাপ রাজা ভাই লক্ষেশ্বর।
মা পাটেশ্বরী, আপ্‌নে বিদ্যাধরী।
মাঘ মণ্ডলে ঢাইলা ঘি, আমরা বড় মানুষের ঝি।

অন্যান্য মাস

ফাল্গুন মাসে ফাল্গুনদোলা নামক এক ব্রতের অনুষ্ঠান হয়, তবে পূর্ব-মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতেই ইহার একটিমাত্র ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতে দেবতাটি যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না—

ফাল্গুনদোলা—গুণ প্রতিষ্ঠা
গুণে তিতা—গুণে মিঠা।
ভোজন ভাত—পিন্ধন পাট
পাট কাপড়ে—রাত্রি-বাস।

বসন্তকালে স্ত্রীলোকেরা বসন্ত রায়ের ব্রত করিবার পূর্বে সপ্তাহকাল 'উত্তম' ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন; ক্রমে আমাদের নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণই 'উত্তম'; তাঁহারই আর এক নাম 'বসন্ত রায়' হইয়াছে।

বসন্তকালের অপরাহ্নবেলায় কুমারী কন্যাগণ দ্রোণ, ধুস্তুর, পলাস, মন্দার, ভাণ্ডীর প্রভৃতি নানা জাতীয় বাসন্তী কুসুমে ডালা সাজাইয়া লইয়া বিল্ব, কদম্ব, নিম্ব অভাবে অন্য কোন বৃক্ষমূলে সন্ধ্যাকালে উত্তম ঠাকুরের পূজা করেন। ফুলের ডালায় ছোট ছোট মাটির ঢেলা এবং ধান্য দূর্বা বৃক্ষমূলে দিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। উত্তম পূজার মন্ত্র, যথা—

উত্তম ঠাকুর ভালা। আমি কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা। ঠাকুর-দাদা কালা॥
উত্তম ঠাকুর ভালা। আমার বাবা কালা॥—মৈমনসিংহ

বাটীস্থ ভাই ভগিনী মাতা পিতা সকলকেই কালা বলিতে হয়। কেবল উত্তম ঠাকুর কাল হইয়াও ভাল।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই গায়ে চুলকাণি রোগ দেখা দেয়, সেই রোগ হইতে নিষ্কৃতির আশায় কয়েকটি লৌকিক দেবীর পূজা দেওয়া হয়,

ছড়াই পূজার মন্ত্র। এখানে মেলেনী ঠাকুরাণীর নামে ছড়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

৩

হাত চুলকায় পা চুলকায় চুলকায় সব গা।
চুলকাতে চুলকাতে মেলেনী ভাটু পাড়ায় যা॥
ভাটু থেকে এসে মেলেনী উজান করলেন থানা।
নর লোকের পূজার সময় পট পটানির মানা॥
মা মেলেনী পূজরে।—মুর্শিদাবাদ

নিম্নোদ্ধৃত ছড়ায় দেবতাটির নাম ঘাঁটু। ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ খোস পাঁচড়ার দেবতা হইলেও ঘাঁটুও তাহাই কি, না, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ছড়া ছুইটি হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে না—

৪

নীল বনায় চুমচুমি।
বুড়ি আনল গুম্‌গুমি॥
গুম্‌গুমিয়ে ভাঙ্গব দাঁত।
বুড়ি আনল চৈত্র মাস॥
চৈত্র মাসের চতুর্দশী।
ঘাঁটুর কপালে চন্দন ঘষি॥
ঘষতে ঘষতে পড়ল ফোঁটা।
একা ঘাঁটুর সাত বেটা॥
ধোপা ঘাটের জল খেয়ে।
মোম পড়ল ধরাম্ দিয়ে॥—নদীয়া

বৈশাখ মাসে কুমারী মেয়েরা তুলসীব্রত করিয়া থাকে, ইহা যে বৈষ্ণব প্রভাবের ফল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার ছড়াতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

৫

তুলসী তুলসী মাধবী,
কও তুলসী কৃষ্ণ কথা।
কৃষ্ণ কথা শুনি মনে,
কোটি কোটি প্রণাম তুলসী চরণে।—মুর্শিদাবাদ

বিহু বা বিষু উৎসব বাংলার প্রাতিবেশী অসমীয় সমাজের এক জাতীয় উৎসব। কাছাড় জিলার বাঙ্গালী সমাজে ইহার প্রভাব দেখা যায়। সেখানে এই উৎসব উপলক্ষে বাংলা ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায়—

৬

বিহুর দিনে আজি
বৈশাখী আয় সাজি ;
ছেড়ে ঘরের কোণ
খেল্‌তে আয় বোন্।—কাছাড়

৭

রাজার চাকর আমার কাকা—
ফৌজাদারের কত টাকা !
ছয়টা মোটা শূয়র কাটি
দিবে খাওয়া পরিপাটি।—কাছাড়

৮

দাদা আমার সোনামণি,
এই যাই, এই এখনি।
করিও না তাড়াতাড়ি
পরছি আমি ভাল সাড়ী।
একটু দেরী কর ভাই,
মেয়ে—না মেজে যেতে নাই।—কাছাড়

জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের নদী নালা খাল বিলের জল যখন শুকাইয়া আসে, তখন বৃষ্টি কামনা করিয়া আঙ্গিনার এককোণে তিনটি গাছের আল্পনা আঁকিতে হয়। একটি মাটির ঘট ফুটা করিয়া গাছের মাথায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টির অনুকরণ করিয়া মেয়েরা বসুধাকে বারিধারার সিঞ্চিত করে এবং বৃষ্টির জন্য মিনতি জানায়। আটটি তারার আল্পনার উপর ফুল রাখিয়া ছড়া বলে—

৯

অষ্টবসু, অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী
আটদিকে আটফল আমরা রাখি।

ব্রতের কামনা—

বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা॥

ইহাই বসুধারা ব্রত। ইংরেজিতে ইহার অনুষ্ঠানকে Sympathetic magic বলে।

আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষার এই দুই মাস কেবলমাত্র মনসার ব্রত ব্যতীত আর বিশেষ কোন ব্রতের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায় না। কিন্তু মনসা ব্রতে কোন ছড়া নাই। ব্রত এবং গানই এই উপলক্ষে শুনিতে পাওয়া যায়। শরৎ কালের মধ্যেও কেবল ভাদ্র মাসে কয়েকটি ব্রত আছে, তাহাদের একটির নাম ভাজুই, ইহা পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতে ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

১০

কাটাকল কাটিয়ে তুললাম মাটি
তাতে উঠল বামুন বিটি।
ওঠ কেন লো বামুন বিটি, দেখ কেন লো চেয়ে।
আমার ভাঁজুমার বিয়ে শনি-মঙ্গলবারে।
তোরা পৈতা যোগাস লো এক একুশবারে। -মুর্শিদাবাদ

১১

তিনদিনকার ভাজুই আমার চারে দিলেন পা,
তবুতো সোনার ভাজুই গা তোলে না।
গা তোলরে ভাজুই গা তোল,
বসতে দেব শীতল পাটি খেতে দেব ননী।
জল আনাটা সফল ওই মা বল তুমি,
মা বলাটা বড় কথা বলরে যাদুমণি।
যাদুর হাতে ক্ষীরের নাড়ু বর্ধমানের কলা, ভাজুই মা
গা তুলে ভোজনে বসে আতপ খাও।
হে নন্দের বেলা ভাজুই ঘরকে আলো করে॥

১২

'বারো হাত কাপড়খান তেরো হাত দশি,
লুটাতে লুটাতে স্যাক্‌রা ভাইয়ের বাড়ী।
স্যাক্‌রা ভাই স্যাক্‌রা ভাই বসো নগদ চাঁদি,
এমন করে মল গড়াবো আমার ভাজুই সাজে।
সাজতে কুজতে ঘামলো গা,
কই যেলিলো সরু বেয়ান বাতাস করে যা।
হাতের বেনা কেড়ে নিয়ে তিন ঠোকনা দিয়ে,
ঠোকনা নয় ঠুকনি নয় ইন্দ্ররাজার ঘর।
ইন্দ্ররাজার ঘরেরে ভাই আঁজার পাঁজার ধান,
এইখানেতে ভাজুই থুলাম ভাজুই নিল কে ?
তুই ছোঁড়াতে যুক্তি করে ভাজুই নিয়েছে,
ও ছোড়া তোর পায়ে পড়ি ভাজুই এনে দে।
করবলির ডাল ধরে পায়ে ঝুলেঘোলা।
কলকে মুটির ফুলেরে ভাই মেলাম পাগোড়া।
যতফুল পড়ে রে ভাই থাক্‌রা থকরা।
জবার ফুল তুলতে যেলাম জবার কাঁটা ভুকলোরে।
হাত ঝিম ঝিম পা ঝিম ঝিম পায়রাণী ঘুমালো রে।
আমার ভাজুইয়ের উকুন হয়েছে।
শাশুড়ী নাই ননদ নাই তুলে দেবে কে ?
আজ এতক্ষণ ভাজুই আমার বড়ঘরের আড়ে,
কাল এতক্ষণ ভাজুই আমার মধ্যম পাথারে।
ভাজুই যাবে সোঁতে সোঁতে আমরা যাবে নায়ে,
হাতের কাঁকন বাঁধা দিয়ে ভাজুই তোল নায়ে।—**মুর্শিদাবাদ**

১৩

ও পেড়েদের ভাজুগুলি গড়ের গুগুলি,
আমাদের ভাজুগুলি সোনার মাদুলি।
ও পেড়েদের ভাজুগুলি তুঁষের ধুস্থ খায়,
আমার ভাঁজুগুলি ধূপে ধুস্থ পায়।

কাঁথরা ভেঙ্গে শাক যোগালাম শাক দম দম করে।
শাক বেচে শাঁখা পরবো সতীন ফেটে মরে॥
আম ধরে থপা থপা তেঁতুল ধরে বাঁকা,
কখন দেখিনি মা গো রাঁড়ের হাতে শাঁখা—মুর্শিদাবাদ

১৪

একদিনের ভাঁজুই আমার ছু'এ দিল পা,
তবু সোনার ভাঁজুই আমার গা তোল না।
গা তোল রে ভাঁজু আমার গা তোল রে,
বসতে দেব শীতল পাটি খেতে নেব ননী।
জনম সফল হোক একবার মা বলরে তুমি।
মা বলাটা বড় কথা বর্ধমানের ওলা,
গা তুলে ভোজনে বস এ আনন্দবেলা।—ঐ

১৫

আয় আয় গৌরী চল ফুল বাড়ী।
ফুল বাড়ীতে আছে আমার খেলার যশোমতী।
ফুল তোল, পুষ্প তোল, বেছে তোল কুঁড়ি,
আয় আয় গৌরী চল ফুল বাড়ী।
ফুল তুলতে জানিনা মেনা মেনা করে,
হাতের সাজি কেড়ে নিল তিন ঠোকনা মেরে।
ঘর নিকাতে জানিনা মেনা মেনা করে,
হাতের ছোঁচ কেড়ে নিল তিন ঠেকনা মেরে।
চাপড় নয়, ঠুনকো নয়, গালে মেলো চড়,
ভাঁজুর মায়ের নাম লক্ষ্মীশ্বর।—ঐ

ভাদুলী এক অতি প্রাচীন মেয়েলী ব্রত। যে যুগে বাংলার সওদাগরগণ সমুদ্র ও নদীপথে গিয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিত, সেই যুগে এই ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে প্রবাসী পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তনের আশীর্বাদ কামনা করিয়া নদী ও সমুদ্রের

পূজা করা হয়। ভাদ্র মাসে এই ব্রত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদুলী। ইহার ছড়াগুলি শঙ্কিত নারী হৃদয়ের বাস্তব অনুভূতিতে সরস।

১৬

এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ।
ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো
আমার বাপ-ভাইরে মনে রেখো।
জোড়-জোড়-জোড় সোনার দুওর জোড় নৌকায় পা।
আসতে যেতে কুশল করবেন ভাদুলী মা॥—ঢাকা

১৭

বনের বাঘ বনের বাঘ,
তোমরা নিও না আমার বাপ-ভায়ের দোষ।
তোমার হোক সোনার পিড়ি
যদি কুশলে তারা আসেন আপন বাড়ী।—ঐ

১৮

নদী, নদী, কোথা যাও?
বাপ ভায়ের বার্তা দাও।
নদী, নদী, কোথা যাও?
সোয়ামী শ্বশুরের বার্তা দাও।
সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন সমুদ্রে ঢেউ তুলে!
সাগর! সাগর! বন্দি,
তোমার সঙ্গে সন্ধি।
একূল ওকূল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।

সুয়ো দুয়ো যায় ভেসে।
সাত ভাই আসে হেঁসে ॥
ভেলা ভেলা সমুদ্রে থাকো।
আমার বাপ ভাইরে মনে রেখো ॥
কাগারে বাগারে কার কপালে যাও।
আমার বাপ ভাই গেছেন বাণিজ্যে
কোথাও দেখলে লাও ॥—ঢাকা

১৯

এ নদী সে নদী একখানে মুখ—
ভাদুলি ঠাকুরাণী ঘুচাবে দুখ।
নদী নদী কোথা যাও?
বাপ ভায়ের কথা দাও।
নদী নদী কোথা যাও?
স্বামী শ্বশুরের কথা দাও।—মুর্শিদাবাদ
নদী নদী কোথা যাও
বাপ ভাইয়ের বার্তা দাও।
নদী নদী কোথা যাও
স্বামী শ্বশুরের বার্ত্তা দাও
নদীর জল বৃষ্টি জল যে জল হও,
আমার বাপ ভাইয়ের সংবাদ কও ॥—ঢাকা

আশ্বিন মাসে বাংলার বৃহত্তর জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান, এই মাসে মেয়েলী ব্রতের সংখ্যা অল্প এবং যাহা আছে, তাহাতেও ছড়া শুনিতে পাওয়া যায় না। গান কিংবা ব্রতকথাই ইহাদের অঙ্গ।

কার্তিক মাসের ভাইফোঁটা বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে এক সুপরিচিত উৎসব। তাহার মধ্যে কিছু কিছু ছড়া আছে—

২০

প্রতিপদে দিয়ে ফোঁটা, দ্বিতীয়েতে নিতে
আজ হতে ভাই আমার যমের ঘরে
নিমের অধিক তিতে।

ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাঁড়া,
বোনের ফোঁটা না নিয়ে ভাই
না যেও যম পাড়া,
না যেও যমের ঘর।
আজ হতে ভাই আমার রাজ-রাজেশ্বর।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা
আমি দেই আমার ভাইর কপালে ফোঁটা,
ভাইর কপালে দিলুম ফোঁটা
যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা। —২৪ পরগণা

স্বর্গে শঙ্খের ধ্বনি, মঞ্চে জোকার,
বোনে ভাইকে ফোঁটা দেয়,
ভাই, না যাইও, যমের দক্ষিণ দোয়ার॥
যম-দোয়ারে দিয়া কাঁটা,
যম-খরত বাইড়া আইতা
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা॥ —মৈমনসিংহ

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে ভগ্নীরা যেমন ভাইদের যমদুয়ারে কাঁটা দিয়া থাকে, তেমনই যমকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য যমপুকুর ব্রতের অনুষ্ঠান করে। ইহা যমরাজা ও যমরাণীর পুজা। ইহার ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়—

২১

শুষ্‌নী কল্‌মী ল ল করে,
রাজার বেটা পাখী মারে।
মারণ পাখী সুকোর বিল,
সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুল্‌তে লাগল ছড়,
আমার বাপ-ভাই হোক লঙ্কেশ্বর।
শুষুণী কল্‌মী ন ন করে,
রাজার বেটা পক্ষী-মারে।

মারণ পক্ষী সুখের বিল ;
সোনার কৌটা রূপোর খিল।
খিল খুল্‌তে হাতে ছড়।
আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর ॥
হেলেঞ্চা কল্‌মী লক্ লক্ করে,
রাজার বেটা পক্ষী মারে ;
মারেন পক্ষী, শুকোয় বিল,
সোনার কৌটা, রূপোর খিল ;
খিল খুল্‌তে লাগল ছড়,
আমার ভাই বাপ—ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।
শুষ্‌নী কলমী ল ল করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে ॥
মারণ পক্ষী সুকোর বিল।
সোনার কৌটা রূপার খিল ॥
খিল খুল্‌তে লাগল ছিড়,
আমার বাপ ভাই হোক্ লক্ষেশ্বর।

বারমাসী ছড়া

কতকগুলি ছড়া কেবলমাত্র যে নির্দিষ্ট কোন মাসেই অনুষ্ঠিত কোন ব্রত কিংবা পার্বণ উপলক্ষে আবৃত্তি করা হয়, তাহা নহে—বৎসরের মধ্যে যে কোন মাসে অনুষ্ঠিত ব্রত কিংবা পার্বণ উপলক্ষে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বারমাসী ছড়া বলা যাইতে পারে ; বলাই বাহুল্য যে, বারমাসী গীত বা বারমাস্যা হইতে ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কারণ ; ইহা গীতি নহে, ছড়া মাত্র।

এই শ্রেণীর ছড়ার মধ্যে গোরক্ষনাথের ছড়াই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। গোরক্ষনাথের পূজা বৎসরের যে কোন মাসেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, সেই উপলক্ষেই ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয় বলিয়া, বৎসরের যে কোন সময়েই তাহাদিগকে আবৃত্তি করা হইতে পারে।

গো কৃষিজীবীর প্রধান সম্পদ, গোজাতির কল্যাণের জন্যই গোরক্ষনাথের পূজা বা সেবার অনুষ্ঠান হয়। ইনি নাথগুরু গোরক্ষনাথ নহে, গো-জাতির রক্ষক বলিয়া ইনি গোরক্ষক, তবে গোরক্ষনাথের নামটির সঙ্গে ইহার নামটিও একাকার হইয়া গিয়াছে। পূর্ব বাংলা প্রধানতঃ মৈমনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এই সকল অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক গোরক্ষনাথের ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যায়। গাভী প্রসব করিবার একুশ দিন পর নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ প্রথম দোহন করিয়া তাহার দুগ্ধ দ্বারা ছোট ছোট নাড়ু প্রস্তুত করিয়া গোরক্ষনাথের পূজা করিতে হয়, নাড়ু প্রসাদের লোভে বালক বালিকা ও গৃহস্থগণ আসিয়া গোশালায় সমবেত হয়, সেইখানে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একজন মূল আবৃত্তিকারকের সহায়তায় সমবেত নিমন্ত্রিত কৃষক ও গৃহস্থ বালকগণ ধুয়া ধরিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করে।

১

আইলেন গোরক্ষনাথ। ……হৈচ্চ (সকলে)
বইলেন খাটে।
চরণ ধুইলাইন্ ঘটের জলে।
কও সকলে শ্যামসুন্দর।
রণা রণা ফুলকা রণা।
ফুলের কড়ি।

তাই দিয়া কিনলাম কপিলেশ্বরী।
দুধ দেয় সে হাড়ি হাড়ি।
এক বানের দুধ তার বাছুরে খাইল।
এক বানের দুধ তার বসুমতী খাইল।
এক বানের দুধ তার গোরখে খাইল।
এক বানের দুধ তার ঠাকুর সেবায় লাগল।—পূর্ব মৈমনসিং

২

তোরা কে?
আমরা গোরক্ষের রাখাল।
গেছিলি কোথায়?
গাই বাছুর আশীর্বাদ করবার।
দেখলি কি কি?
বার শ' বলদ তের শ' গাই।
বাছুর কত লেখা জোখা নাই।
ডেক্‌রা গরুতে পারাইয়া মারল,
ঝাপ খুইলা দে বাড়ীৎ যাই। —পশ্চিম মৈমনসিং

৩

রণা রণা হৈচ্চ
খুইদা রণা, „
খুদের কড়ি, „
তাই দিয়া কিনলাম গাই কবিলেশ্বরী। „
দুধ দেয় কি হাড়ী হাড়ী। „
এক বানের দুধ তার ঠাকুর সেবায় যায়, „
আর এক বানের দুধ তার বাছুরে খায়, „
আর এক বানের দুধ তার গৃহস্থে খায়, „
আর এক বানের দুধ তার গোয়ালে নেয় „
বল ভাই শ্যাম সুবল।—ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা

৪

উত্তরের দেশে তালের ডাউগ। হেঁচ্চ
গরুর বিগ্নি মানুষের বিগ্নি যাউক॥ ”
পুব দেশে সুপারির ডাউগ। ”
গরুর বিগ্নি মানুষের বিগ্নি যাউক॥ ”
দক্ষিণ দেশে নারিকেলের ডাউগ। ”
গরুর বিগ্নি মানুষের বিগ্নি যাউক॥ ”
পশ্চিম দেশে খেজুরের ডাউগ। ”
গরুর বিগ্নি মানুষের বিগ্নি যাউক॥ ”
জাইঠ্যা বগের হাঁটু পানি। ”
ছ'মাসের পথ যায় গরুর বিগ্নি ”
বল ভাই শ্যাম সুবল।—ঢাকা, বিক্রমপুর

কতকগুলি ছড়া পীর ও গাজির ছড়া নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে সোনাপীর, মাণিকপীর ইত্যাদির মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নীতিশিক্ষা-মূলক বিষয়ও শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ফকিরেরা এই সকল ছড়া আবৃত্তি করিয়া হিন্দুমুসলমান সকলের দ্বারে দ্বারেই ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র ছড়া এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল ছড়া আবৃত্তি করিবার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই, তবে সাধারণতঃ যে সময় ভিক্ষা সহজলভ্য অর্থাৎ পৌষ মাস তখনই ইহাদের সর্বাধিক প্রচলন হইয়া থাকে। অন্যদিকে যদি কখনও অনাবৃষ্টি কিংবা মড়ক দেখা দেয়, তখনও দৈবকৃপাভিখারী গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা সুলভ হইয়া উঠে বলিয়া ইহাদের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

৫

শাশুড়ী উঠিয়া বলে মাইজা বোলো মা,
গগনেতে অধিক বেলা দুয়ার খোলবা না॥
এমনতর ঘরের বৌরা শুইয়া থাকে নাকি।
দুই চার দণ্ড বেলা হইল উঠান সুরতে বাকী॥

মাইজা বৌ উইঠা বলে আমি সবার দাসী।
এত মানুষ থাকতে আমি উঠান ঘুরতে আসি॥
শাশুড়ী কয় এ সংসারে লাগছে মরণ দশা।
মনে মনে তোমার বুঝি ভেন্ন হবার আশা॥
ভেন্ন হবার আশায় থাকে ভেন্ন হইয়া যাও।
মোরে ছাইড়া তোমরা সব্বে দুধে ভাতে খাও॥
খাইট্টা থুইট্টা মাইজা কর্তা বাড়ী যখন আসে।
ঘরের মধ্যে মাইজ্যা বৌ গাল ফুলাইয়া বসে॥—ঢাকা

তবে গাজীর ছড়া প্রধানতঃ মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণের বীরত্বপূর্ণ জীবন কাহিনী অবলম্বন করিয়াই রচিত হয়।

ঐন্দ্রজালিক ছড়া

কতকগুলি ছড়াকে ঐন্দ্রজালিক (magical) ছড়া বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। সাধারণের বিশ্বাস ছড়াগুলি আবৃত্তি করিয়া প্রাকৃতিক জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, এই ভাবে সমাজ অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইতে পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করিয়া থাকে।

এই ছড়ার মধ্যে দুইটি প্রধান ভাগ, এক শ্রেণীর ছড়া বর্ষাবারক (rain preventing), আর এক শ্রেণীর ছড়া বর্ষাকারক (rain producing)। যদিও ছড়াগুলি বর্তমানে শিশুর কৌতুক ক্রীড়ার বিষয় হইয়াছে, তথাপি একদিন সমাজে ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য ছিল। কয়েকটি ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

বর্ষাবারক ছড়াগুলি সাধারণতঃ রৌদ্রের আবাহন সূচক, ইহাদিগকে 'আয় রোদ' বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে—

আয় রোদ

১

রোদ আয়রে হেলে। ছাগল দেব কেনে॥
ছাগলীর মা বুড়ী। কাট কুড়তে গেলি॥
ছ'খান কাপড় পেলি। ছ'বউকে দিলি॥
আপ্নি মরিস জাড়ে। কলা গাছের আড়ে॥
কলা পড়ে দুপ্ দাপ্। বুড়ী খায় কুপ্ কাপ্॥
যা বুড়ী তুই যষ্ঠী-তলা। সেথা পাবি খই কলা॥
যা বুড়ী তুই সিংটী। যেথা পাবি আংটী।
যা বুড়ী তুই কোলিকাতা। সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা॥
যা বুড়ী তুই বদ্দমান। সেথা পাবি জলপান॥
বদ্দমানের রাঙ্গা মাটি। বুড়ীকে ধরে ছ্যাডাং কাটি॥—বর্ধমান

২

আয় রোদ টেনে, চাউল দেব অনে।
বাজার বুড়ি, কাঠ কুড়াতে গেলি
দু'খান কাপড় পেলি ছ'বৌকে দিলি
আপনি মরে জাড়ে, কলা গাছের আড়ে।

কলা পড়ে টুপ্‌টাপ্‌ বুড়ি খায় কুপ্‌ কাপ্‌।
বুড়াকে দেয় চপাটি নিজে খায় কলাটি
বুড়া মরে কেসে, বুড়ি মরে হেসে।—মেদিনীপুর

রৌদ্রের সঙ্গে ছাগলের একটি সম্পর্ক আছে, রৌদ্র ব্যতীত ছাগল চরিতে পারে না। হিন্দী একটি প্রবাদেও শুনিতে পাওয়া যায়—

বাল কা ভালা বোল্‌না চোল্‌না বহুড়ী কা ভালা চুপ।
ভেক্‌কা ভালা বরখা বাদর অজকা ভালা ধূপ॥

সেই সূত্রেই বাংলা দেশে প্রচলিত সকল রৌদ্রের আবাহন সূচক ছড়াতেই ছাগলের কথা আসিয়াছে।

৩

রোদ আয় রে ছটাফটা, ছাগল দেব গোটা-গোটা,
সূয্যির মা বুড়ি, কাঠ কুড়াইতে গেলি,
'ছ' খানা কাপড় পেলি, ছ' বৌকে দিলি,
সে বৌ কই? শাকে জল দিচ্ছে; সে শাক কই?
গরুতে খেয়েছে; সে গরু কই? বনে গিয়েছে;
সে বন কই? পুড়ে গিয়েছে; সে ছাই কই? উড়ে গিয়েছে;
কলা গাছের আড়ে; কলা পড়ে ঢুপ দাপ
বুড়ি খায় কুপ, কাপ
খেঁকশিয়ালির লোটাকান ডুব্বো ভরা রোদ আন্‌।—বীরভূম

সূর্য দেবতার বৃদ্ধা জননী কি ভাবে যে কাঠ কুড়াইতে গিয়া ছয়খানি কাপড়ের সন্ধান পাইলেন, তাহা রহস্যজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু ততোধিক রহস্যজনক তাঁহার ছয় পুত্রবধূর শাকে জল দেওয়ার কল্পনাটি। ঐন্দ্রজালিক ছড়ার যে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, ইহারাও যে ছড়ার মৌলিক ধর্ম হইতে বঞ্চিত নহে, ইহা হইতে তাহা দেখা যায়।

৪

আয় রোদ ঝেঁপে,
ধান দেব মেপে।
ছাগলের মা বুড়ি,
কাঠ গুড়াতে গেলি।

ছ' খান কাপড় পেলি।
ছ' বৌকে দিলি।
আপনি মরে জাড়ে
কলা গাছের আড়ে।
কলা পড়ে ডুম্ দাম্।
বুড়ি খায় কলাটি
বড়া যায় চোপাটি।
যা বুড়ী তুই হুগলী
সেথা পাবি গুগ্‌লী।
যা বুড়ী তুই বর্ধমান
সেথা পাবি পাকা পান।
যা বুড়ি তুই কোলকাত্তা,
সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা।
যা বুড়ি তুই সোসাটি
সেথা পাবি পাকাটি ॥
যা বুড়ি তুই মক্কা
সেথা হবি অক্কা।—মুর্শিদাবাদ

সূর্য-দেবতার জননী বস্ত্রাভাবে যে শীতে কাঁপিতেছেন, এই কল্পনাটিও বিসদৃশ, তবে ছড়ার জগতে বিসদৃশ বলিয়া কিছু নাই, ঐন্দ্রজালিক ছড়াতেও তাহাই।

আমসত্ত্ব দেওয়ার দিন যদি বৃষ্টি হয়, তবে ঠাকুরমা বলেন—

৫

রৈদ দে রে রৈদানী
চান্দের মার বকের হাত,
কলাতলায় গলা জল
চচ্চর‍্যায়া রৈদ পড়্।—ঢাকা, বিক্রমপুর

পূর্ব বঙ্গের ছড়াগুলির মধ্যে রৌদ্রকে একটু রূঢ় ভাষায় আহ্বান করা হইলেও সেখানেও সূর্যদেবতার জননীর বস্ত্রলাভ এবং তাঁহার পুত্রবধূর কথা আছে। তবে পুত্রবধূর সংখ্যা এখানে একটি বেশি, অর্থাৎ ছয়ের পরিবর্তে সাত। কিন্তু

বস্ত্রের সমস্যা উভয়তই সমান জটিল, উভয় ক্ষেত্রেই পুত্রবধূগণকে বস্ত্রগুলি দান করিবার পর বৃদ্ধার জন্য একখানিও অবশিষ্ট রহিল না।

৬

অল্‌দি দিমু বাইট্যা,
রৌদ্র ওঠ ফাইট্যা,
আগ্রা গাছে বাগ্রা ফুল
চম্ চমাইয়া রৌদ ওঠ।
বুড়ীলো বুড়া বকুল তলায় যাবি ?
সাতখান কাপড় পাবি—
সাত বউরে দিবি,
নিজে নিবি ত্যানার খোট্
চম্‌চমাইয়া রৌদ্ ওঠ্॥—ঢাকা

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে সূর্যজননীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইতেছে এবং এই মৃত্যু যে তাঁহার বস্ত্রাভাবজনিত শীত-কাতরতার জন্যই সংঘটিত হইয়াছে, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়।

৭

সূর্যের মায় মরছে
কুলা দিয়া ঢাকছে।
কুলা গেল ভাইস্যা
রোদ্দ্র উঠল হাইস্যা।—ঢাকা

৮

রোইদ দে রৈইদানি,
চাঁদার মা পুতানি।
চাঁদারে কাড়ি রোইদ দে,
বঅনর ঝিরে বঅনর ঝি,
সূয্য উঠ্যে কুন্দি ?
বেল গাছের তলাদি।
বোল ধইরগ্যে থোপ থোপ,
কাটঠোলর লোট।—চট্টগ্রাম

'কুন্দি' শব্দের অর্থ কোন দিক দিয়া এবং কাটঠোলর লোট শব্দের অর্থ কাঁঠালের নিমন্ত্রণ।

আকাশে রৌদ্র দেখা দিল না বলিয়া চন্দ্র যে কি অপরাধ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না, অথচ চট্টগ্রামের ছড়াগুলিতে চন্দ্রকেই ইহার জন্য অপরাধী করা হইয়াছে। এমন কি, রৌদ্র না উঠিলে চাঁদকে কাটিয়া সাত ঘরে বাঁটিয়া দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হইয়াছে।

৯

রৈদ দে রৈদানি।
চান্দার মা পুতানি॥
চান্দারে কাটি।
সাত ঘর বাঁটি॥
চান্দার হাতত্ বৈল ফুল।
চিরচিরাইয়া রৈদ তুল॥
রৈদ ন দি'ন দি ঘরত যাস্।
চন্দ্র সূর্যের মাথা খাস্॥
বাড়ীর পিছে কলার ডেম্।
কলা কাটি জারিত দেম্॥
কলা হইয়ে বাতি।
গোঞাইর মাথাত্ ছাতি॥
ডেয়ার মাথাত্
সাত কুড়ি সাত গুআ লাথি॥—চট্টগ্রাম

কতকগুলি ছড়ায় বৃষ্টিকে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ করা হইয়াছে,

১০

নেবু পাতা করঞ্চা
হে বৃষ্টি ধরে যা॥—বর্ধমান

১১

নেবুর পাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি থেমে যা।
কচুর পাতে হলদী
এই মেঘটা জলদী।—মুশিদাবাদ

রৌদ্রের আবাহন-সূচক যেমন কতকগুলি ছড়া শুনিতে পাইলাম, তেমনই বৃষ্টির আবাহন-সূচকও কতকগুলি ছড়া শুনিতে পাইব; ইহাদিগকেও 'আয় বৃষ্টি' বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

আয় বৃষ্টি

১২

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে।
ছাগলীর মা পাগলী
কাঠ কুড়াতে গেলি,
ছ'খানা কাপড় পেলি,
ছ'বৌকে দিলি।
কলা গাছের আড়ে
আপনি মরে জাড়ে।
কলা পড়ে ধুপ্ ধাপ্
বুড়ি খায় কুপ্‌কাপ্।
যা বুড়ি বর্ধমান
সেথা পাবি পাকা আম॥—নদীয়া, শান্তিপুর

বলা বাহুল্য 'আয় রোদে'র সঙ্গে ইহার কেবল মাত্র প্রথম পদটিরই পার্থক্য, তবে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে একটু অভিনবত্ব আছে—

১৩

আলে মলো আল কাঁকোড়ী বিলে মলো ধান,
মতি নামবি তো নাম।
এক হাঁটু পানিতে খল খলাবো ঠ্যাং
মতি নামবি তো নাম।—মুশিদাবাদ

পাড়ার মেয়েরা একত্র জড় হইয়া একজন বুড়ী সাজে। মেয়েরা নূপুর পরিয়া লয়। বুড়ী তাহার মাথায় বড় একটি কুলা নেয়, কুলাটিতে নানা আল্পনা আঁকা থাকে। কুলাতে কচুরিপানা রাখিয়া তাহার উপর মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়। বর্ষা পাগলিনীরা দল বল লইয়া ঘুরিয়া বাড়ি বাড়ি বেড়ায়।

আগাইয়া আসেন বাড়ির মেয়েরা। অনেকে এক সঙ্গে উলু দিয়া উঠেন। তারপর বালতি ভরতি জল আনিয়া ঢালিয়া দেন বুড়ীর মাথার কুলার মধ্যে। সঙ্গিনীরা বুড়ীকে ঘিরিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছড়া গায়—

১৪

ঠাকুর্দাদার ভাঙা ঘর,
বৃষ্টি নামে আড়াই ফর।
ঠাকুর্দাদারে ভাই,
ছিটি ছিটি জল দে জাপ্পরি খেলাই॥
চিনা খ্যাতে চিন চিনানি,
ধান খ্যাতে আঠু পানি,
দান খ্যাতে আঠু পানি,
ঠাকুর্দাদারে ভাই,
ছিটি ছিটি জল দে জাপ্পরি খেলাই।
আড়াই ফুটি জল দে নাইয়া ডুইয়া যাই॥—ঢাকা

১৫

কাঁচা মরিচ কাসন্দ।
পোলাপানের আনন্দ॥
আয় বিষ্টি গম গম,
কাইল বিয়ানে মহোচ্ছব।
এক পয়সার অল্‌দি।
বিষ্টি নাম জলদি॥—ঢাকা

১৬

হ্যাদে লো বুন ম্যাঘারাণী
হ্যাতপাও ধুইয়া ফ্যালাও পানী।

ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি
বড় ভুঁইতে হাটু পানি।
মেঘরাণীর ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি লামেলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কাইল্যা ম্যাঘা, ধইল্যা মেঘা বাড়ী আছ নি?
গোলায় আছে বীজ ধান বুনাইতে পার নি?—ফরিদপুর

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে মেঘের নানা নাম শুনিতে পাওয়া যায়—

১৭

কালো মেঘা নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো,
ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা তোমরা সবাই নামো।
কালো মেঘা টলমল, বার মেঘার ভাই,
আরো ফুটিক জল দিলে চীনার ভাত খাই।
কালো মেঘা নামো—নামো চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হ'লে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি,
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘার গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়—ঐ

বর্ষার প্রথম দিনে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা এক হাতে আঁচল ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলে,

১৮

ওলো মেঘারাণী,
হাত পা ধুয়ে ফেলাও পানি।
চিনে বনে চিক্‌চিকেনী
ধান বনে হাঁটু পানি;
কলতলায় গলা জল
গপ্‌গপাইয়ে নাইমা পড়।—ফরিদপুর

১৯

হ্যাদে লো ম্যাগা (মেঘা) রাণী,
জব্‌জবাইয়া ফ্যালা পানি,
চিনা বনে চিনচিনানি,
দান (ধান) বনে আটু (হাটু) পানি
কলা বনে গলা পানি।
ম্যাগেরে দিলাম গুয়াপান,
জবজবাইয়া বিষ্টি নাম।—ফরিদপুর

২০

বাব্‌নে খাইল ধামা,
আইজ্জের মেঘ লামা···
বাব্‌নে খাইল ধামা
আইজ্জের মেঘ লামা···
বাব্‌নে খাইল ঘোড়া
আইজ্জের মেঘ উড়া।
বাব্‌নে খাইল গাই
আইজ্জের মেঘ নাই॥—মৈমনসিং

২১

চট্টগ্রামে বৃষ্টি নামার জন্য গ্রাম্য বালিকারা মাথায় কুলা ও ঘট লইয়া গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী এই গান করে—গৃহস্থ বধূরা মাথায় কুলার উপর জল ঢালে, ঐ জল ধারা তুয়ার সিক্ত করে ও বৃষ্টি নামে।

কালা মেঘ ধলা মেঘ তারা সোদর ভাই,
এক লোচা ঝড় আন ভিজি ভিজি যাই।
মেঘারাণী মেঘারাণী হাত দুউই দুউই পেলা পানি,
পা দুউই দুউই পেলা পানি,
হাঁসে দুঅলে খুজের পানি মেঘারাণীর মা,
গরুএ দুঅলে খুজের পানি মেঘরাণীর মা।

কোচু তলে এক আঁড়ু পানি, মেঘারাণীর মা,
কলা তলে এক গলা পানি মেঘারাণীর মা।
কালা মেঘ ধলা মেঘ তারা সোদর ভাই,
এক লোচা ঝড় আঁন ভিজি ভিজি যাই।—চট্টগ্রাম

লোচা অর্থ পশলা (বৃষ্টি)।

ঐন্দ্রজালিক ছড়া আরও বহু প্রকারের হইতে পারে, যেমন কৃষকগণ প্রতি আষাঢ়ের সাত তারিখে অর্থাৎ যেদিন অম্বুবাচী আরম্ভ হয়, সেইদিন বসুন্ধরাকে ভোগ দেয়। তারপর গলবস্ত্রে সবার মঙ্গলার্থে এই ছড়া বলিয়া থাকে—

২২

বর বর বর বসুমতীর বর
লটকাই লটকাই ধর।
পাড়াপড়শীর ভাগ্যে ধর।
অতিথ পথিকের ভাগ্যে ধর।
বসুমতীর বর।—চট্টগ্রাম

ফল ফুল সব্জীর বীজ রোপণ করিয়া বহু ফলের আশায় এই ছড়া বলা হয়।

আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কৃষক গৃহস্থেরা আম পাতায় সুগন্ধি মসলা মাখাইয়া ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে তাহা পাকাটির মাথায় করিয়া গুঁজিয়া দিয়া আসে, বলে—

২৩

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে সকল শস্যের গর্ভ বসে,
রামের হাতের 'গুমা' ধান হইস তিন দুনা।—মৈমনসিং

হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইবার জন্য এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে—

২৪

আখ্ বাড়ির ধারে
ট্যাংরা মাছ নড়ে।
শালুক পাতা সলতে।
পিদিম কেন জ্বলছে।
নাকছাবিটা হারিয়ে গেল
সদাই মনে পড়ছে॥—হুগলি

এমন কি, গাছ হইতে আম মাটিতে পড়িবার উদ্দেশ্যেও এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়—

২৫

কাগা আমার ঠাকু ভাই,
আম ফালা বাড়িত্ যাই,
পবন বেঠা হনুমান,
লেঙ্গো কইর‍্যা বাতাস্ আন।
পবন আমার ঠাকু ভাই,
আম ফালা বাড়ি যাই।
আম বড় চুকা
আমের ভিতর পুকা॥—মৈমনসিং

আড়ি দিবার ছড়া আছে, আবার আড়ি কাটাইবারও ছড়া আছে। আড়ি কাটাইবার ছড়াটি সর্বত্র সুপরিচিত—

২৬

গাল ফোলা গোবিন্দের মা
চাল্‌তে তলায় যেও না,
চাল্‌তে তলায় গরুর ঠ্যাং
কঙ্কে নাচে ড্যাডাং ড্যাং।—হুগলী

তারপর কিরা দিবার ছড়া, কিরা কাটাইবার ছড়া, মাছ ধরিবার ছড়া, আম কুড়াইবার ছড়া ইত্যাদি যে কত আছে, তাহার অন্ত নাই। তাহাদের কিছু কিছু 'বাংলার লোক-সাহিত্য' প্রথম খণ্ড গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই সকল ছড়া সাহিত্যগুণ-বিবর্জিত।

সর্প দংশন এবং ব্যাঘ্রের আক্রমণে আহত রোগী ঝাড়িবার ছড়াও ঐন্দ্রজালিক ছড়ার অন্তর্গতই গণ্য করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে সাপে কাটা ঝাড়নের ছড়াগুলি সম্পূর্ণ সাহিত্যগুণ বর্জিত। বাঘের আক্রমণে আহত রোগী ঝাড়ার ছড়াও প্রায় তদ্রূপ। তবে বর্ধমান জেলার ভৈটাগ্রাম হইতে বাঘ নাচ নামক একটি লৌকিক উৎসবের কতকগুলি ছড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভৈটাগ্রামে বাঘ নাচ নামক একটি উৎসব শারদীয়া দুর্গাপুজার নবমীর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যাভিনয়ের কুশীলব এই প্রকার—

(১) বেদে (ব্যাঘ্র শিকারী ও যে বাঘ নাচায়) (২) মোড়ল
(৩) ওঝা (গ্রাম্য কবিরাজ ও মন্ত্র-তন্ত্রের অধিকারী) (৪) চৌকিদার
(৫) বেদের স্ত্রী (ওরফে 'হিমির মা') (৬) ব্যাঘ্রদ্বয়

ইহা ব্যতীত ঢাকী ঢুলী প্রভৃতি বাজনদার থাকে।

ইহাতে বাঘ বন্ধনের যে অভিনয় করা হয়, তাহার ছড়া এই প্রকার—

২৭

'এই, আঁচির বন্ধন পাচির বন্ধন বন্ধন বাঘের পা—
আর শালার বাঘ চল্‌তে পারবে না।
'এই, আঁচির বন্ধন পাচির বন্ধন বন্ধন বাঘের চোখ'—
এইবার বেটা অন্ধ হোক।
'এই হুঁকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগ রে বাঘার দাঁত কপাটি।
চাঁচি কুম্‌ড়ো বেড়াল পোড়া,
ভাং রে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদি রে বাঘ নড়িস্ চড়িস,
খ্যাক্‌শেয়ালীর দিব্যি তোকে।'—বর্ধমান

বাঘের আক্রমণে আহত রোগী ঝাড়ার ছড়া—

এনার কাঠি বেনার বোঝা।
আমার নাম ঠন্‌ঠনে রোঝা!
ঝাড়লাম ঝুড়লাম পেয়ে একটি আতা,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে মাথা!
ঝাড়লাম ঝুড়লাম পেয়ে একটি পান,
নেড়ে-চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে কান!
ঝাড়লাম ঝুড়লাম পেয়ে একটি মুড়ি,
নেড়ে চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে ভুঁড়ি!

ঝাড়লাম ঝুড়লাম খেয়ে একটি কুঁকড়ো,
নেড়ে চেড়ে দেখ রে ছোঁড়ার খেয়ে ফেলেছে বুকড়ো !
ঝাড়লাম ঝুড়লাম না পারলাম রাখতে,
কলসী কোদাল যোগাড় কর, যম এসেছে নিতে !
ঝাড়লাম ঝুড়লাম শোয়ালাম খাটে,
রাত পোয়ালে দেখি ছোঁড়াকে নিমতলার ঘাটে।
আল গুড়াগুড় যায় রে মৌয়ো শামুক-খুলি খায়,
আধেক পথে গিয়ে মৌয়ার গায়ে এলো জ্বর,
এক লাফে যায় মৌয়ো যম-রাজার ঘর !—ঐ

মৌয়া শব্দের অর্থ বাঘের বিষ।

বাঘের আক্রমণে আহত রোগী ঝাড়ার আরও একটি ছড়া—

এ পুকুরের পানা রে ভাই ও পুকুরের পানা,
ফুড়ুং করে উড়ে গেল ছোঁড়ার গায়ের টেনা।
আখ বাড়ীতে, পড়লো গোবর !
গোবর করে চবর চবর।
ওর মা দেয় এক সের চার, আমি খাই কড়মড়িয়ে !
ছোঁড়া ওঠে ধড়ফড়িয়ে !—ঐ

ব্রতের ছড়া মাত্রই যে ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্যেই রচিত ও আবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তথাপি উপরি-উদ্ধৃত ছড়াগুলির ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বলিয়া ইহাদিগকে স্বতন্ত্র বিভাগে উল্লেখ করা হইল।

অষ্টম অধ্যায়

সাহিত্যিক ছড়া

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির দীর্ঘ উপবিভাগের সাহাযো ছড়ার রাজ্যের বৈচিত্র্য, বিশিষ্ট মানসিকতা ও সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবিটিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঐ আলোচনায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছড়া তাহার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিচয়ে লোক-সাহিত্যের অপরাপর শাখা হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি; ইহাদের শিল্পরূপও কোন ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি নহে। ইহাদের মধ্যে বৈদগ্ধ্য অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত রসধারা, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়ের স্থান অনেকখানি বেশী। তাই সচেতন শিল্পীর পক্ষে অনুরূপ ছড়া রচনা করা একান্ত কঠিন। তথাপি লৌকিক ছড়ার ভাব-ভাষা, রূপ-ছন্দের সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আধুনিক কালের কবি ও সাহিত্যিকগণকে ছড়া রচনা করিতে দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক যুগের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট, উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত, আজ-কালের কবিগণ ছেলে ভুলানো, মেয়েলি বা ঘুমপাড়ানি ছড়ার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যে সমস্ত ছড়া রচনা করিয়াছেন, তাহাদেরই আমরা সাহিত্যিক ছড়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই ছড়াগুলি সচেতন প্রতিভার বুদ্ধি-প্রধান সৃষ্টি হইলেও ইহাদের গায়ের মাতৃদুগ্ধের অ-বোধ গন্ধটুকুর জন্যই ইহারা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইতেছে। অধিকন্তু একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত সাহিত্যিক ছড়া কখনো বহির্মুখী চিত্রগত ঐক্যে, কখনও বা অন্তর্মুখী প্রাণগত সামঞ্জস্যে লৌকিক ছড়ারই পরিপূরক রূপে আধুনিক মনকে বিশেষ ভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। অবশ্য ইহা বলা একান্ত বাহুল্য যে আবেদনের বৈশিষ্ট্যে এই ছড়াগুলি লৌকিক ছড়াগুলি হইতে ভিন্নতর চরিত্রগুণের অধিকারী। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে যে, আধুনিক মনের কাছে অশিক্ষিত, অ-পটু বুদ্ধির রচিত লৌকিক ছড়াগুলি নূতনতর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে যোগীন্দ্র নাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর

মন্তব্যটিকে স্মরণ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, 'প্রসঙ্গক্রমে এইমাত্র বলিয়া রাখিতে পারি, এই শিশুসুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধির মধ্যেও এই শৈশবোচিত প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে।' বাঙ্গালী শিশু মাতৃদুগ্ধের সহিত মায়ের মুখের নানা প্রকার ছড়া-কবিতার যে রস পান করিয়া থাকে, তাহার সংস্কার সে কোন দিনই ভুলিতে পারে না। দোলনার দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার ছন্দের যে দোল তাহার রক্তের মধ্যে লাগিয়া যায়, তাহার সংস্কারকে ভুলিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় সাহিত্যিক ছড়ার জন্ম সম্ভব হয়।

কিন্তু অসচেতন প্রতিভার সৃষ্টি লৌকিক ছড়াগুলির প্রভাবে এবং প্রেরণায় যে সাহিত্যিক ছড়ার সূত্রপাত, তাহাদের রসনিষ্পত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না। কেন না তিনি তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া'য় 'জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ; জাদু, এত বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির আলোচনা করিতে যাইয়া আধুনিক কবি সাহিত্যিকগণ ছড়া রচনা করিলে বর্ণনা বহুল মার্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে উপরোক্ত ছড়াটির কিরূপ দুর্দশা হইবে, সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; 'আমাদের উপরে এই ছড়াটির রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটি রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম; এমন আচমকা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না। প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত, অনেকটা ইডন্ গর্ডনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জোৎস্নার আলো, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহু-ধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটু জমজমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক রকম করিতে পারিতাম, কিন্তু এই সরল সুন্দর কন্যাটি যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদুর কুসুম ফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ, সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সামান্য কয়েকটি স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।'

তথাপি, রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও, বিবর্তনের ধারায়, সমাজ মানসের নৈপথ্য প্রেরণা ও কবিমনের সুনিবিড় সাধনায়, লৌকিক ছড়ার

পাশাপাশি সাহিত্যিক ছড়ার প্রবাহ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বর্তমান। ইহারা সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি হইলেও জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কার যে ইহাদের পিছনে বিশেষভাবে সক্রিয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাদের লৌকিক রসাবেদন সর্বত্র অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও লৌকিক রঙ্ যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল আছে। ইহারা যেন জাতীয় রস-সংস্কারের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া যুগোপযোগী চিন্তায় নিজেকে পুনর্গঠিত করিয়াছে। অতএব ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, চিরায়ত সাহিত্যধারায় বাংলাদেশে সাহিত্যিক ছড়ার প্রসার এবং প্রচার বাঙ্গালীর লোক-চরিত্রকেই প্রতিফলিত করিয়াছে। আধুনিক নগর-কেন্দ্রিকতা ও উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে বাস করিয়াও আধুনিক লেখকেরা যে লোক-সাহিত্যের উপকরণে, সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টির ধারায় আপনাদের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংহতি হীন, কৃষিজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন, শিল্পকেন্দ্রিক বর্তমান সামাজিক জীবনে লোক-সাহিত্যের মৌলিক পরিচয়টি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি সমাজ-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে নাগরিক-সমাজের মধ্যেও এক ধরণের সংহতি অদূর ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবে এবং কালক্রমে সেই সমাজের অনুযায়ী বাংলার নূতন লোক-সাহিত্য সৃষ্টি হইবে। অন্তর্বর্তী কালে সাহিত্যিক ছড়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে হয়ত যোগসূত্রের কাজ করিবে; যেমন, একদা লিখিত সাহিত্যের বন্ধ্যাপর্বে কবিওয়ালার দল বাংলা সাহিত্যের রস-প্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। তাই বাংলার লোক সাহিত্যে সাহিত্যিক ছড়ার লিখিত রূপ ও তাহার জীবনধর্মিতার আলোচনা একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সকল ছড়া রচয়িতা এই ক্ষেত্রে যথার্থ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তবে বিস্ময়ের সহিত ইহাও লক্ষ্য করিতে হয় যে, বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক মনীষী, চিন্তাবিদ্, লেখক ও কবি লোক-সাহিত্যের এই ছড়া তীর্থে অবগাহন করিয়া প্রাণের ঘট ভরিয়া লইয়াছেন।

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে খৃষ্টান মিশনারীদিগের ও এ'দেশীয় মনীষিগণের যুগ্ম প্রচেষ্টায় শিশুশিক্ষা বিস্তার এবং শিশুর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য হইতেই সাহিত্যিক ছড়ার সৃষ্টি হয়। ইহার সহিত জাতীয়-ঐতিহ্য-পুষ্টির চেতনা সংযুক্ত হইয়াছিল; তবে তাহা আরও পরের কথা।

পরের কথা এই জন্য যে, স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে বা দুই একটি পত্র পত্রিকায় শিশু মনোতৃপ্তির জন্য যে সমস্ত কবিতার সৃষ্টি হয়, তাহা শিশুকবিতা —ছড়া নয়। সকল শিশু কবিতাই ছড়া নহে।

এখন স্বভাবতঃ প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, শিশু-কবিতা আর সাহিত্যিক ছড়ায় পার্থক্য কোথায়? কোন্ তৌল ব্যবহার করিয়া উভয়ের মধ্যকার দূরত্বটুকু জানিয়া লইব? ছড়া এই শব্দটি শ্রবণ মাত্র একটি বিশেষ কাব্য-বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে; একটি সংস্কার অন্তরে সক্রিয় হইয়া উঠে। ইহারা শুধু মাত্র তাহাদের ছন্দ-প্রকরণেই অন্যতর, তাহাই নহে—ইহাদের বক্তব্যের মধ্যেও একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই শ্রেণীর কবিতায় উদ্ভট বিষয়, অবাস্তব পরিস্থিতি, বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা, চিত্রের অসমীচীনতা বর্তমান থাকে। ইহাতে একটি বিশেষ বিষয় কখনও পরিপাটিভাবে শেষের দিকে অগ্রসর হয় না। কিন্তু শিশু-কবিতার ছন্দ সাধারণত পয়ার আশ্রয়। অধিকন্তু তাহাতে অসম্ভব বিষয়ের বর্ণনা থাকিলেও কখন উদ্ভট অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। একটা সুষ্ঠু পরিণতি সেখানে সম্ভাব্য। উদাহরণ দ্বারা দেখান যায় যে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতাগ্রন্থের 'বীরপুরুষ' কবিতা এবং ছড়া কাব্যগ্রন্থের দুই সংখ্যক কবিতাটিকে ('কদমাগঞ্জ উজাড় করে আসছিল মালদহে') নিশ্চয়ই একজাতীয় বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। প্রথমটিকে আমরা শিশু-কবিতা বলিব। ইহা শুদ্ধ-সংস্কৃতির মননজাত কাব্য-চৈতন্যের শিশু-সংস্করণ। কিন্তু শেষেরটির মধ্যে রহিয়াছে শিশু ভোলানাথের দেয়ালা—যাহার রূপ আছে, রস আছে, কিন্তু অর্থটি যেন কেমন এলোমেলো।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, কিছু কিছু সাহিত্যিক ছড়ার অগোছালো রসের সহিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কটুরস মিশাইয়া তাহাতে এক নূতন স্বাদ আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মৌলিক ছড়ার গুণটি নষ্ট হয় নাই এবং যেখানে তাহা হইয়াছে, সেখানে তাহা ছড়ার গুণ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

অতএব আমি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে (বাংলার লোক-সাহিত্য : প্রথম খণ্ড ; পৃষ্ঠা ১৩১-২) ছড়ার যে সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছি, অথবা 'ছেলে ভুলানো ছড়া' হইতে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছি, সেই অনুযায়ী ছড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই রচিত হইতে সুরু হইয়াছে। তবে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সখা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক-কবি লিখিত নিম্নোদ্ধৃত যে কবিতাটি পাই, তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ ছড়ার দূরাগত পদধ্বনি যেমন শুনা গেল, তেমনি শিশু-কবিতা রচনা করিবার একটি সার্থক আদর্শও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। কবিতাটি এই ;—

আঃ ছেড়ে দাও না!

আঃ ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই,
এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই?
দেখ্‌ছো না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোয়া রয়েছে তাতে,
মা বলেছেন নিয়ে যেতে 'চাকর বাকর' নাই।
কাজটি সেরে ফিরে এলে, তখন তোমায় আমায় মিলে
মনের সুখে করবো খেলা যত ভেবে পাই,
কাজ ছেড়ে না করবো খেলা, ছেড়ে দাও না হলো বেলা,
আগে কাজ কি আগে খেলা জানতে আমি চাই।

এই কবিতার সহিত একটি ছবিও ছিল, কিন্তু কবিতার সহিত কবির নাম ছিল না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইহাই প্রথম যুগের একটি শিশু-কবিতা।

এই পত্রিকা এগার বৎসর চলিয়া 'সাথী'-র সহিত মিলিত হইবার সময়ের মধ্যে আরও কিছু কবিতা প্রকাশিত হইলেও, তাহাতে ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত ছিল কিছু না। এমন কি, ঠাকুর বাড়ীর বিখ্যাত শিশু পত্রিকা 'বালক'-এও সাহিত্যিক ছড়া প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যিক ছড়া সৃষ্টি হইবার উর্বর ক্ষেত্র নির্মাণে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অলোকসাধারণ প্রতিভার দ্বারা নিজেও যেমন শিশু কবিতা, নীতিমূলক কবিতা ইত্যাদি রচনা করিলেন, তেমনি সাহিত্যিক ছড়া রচনার ধারা ত্বরান্বিত করিলেন। এইখানে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বার বৎসরের কিশোর সুকুমার রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক লেখনী চর্চার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার পাতায় প্রচুর মজার মজার ছবি ছাপা হইত। এই সব ছবির উপর পাঠক সাধারণের নিকট হইতে কবিতা-গল্প প্রভৃতি চাওয়া হইত। অনেক সময় ছড়া জাতীয় কবিতার সহিতও সুন্দর সুন্দর ছবি ছাপা হইত। পত্রিকা প্রকাশিত হইবার

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে কবির নাম না দিয়া পরপর তিনটি সচিত্র সাহিত্যিক ছড়া ছাপা হয়। প্রথম নাম 'বনের রাজা' ;—

(১)

বনের রাজা

বনের রাজা মুকুট মাথায়,
হাঁকিয়ে জুড়ি আস্‌ছে হেথায়
গড়্‌গড়িয়ে গাড়ী !
কাজনিকো আর হেসে খেলে,
প্রাণটি যাবে দেখতে পেলে,
দাও টেনে ভাই পাড়ি !!

দ্বিতীয় কবিতার নাম 'ভুলুর নাচ' ;—

(২)

তা ধেই তা ধেই, ধেই,
নাচে মেরা ভুলু এই !
নাকে দড়ি দু'হাত তুলে
ভুলু নাচে তালে তালে,
ধিনতা তিনিতা তা—
ক্যায়াবাৎ—বাঃ—বাঃ !

তৃতীয় কবিতার নাম হইতেছে 'ফড়িং বাবুর বিয়ে'।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিংশ শতাব্দীতেই সাহিত্যিক ছড়া আপনার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লইয়া বাংলা সাহিত্য-দরবারে এক উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে।

'মুকুল' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের (১৯০০) বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছেলে ভুলানো ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার ঢঙে এক কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম 'দাদামশার সাধের নাতি'। আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ এবং জীবনের ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রে অক্লান্তকর্মী শিবনাথ শিশু মনোরঞ্জনের এই নূতনতর ক্ষেত্রে কি ভাবে অন্তরের অকৃত্রিম সহানুভূতির স্নেহরসধারা উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

দাদামশার সাধের নাতি ফড়িং বাবু নাম,
এই সহরের এক কোণেতে আছে তার ধাম।
তালপত্রের সিপাই ভায়া লিক্‌লিকে শরীর,
চলেন যদি উড়েন যেন পা দুটি অস্থির।
কি যে করেন, কোথায় যে যান, হয় না তা নির্ণয়,
বুদ্ধি শুদ্ধি গজাবে যে হয় না সে সময়।
লেখা পড়ায় মন বসে না বইকে লাগে ডর,
পড়াশুনা শিকায় তোলা কেবল খেলায় ভর।
বাড়ীর লোকে পাগল পারা এক ফড়িঙ্গের চোটে,
কি হবে গো তাদের গতি আর একটি যদি জোটে।
দিচ্চে আজ ফড়িং ভায়া সাত বছরে পা,
দাদা বলে আপৎ বালাই সব দূরে যা,
মা বাপের আশা বিফল হবে না কখন,
দাদামশার সাধের নাতি হবেন একজন।

রবীন্দ্রনাথও ছোটদের জন্য 'মুকুলে'র পাতায় কবিতা লেখেন। কিন্তু তাহা সাহিত্যিক ছড়া বা লৌকিক ছড়ার আঙ্গিকে লিখিত নয়; তাহা শিশু-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাহিত্যিক ছড়ার গ্রন্থ 'খাপছাড়া' ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই প্রধানতঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছড়া রচনা করিতে থাকেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশের পর সুকুমার রায়চৌধুরী সেখানে আসিয়া তাঁহার বিখ্যাত ছড়াগুলি রচনা করেন।

আমরা সাহিত্যিক ছড়ার সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত হইয়া এক বিরাট রত্ন-ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। কত খ্যাত-অখ্যাত কবি কত বিচিত্র বিষয় ও উপকরণ অবলম্বন করিয়া যে ছড়া রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের জন্য তাহাদের সুসম্পূর্ণ বিভাগ নির্ণয় করা কঠিন। তথাপি মোটামুটি ভাবে তাহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের একটি রেখা টানা যায়। এই হিসাবে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে আবোল-তাবোল বা উদ্ভট শ্রেণীর রচনার সংখ্যাই বেশী এবং এই শ্রেণীর ছড়ায় কবিদিগের সিদ্ধি সমধিক। ইহার পর বিদ্রূপাত্মক বা ব্যঙ্গমূলক ছড়ার কথার উল্লেখ

করিতে হয়। রাজনীতি, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা অপ্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যিক ছড়ার উপজীব্য হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তাহার সম্পর্কিত বিস্ময়বোধ অবলম্বন করিয়া ছড়া রচনা করিতেও কবিগণ দ্বিধা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছড়ার ছবি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, '……এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাক্‌বে স্বর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।' ইহাই আবোল-তাবোল বা উদ্ভট শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তবে এই শ্রেণীতে এমন অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যকার তির্যক্ ইঙ্গিতসমূহ শিশুবুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের আলোচনা শুধু মাত্র শিশুবোধগম্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা দেখাইব যে আধুনিক বাংলার সকল কবি সাহিত্যিক কি ভাবে লোকচরিত্র অবলম্বন করিয়া একাধারে বয়স্কের অনুভব, জননীর অন্তঃকরণ ও শিশুর বিস্ময় মিশাইয়া ছড়া রচনা করিয়াছেন। উদাহরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের ৪৯ নং কবিতার উল্লেখ করিতেছি ;—

বরের বাপের বাড়ি
যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
চলেছে দই-বাহিক।
পণ দেবে কত টাকা
লেখাপড়া হবে পাকা,
দলিলের খাতা নিয়ে
এসেছে সই-বাহিক।

অথবা,

খবর পেলাম কল্য,
তাঞ্জামেতে চড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চলল!
সময়টা তার জলদি কাটে ;
পৌছল যেই হলদি ঘাটে

একটা ঘোড়া রইল বাকি,
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরাণহাটায় পৌছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল। (ঐ, ৪৫ নং ছড়া)।

ইহাদের মধ্যে বয়স্কের অনুভব, জননীর অন্তঃকরণ ও শিশুর বিস্ময় এই ত্রিধারাই বর্তমান।

কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছড়ায় লৌকিক রঙ্‌ কিছু গাঢ়তর এবং তাঁহার সহজ সরল আন্তরিকতায় একটি স্নেহ কোমলভাব বর্তমান। যেমন,

আয়রে ময়ূর আয়—
প্যাখম ধরে নেচে নেচে
যাদুর কা'ছে আয়!
আস্‌তে যেতে ঘুঙুর বাজে
সোনার নূপুর পায়॥

বা, বিখ্যাত 'মজার মুল্লুক' কবিতার,

এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো!—ইত্যাদি ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মৌখিক ছড়ার সংগ্রাহক এবং সাহিত্যিক ছড়ার রচয়িতা দুই-ই ছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সংগ্রহে এবং রচনায় অনেক সময় একাকার হইয়া গিয়াছে।

উদ্ভট বা আবোল তাবোল ছড়া রচনায় সুকুমার রায় যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আজও অদ্বিতীয় হইয়া আছে। তাঁহার 'আবোল-তাবোল' এবং 'খাই-খাই' গ্রন্থদ্বয় ছড়া-মহাকাব্য। ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক কবিতার মধ্যে অসঙ্গতির রস বিশেষ কৌশলে কবি উৎসারিত করিয়াছেন। তাঁহার 'আবোল-তাবোল' গ্রন্থের 'একুশে আইন' কবিতার লঘুতা ও কৌতুক অতিরিক্ত সূক্ষ্ম-ব্যঙ্গের ঝাঁজ তাঁহার কবিত্বশক্তির স্বরূপটি প্রকাশিত করিয়া থাকে। আবার তিনি যখন লেখেন ;—

…কান করে কট্‌কট, ফোড়া করে টন্‌টন—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।

কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা,
ঝোলা গুড় কিসে দেয়? সাবান না পট্‌কা……

কিংবা, খাইতে চাওয়া হ্যাংলাদের আহ্বান করিয়া—

খাই খাই করো কেন এস বসো আহারে।
খাওয়াবো আজব খাওয়া, খাওয়া বলে যাহারে।

আজব খাওয়ার ফর্দ দেন, তখন একাধারে অভূতপূর্বের অসঙ্গতি ও কৃত্রিম ছেলেমানুষীর ভানটি মনকে আবিষ্ট করিয়া তুলে। অধিকন্তু ছড়ার রাজ্যের এই মহাকবি নিতান্ত কৌতুকের আশ্রয়ে 'কুমড়ো পটাসে'র ট্র্যাজিডি বা হুলোর মর্মবেদনা ব্যক্ত করেন;

'পূবদিকে মাঝরাতে ঝোপ নিয়ে রাঙা,
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধাখানা ভাঙ্গা।
চট করে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়্ দুড়্ ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি,
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কান কাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্ করে নিভে গেল বুক ভরা আশা।' ('হুলোর গান')

তখন অসম্ভবের মধ্যেও একটি সামগ্রিক শিল্প-নৈপুণ্য সর্ব-বয়সের পাঠককে এক অলৌকিক রসের সন্ধান দেয়।

এই রস-সৃষ্টিতে আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেণী ও সর্ব বয়সের কবি এক বিশেষ পটুত্ব দেখাইয়াছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল লেখেন,

অ-মা, তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং—
খাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা, নাক্ ডেঙাডেং ড্যাং!
ওঁর নাক্‌টাকে কে করলো খাঁদা র্‌যাঁদা বুলিয়ে?
চামচিকে-ছা ব'সে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে।
বুড়ো গরুর পিঠে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং,
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

* * *

দাদু বুঝি চীনা ম্যান মা, নাম বুঝি চাং চু?

তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু!
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন।
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

* * *

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

এই অপূর্ব নাসিকা-বন্দনায় আমাদের সমাজের নাতি-দাদামশায়ের ঠাট্টার সম্পর্কটিকে অনাবিল ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া সৌহার্দ্যপূর্ণ বাঙ্গালী জীবনের পারিবারিক সম্পর্কটিকে কবি স্ফুটতর করিতে চাহিয়াছেন।

মৃত্যুর মাত্র সাত-আট মাস পূর্বে (৫ ডিসেম্বর ১৯৪০) রচিত রবীন্দ্রনাথের,

মাঝ রাতে ঘুম এল—লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুদু বলে, মামা আসে, এইবেলা লুকো ;
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চ'ড়ে, খুড়ো বলে—আহা,
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী যে হাসে,
বলে, আজ ইংরেজী মাসের আঠাশে।......

(ছড়া : ১১ সংখ্যক)

এই উদ্ভট কবিতার মধ্যে ছড়ার প্রবহমাণ স্রোতটির সহিত, অন্তরের সহজ যোগসূত্রটি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলার অগ্রতম কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যের এই ক্ষেত্রে পদচারণা করিয়া এই দিকটিকে সর্বদাই সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন।

পণ্ডিত ও সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়ার সহজ আনন্দ রস আকণ্ঠ পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি লেখেন,—

এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুষ।

অবশেষে একদিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন—.
ফানুষ ওড়ায় মানুষ ॥

(রাঙাধানের খই : লিমেরিক। পৃঃ ৮)

তাঁহার ছড়ায় লৌকিক রঙ্‌টি অত্যন্ত পরিচিত চরণগুলির মধ্য দিয়া ধরা পড়িয়াছে—

ইরা ইরা ইরানী
রাঙা মাথায় চিরুনি।
ইরা যাবে তেহারান
ওরা ভেবে হয়রান।
পথ গেল হারিয়ে
গাড়ী গেল ছাড়িয়ে
এলেতোড় কেলেতোড় মেলেতোড়
পৌছল বেলেতোড়।.........

(ঐ—ইরা তারা। পৃঃ ৯)

ঐ একই গ্রন্থের 'ময়নার মা ময়নামতী' ছড়াটিতে (পৃঃ ১৪) পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখিত একটি পরিচিত ছড়ার আধুনিক রূপকরণ তিনি অদ্ভুত ভাবে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ছড়ার বই দুইখানির ('উড়কি ধানের মুড়কি' ও 'রাঙা ধানের খৈ') নামকরণের মধ্যে যে লৌকিক-চেতনা বিধৃত আছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়। আবোল-তাবোল কথার মধ্য দিয়া যুদ্ধের প্রতি কবি যে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া রচনা করিয়াছেন, তাহা দূরাগত স্মৃতির জাগরণে সাহায্য করে—

হাঁ গো হাঁ
পটলের মা
বর্গীরা পৌছাল বর্মা।
আসতে কি পারে
গঙ্গার ধারে
এ দিকে যে রয়েছেন শর্মা।

থাক্ হে থাক্
পটলের বাপ
শুনেছি অমন কত বাক্।
তুমি যদি না যাও
বেহালাটি বাজাও
আমি যাই, পট্‌লাও যাক্।
('উড়কি ধানের মুড়কি' : পারিবারিক। পৃঃ ১২)

খেয়াল খুশির হাল্‌কা হাসি ও অসম্ভবের খাপছাড়া ছিন্নভিন্ন মেঘের সঙ্গে মনটিকে ভাসাইয়া দিবার অবসর নিষ্ঠাবান বিদগ্ধ কবিও বুঝি জুটাইয়া লন। তাহা যদি না লইতেন, তাহা হইলে এই ছড়াটি রচনা করিতেন কি করিয়া ?

খোকন মোহন চৌধুরী
ডলার পেলেন ছয় কুড়ি।
ভাবলে মনে চড়বে এবার
রেশমি-ঝালর চৌঘুড়ি।
যা চ'লে যা এক ডলার,
পাচ্ছে খিদে, আন ফলার।
টাটকা নরম ঠাণ্ডা পীচ,
ডিম্ব-ভরা স্যাণ্ডুইচ।

* * * *

শীতের শেষে রাত পোহালে
থমকা হেসে, হাল্‌কা চালে
শুক্‌নো-চিঁড়ে ফিরবে ঘরে
খোকন মোহন চৌধুরী—
('বার মাসের ছড়া' : বুদ্ধদেব বসু।
ডলারের ছড়া : পৃঃ ১০৩)

অথবা ঐ একই গ্রন্থের 'লক্ষ্মী-সরস্বতী' (পৃঃ ১০৬) ছড়াটির মধ্য দিয়া অত্যন্ত পরিচিত দুই দেবীর অদ্ভুত খামখেয়ালীপনার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা শুধু মাত্র কাব্যরস নয়, কৌতুক রসও পান করায়। ইহার রচনায় লৌকিক রঙ

কিছুটা অস্পষ্ট হইলেও ছড়া ও রূপকথার রাজ্যের সেই 'চম্পাবরণ কন্যা'র নাম তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই—বোধহয় তাহা সম্ভবও নয়। কারণ,

রং মশালের সম্পাদকের চম্পাবরণ কন্যা
ঘর করেছেন আলো ;
সমস্ত তার ভালো।
দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।
রাত্তিরে ঘুমোন না ;
পূর্ণ চাঁদের তারার মতো
প্রথম ফোঁটা তারার মতো
সন্ধ্যা হ'লেই তন্দ্রা-হারা চম্পাবরণ কন্যা।

('ছবি-ছড়ার দেশে' : সংকলন। পৃঃ ২৯)

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর সর্বাপেক্ষা বড় পরিচিতি কবি বলিয়া। তাঁহার অন্য সকল গুণপনার অধিক হইয়া রহিয়াছে তাঁহার অকৃত্রিম কবিত্ব। কিন্তু তিনি কবিখ্যাতির অনুকূলে বহু কবিতা রচনা করিলেও ছড়ার জন্য যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথকতর। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি রাশিয়ান ছড়া অবলম্বনে 'কুমির! কুমির!' রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও মৌলিকতা নাই। কিন্তু ;—

বেরুচ্ছ যে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথা? চীন দেশে?
ছি! ছি! ছি! ছি! কেউ কখনো
যায় সেখানে এই বেশে?
গায়ে তোমার 'নাং স্থ' কোথায়
পায়ে কোথায় 'সিং ত্যাচাং'?
জানো নাক ওসব বুঝি?
চীনে যাবার ঢের ফ্যাচাং।

* * * *

সেবার যখন বোঙের বনে—
কি বললে? বর্মা নয়?
যাচ্ছ তবে ফিলিপাইন?
এতক্ষণ তা বলতে হয়।.........ইত্যাদি

('জোনাকিরা : যাচ্ছে কোথায়?' পৃঃ ২৯)

ছড়ার মধ্যে খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী রহস্য অন্তঃসলিলা হইয়া অবিরত ভাসিয়া যায়, তাহা অতলান্তিক গাম্ভীর্যদ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়—শুধু উপলব্ধির জগতে পৌছাইয়া তাহাকে স্পর্শ করা যায় মাত্র। তাঁহার মধ্যে এই উপলব্ধির নিবিড়তা আছে বলিয়াই 'বর্ণ-পরিচয়ে'র বই লিখিতে বসিয়া, ছড়া-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। বহু বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে ছাপা এই অপূর্ব সুন্দর পুস্তিকাটির প্রতিটি ছড়া যদি উদ্ধার করিতে পারিতাম; তাহা হইলে বোধ হয় মনের অভিলাষ পূর্ণ হইত। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ত' অক্ষরটি দিয়া বাক্য রচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ;—

তলোয়ারটা তাড়াতাড়ি
খুলতে গেল বীর,
খালি হাতল খুলে এল
তাইতে চক্ষু স্থির। ('পড়তে মজা')

কিংবা তাহার আর একটি সাধারণ ছড়া ;—

ও বাড়ির ময়না,
কেন কথা কয় না
জানলাম ইতিহাস ঘেঁটে ;
ভুল করে একদিন
খেয়েছিল আলপিন,
সেই থেকে গেছে কথা এঁটে।—ঐ

সুনির্মল বসু তাঁহার 'আমার ছড়া' সঞ্চয়ন গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখিয়াছেন ; "শিশুদের জন্যে কবিতাই লিখ্‌তাম......আগে বিশেষ কিছু ছড়া লিখি নাই, কিন্তু আমার সেই কাব্য-জীবনের মূল উৎস হচ্ছে, আমার সেই বাল্য-জীবনের মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধু ঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি। ঐ ছড়াগুলির কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী...কারণ, আমার মনে হয়, ছড়া লেখা সহজ নয়। ছড়া লিখিবার রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সাধারণ রচনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা...।' এই উক্তির মধ্য দিয়া দুইটি সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথমতঃ শিশু-কবিতা ও ছড়া এক জিনিস নয় (পূর্বে এই বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি)। দ্বিতীয়তঃ ছড়া খুব সহজ বস্তু হইলেও, ইহা রচনা করা আদৌ সহজ নয় ; রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে। (খাপছাড়া : ভূমিকা)।

কিন্তু খুব সহজেই কবি সুনির্মল তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলিতে সেই সহজ কথা-গুলিকে বলিতে পারিয়াছেন। কত বিচিত্র বিষয়, কত নূতন নূতন মানুষ, কত অবাক বিস্ময়কে যে কথার পরে কথা বসাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই একটি উদাহরণ দিই—

কাল্‌কে রাতে তাল্‌তলাতে গালফোলা এক বুড়ী,
গাছের থেকে খাচ্ছে পেড়ে গরম গরম মুড়ি।
একটু দূরে তালপুকুরে জাল ফেলে এক ছেলে—
নরম মিঠে গোকুল পিঠে অনেকগুলো পেলে।

অথবা,

উড়কী ধানের মুড়কী,
ইঁদুর চাটে গুড় কি ?
টিক্‌টিকিটা বানায় বাড়ী,
ফড়িং ভাঙে সুরকী।
মৌমাছিরা মধুর লোভে
যাচ্ছে মধুপুর কি ?

এই সমস্ত ছড়ায় সুনির্মলকে সুকুমার রায়ের উত্তর-সাধক বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়টি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাহা সত্য নহে। কারণ, সুকুমার রায়ের ছড়ার মধ্যে আকস্মিক উদ্ভটতা বা বিস্ময়ের রস আছে বটে, কিন্তু কোন ছড়া-কবিতার মধ্যে লৌকিক রঙ ও রস-স্পর্শ প্রায় একেবারেই অবর্তমান। মনে হয়, একটি ভিনদেশীয় ফুল এদেশের মাটি-জল-বাতাসে অত্যন্ত সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুনির্মলের সমস্ত ছড়ারাজ্য ঘুরিয়া আসিলে মাটির গন্ধ ও 'মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধুঝরানো সুরেলা ছড়াগুলির' স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং এইখানেই সুনির্মলের সুকুমার রায়ের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য।

শিশু সাহিত্যের পারিবারিক পৃষ্ঠপোষক রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যতম সন্তান সুখলতা রাও বিভিন্ন শ্রেণীর ছড়া লিখিয়া একাধারে যেমন শিশু মনোরঞ্জন করিয়াছেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের এই দিকটিকেও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। সেই পুরাতন 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় শিশুসাহিত্য ও ছড়া রচনায় তাঁহার যে হাতে-খড়ি হইয়াছে, তাহার ধারা আজিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের

মধ্য দিয়া অব্যাহত রহিয়াছে। সেই জন্যই নূতন 'সন্দেশ'-এর পাতায় 'বাব্‌না ভূত'—

বাব্‌না ভূতের ছানা
নেইকো তাদের ডানা,
ঝড়ের সাথে খেলায় মাতে
ঝেঁটিয়ে আকাশখানা।
গাছের মাথায় দোলে
তালের পাতায় ঝোলে
ঘর বাঁধে না ধার ধারে না
হাওয়ায় গাড়ে থানা।

(প্রথম বর্ষ ২য়, সংখ্যা পৃঃ ১৬।)

অথবা 'দিঙ্‌নগরের বুড়ী'—

দিঙ্‌নগরের বুড়ী এল, তিনটি মেয়ে মুঠোয় ধরে ;
একটি সেঁকে, একটি বাড়ে,
একটি ভাল রান্না করে,
মিহি সুতো কাটতে পারে,
ঘরের কাজও করতে পারে ;
ও গিন্নীমা, কিনবে নাকি
একটি মেয়ে, আদর ক'রে ?

(ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন : পৃঃ ৫৫)

প্রভৃতি ছড়া এক একটি বিশেষত্ব লইয়া আজও উপস্থিত হয়। এই নবপর্যায়ের 'সন্দেশ' আশ্রয় করিয়া আজিকার শিল্পী ও শিল্পজগতে বহু আলোচিত নাম সত্যজিৎ রায় ছড়া সাহিত্যের আম-দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তবে তাঁহার ছড়াগুলির মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টি থাকিলেও তাহাতে অসংলগ্নতার বিস্ময় অনুপস্থিত।

প্রবীণ সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কেহই ছড়া লিখিয়ে ত' নহেনই, কবি হিসাবেও ইঁহাদের পরিচিতি নাই। তথাপি মিষ্ট-অসংলগ্নতার শিশুপনা তাঁহাদের গাম্ভীর্যের অন্তরালে চাপা থাকে

নাই। পুরাতন শিশু-পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যেমন,

ধুমধড়াক্কা দেখেছ কি?—
শুনেছ কি তাহার গান?
নাপিত-বৌয়ের পিসি বলেন—
বিকট তাহার তিনটে কান!

* * *

মুখখানা তার কুলো-পানা
ঢোঁড়া-সাপের চক্কোরে
হার মেনে যায় কে না জানে
তাহার সাথে টক্করে!

* * *

দেখতে যদি চাও কখনো
যেও নাকো রাস্তাতে;
গোলক-ধাঁধায় পথ হারিয়ে
হবে শেষে পস্তাতে!

(ধুমধড়াক্কা: 'মৌচাক': ১৩৩২ আশ্বিন)

'মৌচাকে'র পাতায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে সকল শিশু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটির মধ্যে উৎকৃষ্ট ছড়ার লক্ষণ আবিষ্কার করা কিছু দুরূহ নহে। যেমন;—

* * চাঁদের কবে ধরবে মাথা, সূর্য যাবে খসে',
তারার দলে খেলবে ম্যাচ, বলেন অঙ্ক কষে,'—

* * *

টাকা কিম্বা আধুলিটা, ভাঙ্গান যদি নিজে,
হিসাব বুঝে নিতে তারি, লাগে স'তিন ঘণ্টা—
আবার সেথায় রেখে আসেন পয়সা দু'চার গণ্ডা!

('মৌচাক': পণ্ডিত: চৈত্র ১৩২৮।)

পূর্বেই বলিয়াছি, মা-ঠাকুরমার মুখ হইতে শুনা ছড়ার সংস্কার পরিণত বয়সের সমৃদ্ধ কবিমনকেও প্রভাবিত করিয়া থাকে। ইহার স্বপক্ষে প্রবলতম

সাক্ষী হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর 'চাণক্যশ্লোকাষ্টক' ছড়াটির উল্লেখ করিতে পারি ;—

ছোটং ছেলে খেলেং পান।
বড়ং লোকে মলেং কান॥
টুপিং যেম্নি ফেলেং খুলে।
পেত্নীং অম্নি ধরেং চুলে॥
ছোটং ছেলে বেশীং কাঁদে।
ভূতং তাহার চাপেং কাঁধে॥

* *

ছেলে যদি খায় ঘড়িং ঘড়িং।
নাকটি হয় তার বড়িং বড়িং॥
চুলগুলি সব দড়িং দড়িং।
হাত পা গুলো ফড়িং ফড়িং॥

(রবিবার : ২০শে মাঘ, ১৩৬৩)

কবি আবোল-তাবোল ভাবকে এক উদ্ভট ভাষা প্রয়োগে কেমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ; ভাষা ও ভাবের এমন হর-গৌরী মিলন কদাচিৎ দেখা যায়।

সেই কতদিন পূর্বে 'মৌচাকে'র পৃষ্ঠায় এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ এবং কোনান ডয়েলের যুগ্ম-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত এবং আজিও শিশু-রাজ্যের সুখ্যাতির সিংহাসনে সমাসীন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের দুই একটি ছড়ার সন্ধান পাওয়া, ঐ 'মৌচাকে'র পৃষ্ঠাতেই, কিছু দুর্লভ নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'পালোয়ান প্যালারাম' ছড়াটির কয়েকটি পদ উদ্ধার করিতে পারি ;—

হাঁপ ছেড়ে হুস্-হুস্ ভাঁজি কষে ডম্বল,
খাসা আছি ! হয় নাকো জ্বর, কাশি, অম্বল !
মহাবীর হব আমি, লেখা আছে কুষ্ঠীতে,
খ্যাপা হাতী কুপোকাৎ, এত জোর মুষ্টিতে !

* * *

সাঁতারেতে গাঙ্ পার—লাফে পার পর্বত,
তেষ্টাতে গিলি খালি বাদামের সরবৎ !

পেটুক তো নই আমি ক্ষুধা মোর অল্পই,—
হাস্‌চ যে? ভাবচ্‌ কি এটা গাল-গল্পই?

* * *

হ'তে পারি আমি যাদু, রোগা, বেঁটে-খর্ব্বুটে,
দিতে পারি তবু তোর ভিরকুটি ছরকুটে!
ক্রোধানল জ্বলে যদি, কিছুতেই ক্ষমা নয়,
অতিশয় তাড়াতাড়ি যাবে বাছা যমালয়।

('মৌচাক' : কার্তিক ১৩৩১ পৃঃ ২৭৮)

এই অপরূপ বীরত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়া কবি হাস্যরসের উৎসরণ ঘটাইয়াছেন; তাহাতে তাঁহাকে লৌকিক ছড়ার 'খোকন' বাবুর দোসর বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেরই কবি-খ্যাতি না থাকিলেও তাঁহাদের কেহ কেহ ছড়া রচনায় নিপুণতা দেখাইয়াছেন। আমরা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীরও কয়েকটি শিশু-কবিতা এবং ছড়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এখানে তাঁহার উদ্ভট শ্রেণীর একটি ছড়া উদ্ধার করিয়া দিতেছি;—

কোথা যাবে? কালিঘাট, লালদীঘি ঝরিয়া?
লজ্জা ও রাগ কেন? হয়ে যাও মরিয়া।
কালিঘাটে গেলে ভাই ঘাট নাহি পাবে গো,
লালদীঘি নামে—নীল জলে না'বে গো।
তার চেয়ে বলি তুমি সোজা যাও কাশীতে,
সেথা বাধা নাহি দেয় হাসিতে ও কাসিতে।
করো যাহা ভালো হয়, মন তব যাহা চায়
ভৈরবী ধরো তান যদি মন গান গায়।
আমারে যে বলেছিল ও পাড়ার প্যালারাম,
কাশীবাসী হলে ভাই সবে গায় রাম নাম।
যাহাদের কোনোদিন কামড়েছে কুকুরে
হয় ভোর সন্ধ্যায়, নয় বেলা দুপুরে।
যাহাদের কোনোদিন গুঁতিয়েছে ছাগলে,
তাহাদের নিশ্চয় তাড়া করে পাগলে।

('ছবি-ছড়ার দেশে' : আবোল তাবোল। পৃঃ ৪০)

আশা দেবীও ছড়া রচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন—

দাড়িওলা পাচু যায়
পায়ে তার নাগরা,—
আঁচলেতে চাবি বাঁধা
পরনেতে ঘাগরা।
সবে বলে "বেশ দাদা
কিবা রূপ মরিরে,
যেন তুমি অপরূপ
বাঁশবনে পরীরে।
রূপ দেখে মরে যাই
সাধ নাই বাঁচতে,
সাবাস মানিয়েছে তো
পার দাদা নাচতে ?"
পাচু বলে—'বর আমি
পার নাকি চিনতে,
বউবাজারেতে আজ
যাই বউ কিনতে ॥'

('ঘুমতি নদীর ঢেউ' : আশা দেবী : দাড়িওয়ালা পাচু। পৃঃ ১৮।)

অথবা 'নীল তারা নীল তারা' গ্রন্থের 'দামুর বিলাপ' ছড়াটির মধ্যে যে অসম্ভাব্যতার রঙ আছে, তাহা ছড়ার বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করিয়াছে। কিংবা উপরিউক্ত গ্রন্থ 'ঘুমতি নদীর ঢেউ'-এর 'শেষের গান' ছড়াটিতে বাঙ্গালীর চির পরিচিত 'নটে গাছটি মুড়ালো' ছড়ার ভাব ও কিছু ভাষার সাহায্য অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ শেষ করিবার ভঙ্গিটির সার্থক অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

কথা গেল ফুরিয়ে,
নটে গাছ মুড়িয়ে,—
খোকনকে খেতে দেই,
ঘন দুধ জুড়িয়ে।
ওই চাঁদ উঠ্‌লো,
বন ফুল ফুটলো,

ঘুম পরী নামে চোখে
নীল পাখা উড়িয়ে।
চাঁদ মুখে চুমো,
খোকা ঘুমো ঘুমো॥ (পৃঃ ২০)

বাংলা সাহিত্যিক ছড়ার ধারাকে নবীন কবিদিগের মধ্যদিয়া যদি আরও অধিক ছড়া অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক শক্তিমান কবির সন্ধান পাওয়া যাইবে। তবে এই অধ্যায়ের মুখপাতে বলিয়াছি যে, বাংলা সাহিত্যের এই শাখার ব্যাপ্তি ও প্রাচুর্য এত বেশী এবং এই বিভাগে কবির সংখ্যা এরূপ অধিক যে, তাহা দ্বারা এক স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন। এমন কি, বাংলার ছড়ার ক্রমপরিণতির সূত্র ধরিয়া সাহিত্যিক ছড়ার মধ্য দিয়া বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে এক ব্যাপক গবেষণা পর্যন্ত চলিতে পারে।

তবে এই পর্যায়ের আলোচনা ও উদাহরণের তালিকা শেষ করিবার পূর্বে দুইজন তরুণতম কবি, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুষার চট্টোপাধ্যায়ের, ছড়ার উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া মনে করি।

পুতুলপুরীর দেউড়িতে ওই
বিছিয়ে চারপাই,
মউজ করে বসে আছেন
তালপাতার সিপাই।
সেপাই সেপাই একটু সরো
দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করো,
ক্যাচকেঁচিয়ে শব্দ কেন—
ভাঙ্‌লো নাকি হাত?
সামলে দাঁড়াও নইলে বাপু
পড়বে কুপোকাত।
সেপাই সেপাই পাগ্‌ড়ি তোমায়
মানাচ্ছে অদ্‌ভুত;
তাগ্‌ড়া গোঁফে মুখে তোমার
একটুও নেই খুঁত।

* * * *

চটপটিয়ে চটিজুতো
ছটফটিয়ে তাই,
পুরীর মধ্যে ঢুকে পড়েন
তালপাতার সেপাই !

(তালপাতার সেপাই : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোঃ)

এই ছড়াটির মধ্যে ছন্দের যাদু থাকিলেও লৌকিক রঙ তেমন ঘন হইয়া উঠে নাই ; কিন্তু অপর পক্ষে তুষার চট্টোপাধ্যায়ের এই ছড়ার মধ্যে অসঙ্গতি রস, লৌকিক শব্দ ও রূপকথার আমেজ কিছু অধিক। যেমন ;—

চাল কুমড়ো মাছের বঁটি,
জল খাও ঘটি ঘটি
কাটুম কুটুম ভুন্ধু ভুতুম ইলিশ মাছের ডিম।
ল্যাজ উল্টে ডিগবাজি খায় হাট্টিমাটিম টিম ॥

(রান্না ঘরের কথা)

মোটের উপর এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের মজ্জার মধ্যে যে সংস্কার একবার অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায় এবং জাতীয় চৈতন্য যাহার সহিত আশ্লিষ্ট থাকে, তাহা কখন অবলুপ্ত তো হয়ই না—অধিকন্তু নূতন নূতন পথে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যেমন বেগবতী নদীর সম্মুখে কোন বাধা উপস্থিত হইলে হয় তাহাকে উল্লঙ্ঘন করে, অথবা নূতন পথে নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়া অপর নূতন অঞ্চলকে শস্য-শ্যামল করিয়া তুলে। আমাদের সংগৃহীত দ্বিতীয় পর্যায়ের ছেলে ভুলানো ধরণের সাহিত্যিক ছড়াগুলি আমার এই বক্তব্যকে আর দৃঢ়ভিত্তিক করিবে।

আধুনিক কবিগণ দুর্বোধ্য কবিতা রচনা করিবার দুর্নাম যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি জাতীয় রস-সংস্কারের প্রভাবকে পুনর্জাগরিত করিবার জন্য সচেতন দায়িত্বও কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে, অসংখ্য ছড়া-ছবির গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এবং দোলনার দোলার সহিত মায়ের মুখে রচিত চিরকালের ছড়াগুলিকে ভাঙ্গিয়া নব-কলেবর দান করিয়া 'মরা গাঙ্গে' যেন প্রাণপ্রবাহ বহাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন কবি এই ছড়ার আঙ্গিকে শহর-বন্দর-দেশের নানারকম চলতি বিষয়, ভোটাভুটি,

জাল-জোচ্চুরি, অত্যাচার-অবিচার লইয়াও অনেক ছড়া রচনা করিয়াছেন। এইগুলির কিছু ব্যঙ্গাত্মক ছড়া এবং কিছু রাজনৈতিক ছড়া নাম দিয়া পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

বনকাপাসী রাঙা-মাসি, কওনা মেসোর কথা।
কওনা মাসি কানে কানে মেসো গেছেন কোথা॥
মেসো গেছেন কল্‌কাতাতে রেলগাড়িতে চড়ি'।
বেঁধে নিছেন কোঁচার খুঁটে একটা কাণা কড়ি॥
কাণা কড়ির সওদা পেতে ঘুরতে হবে সাল্‌কে।
আজ তো যেন আছেই আর সারাটি দিন কাল্‌কে॥
কিনতে হবে রকম রকম খেল্‌না পুতুল ঝুমঝুমি।
নিজের হাতে দিবেন কি না খোকাখুকীর মুখমুমি॥
একটি ঝাঁক্যা সওদা হবে, আনবে ব'য়ে মুটে।
গাঁটের কড়ি মেসোর তবু থাকবে কোঁচার খুঁটে॥

(ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি : কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত)

এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশে মা-মাসি বা পিসি সম্বন্ধে যে সকল ছড়ার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের আঙ্গিক ও ভঙ্গি অনুসরণ করিয়া একালের শহর-নগরের কবিগণ কিভাবে যে নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এখানে লক্ষণীয়। এই কবিরই ঐ গ্রন্থের 'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যাও এসে' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নানাপ্রকার ছড়া লিখিবার মিষ্টি হাত আছে; জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-ও এই বিষয়ে পিছাইয়া নাই। আশা দেবী (গঙ্গোপাধ্যায়) শুধুমাত্র শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনার নীরস ও শ্রমসাধ্য কার্যেই বুদ্ধি নিযুক্ত করেন নাই; শিশুসাহিত্য, বিশেষ করিয়া নানা শ্রেণীর ছড়া রচনায় কৃতিত্বের ছাপ রাখিয়াছেন। আমরা নিম্নে উক্ত তিনজনের আবোল-তাবোল শ্রেণীর ছড়ার কিছু নমুনা দিতেছি ;—

এক যে ছিল রাজা—
রাজত্বটা মস্ত ;
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উল্‌টে,
শূলে চড়ার আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।

* * *

সিংহাসনে চোখ পড়তেই
ওঠে সবাই আঁৎকে,
রাজা না থাক, কিন্তু রাজার
গোঁফ যে আছে আট্‌কে।...

('বার্ষিক আগামী' : এক যে ছিল :
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩৬৩)

এই ছোট ছড়াটির মধ্যে রূপকথার আমেজ ও গল্প বলিবার বিশেষ ঢঙ্‌টি লক্ষণীয়। তারপর,

কাল্‌না কুল তুলতে গিয়ে ডল্‌না খেলো মাসি
চৈত্র মাসের গাজন বাজে ঢোলটা হ'ল বাসি।
ঝি শত্তুর মা শত্তুর আর শত্তুর কারা
বাট্‌না বাটে নন্‌দা বুড়ী বউ যে কেঁদে সারা।

... ...

ঝামর ঝুমুর, রূপোর নূপুর রাত জাগিয়ে যায়,
জানলা খুলে ঘোমটা তুলে সাত বৌরা চায়।
আগ ডিঙ্গোলো বাগ ডিঙ্গোলো ডিঙ্গোলো পরীর দেশ,
যেতে যেতে পেলো রাণী আট কবিতার দেশ॥

('আগামী' : আট কবিতার দেশ : ফাল্গুন ১৩৬৩ পৃঃ ১)

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের এই কবিতার মধ্যে একটা ঘরোয়া আমেজ এবং 'লাল পিঁপড়ের গান' ছড়াটির মধ্যে সুকুমার রায়ের একটি বিখ্যাত কবিতার দূরাগত পদধ্বনি শুনা গেলেও জ্যোতিরিন্দ্রের আপন বৈশিষ্ট্যটিকে চিনিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

এই শ্রেণীর ছড়ায় '......বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাবহীন'-এর আহ্বান নাই অথবা এইখানে, '......খ্যাপার গানে নাইকো মানে নাইকো

স্বর,' ভাবটি অনুপস্থিত ; বা '......অসম্ভবের ছন্দ'ও ইহার নহে। ইহাতে অসঙ্গতির রস অপেক্ষা কৌতুকরস কিছু গাঢ়তর। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' বা 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থ দুইটির মধ্যে আবোল-তাবোল শ্রেণীর ছড়ার উল্লেখ যেমন পাইয়াছি, তেমনি ছেলে-ভুলানো ছড়াও অপ্রতুল নয়। যেমন ;—

ডাকাতের সাড়া পেয়ে
তাড়াতাড়ি ইজ্রেরে,
চোক ঢেকে মুখ ঢেকে
ঢাকা দিল নিজেরে।

পেটে ছুরি লাগাল কি,
প্রাণ তার ভাগাল কি,
দেখতে পেল না কালু
হল তার কী যে রে!

(৮৪ সংখ্যক কবিতা : 'খাপছাড়া')

অথবা ঐ একই কাব্য গ্রন্থের ৮০ সংখ্যক কবিতাটিকে ছেলে-ভুলানো ছড়া বলিলেও ৭৪ সংখ্যক কবিতাটিকে আবোল-তাবোল শ্রেণীর কবিতা বলিব।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে ভাবে লোক-সংস্কার ও সংস্কৃতি (Folk tradition and culture) নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির জারক রসে জারিত করিয়া নূতন যুগ ও সভ্যতার পাতে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকট বাংলা দেশ ও সাহিত্য চির-ঋণী রহিয়াছে। উভয়ের ভিত্তিভূমি ছিল ধ্রুপদী-আচার। এইভাবে উচ্চতম মননের সহিত লৌকিক আচার-আচরণের মেলবন্ধন হওয়ায় যে রসলোকের সৃষ্টি হইল, তাহারই ফল হিসাবে তাঁহারা ছড়া রচনা করিয়াছিলেন।

ঘুম্‌তা ঘুমায় ঘুম্‌তা ঘুমায়
রাতের পাখি গাছের কোলে,
দোলে দোলে কোলের ছেলে
মায়ের কোলে।
নিদ্ পাড়ে নিদ্ পাড়ে
হিম-নদী জল,

আলো-ছায়ায় নিদ্ পাড়ে
নীল পাহাড়ের ঢল !
ঘুম যাচ্ছে ঘুম যাচ্ছে
শিমূল-গাছের ফুল,
ঘুমায় ঘুমায় গানের বাতাস,
রাতের আকাশ—রাত দুপুর !

(অবনীন্দ্রনাথ, 'বার্ষিক শিশুসাথী'. ১৩৬৭, পৃঃ ১)

অবনীন্দ্রনাথ ছেলে-ভুলানো এই ছড়ার মধ্যেও নিজের শিল্পী পরিচয়টিকে গোপন রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার,

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাজছে বাদল গামুর-গুমুর
ডাল চাল আর মক্কা-মুসুর
ফোঁটায় ফোঁটায় নামে—
আকাশ থেকে নামে
জলের সাথে নামে—
ঘরে ঘরে নামে—
টাপুর টুপুর গামুর-গুমুর
গামুর-গুমুর টাপুর টুপুর।......

('ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন' : বৃষ্টি পড়ে, পৃঃ ১)

প্রভৃতি ছড়ার মধ্যে শব্দের তুলি দিয়া কল্পলোকের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সকল বয়সের সকল কালের বাঙ্গালীর নিকট-ই উপভোগ্য। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় শব্দের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল। এই শব্দ দ্বারা যাদু সৃষ্টি করার কৌশল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বহু কবিতার মধ্যে দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতাগুলি আকৃতিতে ছড়া না হইলেও প্রকৃতিতে ছড়া। যেমন, তাঁহার 'দোপাটি ফুল' কবিতাটির,—

ট্যাপা দোপাটি তুমি দোপাটি
তোফা খোঁপাটি বাঃ !
বাঁকানো খুঁটি বিনুনি দুটি
না হয় ঝুঁটি—হা !

ও কি লাগালে টেবো তু'গালে ?
চাঁদা কপালে চি !
দীপি ধোরো না তুমি যে সোনা
কথা শোনো না ? ছি !·········

ইহার ছন্দ ও শব্দের মোহমন্ত্র ইহাকে ছড়ার পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। ঠিক ঐ ভাবে 'কম্‌লা-ফুলি' কবিতার মধ্যে ছেলে-ভুলানো ছড়ার আমেজ লক্ষ্য করা যায়। যেমন ;—

কম্‌লা-ফুলি, কম্‌লা-ফুলি ! কমলা লেবুর ফুল !
কম্‌লা-ফুলির বিয়ে হবে কানে মোতির দুল !
কম্‌লা-ফুলির বিয়ে—
দেখতে যাবে, ফলার খাবে চন্দনা আর টিয়ে !·········

ভাষা ও ছন্দ যাঁহার আয়ত্তাধীন, কৌতুকস্নিগ্ধ মন যাঁহার সদা-সচেতন, তৃষিত আত্মা যাঁহার প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ পানে পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে যে লৌকিক আমেজ রঙ্‌ ধরাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ? সেই কারণেই মেয়েলি ভাষা ও ছন্দ তাঁহার কাব্য গ্রন্থাবলীর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিককেও ছেলে-ভুলানোর আব্দার শুনিতে হয়—ডাক পড়ে ছড়ার রাজত্বে—

হিংসুটে হিংসুক
কারু মনে নেই সুখ।
এর যদি নাম হয়
ওর তবে ঘাম হয় ;
ও যদি বা টাকা পায়
জ্বলবে এ' কাটা ঘায়।
... ...
এর গরু দড়ি-ছুট,
দিচ্ছে ও হরি-লুট ;
ওর পাখী খাঁচা-খোলা,
খুসিতে এ কান্না-ভোলা।······

কিন্তু যখনই,

এর যদি মরে বউ,
খাবে ও যে চৌ-চৌ ;
ওরো যদি বউ মরে,
তবে দুয়ে ভাব করে।

('ছবি-ছড়ার দেশে' : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। হিংস্রুটে, পৃঃ ২০)

হাতে শুধু বোমা বা মারণাস্ত্র নয়, কলমও সমানভাবে অভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে যে প্রযুক্ত হইতে পারে, বাংলা দেশের ছেলেরা তাহা দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ইহার প্রমাণ। ইনি কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভেই 'মৌচাকে' কবিতা লেখা সুরু করেন ; এমন কি, চতুর্থ বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় 'মৌচাকে' মুদ্রিত একটি ছবির উপর কবিতা লিখিয়া পুরস্কার পান। আমরা এইখানে তাঁহার একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া মুদ্রিত করিতেছি,

ঢ্যাম-কুড়-কুড় বাদ্যি বাজে
আজ শিয়ালের বিয়ে,
আকাশ জুড়ে মেঘ-মেয়েরা
সাজছে মায়ে ঝিয়ে।
দিন দুপুরে তাইত
দেখতে চকিত পাইত
ঝিলিক হাসি-বিদ্যুতের
এদিক, সেদিক দিয়ে।
ঢ্যাম-কুড়-কুড় বাদ্যি বাজে
নাচে ব্যাঙের ছা—
দোলায় মাথা লেবুর পাতা
রাঙা করমচা!
চাতক কি গান গাইছে
'ফটিক জল' চাইছে?
তাই রিম-ঝিম বৃষ্টি বুঝি
ফেলছে ফোঁটা-পা !!

('শিশু-সাথী' : ঢ্যাম-কুড়-কুড় বাদ্যি, শ্রাবণ, ১৩৬৯, পৃঃ ২৫৬]

প্রবীণ কবি কবিশেখর কালিদাস রায় বা নরেন্দ্র দেব ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য কবিতা লেখেন এবং 'মৌচাকে'র পৃষ্ঠায় তাঁহাদের সেই সমস্ত শিশু-কবিতা মাসের পর মাস ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে; অবশ্য তাহাদিগকে ঠিক ছড়া বলা যায় কি না সন্দেহ।

গবেষক পণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্তের ছড়ার কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া শিশুমনের রহস্যলোকের সহজ স্বাচ্ছন্দে তাঁহার যে অনায়াস লেখনী প্রয়াস, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য—

ছুট্টির দিনটা— পাক খাই তিনটা—
তাক্‌ধিন ধিনতা নাচি আর গাই ;
চেয়ে দেখি বাইরে রোদটুকু নাইরে—
হুল্লোড়ে ডাকে মেঘ হাঁই মাই কাঁই।

—'ছুটির দিনে মেঘের গল্প'

বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক ও সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীকেও লোক্-সাহিত্য-রসিক বলিয়া মনে হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে ছড়া রচনার ক্ষেত্রে তিনিও স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। ব্যঙ্গের তির্যক আঘাতে শাণিত সমসাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহার ছড়াগুলি বিশেষত্বপুর্ণ।

অজিত দত্ত-র কাব্য সম্ভার খুব বিপুল না হইলেও তিনি ছড়া রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'ছড়ার বই' পুস্তিকাটির ছবিভরা পাতার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গেলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,

মাথায় নিয়ে বাজে কথার ঝুড়ি
রাস্তা'চলে আদ্যিকালের-বুড়ি।
সত্যিযুগের মিথ্যে যুগের হাল্কা ভারি মিষ্টি,
লম্বা ছোট গল্প যত সব আছে তার মিষ্টি।
... ...
বিলোয় বুড়ি গল্প-গাথা গংগা থেকে কংগো,
হাজার ছাঁদের গল্প বুড়ির লক্ষ তাদের রঙ্গ।
কেউ বা শুধু কুড়িয়ে রাখে মনের ঝাঁপি ভরতি,
কেউ কাগজে কালোর দাগে কুড়োয় ঝড়তি পড়তি

কেউ বা করে গল্পবিলাস গল্প লেখে অন্তে,
বুড়ির ঝুড়ি ভর্তি তবু ভবিষ্যতের জন্যে।—'ছড়ার বই'

কিংবা ঐ একই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠার 'টুবলু' ছড়াটির মধ্যে,

আব্দারে টুবলুর নেই কোনো জুড়ি,
উড়োগাড়ি দেখে বলে ওড়াবে ও-ঘুড়ি।
কাছি মেজে মাঞ্জায়
আমাদের প্রাণ যায়,
গাছ কেটে হয়রান গড়তে লাটাই—
তিন দিন-রাত্তির বেঘোরে কাটাই।...—ঐ

ছেলে-ভুলানো ছড়ার ভঙ্গিটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কবির ছড়াগুলির মধ্যে আবোল-তাবোল সুর কিছু দুর্লক্ষ্য। এই কথাই আমরা বুদ্ধদেব বসুর ছড়াগুলির সম্বন্ধেও বলিতে পারি। তবে শেষোক্ত কবির ছড়ায় বুদ্ধিগ্রাহ্যতার জগতের ছবি কিঞ্চিৎ অধিক, যাহা ছড়ার পরিপন্থী।

সাহিত্যিক ছড়া রচনায় এ'কালের বিশিষ্ট কবি বিষ্ণু দে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, ছড়া রচনায় সার্থকতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার দুইটি ছড়ার অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

লাল জুতুয়া পায়ে বেড়ায়, হাত দুটো যা' দুলে।
ধেই ধেই সে ছুটে বেড়ায় আবার ওঠে কোলে।—বিষ্ণু দে

এই ধাঁধার ছড়াটিও লক্ষণীয়—

লম্বা লম্বা ঠ্যাং
বাঁকা তার দুটো উরু,
ছোট্ট একটা মাথা
নেই চোখ নেই ভুরু। (চিম্‌টা : ঐ)

বর্তমান গ্রন্থের লেখকেরও একখানি ছড়া জাতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'আজব বেদে' (১৯৩৬)। ছড়ার ছন্দ ও সুর অনুসরণ করিয়া রচিত ইহা হইতেও কয়েকটি কবিতার অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়, প্রথমতঃ যেমন,

ঠুন্ ঠুন্ ঘুঙুর
পথে কার বাজ্‌ল !

খোকাদের ঘুম চোর
ঐ বুঝি বাজল।—(হরকরা : আশুতোষ ভট্টাচার্য)

কিংবা

মধুবোস ডাক্তার
বড় নাম ডাক তার।
কলেরা কি ম্যালেরিয়া
সারে আইডিন দিয়া
ঘায়ে দিয়া কুইনিন
বাঁধি রাখে দুইদিন।— (উদোর পিণ্ডি : ঐ)

তারপর

মুখুয্যেদের ভাগ্নে রেমো
ডেঙ্গু জরের নিত্য রুগী,
সে বার এ'ল কোলকাতাতে
গাঁয়ে ছ'মাস পিত্তে ভুগি।— (ভস্মকীট : ঐ)

তাহাতে ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ্-এর সুপরিচিত Pied Piper of Hamelin কবিতাটিও বাংলা ছড়ার ছন্দে এই ভাবে ধরা দিয়াছে—

অনেক দিনের কথা, তখন বাগবাজারের ধার,
গঙ্গা নদীর জোয়ার জলে ধুইত হাজার বার।
নদীর সেথায় গহীন কত সবাই জান খাসা,
মাঝ নদীতে তল না পেয়ে পুল ছিল যার ভাসা।
বড় লোকের ভীড় যেখানে ছিল সে একদিন,
খালের পাড়ে খুঁড়্‌লে মাটি মিলবে ভিতের চিন্।
সেই সময়ের একটি কথা সবাই গেছে ভুলি,
বললে শেষে বলবে হেসে নেহাৎ গাঁজাগুলি।
বলব তবু—নয় এ কভু মিথ্যা গানের পালা,
এক সময়ে এই পাড়ায় হলো ইঁদুর জ্বালা।—(আজব বেদে : ঐ)

পূর্বেই বলিয়াছি যে তরুণ কবিগণের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে সকল শ্রেণীর ছড়া, বিশেষভাবে ছেলে-ভুলানো ও রাজনৈতিক ছড়া,

সুন্দরভাবে খেলিয়াছে। এখানে তাঁহার একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।—

একা

কেউ কি আছে, দিতে পারে
পুপের সঙ্গে টেক্কা?
বাঘা বলে: 'ঘেউ ঘেউ—
ঠিক বলেছে, নেই কেউ।
সেদিক থেকে একেবারে
আমার মেয়ে একা।

* * *

আষাঢ়ে মেঘ শুয়ে থাকায়
পুপের ভারি আপত্তি।
খোঁচায়, 'কাজে যা তুই',
মেঘেরা করে গাঁইগুঁই।
অবাক হয়ে আমি তাকাই—
সাহস মেয়ের সত্যি!

('বার্ষিক আগামী': ১৩৬৪, পৃ: ২৪)

ছেলে-ভুলানো ছড়ার ভোগবতী ধারায় সৃষ্টিফসলের প্রাচুর্য দেখা যায় নাই এমন কবি বাংলা দেশে আছে কি? উত্তরে বলা যায় যে, সম্ভবতঃ নাই। সেই জন্যই প্রাচীনতম কবি হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণতম কবির পর্যন্ত ছড়া লেখায় সিদ্ধি ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি-সাহিত্যিক সমাজমনের অনুবর্তী। তাই বাংলা বা ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা গিয়াছিল এবং বর্তমানে দেশে রাজনীতির যে প্রাধান্য দেখা দিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বা ব্যঙ্গ করিয়া প্রচুর ছড়া রচিত হইয়াছে। ইহাদেরেই আমরা রাজনৈতিক ছড়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই শ্রেণীর ছড়া রচনায় নবীন ও প্রবীণের সকলেরই ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। সুকুমার রায় অবশ্য সরাসরি রাজনৈতিক ছড়া রচনা না করিলেও তাঁহার 'শিবঠাকুরের দেশে' বা 'পাঁচ আইন' নামক কবিতাগুলিতে রাজনৈতিক

ব্যঙ্গের ঝাঁঝ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবিগণের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায় এই বিষয়ের অবলম্বনে এক কৌতুকমিশ্র পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক আবহাওয়াই তাঁহার ছড়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।

হরপ্রসাদ মিত্রের অন্তর্লোকে লৌকিক ছড়ার প্রভাব স্থায়ী বলিয়াই অনুভব করা যায়। তাঁহার 'ভ্রমণ' নামক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দুই একটি রাজনৈতিক বিষয় লইয়া রচিত ছড়ারও সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে 'খণ্ডকাব্য' নামক ৫ সংখ্যক কবিতাটির উল্লেখ করা যায় ;—

জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান্
শুভবুদ্ধির বৃষ্টি আন্।
বৃষ্টি যে এলো রাজপুতানার প্রান্তরে।
আজমীর ডোবে,
বাংলা ও শোবে।
উৎকল ক্ষোভে ক্ষুব্ধ।
মিত্র-শক্তি টাক্-ডুমাডুম্ জয়যাত্রার গান ধরে।.........

ছড়ার একেবারে লৌকিক রূপটিকে অবলম্বন করিয়া কবি ও চিত্রশিল্পী পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী একটি সুন্দর ছড়া রচনা করিয়াছেন ;—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাল ঘাগর মৃদঙ্গ বাজে।
বাজতে বাজতে খরতাল।
কোলকাতা জুড়ে হরতাল।
হরতালে হরতালে উত্তাল ছন্দ,
ট্রামে চাকা বন্ধ
ট্রামে চাকা বন্ধ।......

(একালের ছড়া : 'আগামী'—১৩৬০, পৌষ)

যদিও ইহার মধ্যে রাজনৈতিক গন্ধ কিছু উগ্র, তথাপি ইহার লৌকিক প্রবণতা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক কালের কৃত্রিমতার মধ্যেও

যে বাঙ্গালীর প্রাণসত্তাটুকু হারায় নাই, তাহা কবি শুদ্ধসত্ব বসুর ছড়াগুলির মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

কলাবতী রাজকন্যে আজ গ্রামে এসেছে,
প্রাসাদ ছেড়ে ছোট্ট কুঁড়ে ভালবেসেছে!
কে এসেছে, কে এসেছে, কে এসেছে, সই?
'গাঁয়ের মেয়ে কলাবতী, রাজকন্যে নই;......
'এ-যে বড় আজব দেশ ভাব করতে আড়ি?
সত্যি, তুমি ধরেছো ঠিক, বুদ্ধি বলিহারী।......
মরদ আছে মানুষ যে নেই এমন কাণ্ড ঘটে,
পুজো তো' নেই মচ্ছো যা ভক্তিটুকু রটে।......ইত্যাদি।
('ধান ভানতে শিবের গীত')

রাজনৈতিক ছড়া রচনায় কিছুটা উগ্র হইলেও তরুণদিগের মধ্যে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় কিছুটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন। ইনি মা-ঠাকুমার মুখের পরিচিত ছড়ার মধ্যে তাঁহার যুগের উচ্চারিত কথাটিকে সুবিধামত চোলাই করিয়া দিতে পারিয়াছেন। তাঁহার 'বর্গী এলো দেশে' কাব্যপুস্তকটির অনেকগুলি ছড়াতেই তিনি চিরদিনের ছড়ার ধারাটিকে সচেতনভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। যেমন ঐ পুস্তকের 'তাই তাই' ছড়াটি—

তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই,
মামার বাড়ি এলাম দেখে
খুদ কুঁড়াটি নাই।
মামী আছেন উপোষ করে
সারা দুপুরটাই।
মামা-মণি বেকার এখন
চাকরি গেছে তাই,
চোখটি বুঁজে পালিয়ে এসে
হাফ্ ছেড়েছি ভাই।
তাই তাই তাই।......

রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছড়া লেখায় সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রসূণ বসু, মিহির সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কবির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শঙ্খ ঘোষের একটি বিখ্যাত ছড়ার উল্লেখ করিয়া এই বিভাগের আলোচনা শেষ করিব। শঙ্খ ঘোষের ছড়াটি প্রথমে 'পরিচয়ে'র ১৩৫৮ পৌষের সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। পরে কিছু পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হয়।

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে,
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী—
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।......
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।......ইত্যাদি।

এটম্ বোমা, স্পুটনিক প্রভৃতি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার লইয়াও নানা সাহিত্যিক ছড়া রচিত হইয়াছে। 'স্পুটনিক'-কে অবলম্বন করিয়া রচিত একটি ছড়ার উল্লেখ এখানে করিয়া সাহিত্যিক ছড়ার অধ্যায়টির আলোচনা শেষ করিব।

ছোট্ট মামা,
মস্কো থেকে নক্সা করা খামে খবর পাই,
চাঁদা মামার হয়েছে এক ছোট্ট নোতুন ভাই।
ছোট্ট মামা দিচ্ছে হামা নীল আকাশের গায়,
কেউ বা দিল উলুধ্বনি কেউ করে হায় হায়।
ফ্যালা, এলো, রুনু, ঝুনু আহ্লাদে আটখান,
টিপ দিয়ে যাও ছোট্ট মামা ঘুমপাড়ানি গান॥

—তুষার চট্টোপাধ্যায়

অথবা

পকেট ভরে রকেট পুরে লাফদি যদি শূন্যে,
হাত দিয়ে চাঁদ ধরতে পারি পক্ষীরাজের পুণ্যে।
মেঘ দাবড়াই, মেঘ দাবড়াই শূন্যে রাখি পা,
হাওয়ার মুখে লাগাম দিলে পক্ষীরাজের ছা।
পুণ্যিপুকুর দুধের সরা
সুয্যিচাঁদে আকাশ ভরা
এপার আকাশ ওপার আকাশ মধ্যিখানে হাওয়া
পকেট ভরে রকেট পুরে শূন্যে আসা যাওয়া।—ঐ

বাংলা সাহিত্য যেমন নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া এক নবীন যুগ-ক্রান্তির দিকে যাত্রা করিয়াছে ; ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাহিত্যেরই এই বিশেষ শাখাটি লৌকিক ঐতিহ্য-রসপুষ্ট হইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। আমরা এইখানে নাতিবিস্তৃত আলোচনার মধ্যে বহু কবির কৃতিত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা ছাড়াও আরও বহু খ্যাতিমান ও সার্থকতর কবি—অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, অশোক বিজয় রাহা, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় দাস, কৃষ্ণ ধর, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, রাম বসু, ভাস্কর বসু, অসীম রায়, চিত্ত ঘোষ, সন্তোষ অধিকারী, সিদ্ধেশ্বর সেন, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, আনন্দ বাগচি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমল সেনগুপ্ত, পলাশ মিত্র, প্রণব মুখোপাধ্যায়, সনৎ মিত্র, জয়শ্রী চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হয়ত ইঁহাদের অনেকের রচনায় যথাযথ অর্থে সর্বদা ছড়ার সূক্ষ্মতর ও লৌকিক বৈশিষ্ট্যটি অনুসন্ধান করা কঠিন ; তথাপি সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, আধুনিকতম কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা কাব্যের প্রবহমান ধারায় লৌকিক ছড়ার প্রভাব সততই সক্রিয় রহিয়াছে।

———

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—(ক)

'খুকুমণির ছড়া'র ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে, বোধ করি, একটা নূতন উদ্যম। ইহার একটা ভূমিকা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় যখন আমাকে এই ভূমিকা লিখিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন আহ্লাদের ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি এই ভার গ্রহণ করি। আহ্লাদের কারণ, আমি এইরূপ ছড়া সংগ্রহের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। কৃতজ্ঞতার কারণ, প্রকাশক মহাশয় সেই অভাব এত সত্বর পূর্ণ করিতেছেন। ইংরাজীতে বালকজনের চিত্তাকর্ষক বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থ রাশি রাশি বর্তমান আছে। বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এজন্য তিনি বঙ্গের বালক-বালিকাগণের ও তাহাদের পিতামাতাদিগের সর্বথা কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রকাশিত শিশু-পাঠ্য-পুস্তকগুলি সুরঞ্জিত ছবি ও কৌতুকময় উপাখ্যানাদি সমাবেশে শিশুজনের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান কার্যে তিনি একটু অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন; সেই কারণে তিনি বিশেষতঃ প্রশংসার্হ।

কথাটা একটু খুলিয়া না বলিলে ছড়া-সংগ্রহের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় অলংকৃত পরম শ্রদ্ধাস্পদ্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতা সংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি-ছড়া' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; ঐ প্রবন্ধে যে ভাবুকতা, সরসতা ও চিন্তাশীলতার সহিত এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষে অনুকরণের অতীত। ঐ প্রবন্ধটিকেই বর্তমান

পুস্তকের ভুমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিলে, আমার নীরস ওকালতি হইতে পাঠকগণ নিস্তার পাইতেন।

রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধ পাঠেই নিরস্ত ছিলেন না; তিনি স্বয়ং সংগ্রহ কার্যেও নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কি কারণে জানি না, কাজটা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়।

সম্ভবতঃ পরিষৎ-পত্রিকার পাঠক সম্প্রদায় অথবা পরিষদের পরিচালকগণ ছেলে-ভুলান ছড়ার সংগ্রহ তাঁহাদের মত প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রবীণজনোচিত গাম্ভীর্যে আর আঘাত লাগে নাই, ভাল কথা; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যে আমার বিবেচনায় একটা প্রকাণ্ড অভাব বর্তমান রহিয়াছিল। বর্তমান সংগ্রহের প্রকাশক এ পর্যন্ত প্রবীণ সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য কোন পরিশ্রম করেন নাই। বালক-সম্প্রদায়ের জন্যই তাঁহার পরিশ্রম এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; ইহা আমি একটা সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করি; এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রবীণ বন্ধুগণের নীরব বিদ্রূপময় কটাক্ষপাত সহ্য করিয়াও তিনি যে এই 'ছেলেমি' কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার সাহসের প্রশংসা করি। তাঁহার বতমান উদ্যম বালক বালিকাগণের পরিতোষের জন্য সীমাবদ্ধ হইলেও ইহার ফল দূরতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে বলিয়া আমি বস্তুতই বিশ্বাস করি; এবং তজ্জন্য এই ভূমিকার বাগাড়ম্বরে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি না।

যাহাতে কোনো আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু শিশুজনপ্রিয় সাহিত্যের ভিতর হইতে সেরূপ কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিষ্কাশনে আমি একান্ত অক্ষম। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথা বলিয়া রাখিতে পারি যে, এই সাহিত্যে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত না থাকিলেও, হয়ত দুই একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব, দুই একটা সামাজিক তত্ত্ব সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকিতে না পারে, এমন নহে। ভূতত্ত্ববিদেরা একখানা দাঁত বা একখানা হাড় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নূতন পরিচ্ছেদ উদ্ঘাটিত করিয়া

ফেলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতের কোন গ্রিম্ বা মোক্ষমূলার এই বাঙ্গালীর ছেলের ছেলেমি ভাণ্ডারের মধ্য হইতে দুই একটা নাম বা শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের কোন বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন কি না, জানি না। 'দামোদর ছুতোর', 'শ্যামঠাকুর', 'শিবুসদাগর', 'কংশ রাজা' ও 'হড়ম বিবি', কোন্ অতীত কালের বিস্মৃতপ্রায় ইতিবৃত্তের অপরিচিত স্মৃতিচিহ্ন মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে ; তাহা আমরা এখন কল্পনায় আনিতে পারি না। কল্পনায় আনিতে পারি না ; কিন্তু এই সকল লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে ও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপরই রহিয়াছে। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে আমরা ভবিষ্যতের নিকট মার্জনার অধিকারী হইব না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই। এবং আমার বিশ্বাস, এই বিরাগের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব। ইতিহাস মনুষ্য জীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে ; বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে ; সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। ইতিহাসে বিরাগের নাম বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্য ঘটনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গ্রহণের জন্য যতটা লোলুপ ও সত্যের আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্, সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আসক্তি নাই। সত্যকে আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহি না ; আমাদের বিশ্বাস আমাদের বিনা প্রযত্নে, বিনা উদ্যমে, প্রকৃতিদেবী সত্য-সমষ্টি দ্বারা আপনার যে দেব-দেহ নির্মিত করিয়াছেন, সেই দেহের জ্যোতিঃ আমাদের চোখের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়া দেখাইবেন এবং সেই পরা জ্যোতিঃর আনন্দ উপভোগে আমাদিগকে সমর্থ করিবেন।

কোন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই অবজ্ঞাত ছড়া-সাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অন্যবিধ সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্যজীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব-

জীবনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।

প্রকৃতির বজ্রশাসনে নিয়মিত হইয়া আমাদের মত বয়স্ক মানুষ স্বয়ং সংযত হয় ও প্রকৃতিকে সংযত মূর্তিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে সর্বত্র আমরা নিয়মের ও শৃঙ্খলার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। সেই নিয়মের বন্ধনে আমরা আপন জীবনকে আবদ্ধ দেখি ও সেই নিয়মের শাসনে আমরা চলিয়া থাকি। সে সকল ঘটনা নিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা নির্দিষ্ট স্থান দেখা যায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এক একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধের বন্ধন দেখা যায়। এই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত ও পরস্পর নির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ প্রাকৃতিক ঘটনার সমবায় ও পরস্পরা লইয়া প্রকৃতির এই শরীর; এই শরীরের কিয়দংশ ব্যাপিয়া আমাদের কারবার; আমাদের কারবার যে পরিমাণে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করে, জীবনযাত্রায় আমাদের সাফল্যও সেই পরিমাণে ঘটে। কিন্তু এমন অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনাও সচরাচর আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, প্রকৃতি-শরীরে যাহার ঠিক স্থান আমরা সহসা নির্দেশ করিতে পারি না বা অন্যান্য পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত যাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি না। এক সম্প্রদায়ের লোকে এইরূপ ঘটনাকে 'অতি প্রাকৃত' বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু এইরূপ আপাততঃ অতি প্রাকৃতিক অসাধারণ ঘটনার সংখ্যা যতই অধিক হয়, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ততই নষ্ট হয়; এবং এই শৃঙ্খলা হইতে প্রকৃতির যে সৌন্দর্যের উৎপত্তি, সেই সৌন্দর্যও ততই বিকৃত হয়। বস্তুতঃ স্বনিয়তঃ মনুষ্যবুদ্ধির নিকট শৃঙ্খলাতেই সৌন্দর্য, বিশৃঙ্খলাই কুৎসিত; যাহা প্রাকৃত, তাহা সুন্দর, যাহা অতিপ্রাকৃত, তাহা প্রকৃতির মহাকাব্যে কেবল ছন্দোভঙ্গ ও যতিভঙ্গ করিয়া রসাস্বাদনে ব্যাঘাত জন্মায়।

বয়স্ক ও পূর্ণতা প্রাপ্ত মনুষ্যের পক্ষে এই এক কথা; কিন্তু শিশুর পক্ষে সমস্তই ইহার বিপরীত। প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্মিত হইয়া মানব-শিশু সদ্য সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একেবারে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। তাহার স্বাধীন মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্তিও সম্পূর্ণভাবে

বিশৃঙ্খল ও সংযম-রহিত। তাহার নিকট জগতের খানিকটা প্রাকৃত, খানিকটা অতিপ্রাকৃত নহে, সমস্তটাই অতিপ্রাকৃত ; অথবা বয়স্ক লোকে যাহাকে অতি প্রাকৃত বলিতে চায় ও যাহার অস্তিত্বে শঙ্কিত বা চিন্তিত বা হতবুদ্ধি হয়, যাহাকে প্রাকৃতের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য আপনার বুদ্ধিশক্তিকে বিনিয়োগ করে, তাহাই তাহার নিকট একমাত্র প্রাকৃত। শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বন্ধনের ও নিয়মের ও শৃঙ্খলার এই সম্পূর্ণ অভাবে তাহার কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ বা দ্বিধাবোধ হয় না। এই শৃঙ্খলাহীন, নিয়মহীন, বিপর্যস্ত জগতের মধ্যে সে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। প্রকৃতির কাব্যে একটু ছন্দঃপাত দেখিলেই আমাদের মত বয়স্কের কাণে ও প্রবীণের কাণে কেমন কেমন ঠেকে ; কিন্তু শিশুর নিকট সেই কাব্যখানা আদ্যোপান্ত ছন্দোহীন। উহাতে কোনরূপ মিলের বিচার নাই, কোনরূপ বিরামের নিয়ম নাই। সঙ্গীতটার আগাগোড়াই বেসুরো ও বেতালা। অথচ এই ছন্দের ও মিলের অভাব, এই সুরের ও তালের সম্পূর্ণ অসদ্ভাবই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও পরিতোষ উৎপাদনে সমর্থ। ছন্দের অস্তিত্ব ও তালের অস্তিত্বই হয়ত তাহার অসংযত মুক্ত স্বাধীনতাকে ব্যাঘাত দিয়া তাহার আনন্দের তীব্রতম হানি জন্মায়।

আমার প্রবীণ বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বকথার জন্য লালায়িত, তাঁহারা ছেলে-ভুলান ছড়ার মধ্যে এইরূপ একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর পাইবেন ; একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মীমাংসা দ্বারা তাঁহাদের বিজ্ঞতার পরিমাপে তাঁহারা অবকাশ পাইবেন। কোন্ পথে মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের আলোচনায় আমি এ স্থলে প্রবৃত্ত হইব না। আমার সে ক্ষমতাও নাই এবং বর্তমান ক্ষুদ্র পুস্তকের দুর্বল মেরুদণ্ড তদ্বিধ তত্ত্বালোচনার ভার বহনেও সর্বথা অক্ষম। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে এইমাত্র বলিয়া রাখিতে পারি, এই শিশুজনসুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধিসহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধের মধ্যেও এই শৈশবোচিত প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। বিভিন্ন জাতির উপাসনাপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই শৈশবোচিত প্রবৃত্তির ভূরি পরিমাণ পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইবে। আমরা যে সকল জাতিকে অসভ্য বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাদের সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানটাই এইরূপ অনিয়ত, বন্ধনশূন্য অতিপ্রাকৃতে নির্ভর ও বিশ্বাস মাত্র,

ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না, আমাদের মধ্যে ও পৃথিবীর সভ্যতম জাতির মধ্যেও বোধ করি, পনের আনার অধিক লোক এই অতিপ্রাকৃতের মরীচিকার প্রতি সুপেয় বারিভ্রমে ধাবিত রহিয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের বিপর্যয় দেখিয়া যাঁহাদের বুদ্ধি মর্মাহত ও অপমানিত হয় না, অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে যাঁহাদের জগত-প্রণালীর প্রতি ভক্তির সঞ্চার ও প্রেমের সঞ্চার হয় না—প্রত্যুত এই অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব এই ছন্দের ও সুরের অভাবই যাঁহাদের উল্লাসের ও আনন্দের উৎপাদক, তাঁহাদের সংখ্যা ও প্রভাব পৃথিবীর মধ্যে এখনও সামান্য নহে। ইহাকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বলিয়া নির্দেশ করিব, তাহার বিচারে আমি সর্বথা অসমর্থ।

আর একটা কথা আছে। বয়স্ক মানবের চরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ। প্রাকৃতিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা দেশভেদে ও কালভেদে মানব চরিত্রের স্বাভাবিক কাঠামটাকে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া তাহার উপর পালিশ দিয়া রঙ্ ফলাইয়া বিভিন্ন মূর্তি প্রদান করে; কিন্তু শিশুচরিত্র বোধকরি সর্বদেশেই ও সর্বকালেই একরূপ। বয়স্ক বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বহিতে একেবারেই অসমর্থ; কিন্তু মানব-শিশু যখন সূতিকাগার হইতে প্রথম বাহির হইয়া সংসারের সহিত পরিচয় আরম্ভ করে, তখন শাদা চামড়া ও কাল চামড়া উভয়েরই অভ্যন্তরে ঠিক একজাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রবৃত্তি বর্তমান থাকে। যাঁহাদের অবকাশ আছে, তাঁহারা বাঙ্গালীর ছেলের 'ছড়া' ও ইংরেজের ছেলের 'নার্শারি গান' মিলাইয়া দেখিবেন, উভয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত রকমের সৌসাদৃশ্য বর্তমান। এই সৌসাদৃশ্য সর্বত্র বুঝাইবার জন্য উভয় শিশুর পূর্ব-পিতামহের কাস্পীয়-সাগর-তটে বাস কল্পনা না করিলেও চলিতে পারে; কেন না, এই সৌসাদৃশ্য আর্যভূমির সম্পূর্ণ বাহিরে ষোল আনা অনার্য শিশুর শৈশবলীলা অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে। কেবল শিশু-প্রকৃতি কেন, বয়স্ক মনুষ্যের প্রকৃতিতেও যে অংশটুকু মানব জাতির সাধারণ, তাহারও পরিচয় এই বিভিন্ন দেশের ছড়া-সাহিত্যে সুস্পষ্ট পাওয়া যাইবে। স্নেহ-বিবশা জননী যখন গৃহ-কোণের অন্ধকার মধ্যে, লোক-নয়নের অন্তরালে অস্ফুট-বাক্ অস্ফুট-বুদ্ধি অপত্যের মুখের পানে চাহিয়া আপনার আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন তাহার বাক্যভঙ্গি কার্যভঙ্গি কোন কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার বা প্রণালীর কোন ধার ধারিতে চাহে না। তখন স্বাভাবিক মানব

চরিত্র কৃত্রিমতার পর্দার অন্তরাল সরাইয়া ফেলিয়া আপনার নগ্ন মূর্তি আবিষ্কার করে; সেই মূর্তি বোধকরি 'চীন হইতে পেরু' পর্যন্ত সকল দেশের মধ্যেই এক।

বাঙ্গালী শিশুর ও বাঙ্গালী জননীর স্বাভাবিক চরিত্রে অসাধারণত্ব কিছু না থাকুক, কিন্তু সেই জননীর ও তাঁহার অন্যান্য প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সামাজিক চরিত্রে বঙ্গদেশে ও বঙ্গসমাজে বাসনিবন্ধন যে অনন্যসাধারণত্ব, যে বৈশিষ্ট্য আছে, এই ছড়া-সাহিত্যে তাহারও পরিচয় না পাওয়া যাইবে, এমন নহে। বস্তুতঃ এই সকল ক্ষুদ্র মাহাত্ম্যহীন অর্থহীন অসংলগ্ন কবিতার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে এক এক স্থানে গৃহস্থ বাঙ্গালীর গৃহের সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই বটে, অথবা লক্ষ্মণ-সেনের সময় হইতে বাঙ্গালীর যে রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে, তাহাতে গৌরবের সামগ্রী কিছুই নাই বটে, তথাপি সেই লক্ষ্মণসেনের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের যে ধারাবাহিক স্রোত বহিয়া আসিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে অংশের কাহিনী প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে, তাহা মাধুর্যে ও কারুণ্যে ও কোমল শান্তরসের আতিশয্যে পৃথিবীতে হয় ত অতুল্য। বাঙ্গালী জীবনের সে অংশে কোন উৎকট দীপ্তি, কোন তীব্র জ্বালা, কোন গৌরবময় মহিমা নাই বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য অন্যান্য বিশেষণেরও প্রয়োজন! মমতা ও করুণা, ভক্তি ও প্রীতি, বাৎসল্য ও পবিত্রতা যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয়, তবে বাঙ্গালীর জীবন জগৎ-সংসারে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা না করা যাইতে পারে। পরলোকগত স্যার মনিয়ার্ উইলিয়ামস্ কিছুদিন হইল হিন্দু-জাতির 'হোম' নাই বলিয়া করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশাল হিন্দু-জাতির কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে 'হোমে'র মধ্যে আশৈশব লালিত হইয়া আসিয়াছি—পিতামাতা, ভাইভগিনী, বৃদ্ধা দিদিমা ও অতিবৃদ্ধ দাদা মহাশয় যে 'হোমে'র মধ্যে বাস করিয়া পরস্পর স্নেহ ও প্রীতির বিনিময় করিয়া আসিতেছেন, 'মাসী পিসি বনগাঁ-বাসী' এমন কি, যাহাদের 'বনের মধ্যে ঘর' তাহাদেরও যে 'হোমে'র মধ্যে স্থান নির্দিষ্ট আছে, মুষ্টি-ভিক্ষাজীবী অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিও মুহূর্তের জন্য যে 'হোমে' আপনার বিহিত স্থান অধিকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না এবং গৃহমার্জার, গৃহগোধিকা ও

বাস্তুসাপ পর্যন্ত যে 'হোমে'র মধ্যে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বিশাল 'হোমে'র সহিত অনুদার অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রাচীর বেষ্টিত বিলাতী 'হোমে'র তুলনা করিয়া বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের অবমাননা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রার্থনা যে, বঙ্গভূমিতে এইরূপ 'হোমে'র প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হউক।

বাঙ্গালী জাতির সমগ্র সাহিত্যটাতেই বাঙ্গালীর সেই গৃহের বিবিধ চিত্র নানা রঙে চিত্রিত হইয়াছে এবং স্বভাবের তুলিকা যেন সেই রঙ্ ফলাইবার জন্য কোন কৃত্রিম উপকরণের সাহায্য লয় নাই; স্বভাবের ভাণ্ডার হইতেই সেই রঙ্গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি আধুনিক যুগের কৃত্রিম শিক্ষার প্রভাবে নির্মিত সাহিত্যের কথা বলিতেছি না; বাঙ্গালীর অকৃত্রিম প্রাচীন নিজস্ব সাহিত্যের কথা বলিতেছি; এবং এই অকৃত্রিমতার হিসাবে বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিশু-সাহিত্য বা ছড়া-সাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্বতোভাবে অতুলনীয়। যাঁহারা উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে একবার প্রবেশ করিলেই উদাহরণের বহুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আমি আর সে পরিশ্রমটুকু গ্রহণ করিলাম না।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলিব। এই পুস্তকের সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা আড়াই শতকেরও কম। পাঠককে অনুরোধ করি, তন্মধ্যে কয়টির মধ্যে 'বৌ' নামক অবগুণ্ঠনান্তরালস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থের প্রসঙ্গ আছে, একবার গণিয়া দেখিবেন; এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালী গৃহস্থ মহাশয় যখন দন্তহীন অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে দোদুল্যমান থাকিয়া 'আধ আধ' বাণী ও 'খল খল' হাস্যের ছটায় জননীর আঁধার মানসাকাশে থাকিয়া থাকিয়া তড়িল্লতার বিকাশ করেন, তখন মাতৃদেবী ভবিষ্যৎকালে তাঁহার গৃহের জ্যোতিঃ-স্বরূপা কিন্তু তদানীং মাতৃকুক্ষীতে অলব্ধপ্রবেশা অপ্রাপ্তজীবিত বধূটির 'সোনা হেন রংটি' ও 'ঠোঁটে আল্তা গোলার ঢেউ' কল্পনা করিয়াও সেই মনঃকল্পিতরূপা বধূর হস্তে তাঁহার 'কাল সোনা'কে 'তিনটে ঠোনা' খাওয়াইয়া কিরূপ আনন্দলাভ করেন, তাহার অনুভবে একবার চেষ্টা করিবেন। আমার বাল্যবিবাহ-বিরোধী বন্ধুগণকে 'খুকুমণির ছড়া'র এই অংশগুলি সযত্নে পরিহার করিতে অনুরোধ করি, কিন্তু আমার যে সকল প্রবীণ বন্ধু সাহিত্য-মধ্যে তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য লালায়িত, তাঁহারা মানব-চরিত্রের বা মানবী-চরিত্রের এই

অদ্ভুত বিকাশে একটা উৎকট তত্ত্ব নির্ণয়ের অবকাশ পাইবেন, ভরসা করি।

যাহা হউক, এই শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধু-সম্প্রদায়, 'খুকুমণির ছড়া'র মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-সংগ্রহে বা আনন্দ-সংগ্রহে সমর্থ হউন বা না হউন, আশা করি, যাহাদের জীবন অদ্যাপি জগতের কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্ফূর্তিহীন হইতে পায় নাই, যাহাদের নিকট বিশ্ব-সংসারে সকলই নূতন, সকলই কৌতুকময়, সকলই সত্য, সকলই স্বাভাবিক, সকলই উন্মুক্ত বিশৃঙ্খলতার কলরবে ও উল্লাসে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের আনন্দের মাত্রা সম্বর্ধনে এই গ্রন্থ কৃতকার্য হইয়া প্রকাশকের শ্রম সফল করিবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার তুলনায় ভূমিকার দীর্ঘ আয়তন ও অসঙ্গত আড়ম্বর হয়ত পাঠক-পাঠিকার অরুচি উদ্রেক করিবে। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার যেরূপ সংস্কার আছে, তৎকর্তৃক প্ররোচিত হইয়া আমি তাঁহাদের মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি। যে পাঠক-সম্প্রদায়ের কোমল করে এই সুরঞ্জিত উপহার প্রকাশক মহাশয় কর্তৃক অর্পিত হইবে, আমি ঠিক তাহাদিগের জন্য এই ভূমিকা লিখি নাই। আশা করি, বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর অনাদৃত, অবজ্ঞাত গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গের সুধীসমাজ কর্তৃক যথোচিতভাবে আরব্ধ হইবে।

কলিকাতা।
৮ই আষাঢ়, ১৩০৬ } **শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী**

পরিশিষ্ট—(খ)

সংযোজন

কাছাড় জিলা হইতে সংগৃহীত কয়েকটি ছড়া

১

এক ঘর রে এক ঘর
দুই ঘর বানাইল কুনে
লখমি আইলা চাইরো কুনে।
আইলা লখমি গেলা কই ?
লখমি গেলা লাগাইপুর
কিন্যা আন্‌লা চাম্পাফুল,
চাম্পাফুল না মত্তবান
হাসু হাসু করে ধান।
অ মিয়া সদাগর !
সোনার টুপি মাথায় ধর !
সোনার টুপি লোহার খিল
যার ঘরত আছে ধান বিচ,
ধান বিচ্‌ না দিতে পারে
চাল কড়ি দিয়া বিদায় করে।—কাছাড়

২

ওরে ভাই মটমটি,
তর বউ কটমটি।
আমরায় বায় চাইল
আমরারে বুঝি খাইল।
অ বৌ রাগ কেনে
এমতে এমতে চাও কেনে।

খর কেনে ডাক না
ভাত কেনে মাখ না
আমরা আইছি আইজ
খাইলু কলার মাইজ।
অ বৌ রাগ কেনে
এমনে এমতে চাও কেনে। —ঐ

৩

দাসদাসী একশত
ধান আনি উগার ভর
পণ পণ ধান
ঘর তুই না মান।
উগার থাকি বাইয়া পড়ে
লক্ষ্মী ত না লড়ে।
ওগ তুমি গিরস্বামী
ঘর থাকি আও লামি!
আমরা আইছি দেশের ভাই
ধান দেও ফিরি ঘর যাই। —ঐ

৪

আইলাম রে আইলাম রে আইলাম রে
গৃহস্থের বাড়ী।
আগপাশ কলার ছড়ি।
কলার ছড়ি কাটিয়া
হাথির উপর বসাইয়া
হাথি উপর গোংগা নাচে
আমায় দেখি পরী নাচে।
ও পরী দূর যা
নিমগাছে বইয়া খা
নিমগাছ মুড়াইমু
শকুড়ি রাথাল উজাইমু। —ঐ

৫

বাঘুয়া রে বাঘুয়া
শীত পড়ল মাঘুয়া
কাঁথায় জান বাঁচায় না
শীতও বুঝি লড়ে না।
ও বুড়ি কাথার মা
আমার বায়দি ফিরি চা
তোর শীত লাগে না
ইবার থোড়া শীত খা।
সারা দিন গরু চরাই
বাকী সময় ধান মরাই
শীতে মরি কাঁপিয়া
ধান এক পণ দে মাপিয়া।

৬

মেঘা মেঘা, মুই তোর ভাই,
এক ফুটা পানি দেরে
আউসর ভাত খাই।
কালা মেঘা ধলা মেঘা
মুই তোর ভাই,
এক ফুটা পানি দেস তে
সাইলর ভাত খাই।
কালা মেঘা ধলী মেঘা
মুই তোর ভাই,
এক ফুটা পানি দেস তে
আমানর ভাত খাই। —ঐ

চাইর দিকে চাইর খাল কাটিয়া
বিছরা কইরালাম সারা,

তার মধ্যে রুইয়া দিলাম
কুইয়ারর চেরা।
ফুড় দিলাম মাটি দিলাম
আর দিলাম খইল।
চাইর দিনে কুইয়ার খিত্তা
গলা উঁচা হইল।
সারর মা সুরর মা
তারা আইলা দেইখতা
শেখ পরীর নাচ দেখি
তারা কইল খাইতা। —ঐ

৮

উচ্চা ঠিকরো বইছে টিয়া
সোনার টুপী মাথাত দিয়া।
কালা বোয়ে ভাত আনে,
ন-বেয়ে ধান বানে।
টিয়ায় কয় খাইত নায়
পুতে কান্দে ধরে মায়।
আমিও না তুমিও না
টিয়ারে ভাত দিও না। —ঐ

৯

বন বাদাড় বাংগি
আইলাম তোমার বাড়ি।
গাত করে বেদনা
চাউল কেনে দেয় না।
ঘর ভরতি আছে ধান
পেট ভরিয়া ভাত খান।
আমরা হইলাম গরীব লুক
আপনার কাছে বড় সুখ।

কিছু ধান দেইন গ!
আমরার পেট ভরাই গ!
জয় হৌক জয়!
ধান দিয়াছ বাঁচি থাক বহু দিনময় —ঐ

১০

আম্বা আম্বা আম্বা আম্বা
বাছুর ডাকে আপন মারে।
ডাক শুনি মা আইল।
বাছুরে মার গা লেইল।
আম্বা আম্বা করে পুতে
দুধ খাবাইয়া মায়ে হুতে।
চড়ারে চড়া বেইল পড়া
গাইরে থইয়া গফ্ করে ফইয়া —ঐ

মুদ্রিত প্রথম বাংলা ছড়া

এই গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন কর্তৃক সংগৃহীত 'দুগ্ধ মিঠা, চিনি মিঠা, আরো মিঠা ননী' ইত্যাদি ছড়াটিই বাংলা ছড়ার প্রাচীনতম সংগ্রহ। কিন্তু ১২৭১ সাল বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিক্রম নাটকে' নিম্নলিখিত ছড়াটি উদ্ধৃত হইয়াছিল—

নিম তিতো কল্লা (করলা) তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তা হতে অধিক তিতো দু সতীনের ঘর॥

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত পাঠটি এই প্রকার,

নিম তিতো নিসিন্দা তিতো তিতো মাকাল ফল।
তা হ'তে অধিক তিতো, কন্যে, বোন সতীনের ঘর॥

সুতরাং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত ছড়াটিই বাংলা মৌখিক ছড়ার প্রাচীনতম সংগ্রহ বলিয়া মনে হয়।

পরিশিষ্ট—(গ)

শব্দ-সূচী

খ

জ

ঝ

ট

ঠ

ন

ফ

ব

ভ

য

আমার কথাটি ফুরালো।
নটে গাছটি মুড়াল
নটে গাছ নটে কেঁন মুড়ালি
আমায় যে গরু খায়
গরু গরু কেন খাউ
রাখাল যে চরায়নি
রাখাল কেন চরাওনি
বৌ যে ভাত দেয়নি
বৌ বৌ কেন ভাত দাওনি
কলাগাছে যে পাতা হয়নি
কলাপাতা কলাপাতা কেন হওনি
জল যে হয়নি
জল জল কেন হওনি
ব্যাঙ যে ডাকে নি
ব্যাঙ ব্যাঙ কেন ডাকোনি
সাপে যে খায়
সাপ সাপ কেন খাও
আপন খাবার আপনি খাব
লেজ নেড়ে চলে' যাব।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি., প্রণীত

বাংলার লোক-সাহিত্য

তৃতীয় খণ্ড ঃ গীতি

ভূমিকা

লোক-গীতির বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ, লোক-সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলার লোক-সঙ্গীতে জীবন ও অধ্যাত্মচেতনা

প্রথম অধ্যায়

পটুয়াসঙ্গীত, ভাদু, তুষু, ঝুমুর, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, জাগ গান, মাণিক পীরের জাগ, সোনা পীরের জাগ, নিমাইর জাগ, হাপু গান, আলকাপ, জারি, সারি, ঘাটু গান, ঘাটু নৃত্য, ঘাটু গানে রাধাকৃষ্ণ বিষয়, হিন্দী মিশ্র ঘাটু গান, তেলেনা গান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবহারিক

বিবাহের গান—জলভরা, পাশাখেলা, বাসর-সঙ্গীত, মুসলমান সমাজের বাসর-সঙ্গীত, কন্যাবিদায়, উপনয়নের গান।

তৃতীয় অধ্যায়

আনুষ্ঠানিক

সংজ্ঞা। গাজনের গান, নীলপূজার গান, ভাঁজো, উমা-সঙ্গীত, ভাই ফোঁটার গান, কার্তিক ব্রতের গান, পৌষ পার্বণের গান, ঘেঁটু পূজার গান, বিবিধ অনুষ্ঠানের গান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেম-সঙ্গীত

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম সঙ্গীত

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম সঙ্গীত

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক সঙ্গীতে লোক-সঙ্গীতের প্রভাব

পরিশিষ্ট—

ক্যালকাটা বুক হাউস, : ১।১, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের

সাহিত্য-প্রতিভার আর এক বিস্ময়কর পরিচয়

বনতুলসী

অনবদ্য ছোটগল্প সংগ্রহ—দাম ৪·০০

" 'বনতুলসী'র নামকরণের মধ্যে দিয়ে যে ব্যঞ্জনা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনই ভাবেই তিনি চৌদ্দটি অনবদ্য গল্পে সরল সহজ জীবনের মানবীয় ভাবগুলির রস-মূর্তি নির্মাণ করেছেন। বাইরে যদিও কয়লার কালি, হৃদয়ে কতো সৌন্দর্য, মনে কী অতুল ঐশ্বর্য। 'বনতুলসী' গল্পে ময়ুরার মাধ্যমে অপূর্ব বাৎসল্যরস সঞ্চারিত হয়েছে। 'ঝরা পালকে' সার্কাস জীবনের পট-ভূমিতে ছু'টি দগ্ধ মনের প্রেমের ঔজ্জ্বল্য বিস্ময়-রসের সৃষ্টি ক'রেছে। ব্রাত্যদের যেমন তিনি সহজেই গ্রহণ করেছেন, তেমনি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের চরিত্রাঙ্কনে শ্রীভট্টাচার্য গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলিয়ারি অঞ্চল, পদ্মা, বাংলার বাইরের পরিবেশ ঘটনানুগ। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য শুধু শুষ্ক গবেষক নন, একজন জীবন রস-রসিক স্রষ্টা একথা বলা অবশ্য কর্তব্য।" দেশ, ৬।১।৬২

'এতদিন পর্যন্ত আমরা তাঁকে পণ্ডিত গবেষক বলেই জানতাম, কিন্তু তাঁর ভেতর যে একটি সৌন্দর্যভুক্ মনের অস্তিত্ব বর্তমান, তার সন্ধান মিলবে এখানে।'······লেখকের শক্তি এবং জীবনবোধ এখানে যথার্থ অর্থে-ই স্পর্শগ্রাহী।' যুগান্তর, ১৭।১২।৬১

'গল্প বলার একটি সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি শুরুতেই পাঠক মন আকৃষ্ট করে।··· নানা ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও মানুষের মন যে আসলে স্নেহমমতা ভালবাসার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে 'বনতুলসী'র কয়েকটি গল্পেই এই সহজ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত।'

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮।১।৬২

'প্রতিটি গল্পের মধ্যে এক আশ্চর্য চমক আছে। লিপি-চতুর্যে এবং কল্পনার বলিষ্ঠতায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট সংযোজন এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।' অমৃত, ১৫।১২।৬১

'লেখকের হৃদ্য আন্তরিকতার স্পর্শে গল্পগুলি মধুর ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। প্রায় সব গল্পগুলিরই পাত্র-পাত্রী অতি সাধারণ মানুষ, তথাকথিত বিদগ্ধতার কোন খোলসই নেই তাদের অঙ্গে, কোনরূপ "ইজমে'ও ভারাক্রান্ত নয় তাদের জগৎ, তবু শুধু মাত্র সহজ সাধারণ মানুষের একান্ত ঘরোয়া হাসি-কান্নার পরিচয়েই আখ্যানগুলি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, পড়ে বেশ একটা আরাম পাওয়া যায়।

মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৬৮

'Asutosh Bhattacharyya is well-known in academic circles...His contribution to creative literature is all the more welcome, for it shows the man in the scholar...The stories are set against widely separated backgrounds and the plots are very often able to capture the mood of the locale...And one feels rather relieved that there is no psychological mish-mash or scholary trick in the stories.'

Hindusthan Standard, 1. 4. 62

'লেখকের কাছে কোন জীবনই ক্ষুদ্র নয়, কোন বেদনাই নগণ্য নয়, তাই সকল চরিত্রের প্রতিই তাঁহার গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহতের সন্ধান—ছোটগল্পের এই আদর্শ লেখকের প্রতিটি গল্পেই লক্ষিত হয়। তাঁহার কাহিনীর সহিত ভাষার সঙ্গতি রহিয়াছে। তাই গল্পগুলি শুধু পড়িতেই ভাল লাগে না—পড়িবার পরে পাঠককে ভাবিতে হয়—ভাবিবার পর নূতন সুরের সন্ধান লাভ করা যায়—এই খানেই মনে হয় লেখকের সর্বাধিক সার্থকতা।.........ইহার বহুল প্রচারে বাংলা ভাষার পাঠক সমাজ উপকৃত হইবেন।'

স্বাধীনতা, ২৬।৮।৬২

'আপনার গল্পগুলিতে মানুষ সর্বদায় কেন্দ্রস্থানে এবং তাহাতে humanism এর শক্তি আপনার গল্পগুলিরও শক্তি।.........আপনার চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষ, তাহাদের জীবন আপনি realistic manner দিয়া দেখাইয়াছেন। তারপর আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, তা না হলে আপনি এত জীবিত রূপে সাঁওতাল কুলির জীবন দেখাইতে পারিতেন না।......কয়েকটি গল্প আমরা রুষ ভাষায় অনুবাদ করিব।'

ভেরা নভিকভা, লেনিনগ্রাড্ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০।১।৬৩

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি, প্রণীত

বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড : আলোচনা

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

সুদৃশ্য রেক্সিনে বাঁধাই, রঙিন জ্যাকেটে মোড়া, প্রায় আটশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য বার টাকা পঞ্চাশ ন. প. মাত্র

'আলোচ্য গ্রন্থের লেখক দীর্ঘ কাল যাবৎ বাংলার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। একাধিক গ্রন্থে তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা লব্ধ জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকরা তাঁহার নিকট নানা ভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলার লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে সদ্য প্রকাশিত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা, শ্রম ও গবেষণার পরিচায়ক। তিনি এই গ্রন্থে বাংলার লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ ও পুরাকাহিনী সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপক-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই আলোচনা বহু উদ্ধৃতি দ্বারা মনোজ্ঞ ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-যুক্ত হইয়াছে। বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, যাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বহু কাল পুর্বে তাঁহার "ছেলে ভুলানো ছড়া" প্রবন্ধে সাহিত্যানুরাগীদের সর্বপ্রথম সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর বাংলা সাহিত্যের একাধিক ইতিহাস রচয়িতা লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, লোক-সাহিত্যের কিছু সংগ্রহও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ব্যাপক আলোচনা ইতিপুর্বে হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। লেখকের অধ্যবসায় আছে, তথ্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়; বুদ্ধিজাত যুক্তি-তর্ক দ্বারা লোক-সাহিত্যের রসবিচার তিনি করিয়াছেন। সেই কারণেই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের এক স্বল্পাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে অনেকখানি আলোক-সম্পাত করিয়াছে।'

—দেশ, ২০. ১১. ৫৪

'তীক্ষ্ণধীর সহিত গভীর শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে যাঁরা সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যের অধ্যয়ন-আলোচনায় ব্রতী হ'য়েছেন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন অগ্রগণ্য। তাঁর "বাংলার লোক-সাহিত্য" গ্রন্থখানি তাঁর মনীষার, কঠোর পরিশ্রম এবং নৈষ্ঠিক যত্নের শ্রদ্ধার্হ পরিচয় বহন করে।'

—**মাসিক বসুমতী**, পৌষ ১৩৬১

'বইটির প্রথম সংস্করণেই এ'র অভিনবত্ব ও মৌলিকতা দেশবাসীকে মুগ্ধ ক'রেছিল। নূতন সংশোধিত সংস্করণে এ'র বিষয়-সম্পদ যেমন আরও বেড়েছে, তেমনই আলোচনায় লোক-সংস্কৃতির ও গ্রাম্য মানসিকতার উপর অনেক নূতন দিকের আলোকপাতও করা হ'য়েছে। তাই এই বই থেকে বাংলা দেশকে (যে দেশের দশ আনা অংশ রাজনৈতিক ঘটনাবিপাকে মাতৃ-ভূমির বাইরে চলে গেছে) জানবেন যাঁরা, তাঁরা সমগ্র বাংলার প্রাণ-প্রবাহটিই অন্তরঙ্গ ভাবে চিনবেন। আমরা এই বইয়ের যোগ্য প্রচার ও সমাদর কামনা করি এবং সুধী গ্রন্থকারকে জানাই সাদর অভিনন্দন।'

—**যুগান্তর** (নন্দগোপাল সেনগুপ্ত) ১১. ৩. ৫৮

'An awakened nation that wants to know itself cannot afford to ignore it. ...The present work is the result of the author's long and extensive research, promted by sincere love for this 'genre' of literature. ......Serious students of literature will feel indebted to the present author for this valuable contribution.'

—**Hindusthan Standard**, 13. 3. 55